পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা-অনুষদের অন্তর্গত বাংলা বিভাগের অধীনে পি-এইচ্.ডি. উপাধি প্রাপ্তির জন্য উপস্থাপিত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষণা অভিসন্দর্ভের শিরোনাম

পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাপ্ত ছড়ায় লোকজীবন এবং সমাজচিত্রের পরিচয় অন্বেষণ ও তার পর্যালোচনা।

(bearing registration no 10018401214000005 of 2018)

গবেষক

(সুদীপ্তা মাইতি)

সহকারী শিক্ষিকা, বাংলা বিভাগ

খেজুরী গুরুপ্রসাদ বালিকা বিদ্যানিকেতন (উ.মা.)

খেজুরী ঃ পূর্ব মেদিনীপুর

বাংলা বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়

বারাসাত ঃ কলকাতা-১২৬

পশ্চিমবঙ্গ ঃ ভারতবর্ষ।

২০২১

পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়
বেরুনানপুকুরিয়া, মালিকাপুর, বারাসাত, উত্তর চব্বিশ পরগণা, কলকাতা- ৭০০ ১২৬
বাংলা বিভাগ

স্মারক নং ....   তারিখ ....

Certificate from the Supervisor

This is to certify that the thesis entitled "পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাপ্ত ছড়ায় লোকজীবন এবং সমাজচিত্রের পরিচয় অন্বেষণ ও তার পর্যালোচনা" submitted by Sudipta Maity, who got her name registered on June 2018, for the award of Ph.D. (Arts) Degree of West Bengal State University is absolutely based her own work under the Supervision of Professor Mohini Mohan Sardar, Professor & Head, Department of Bengali, West Bengal State University, Barasat, Kolkata-700126 and that neither her thesis nor any part of the thesis has been submitted for any degree or any other academic award anywhere before.

Signature of the Supervisor

(Mohini Mohan Sardar)
Professor & Head,
Department of Bengali
West Bengal State University
Barasat, Kolkata-700126

Phone : 033 2524 - 1975, 033 2524 - 1976 ▪ Fax : 033 2524 - 1977 ▪ Email: wbsubregistration.org.

লক্ষ্যং বিশ্বমানম্
পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়
বেরুনানপুকুরিয়া, মালিকাপুর, বারাসাত, উত্তর চব্বিশ পরগণা, কলকাতা- ৭০০ ১২৬
বাংলা বিভাগ

স্মারক নং .... তারিখ ....

Declaration

I, Sudipta Maity, bearing Ph.D. registration no 10018401214000005 dated 18.06.2018, hereby declared that the work described in this thesis entitled "পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাপ্ত ছড়ায় লোকজীবন এবং সমাজচিত্রের পরিচয় অন্বেষণ ও তার পর্যালোচনা" is entirely my won work. No portion of the work referred to in this thesis has been submitted in support of an application for another degree or qualification of this or any other University or Institute. Any help or source information, with has been availed in the thesis, has been duly acknowledged.

(Sudipta Maity)
Ph. D. Scholar
Department of Bengali
West Bengal State University
Barasat, Kolkata-700126

Phone : 033 2524 - 1975, 033 2524 - 1976 ▪ Fax : 033 2524 - 1977 ▪ Email: wbsubregistration.org.

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার এই গবেষণা কর্মটি দীর্ঘদিনের নিরলস শ্রমের ফসল। একই সঙ্গে মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমের ফলস্বরূপ আমার এই গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন হয়েছে। একাধিক ব্যক্তি বিভিন্নভাবে আমার সেই পরিশ্রমকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাই এই গবেষণা কর্মকে সার্থক রূপ দিতে গিয়ে আমি বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে একাধিক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে ঋণী হয়ে রয়েছি।

প্রথমেই আমি বলবো আমার শিক্ষক মহাশয় ড. মোহিনীমোহন সরদারের কথা। আমার গবেষণার বিষয়টি উনিই আমাকে ভাবতে সাহায্য করেছিলেন বিষয়টির সজ্জাতেও ওনার সাহায্য পেয়েছি। এই অবসরে স্যারের সেই ঋণ স্বীকার করছি এবং স্যারের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাচ্ছি।

কাঁথি মহকুমা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারের কর্মীদের প্রতি আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বারবার তাঁরা আমাকে বিভিন্ন গ্রন্থ এবং পত্র-পত্রিকা দেখার এবং পড়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা গ্রন্থাগার যথা ন্যাশান্যাল লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলাগাছিয়া লাইব্রেরী, মহাজাতী সদন লাইব্রেরী প্রভৃতি গ্রন্থাগারে আমি গ্রন্থ ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছি। এই সমস্ত পুস্তকাগারের গ্রন্থাগারিক ও কর্মীদের প্রতি আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এছাড়াও সাহায্য নিয়েছি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে। তাদের আধিকারিক ও কর্মচারীদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া বহু তথ্য আমার গবেষণা কর্মকে সমৃদ্ধ করেছে। তাই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে উপকৃত সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতি এবং তাঁদের আধিকারিকদের প্রতি আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ও ঋণ স্বীকার করছি।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথিতযশা প্রাক্তন অধ্যাপিকা ড. সুমিতা চক্রবর্তী আমার গবেষণার বিষয়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টিকোণের সন্ধান দিয়েছেন। এই অবসরে তাঁকেও আমি প্রণাম জানাই। প্রণাম জানাই আমার শিক্ষক মহাশয় এবং লোকসংস্কৃতিবিদ্ ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী মহাশয়কে। বহুবার বহুভাবে তিনি আমাকে এই গবেষণা কর্মে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা জানাই মাননীয় অধ্যক্ষ ড. অসীমকুমার মান্না মহাশয়কেও, যিনি বিভিন্নভাবে তথ্য প্রদানে আমাকে সাহায্য করেছেন।

আমার অভিভাবক ও পিতৃসম অধ্যাপক অমলেন্দু বিকাশ জানার উৎসাহ ও প্রেরণায় এযাবৎকাল বহু বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়েও আমি আমার গবেষণার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে রাখতে পেরেছি। কখনও পুস্তক দিয়ে, কখনও মতামত প্রদান করে, কখনও বা কোনো বিশেষ বিষয়ের বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তিনি আমার গবেষণা কর্মকে অনেকখানি সহজ ও সাবলীল করে দিয়েছেন। তাঁকে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম জানাই।

এছাড়াও রয়েছে আমার স্নেহের বহু ছাত্রী এবং তাদের পরিবার ও পরিজন, যাঁরা অকুণ্ঠভাবে আমার গবেষণার ক্ষেত্র সমীক্ষা লব্ধ মাটির ফসল 'ছড়া' সংগ্রহে আমাকে সাহায্য করেছেন। সাহায্য করেছেন আমার বিদ্যালয়ের কোনো কোনো সহকর্মী, তাঁদেরকেও জানাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্মান। কৃতজ্ঞতা জানাই ছড়া সংগ্রাহক মাধব সামন্ত, বৃহস্পতি মণ্ডল, নিকুঞ্জ বেরা, মানস বেরা, রত্যেন হাজরা, মিঙ্কু সৎপতি, কার্তিক ডিঙ্গাল, শশধর সামন্ত, ইন্দুবালা মণ্ডল, সমাপ্তি সামন্ত, সুপ্রভা ভূঞ্যা, বিভাষ মাইতি, প্রতিমা নায়েক, ননীবালা বেরাকে, এঁরা প্রতেকেই ছড়া সংগ্রহ করে দিয়ে আমার গবেষণা কর্মটিকে সম্পূর্ণতা দান করেছেন। এই প্রসঙ্গে আমার ক্ষেত্র সমীক্ষার দুই উপকূলীয় অঞ্চলের বাসিন্দা বহু গ্রামীণ সহজসরল অধিবাসীবৃন্দ এবং তাঁদের ছোটো বড় সকলকেই জানাই আমার প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা।

বিশেষত আমার জননী আরতি মাইতি তাঁর স্মৃতি থেকে অনেক ছড়া আমাকে দিয়ে আমার ছড়ার সংগ্রহকে সমৃদ্ধ করেছেন। এই অবসরে তাঁকেও আমি প্রণাম জানাই।

এছাড়া উপকূলীয় অঞ্চলের সব ধর্ম এবং বর্ণের ও বিভিন্ন পেশায় যুক্ত থাকা সাধারণ মানুষজনকেও আমি আমার শ্রদ্ধা এবং প্রণাম জানাচ্ছি, কারণ অনেক সময় তাঁরাও তাঁদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে ছড়া দিয়ে আমার ছড়া সংগ্রহকে সমৃদ্ধ ও পুষ্ট করেছেন।

আমার জীবনসঙ্গী বিশ্বজিৎ মান্না তাঁর মূল্যবান সময়, সুপরামর্শ এবং ক্ষেত্র সমীক্ষার অন্যতম সহায়ক হিসেবে গবেষণাকর্মকে সম্পূর্ণতাদানে সহায়তা করেছেন। এই অবসরে তাঁকেও আমি শ্রদ্ধা সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

গবেষণাকর্মটিকে যিনি ছাপার অক্ষরে বাস্তবতা দান করেছেন, 'ছবি লেজার' প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ও মুদ্রণশিল্পী মহাশয়কেও আমি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, সম্মান ও প্রণাম জানাই।

সুদীপ্তা মাইতি

সহকারী শিক্ষিকা, বাংলা বিভাগ

খেজুরী গুরুপ্রসাদ বালিকা বিদ্যানিকেতন (উ.মা.)

প্রাক্‌কথন

পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় জনপদবাসীর জীবনযাপনের সঙ্গো ছড়ার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। রোজকার জীবনচর্যায়, কথাবার্তায়, আড্ডায় তাঁরা প্রচলিত ছড়ার প্রয়োগ করে থাকেন। আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভের মূল অন্বেষণ পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাপ্ত সেইসমস্ত ছড়ায় উক্ত অঞ্চলের লোক-জীবনচর্যা ও সমাজচিত্রের পরিচয় উদ্ধার এবং তার পর্যালোচনা।

বর্তমান অভিসন্দর্ভে যে ছড়াগুলি ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলি পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলে লোকমুখে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত রয়েছে। সময়ের গ্রাসে অনেকক্ষেত্রে ছড়াগুলির জীবনীশক্তি হারিয়ে যেতে বসেছে, সক্ষম স্মৃতির লালনে এখনো ছড়াগুলি তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। অক্লান্ত অনুসন্ধানের ফল হিসেবে আলোচ্য ছড়াগুলি সংগ্রহ এই গবেষণার মূল সম্পদ বলে মনে করি। পূর্ব মেদিনীপুরের বিভিন্ন অঞ্চলের বয়স্ক নারী-পুরুষের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে ছড়াগুলি সংগৃহীত হয়েছে। সাক্ষাৎকারগুলি ক্ষেত্রসমীক্ষার স্থিরচিত্রের মাধ্যমে, কখনো কখনোবা স্বরগ্রাহক যন্ত্রে এবং অধিকাংশসময় খাতায় কলমে সংগ্রহ করার প্রয়াস করেছি।

সংগৃহীত ছড়ার সংখ্যা ৩৬০-এর অধিক। গবেষণা অভিসন্দর্ভে ছড়াগুলিকে বিষয়ানুগ বিভাজনে, পর্যায়ক্রমিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে কতকগুলি অধ্যায়ভিত্তিক পরিকাঠামোতে সজ্জিত করার চেষ্টা করেছি ; সেখানে ইতিহাস সূত্রে, ব্যবহারিকসূত্রে, পরিবেশগতসূত্রে, কখনওবা নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ছড়াগুলিকে বিশ্লেষণ করে বেশ কিছু তত্ত্বমূলক সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করেছি। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রাপ্ত ছড়ার দৃষ্টান্ত উদ্ধার করার চেষ্টার পাশাপাশি তাদের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এবং ছড়াগুলির গুরুত্বের সামাজিক দিকগুলিকে উদ্ধার করার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রথম পর্যায়ে ছড়াগুলি যথাযথ সংগ্রহের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। শুধু বিষয়গত উপস্থাপনা নয়, উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে উচ্চারিত ছড়াগুলির ভাষারূপও ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস করা হয়েছে। এই কাজে Random Sampling -এর সাহায্যে কিছু ছড়ার শুদ্ধ পাঠ উদ্ধার করা হয়েছে। একই ছড়া বক্তাদের উচ্চারণভেদে কেমনভাবে তার ভাষা ও উচ্চারণের রূপ বদলে যায় তাও উদ্ধার করার চেষ্টা করেছি আমরা। এই প্রয়াসে খুব সহজেই উপকূলীয় অঞ্চলের লোকভাষার একটি সাহিত্যিক রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আশুতোষ ভট্টাচার্য, সুশীল কুমার দে প্রমুখ সাহিত্যিক এবং গবেষকও ছড়ার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁদের সেই প্রয়াস আজও সারস্বত সমাজে বিশেষ মূল্য ও সম্মান পায়। তাঁদের সংগ্রহের বাইরেও এখনও যে বহু অসংগৃহীত ছড়া আছে, আমার গবেষণায় সেকথা স্পষ্ট হয়। তাই ছড়ার আলোচনায় এই গবেষণাগ্রন্থের গুরুত্ব যে আছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ধন্যবাদসহ

সুদীপ্তা মাইতি।

সূচিপত্র

ক্রমিক নং অধ্যায় সূচিপত্রের বিষয় পৃষ্ঠা সংখ্যা

ভূমিকা vii-x

১. প্রথম অধ্যায় ঃ লোকছড়ার সাধারণ আলোচনা ঃ সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, লোকছড়ার ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান ১-৪০

১.১ প্রথম অধ্যায়, ১. লোকছড়ার সংজ্ঞা বিষয়ক সাধারণ আলোচনা।

১.২ প্রথম অধ্যায়, ২. লোকছড়ার বৈশিষ্ট্য সন্ধান।

১.৩ প্রথম অধ্যায়, ৩. লোকছড়ার ইতিবৃত্ত সন্ধান।

২. দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ক্ষেত্রসমীক্ষা ঃ নির্বাচিত ভৌগোলিক অঞ্চলের পরিচয় উদ্ধার ও তার পর্যালোচনা ৪১-১২৭

২.১ দ্বিতীয় অধ্যায়, ১. পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলের মানচিত্র।

২.২ দ্বিতীয় অধ্যায়, ২. ভৌগোলিক অবস্থান ঃ নদী উপকূল এবং সমুদ্র উপকূল।

২.৩ দ্বিতীয় অধ্যায়, ৩. ক্ষেত্রসমীক্ষা অঞ্চল।

২.৪ দ্বিতীয় অধ্যায়, ৪. লোকজীবন ও অর্থনৈতিক অবস্থা।

২.৫ দ্বিতীয় অধ্যায়, ৫. সামাজিক ও পারিবারিক পরিকাঠামো।

২.৬ দ্বিতীয় অধ্যায়, ৬. বিনোদন।

২.৭ দ্বিতীয় অধ্যায়, ৭. শিক্ষা পরিকাঠামো।

২.৮ দ্বিতীয় অধ্যায়, ৮. ভাষা।

২.৯ দ্বিতীয় অধ্যায়, ৯. মানচিত্র।

২.১০ দ্বিতীয় অধ্যায়, ১০. সাক্ষাৎকার।

৩. তৃতীয় অধ্যায় ঃ ছড়ায় বিজ্ঞান মনস্কতা, অর্থবিজ্ঞান এবং ভাষাবিজ্ঞান চেতনার অনুসন্ধান ও তার বিশ্লেষণ। ১২৮-১৭৬

৩.১ তৃতীয় অধ্যায়, ১. ছড়ায় অর্থবিজ্ঞান চেতনার অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ।

৩.২ তৃতীয় অধ্যায়, ২. ছড়ায় ভাষাবিজ্ঞান চেতনার অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ।

৩.২.ক ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিচয়।

৩.২.খ রূপতাত্ত্বিক পরিচয়।

৩.৩.গ বাক্যগঠনগত বৈশিষ্ট্য।

৪. চতুর্থ অধ্যায় ঃ একটি তুলনামূলক অনুসন্ধান ঃ লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখা বনাম ছড়া। ১৭৭-২১১

৪.১ চতুর্থ অধ্যায়, ১. ছড়া ও ধাঁধা।

৪.২ চতুর্থ অধ্যায়, ২. ছড়া ও প্রবাদ।

৪.৩ চতুর্থ অধ্যায়, ৩. ছড়া ও লোকগান।

৪.৪ চতুর্থ অধ্যায়, ৪. ছড়া ও গীতিকা।

৪.৫ চতুর্থ অধ্যায়, ৫. ছড়া ও লোককথা।

৪.৬ চতুর্থ অধ্যায়, ৬. ছড়া ও লোকপুরাণ।

৫. পঞ্চম অধ্যায় ঃ পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাপ্ত ছড়ায় নান্দনিক রূপের অনুসন্ধান এবং কাব্য, নাটক, কথাসাহিত্যে তাদের প্রয়োগের উপযোগিতা বিচার। ২১২-২৪৩

৫.১ পঞ্চম অধ্যায়, ১. ছড়ায় নান্দনিক রূপ।

৫.২ পঞ্চম অধ্যায়, ২. কাব্য, নাটক, কথা সাহিত্যে ছড়ার উপযোগিতা বিচার।

৬. ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাপ্ত ছড়ার বিষয়বৈচিত্র্য ও গঠনশৈলী বিচার। ২৪৪-৩৯৪

৬.১ ষষ্ঠ অধ্যায়, ১. বিষয়বস্তুগত দিক ঃ

৬.১.১ সমাজ বিষয়ক ছড়া।

৬.১.২ প্রকৃতি বিষয়ক ছড়া।

৬.১.৩ জাদু বিষয়ক ছড়া।

৬.১.৪ প্রেম বিষয়ক ছড়া।

৬.১.৫ প্রতিবাদ বিষয়ক ছড়া।

৬.১.৬ বিবিধ বিষয়ক ছড়া, (ক্রীড়া, বর্তমান, জাতি, রাজনীতি, পাঠান্তর, রঙ্গ-ব্যঙ্গ মূলক ছড়া)

৬.২ ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ ২. গঠনশৈলী বা আঙ্গিকগত দিক

৬.২.১ বাক্যনির্ভর ছড়া।

৬.২.২ পংক্তিনির্ভর ছড়া।

৬.২.৩ মিল ও ছন্দধর্মী ছড়া।

৬.২.৪ শব্দ ও সৌকর্যগত ছড়া।

৬.২.৫ শৃঙ্খলামূলক ছড়া।

৬.২.৬ বিপরীত ভাবধর্মী ছড়া।

৬.২.৭ প্রশ্ন-উত্তর ধর্মী ছড়া।

৬.২.৮ পুনরাবৃত্তিমূলক ছড়া।

৬.২.৯ চিঠিধর্মী ছড়া।
৬.২.১০ গল্পকথনধর্মী ছড়া।
৬.২.১১ পুরুষের ছড়া।
৬.২.১২ নারীর ছড়া।
৬.২.১৩ শিশুদের ছড়া।

৭. সপ্তম অধ্যায় ঃ ছড়ায় ব্যবহারিক জীবন ও নারী, পুরুষ, শিশু এবং সমাজ সম্পর্কিত মনস্তত্ত্বের অনুসন্ধান ও তার পর্যালোচনা। ৩৯৫-৪২৪
৭.১ সপ্তম অধ্যায়, ১. ছড়ায় ব্যবহারিক জীবন ও নারী মনস্তত্ত্ব।
৭.২ সপ্তম অধ্যায়, ২. ছড়ায় পুরুষ মনস্তত্ত্ব।
৭.৩ সপ্তম অধ্যায়, ৩. ছড়ায় শিশু মনস্তত্ত্ব।
৭.৪ সপ্তম অধ্যায়, ৪. সমাজ মনস্তত্ত্বের অনুসন্ধান।

৮. অষ্টম অধ্যায় ঃ প্রাপ্ত ছড়ার মোটিফ অন্বেষণ এবং তার গ্রহণযোগ্যতা বিশ্লেষণ। ৪২৫-৪৪১

৯. নবম অধ্যায় ঃ একালে এই জাতীয় চর্চার প্রাসঙ্গিকতা বিচার। ৪৪২-৪৪৮

১০. পরিশিষ্ট ঃ ৪৪৯-৬০২
১০.১ পরিশিষ্ট, ১. গবেষণা অভিসন্দর্ভের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক চিত্র ও তথ্যাবলী।
১০.২ পরিশিষ্ট, ২. সংগৃহীত দুষ্প্রাপ্য ও অপ্রকাশিত ছড়ার সংকলন।
১০.৩ পরিশিষ্ট, ৩. অতিরিক্ত ছড়ার সংকলন।

গ্রন্থপঞ্জী ৬০৩-৬০৭

অবতরণিকা

লোকসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সম্পদ হল ছড়া। অজ্ঞাতপূর্বকালের[১] এই ছড়াগুলি লোক মুখে মুখে বাহিত ও চর্চিত হয়ে আসলেও স্মৃতি ও শ্রুতিবাহিত ছড়াগুলি আজ কাল ব্যস্ততার ভিড়ে ও সময়ের গ্রাসে সমাজ থেকে তাদের অস্তিত্ব ক্রমশ হারিয়ে ফেলছে। তার মাঝেও বেশকিছু ছড়া আজও তাদের জীবনীশক্তি অটুট রেখেছে। আমি এই বিস্মৃতমান মাটির ফসলগুলিকে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার জন্য চেষ্টা করেছিমাত্র। সেই কারণে আমি আমার অতি পরিচিত চির শৈশবের জন্মভূমি পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলকে বেছে নিয়েছি আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভের বিষয় হিসেবে। গবেষণা অভিসন্দর্ভের শিরোনাম হিসাবে "পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাপ্ত ছড়ায় লোকজীবন এবং সমাজচিত্রের পরিচয় অন্বেষণ ও তার পর্যালোচনা" নামটি নির্বাচন করেছি। গবেষণা অভিসন্দর্ভের মধ্যে যে সমস্ত ছড়াগুলো গ্রামে-গঞ্জে, নদী-নালা, মাঠ-ঘাট, বাঁশবনের বাতাসে আজও অবহেলায় অনাদরে লালিত হচ্ছে সেই সমস্ত ছড়াগুলোকে সংগ্রহ করে সাহিত্যের সাধকের অঙ্গানে প্রতিষ্ঠা করাই আমার গবেষণার মূল উদ্দেশ্য।

১৯৯৭ সালে যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ বিষয় হিসেবে লোকসাহিত্য নিয়ে স্নাতকোত্তর শংসাপত্র লাভ করেছি, তখন থেকেই ফল্গুধারার মতো হৃদয়ের অন্তরালে যে কথা প্রায়ই শুনতে পেতাম, তা হল ছড়া সংগ্রহ করা। বলতে গেলে সেইদিন থেকেই আমার সংগ্রহের কাজ শুরু। তারপর ঘুরে বেড়ালাম আমারই চেনা পূর্ব মেদিনীপুরের অন্তর্গত চার মহকুমায়। হলদিয়া, তমলুক, কাঁথি, এগরা এই চার উপকূলীয় অঞ্চল হল আমার ছড়া সংগ্রহের ক্ষেত্রভূমি। কবি সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'ছেলে ভুলানো ছড়া' প্রবন্ধের প্রথমেই বলেছেন,

"বাংলা ভাষায় ছেলে ভুলাইবার জন্য যে-সকল মেয়েলি ছড়া প্রচলিত আছে, কিছুকাল হইতে আমি তাহা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম।"[২]

কবির কথার সুরে সুর-মিলিয়ে বলি ছড়া কেবল ছড়া নয়, এই জাতীয় ফসলগুলি আমাদের অতীত ভাষা, অতীত লোকসমাজ, তাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি, জীবনযাপন প্রণালী, আচার বিচার, অতীত-ঐতিহ্য তথা ইতিহাসকে জানার অন্যতম মাধ্যম। আমাদের না দেখা না জানা অতীতের আদি তার আদি এবং তস্য আদি পিতামহ মাতা মহীগণের মিষ্টি মধুর সুর লহরী নিঃসৃত বাণী নূপুর-নিক্কনের মতো মৃদু তরঙ্গে আজও আমাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট

হয়। আর সেই সুমধুর ধ্বনি-তরঙ্গ ঊর্মি ভাঙতে ভাঙতে আজ নদী সমুদ্র উপকূলে আছড়ে পড়ে কোথায় যেন জনসমুদ্রে অদৃশ্য হতে বসেছে। তাই সেই তরঙ্গ মালাগুলিকে আহরণে সার্থক ও সুন্দর করে শুধু রেখে দেওয়া নয়, আগামী পৃথিবীর ভাবী প্রজন্মের হাতে তুলে দেওয়াই আমার গবেষণার মূল অভিপ্রায়। লোকসাহিত্য বা তার মধ্যকার অংশ ছড়া, আজ আর অক্ষর জ্ঞানহীন, অমার্জিত, অপরিশীলিত ব্রাত্যজনের সাহিত্য নয়, লোকসাহিত্য আজ শিক্ষিত জনেরও সাহিত্য। অতীতে এই মাটির ফসলগুলি মুখে মুখে চর্চিত হত বলে অনেকে মনে করেন ছড়াগুলির বুঝি শিক্ষিত সমাজে কোনো জায়গা নেই। আজ আর তা কেউ মনে করেন না। এদেশের বহুপূর্বে পাশ্চাত্যে তাই লোকসাহিত্যের ব্যাপক পরিধি প্রসারিত হয়েছে এবং তার চর্চাও সংগ্রহের কাজও শুরু হয়ে গেছে। অনেক সাহিত্য রচিত হয়েছে এখনও হচ্ছে এবং সেইসঙ্গে চলছে গবেষণার কাজও। সেই সূত্র ধরে আমরা বাঙালিরাও আর পিছিয়ে না থেকে ছড়াসাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিতে পারি। যা আজ আঞ্চলিক আগামীতে তা আন্তর্জাতিক হয়ে উঠতে পারে। এ প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য—

"বাংলার ছড়াগুলির একটি প্রধান গুণ এই যে, লোকসাহিত্যের অন্যান্য কোন কোন বিষয়ের মত ইহারা যে কেবলমাত্র আঞ্চলিক, অর্থাৎ একই অঞ্চলে সীমাবদ্ধ তাহা নহে, —অনুসন্ধানের ফলে দেখা গিয়াছে যে, একটি ছড়া যে কোন ভাবেই হোক, বাংলাদেশের এক প্রান্তে রচিত হইলেও কালক্রমে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত অনায়াসেই বিস্তার লাভ করিয়াছে। যে সকল সাংস্কৃতিক উপকরণ দ্বারা সমগ্র বাঙালীর মধ্যে কালক্রমে একটি অখণ্ড ঐক্য সৃষ্টি হইয়াছে, ছড়া তাহাদের অন্যতম ;"[৩]

শুধু অতীত ঐতিহ্য নয় আমাদের অতীত ভাষা নির্ণয়ের পক্ষে ছড়াগুলির বিশেষ মূল্য আছে। কালের প্রবাহে ভাষা কীভাবে পরিবর্তিত হয়, ভাষার সঙ্গে সঙ্গে তার রূপগত ধ্বনিতত্ত্বগত এবং বাক্যগঠনগত নানা পরিবর্তন হচ্ছে। ছড়াও আমাদের ভাষার উপরিউক্ত পরিবর্তনকে বহন করে চলেছে। আর যে কারণে ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় ও ছড়ার গুরুত্ব অনুভূত হচ্ছে। প্রবহমান এই মৌখিক সাহিত্য আজ তাই বহুচর্চিত এবং আলোচিত গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে, আকৃতি ও প্রকৃতিতে ছড়াধর্মী প্রবাদগুলিকেও আমি আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভে স্থান দিয়েছি।

পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলে রয়েছে অজস্র ছড়া ভাণ্ডার। গ্রামের অভ্যন্তরে

জীর্ণ দীন দরিদ্র মাটির কুঁড়ে ঘরে বসে হয়তো অন্নাভাব দেখা যাবে, দেখা যাবে না ছড়ার অপ্রতুলতা। বুড়ো-বুড়ির দল গ্রামের প্রান্তে শাঁকোর পাশে, বাঁশবাগানের মোড়ে, কিংবা গুমটি[৪] দোকানের পাশে জন পাঁচ-ছয় বসে একসাথে এখনো মনের সুখে ছড়া বলে। রাত নামে, আকাশের বুকে চাঁদ-তারা আলোছায়া খেলে, তার-ই আলো-আঁধারি জ্যোৎস্না মেখে মাথা ভর্তি পাকা চুল নিয়ে তারা আজও তাদের ছড়ার পসরা ফেরি করে। তার-ই কিছু কিছু স্মৃতি ও বিস্মৃতি নিয়ে আমার ছড়ার পথ হাঁটা। রোজ্‌নামচায় তাদের আড্ডায় গার্হস্থ্য জীবনচর্চায় ছড়াগুলি আজও ভাস্বর, অমর। সেই পূর্বের অসংগৃহীত ছড়াগুলি ক্ষুদ্র বেলফুলের ন্যায় সৌরভে গৌরবে লোকসাহিত্যের ধারাকে আরো যে সমৃদ্ধ করবে তা সহজেই বলা যায়।

'পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাপ্ত ছড়ায় লোকজীবন এবং সমাজচিত্রের পরিচয় অন্বেষণ ও তার পর্যালোচনা' শীর্ষক এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের বিষয়কে মোট নয়টি অধ্যায়ে বিভাজন করে আলোচনায় অগ্রসর হয়েছি। প্রথম অধ্যায়ে লোকছড়ার সাধারণ আলোচনায় রয়েছে সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য এবং লোকছড়ার ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান। দ্বিতীয় অধ্যায় ক্ষেত্রসমীক্ষা অঞ্চল, যেখানে আলোচিত হয়েছে নির্বাচিত ভৌগোলিক অঞ্চলের পরিচয় উদ্ধার ও তার পর্যালোচনার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেত্রসমীক্ষা অঞ্চলের মানচিত্র এবং ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকার। তৃতীয় অধ্যায়ে ছড়ায় বিজ্ঞান মনস্কতার আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে অর্থবিজ্ঞান এবং ভাষাবিজ্ঞান চেতনার অনুসন্ধান ও তার বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়েছি আমরা। তুলনামূলক অনুসন্ধানে লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখা বনাম ছড়ার স্বরূপ সন্ধানে আমরা আগ্রহী হয়েছি গবেষণা অভিসন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায়ে। গবেষণা অভিসন্দর্ভের পঞ্চম অধ্যায়ে পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাপ্ত ছড়ায় নান্দনিক রূপের অনুসন্ধান ও কাব্য-নাটক-কথাসাহিত্যে তাদের উপযোগিতা বিচার করে ছড়াগুলির গুরুত্ব ও সাহিত্যে তার সফল প্রয়োগ দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ক্ষেত্রসমীক্ষায় লব্ধ ছড়াগুলির বিষয়ভিত্তিক বিভাজন এবং গঠনশৈলী বিচার-ই আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। ছড়ায় ব্যবহারিক জীবন ও নারী, পুরুষ, শিশু এবং সমাজ সম্পর্কিত মনস্তত্ত্বের বিচার বিশ্লেষণে আগ্রহী হয়েছি গবেষণার সপ্তম অধ্যায়ে। অষ্টম অধ্যায়ে প্রাপ্ত ছড়ার মোটিফ অন্বেষণ এবং তার গ্রহণযোগ্যতা বিশ্লেষণ-ই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য হয়েছে। এবং অন্তিম অধ্যায়ে একালে এই জাতীয় ছড়া চর্চার প্রাসঙ্গিকতা বিচার-বিষয়ক একটি আলোচনা করার চেষ্টা করেছি আমরা। অধ্যায়ের

শেষে পরিশিষ্ট অংশে তিনটি বিষয় সংযোজিত হয়েছে, এক-গবেষণা অভিসন্দর্ভের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলীর চিত্র এবং দুই-সংগৃহীত দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্মূল্য ছড়ার সংকলন ও তিন অতিরিক্ত ছড়ার সংকলন এবং পরিশেষে সহায়ক গ্রন্থপঞ্জির তালিকা।

প্রসঙ্গ নির্দেশ ও মন্তব্য ঃ

১। অজ্ঞাতপূর্বকাল ঃ যে কাল নির্ধারিত হয়নি তারও আগের ইংরেজিতে যাকে 'Protto' বলে।

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'লোকসাহিত্য', প্রকাশক বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ২০০৪, কলি-১৭।

৩। আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য ২য় খণ্ড ঃ ছড়া, প্রকাশক-ক্যালকাটা বুক হাউস প্রকাশ ১৯৬২, কলি-১২।

৪। গুমটি ঃ গুমটি হল কাঠের দোকান, যার উপরের ছাউনী টিন দিয়ে। তিনদিক বন্ধ এবং সামনের দিকে বাঁয়ে অথবা ডানে ছোট্ট একটা দরজা, বাকিটা ঝাপ বন্ধ, যে পথ দিয়ে দোকানী দোকানের ভিতরে যাওয়া আসা করে। এবং ঐ দরজার সামনে বসে ক্রেতাকে বাজার দ্রব্য বিক্রি করে।

—ঃঃ—

প্রথম অধ্যায়

লোকছড়ার সাধারণ আলোচনা ঃ সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, লোকছড়ার ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান।

লোকছড়ার সাধারণ আলোচনাকে তিনটি উপবিভাগে ভাগ করা যায়, যথা ঃ

১. লোকছড়ার সংজ্ঞা বিষয়ক সাধারণ আলোচনা।

২. লোকছড়ার বৈশিষ্ট্য সন্ধান।

৩. লোকছড়ার ইতিবৃত্ত সন্ধান।

১. লোকছড়ার সংজ্ঞা বিষয়ক সাধারণ আলোচনা ঃ

আমরা জানি লোকসংস্কৃতির দুটি বিভাগ, একটি Material Folklore বা বস্তুগত লোকসংস্কৃতি এবং অপরটি Non Material Folklore বা অবস্তুগত লোকসংস্কৃতি। অবস্তুগত লোকসংস্কৃতির একটি অন্যতম বিভাগ হল লোকসাহিত্য, যার মধ্যে আছে ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধা, গীতি, কথা প্রভৃতি বিষয়গুলি। আমাদের আলোচ্য বিষয় ছড়া। লোকসাহিত্যের অন্যান্য উপধারাগুলির মধ্যে ছড়া হল অতি প্রাচীন একটি বিষয়, যাকে আমরা মৌখিক সাহিত্য বা Oral Litareture ও বলি। ছড়া সাধারণত লোক মুখে মুখে চর্চিত ও রচিত। তবে ছড়া প্রথমাবস্থায় কোনো ব্যক্তির দ্বারা রচিত হলেও পরে তা সমষ্টি কর্তৃক গ্রহণ বর্জনের মাধ্যমে (recreation theory বা পুণঃ সৃষ্টি তত্ত্ব) সমষ্টির রচনায় পরিণত হয়। লৌকিক ছড়ায় তাই কোনো রচয়িতার পরিচয় পাওয়া যায় না। ছড়াগুলি যেহেতু মৌখিক, স্মৃতি চর্চিত, তাই এর নানা ভাষান্তর বা পাঠান্তরও পাওয়া যায়। অজ্ঞাতপূর্বকাল থেকেই এই ছড়াগুলি ছন্দে রচিত ও পদ্যধর্মী।

'ছড়া' শব্দ নিয়ে এখন পর্যন্ত যা আলোচনা হয়েছে, তাকে নির্মলেন্দু ভৌমিক তাঁর 'বাঙালা ছড়ার ভূমিকা'[১] গ্রন্থে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করেছেন। প্রথমতঃ 'ছড়া' শব্দটি অধুনা লোকসাহিত্যের অঙ্গীভূত একটি বিশেষ শ্রেণিকে বোঝালেও আভিধানিকগণ প্রায় সকলেই গ্রাম্য কবিতাকে বুঝিয়েছেন। 'গ্রাম্যকবিতা'[২] মানেই যে 'লোকসাহিত্য' তা কিন্তু নয়। দ্বিতীয়তঃ আভিধানিকগণের মতে ছড়ার সঙ্গে মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্য (কবিগান, পাঁচালি, তরজা প্রভৃতি) সংগীতের যোগ ছিল। তৃতীয়তঃ আধুনিক

যুগে ছড়া মেয়েলি ব্যাপার হলেও তখন ছড়ায় নারী-পুরুষ ভেদ রক্ষিত হতো না। চতুর্থতঃ ছড়া 'আবৃত্তি' করবার সঙ্গো সঙ্গো তার রচনা কর্মটিও লক্ষ্য করবার মতো। ছড়া আসরে রচিত হতো দুভাবে—পূর্বপরিকল্পিতভাবে এবং হঠাৎ করে। আর এই দুই ধরণের রচনা কর্মের মধ্যে একটা 'সাহিত্যিক' নির্মিতিকে স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। পঞ্চমতঃ ছড়া বলতে ধাঁধা-হেঁয়ালিও বটে। নির্মলেন্দু ভৌমিকের মতে, আসরে দাঁড়িয়ে রচিত ছড়া স্বাভাবিক কারণেই আকারে ছোট হতো। কেননা, আসরে দাঁড়িয়ে ছোট আকারের ছড়ার মধ্যে বাদ প্রতিবাদের রস যেমন প্রকাশিত হত তেমন শ্রোতাদের উপর তা গভীর প্রভাব ফেলতেও সক্ষম হত।[৩]

'ছড়া শব্দটির উল্লেখ প্রসঙ্গো নির্মলেন্দু ভৌমিক বলেছেন, সুকুমার সেন সঙ্কলিত An Etymological Dictionary of Bengali[৪] (Calcutta : 1971. Vols. I, II) গ্রন্থে ছড়া শব্দটির উল্লেখ নেই।[৫] সুতরাং নির্মলেন্দু ভৌমিকের মতানুযায়ী বলা যায় যে, 'ছড়া' শব্দটি কেবল পশ্চিমবঙ্গোই লোক ব্যবহারে চলিত ছিল। সুকুমার সেন অবশ্য দৃঢ়তার সঙ্গো জানিয়েছেন যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে শব্দটির হদিশ মেলে নি— তবে আভিধানিক জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস পদাবলীর চণ্ডীদাসের পদ থেকে উদ্ধৃতি উদ্ধার করে 'ছড়া' শব্দের প্রয়োগ দেখিয়েছেন। আধুনিককালে কেবল পশ্চিমবঙ্গোই কবি পাঁচালী তরজা গানের মধ্যে 'ছড়া' শব্দটির ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়। 'ছড়া' শব্দের নানান প্রতিশব্দ মধ্যযুগে প্রচলন ছিল। নির্মলেন্দু ভৌমিকের তথ্যানুযায়ী হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'শিকলি' বা 'সিকলি' শব্দটির উল্লেখ করেছেন, (শব্দটি শৃঙ্খলিকা শব্দ থেকে জাত বলে অনুমান করেছেন সুকুমার সেন)। উদাহরণ হিসেবে—'নাচাড়ি শিকলি রূপ কহিব বিদিত' (শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গাল)। নির্মলেন্দু ভৌমিকের মতে 'পূর্বপাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' (ঢাকা, বাঙালা একাডেমী ঃ নভেম্বর ১৯৬৫) গ্রন্থে বলা হয়েছে পাবনা জেলার লোকভাষাতে 'ছড়া' বলতে 'শিকেলি'[৬] শব্দই চলিত আছে, মধ্যযুগেও একই অর্থে এর প্রয়োগ ছিল। অধুনা বাংলাদেশের পাবনা জেলায় এই একই অর্থে এর প্রয়োগ ছিল 'সক্‌কোল'। পূর্ব পশ্চিমবঙ্গো 'ছড়া' বলতে 'শ্লোক' শব্দের তদ্ভব রূপটি ছিল, এখনও প্রচলিত আছে। পশ্চিমবঙ্গোও 'ছড়া' শব্দের বদলে শ্লোক বা শোলোক এখনও ব্যবহৃত। 'ছড়া' অর্থে শ্রীহট্টে 'পই' < পদ এবং 'দিঠান' < দৃষ্টান্ত দুটি বিশেষ শব্দ চলিত আছে। বাংলার লোকভাষাতে ছড়া প্রবাদ ধাঁধা মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

লোকসাহিত্যের এই বিভাগগুলির মধ্যে কোন্ বিভাগটি আগে উদ্ভূত এই বিষয়ে পণ্ডিত মহলে নানান মত থাকলেও ছড়া যে সর্বপ্রথম উদ্ভব হয়েছিল সেকথা আজ অনেকেই স্বীকার করেন। আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে—

> "বাংলার লোকসাহিত্যে ছড়ারই যে সর্বপ্রথম উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। আধুনিককালে সংগৃহীত ছড়াগুলির ক্রম পরিবর্তিত রূপের মধ্যে ইহাদের উদ্ভবের কাল যতই অস্পষ্ট হউক না কেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের প্রথম প্রান্তে যে ডাক ও খনার নামে প্রচলিত ছড়াগুলি অবস্থিত, সে বিষয়ে কেহই সংশয় প্রকাশ করেন না। অতএব বাংলার লোকসাহিত্যের আলোচনায় ছড়াই সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য।"[৭]

এ প্রসঙ্গে নির্মলেন্দু ভৌমিক বলেছেন ঃ

> "যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন ভাবেই এক একটি বিভাগের উদ্ভব হয়েছে, তবে বলব, ছড়ার ব্যাপকতা অন্য কোনো বিভাগের-ই নেই, —অতএব ছড়াই ধাঁধার তুলনায় অগ্রজ।"[৮]

আসলে বঙ্গজননীর এই ফসলগুলি এতদিন ছিল অবহেলিত, ধূলিধূসরিত। প্রসঙ্গক্রমে কবিগুরুর একটি কবিতাংশ মনে পড়ে ;

> "পদ্য হল সমুদ্র ;
> সাহিত্যের আদি যুগের সৃষ্টি।
> তার বৈচিত্র্য ছন্দতরঙ্গে
> কলকল্লোলে।
> গদ্য এল অনেক পরে।
> বাঁধা ছন্দের বাইরে জমালো আসর"[৯] (পুনশ্চ)

সুতরাং আমরা কি একথা বলতে পারি না? যদি এই পদ্যের সৃষ্টি আদিযুগে হয়, তারও আদিযুগে সৃষ্টি হয়েছে ছড়ার, বিষয়টি ভেবে দেখবার মতো।

যাইহোক 'ছড়া' শব্দের বুৎপত্তি সম্পর্কে পণ্ডিত মহলে এযাবৎকাল যে মতামত প্রচলিত রয়েছে, সেগুলি এইরকম ঃ

১। ছন্দ থেকে ছড়া শব্দটি এসেছে। ছন্দ শব্দের অপভ্রংশ রূপ হল ছড়া।[১০]

২। কারো কারো মতে ‘ছটা’ শব্দ থেকে ছড়া শব্দটি উদ্ভূত। সেক্ষেত্রে ভাষাতাত্ত্বিক বিবর্তনটি এইরূপঃ

ছটা > ছডা > ছড়া।[১১]

৩। সুকুমার সেনের মতে, ‘কবিতছত্র থেকে এসেছে ছড়া।’[১২]

সুতরাং ছড়া বলতে আমরা কবিতাছত্র, গ্রাম্য কবিতা, শ্লোক পরম্পরা, পদ্যময় ছন্দ রচনাকে অভিহিত করতে পারি। তবে এদের মধ্যে গ্রাম্য কবিতা-ই অধিক সমর্থিত। কেননা ‘বঙ্গীয় শব্দেকোষ’ গ্রন্থে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন ‘কোন বিষয় লইয়া রচিত গ্রাম্য কবিতা’[১৩] হল ছড়া।

সুবলচন্দ্র মিত্র তাঁর ‘সরল বাঙালা অভিধান’[১৪]-এ ছড়া বলতে, ‘কবিতার শ্লোক’[১৫] বলেছেন।

‘সংসদ বাঙ্গালা অভিধান’-এ বলা হয়েছে—‘গ্রাম্য কবিতা বিশেষ।’[১৬]

রাজশেখর বসুও তাঁর ‘চলন্তিকা’ অভিধানে (১০ম সং) সংস্কৃত ‘ছটা’ বলতে ‘গ্রাম্য কবিতা’ [১৭]কে’ বুঝিয়েছেন।

‘ব্যবহারিক শব্দকোষ’ গ্রন্থে কাজী আব্দুল ওদুদ লিখেছেন ছড়া হল ‘ছন্দোবন্ধ গ্রাম্য উক্তি বা বাদ প্রতিবাদ।’[১৮]

যোগেশচন্দ্র রায় ছড়ার অর্থ করেছেন, ‘সমূহ পরম্পরা’ বা ‘শ্লোক পরম্পরা।’[১৯]

ছড়ার সংজ্ঞা সম্পর্কেও নানাজন নানামত পোষণ করেছেন। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো ছড়ার সর্বজনগ্রাহ্য সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নির্ণয় করা বড়ই কঠিন কাজ। তবুও যে কয়েকটি সংজ্ঞা পাই, সেগুলি এইরূপ ঃ

ভবতারণ দত্তের ‘বাংলা দেশের ছড়া’ (ভাদ্র, ১৩৭৭) গ্রন্থের ভূমিকায় ‘শিশুবেদ’ নামক প্রবন্ধে সুকুমার সেন যা বলেছেন, ছড়ার সংজ্ঞা নির্ণয়ে তা বিশেষভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঃ

“ছড়া শব্দটি পুরানো, কিন্তু এ অর্থে নয়। কবিতা, কবিতাছত্র, কবিতা ছত্রাংশ অর্থে ব্যবহার ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে পাইনি। তবে লোকব্যবহারে এ অর্থ ছিল

সন্দেহ নেই। সাধারণ লোক গদ্য জানত না, 'পদ্য' শব্দ ও অপরিচিত ছিল। মঙ্গাল গান, পাঁচালী, যাত্রা, কথকতায় গদ্য কিছু থাকলে তা শুধু গায়েন কথকদের মন্তব্যে, সুতরাং তা সাধারণ শ্রোতার মনোযোগ টানত না। যা টানত তা হল গান আর কবিতা ছত্র অথবা কবিতাছত্রের অংশ আবৃত্তি। এই শেষোক্তই "ছড়া"—শব্দটির দুই প্রতিষ্ঠিত অর্থে। (১) প্রকীর্ণ বা বিক্ষিপ্ত, ছড়ানো ; (২) গ্রথিত, গাঁথা-মালা-ছড়া। গানের মধ্যে মধ্যে ছড়ানো আর পরপর গ্রথিত—এই ছিল তখন ছড়ার বিশেষত্ব। তারপরে অর্থ হল ছুটকো ছন্দময় রচনা। হিন্দী 'ফুটকল' কবিতা আর সংস্কৃত 'চাণক্য' (চানা ভাজার মতো) শ্লোক ছড়ারই সমনাম।"[২০]

আশুতোষ ভট্টাচার্য 'ছড়া'র সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "যাহা মৌখিক আবৃত্তি (recite) করা হয়, তাহাই ছড়া।"[২১]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছেলেভুলানো ছড়া, ২' তে ছড়া সম্পর্কে বলেছেন,

"শুধুমাত্র এই রসের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই আমি বাংলাদেশের ছড়া সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। ... ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি। বহুকাল হইতে আমাদের দেশের মাতৃভাণ্ডারে এই ছড়াগুলি রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে ; এই ছড়ার মধ্যে আমাদের মাতৃমাতামহীগণের স্নেহসংগীতস্বর জড়িত হইয়া আছে, এই ছড়ার ছন্দে আমাদের পিতৃপিতামহগণের শৈশবনৃত্যের নূপুরনিক্কণ ঝংকৃত হইতেছে। অথচ, আজকাল এই ছড়াগুলি লোকে ক্রমশই বিস্মৃত হইয়া যাইতেছে।"[২২]

আশরাফ সিদ্দিকী তাঁর 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে 'ছড়া' সম্পর্কে যে মন্তব্যটি করেছেন তা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঃ

তিনি বলেছেন, "...এ প্রকারের 'discrepencies' পূর্ণ 'archaic time' থেকেই ছড়াগুলো সৃষ্টি হয়ে আসলেও পরবর্তী সময়ে তা যে আরও 'exacting' হয়েছে তা বেশ বুঝতে পারা যায়।"[২৩]

বরুণকুমার চক্রবর্তী ছড়ার সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে ঃ

"ব্যষ্টি রচিত হয়েও স্বল্পায়তন বিশিষ্ট ছন্দবদ্ধ পদ সমূহ যা নাকি সমষ্টি কর্তৃক গৃহীত হয়ে সমষ্টির সম্পদরূপ পরিচিতি অর্জন করে, যেখানে ছন্দ নির্মিত কৌশল এবং

অসংলগ্ন চিত্রের সমাবেশই মুখ্য, মূলতঃ শিশু ভোলানাথদের মনোরঞ্জনের জন্য যা নাকি মুখে মুখে রচিত এবং মূলতঃ নারী কর্তৃক ব্যবহৃত, তাকেই আমরা ছড়া বলে অভিহিত করতে পারি।"[২৪]

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'ছেলে ভোলোনো ছড়া'[২৫] নামক প্রবন্ধে ছড়া সম্পর্কে বলেছেন ঃ

"ছড়াগুলো এমন জিনিস যে তাদের যেভাবেই সাজাও তা থেকে একটা না একটা রস পাওয়া যায়, সুতরাং ছড়ানো অবস্থাতেই ওগুলো হয়তো রাখাই ঠিক, শুধু মাঝে মাঝে নেড়ে চেড়ে দেখা নানা রকম আলোতে ধরে।"[২৬]

নির্মলেন্দু ভৌমিক এ প্রসঙ্গে বলেছেন 'অবনীন্দ্রনাথ যেন ছড়ার মধ্যে ক্যালিডোস্কোপকে দেখতে পেয়েছেন। ক্যালিডোস্কোপে যেমন একটি চোঙের মধ্যে কয়েকটি কাঁচখণ্ড নিয়ে যদৃচ্ছা ঘোরালেই একটি নয়নমোহন figure পাওয়া যাবেই, ছড়াতেও তেমনি'।

পবিত্রকুমার মিস্ত্রি কয়েকটি বাক্যে ছড়ার সংজ্ঞা দিয়েছেন ঃ

"নাতিদীর্ঘ ছন্দবদ্ধ পদসমষ্টি যা ব্যষ্টি কর্তৃক রচিত হলেও সমষ্টি কর্তৃক গৃহীত হয় এবং ব্যষ্টির পরিচয় অবলুপ্ত হয়ে সমষ্টির সম্পদরূপে গণ্য হয়, যেখানে ছন্দ নির্মিতি কৌশল এবং অসংলগ্ন চিত্রের সমাবেশই প্রধান, যা শিশুর মনোরঞ্জনের জন্য মূলতঃ নারী কর্তৃক ব্যবহৃত হয়, তাকেই আমরা ছড়া বলে অভিহিত করতে পারি।"[২৭]

নির্মলেন্দু ভৌমিকের মতে ঃ

"ছড়া হল বঙ্গীয় লোকসাধারণের সর্বপ্রকার প্রকাশভঙ্গির একটি সর্বজনস্বীকৃত চিরাচরিত ভঙ্গি যেটিকে নারী ও পুরুষ আপনাপন প্রয়োজনে গ্রহণ করেছে, —কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই ছড়ার রচনাগত ভঙ্গিটি প্রায় এক এবং অবিকৃতই আছে। উভয় লিঙ্গের কথিত ও রচিত ছড়ার এই অভিন্ন ও অবিকৃত রচনাভঙ্গিই শেষবারের মতো প্রমাণিত করে, ছড়া এক সাধারণ সম্পত্তি, তা কেবল নারী বা কেবল পুরুষের নয়।"[২৮]

‘ছড়া’র সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিমিরবরণ চক্রবর্তী তাঁর ‘প্রসঙ্গ ছড়া ঃ বিষর ও বৈচিত্র্য’ প্রবন্ধে বলেছেনঃ

“সৃষ্টির আদিমতম মৌখিক সাহিত্যের (Oral literature) প্রকাশই হল ছড়া।”[২৯]

আবার দেবশ্রী পালিত তাঁর ‘ছড়া লোকায়ত জীবনের কারুভাষ’[৩০] গ্রন্থে ছড়ার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেনঃ

“সাধারণভাবে অন্ত্যমিলযুক্ত পদ্য-আকারে রচিত ভাবের সংগতিযুক্ত অথবা বিযুক্ত, তাৎক্ষণিকভাবে সৃজিত রচনাই হল ছড়া।”[৩১]

পরিশেষে, উপরিউক্ত আলোচনার নিরিখে আমরা ছড়ার একটি সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নিরূপণ করতে পারিঃ

ব্যক্তিকর্তৃক রচিত হয়েও যা সমষ্টির মুখে মুখে চর্চিত, স্বল্পায়তনবিশিষ্ট, পদ্যে রচিত, আপাত অসংলগ্ন চিত্রধর্মী, পাঠান্তর-নির্ভর শিশুদের উদ্দেশে রচিত হলেও মূলত সমাজের সকলের, তাকেই আমরা বলবো ছড়া।

২. লোকছড়ার বৈশিষ্ট্য সন্ধান ঃ

ছড়া তার নিজ বৈশিষ্ট্যের কারণে লোকসাহিত্যের অন্যান্য বিষয় থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী। ছড়ার বিশেষত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ ভট্টাচার্য, সুকুমার সেন, নির্মলেন্দু ভৌমিক, দিব্যজ্যোতি মজুমদার, বরুণকুমার চক্রবর্তী প্রমুখ গবেষকগণ নানাবিধ চর্চা করেছেন। উপরিউল্লিখিত বিদগ্ধ ব্যক্তিদের আলোচনা স্মরণে রেখেও মোটামুটিভাবে ছড়ার যে বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায় সেগুলি নিম্নরূপ ঃ

বাংলা ছড়ার আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তিনিই সর্বপ্রথম লোকসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সম্পদ ছড়াকে লোকচক্ষুর সম্মুখবর্তী করেন। এবং তিনি তাঁর ‘লোকসাহিত্য’ গ্রন্থের ‘ছেলে ভুলানো ছড়া’ প্রবন্ধে প্রথমেই বলেছেন ঃ

“বাংলা ভাষায় ছেলে ভুলাইবার জন্য যে সকল মেয়েলি ছড়া প্রচলিত আছে, কিছুকাল হইতে আমি তাহা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম।”[৩২]

— রবীন্দ্রনাথের মতে, মুখে মুখে ছন্দে যা রচিত তাই ছড়া, প্রথমত তা শিশু ভোলানাথদের ভুলাইবার জন্য এবং দ্বিতীয়ত তা কবির মতে 'মেয়েলি ছড়া' বলে অভিহিত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, ছড়ার দুই ক্ষেত্র—এক শিশু, দুই নারী। কিন্তু আজকের দিনে এসে বলা যায়, ছড়া কেবল শিশু বা নারী কেন্দ্রিক নয়, ছড়া সকলের, সর্বজনীন। তাই ছড়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর সার্বিক গ্রহণ যোগ্যতায়। আর এই সর্বজনীনতাকে মেনে নেওয়ার অর্থ লোকসাহিত্যের ব্যাপকতাকে স্বাগত জানানো।

আমরা জানি, ছড়া সমাজের যৌথ প্রচেষ্টার ফসল। জন্মলগ্নে তা কোনো একক ব্যক্তিত্বের থাকলেও ক্রমে সমাজের দশজনের হাতে পড়ে প্রচার লাভ করে, তখন তা ব্যষ্টির সৃষ্টি না হয়ে সমাজের সমষ্টির সৃষ্টিতে পরিণত হয়।

ছড়া মূলত স্বল্পায়তনবিশিষ্ট। বরুণ চক্রবর্তীর মতে, 'শিশুদের জন্য রচিত ছড়া কখনই দীর্ঘাকৃতির হবে না, হয়না।'[৩৩] নির্মলেন্দু ভৌমিকের মতানুযায়ী, মধ্যযুগীয় সংগীতে, সাহিত্যে ব্যবহৃত ছড়ার রূপাকৃতি, তাতে দেখা যায়, পূর্ব থেকে রচিত ছড়ার আকৃতি বড় হত, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আসরে মুখে মুখে যা রচিত হত তা স্বল্পায়তনের। তখনকার শ্রোতারা রসগ্রহণের জন্য আসর বসাতেন। এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য, আশুতোষ ভট্টাচার্যের মত ঃ

"ইহা যাহাদের সাহিত্য তাহাদের মধ্যে বুদ্ধি ও বিচার অপেক্ষা রসের মূল্য বেশী।"[৩৪]

ছড়ায় আছে অসংলগ্ন ভাব। সেইজন্য ছড়ার একটি পদ থেকে অন্য পদ খুব সহজে বিচ্ছিন্ন কিংবা সংযুক্ত হয়ে পড়ে। বরুণকুমার চক্রবর্তীর মতে ঃ

'সচেতন সৃষ্ট সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভাবের অসামঞ্জস্যতা মস্ত এক ত্রুটি, কিন্তু ছড়ার ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্যতা আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। বালকচিত্তে যেমন একটির পর একটি অসংলগ্ন ভাবের উদয় ঘটে, ছড়ার ক্ষেত্রে সেই অসংলগ্নতা বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়।'[৩৫]

ছড়ায় রয়েছে অপূর্ব চিত্রধর্মীতা। একে বরুণকুমার চক্রবর্তী বলেছেন— 'ছড়াগুলি যেন চিত্রের সাম্রাজ্য।'[৩৬] ছড়া সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূল বক্তব্য বলতে গিয়ে মোহিনীমোহন সরদার তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন—

'ছড়ায় বর্ণিত অযত্নে রচিত চিত্রগুলি শুধু যে শিশুর সহজ সৃজনশক্তি দিয়ে সৃজিত হয়ে ওঠে তাই নয়, তা অনেক জায়গায় রেখার এমন সুস্পষ্টতা তৈরী করে যে তা সংশয়ী

লোকের চোখেও অতি সংক্ষেপ বর্ণনায় ত্বরিত চিত্র এনে উপস্থিত করে। এ চিত্রগুলি আসলে একটি রেখা, একটি কথা ছবি।'[৩৭]

ছড়া যেহেতু অসংলগ্ন, চিত্রধর্মী এবং অনেকেই ছড়া রচনায় অংশগ্রহণ করে বলে ছড়ার পাঠান্তর ও বহুল পরিমাণে রয়েছে। এ প্রসঙ্গো বরুণকুমার চক্রবর্তী বলেছেন, পরস্পর সম্পর্কহীন ভাবনা ও চিত্র প্রকাশে অনেকের অংশগ্রহণের অবকাশ বিদ্যমান। তাই লোকসাহিত্যের অন্যান্য বিভাগগুলির তুলনায় 'ছড়া' বিভাগের পাঠান্তর নামক বৈশিষ্ট্যটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ছন্দধর্মিতা ছড়ার অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য। এই ছন্দ মূলত শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দ। শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দের জন্যই ছড়া মানুষের মনে জ্বলজ্বল করছে। প্রতি পর্বের প্রথম অক্ষরের উপর শ্বাসাঘাতের কারণে এর নাম শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ। আবার প্রতি পর্বের স্বরসংখ্যা গণনা করে এর মাত্রার হিসাব করা হয় বলে একে স্বরবৃত্ত ছন্দও বলে। যাইহোক ছড়ার ছন্দে প্রতি পর্বের মাত্রা সংখ্যা কখনও সম আবার কখনও বিষম সংখ্যারও হতে পারে। এই ছন্দের কারণে ছড়ার পাঠান্তর ও বেড়ে যায়, কেননা মানুষ ছড়ার শব্দ ভুলে গেলেও ছন্দ কখনই ভুলে না। তাই ছন্দ ঠিক রেখে অন্যশব্দ দিয়ে ছন্দে মিলিয়ে নতুন নতুন ছড়া তৈরী করে, যার জন্যে পাঠান্তর বা ভাষান্তর পরিলক্ষিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছড়াগুলিকে তাঁর 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে যদৃচ্ছাভাসমান মেঘের সঙ্গো তুলনা করে বলেছেন—

> "আমি ছড়াকে মেঘের সহিত তুলনা করিয়াছি। উভয়েই পরিবর্তনশীল, বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, বায়ুস্রোতে যদৃচ্ছাভাসমান দেখিয়া মনে হয় নিরর্থক। ছড়াও কলাবিচার-শাস্ত্রের বাহির, মেঘবিজ্ঞানও শাস্ত্রনিয়মের মধ্যে ভালো করিয়া ধরা দেয় নাই। অথচ জড়জগতে এবং মানবজগতে এই দুই উচ্ছৃঙ্খল অদ্ভুত পদার্থ চিরকাল মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া আসিতেছে। মেঘবারি-ধারায় নামিয়া আসিয়া শিশু-শস্যকে প্রাণদান করিতেছে এবং ছড়াগুলিও স্নেহরসে বিগলিত হইয়া কল্পনাবৃষ্টিতে শিশুহৃদয়কে উর্বর করিয়া তুলিতেছে।"[৩৮]

ছড়ার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল, আপাতদৃষ্টিতে ছড়া রচনা করা খুব সহজবোধ হলেও ছড়া রচনা করা খুবই কঠিন। রবীন্দ্রনাথের মতে যার পক্ষে সহজ, তার পক্ষে খুবই সহজ,

যারপক্ষে কিছুমাত্র কঠিন, তারপক্ষে খুবই অসাধ্য, যা সবচেয়ে সরল তা সবচেয়ে কঠিন ; আর সহজের প্রধান লক্ষণ হল সর্বাপেক্ষা কঠিন।

বিশুদ্ধ পাঠগ্রহণ ছড়ার অন্যতম একটি বিশেষত্ব। লোকমানস তাদের আটপৌরে জীবনের দলিল তুলে ধরে ছড়ার মধ্য দিয়ে। তাতে সমাজ জীবনের যেমন ছায়াপাত ঘটে, তেমনি ঘটে ভাষার প্রয়োগও। আর এই সূত্র ধরে ভাষাতাত্ত্বিকগণ হয়তো কোনো সূত্র পেলেও পেতে পারেন। ছড়াটি কোন্ সময়কার, কোন্ ভৌগোলিক সমাজ পরিবেশে কীভাবে রচিত। আসলে বলা যায়, যেমনটি পাওয়া যায় তেমনটি আহরণ করাই ছড়া সংগ্রহের অন্যতম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। তখন তা হয় যথাযথ এবং বিজ্ঞানসম্মত। নিজের হৃদয়ের পেলবতা মধুরতা দিয়ে ছড়াকে অনেক বেশি সাজিয়ে গুছিয়ে নেওয়া যায় বটে, তবে তা হয়ে ওঠে লোকসাহিত্যের বৈশিষ্ট্যের অন্যতম পরিপন্থী। তাই ছড়ায় আদি বা বিশুদ্ধ পাঠ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'ছেলে ভুলানো ছড়া ১'-এ একটি পরিচিত ছড়ার বিশেষ শব্দকে পরিবর্তিত করেছিলেন, যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশের চিরপরিচিত চিত্র, কন্যাকে শ্বশুর গৃহে প্রেরণ, বিবাহের পর কন্যার পিতা-মাতা-ভাই-বোন-আত্মীয় পরিজন সকলের কাছে এ এক বিয়োগান্তক ব্যাপার। সেইরূপ বর্ণনাযুক্ত একটি ছড়া ছিল এইরূপ—

"বোন কাঁদেন বোন কাঁদেন খাটের খুরো ধরে
সেই যে বোন গাল দিয়েছেন ভাতারখাকী বলে"[৩৯]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভাতারখাকী'[৪০] শব্দটিকে অপেক্ষাকৃত রূঢ় বোধ করায়, পরিবর্তিত করে 'স্বামীখাকী'[৪১] করেছিলেন। তাঁর স্নেহ দুর্বল চিত্তে শব্দটি অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল, তাই শব্দটি অতীব ইতর হওয়া সত্ত্বেও তিনি পুরোপুরি ত্যাগ করতে পারেননি। কেননা, ভদ্র সমাজে অসামঞ্জস্যবোধ হলেও শব্দটি বিশুদ্ধ করুণ চিত্রের প্রকাশক। তবে কবির এই পরিবর্তন লোকসাহিত্য বিজ্ঞানের বিশুদ্ধ পাঠগ্রহণের পরিপন্থী।

চিরন্তনত্ব ছড়াগুলির এক উল্লেখযোগ্য দিক। কেননা লিখিত সাহিত্য সচেতন শিল্পকলা হলেও মানুষের মনে অনেক সময় আবেদন সৃষ্টি নাও করতে পারে অথচ অলিখিত সাহিত্য হয়েও ছড়া কিন্তু বেশির ভাগ সময় মানুষের মনে সহজেই স্থান করে নেয়। এর কারণ ছড়াগুলির সাহিত্য মূল্যের প্রাচুর্যতা। বরুণকুমার চক্রবর্তী একে বিস্ময়ের ব্যাপার বলে

অভিহিত করেছেন। শিশু যেমন চিরন্তন, ছড়াগুলিও তেমনি চিরন্তন এবং যুগে যুগে কালে কালে অপরিবর্তনীয়। তাই শিশু চরিত্রের সঙ্গে ছড়ার চরিত্রের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিরাজমান। আর এই স্থায়িত্বগুণে বহুপূর্বে রচিত হলেও ছড়াগুলি সমকালেও নতুন বলে মনে হয়।

ছড়াগুলির কোনো রচয়িতা নেই। সেই কারণে ছড়াগুলি কবে কোথায় রচিত হয়েছিল এনিয়ে প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করা বাহুলতা মাত্র। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তি স্মরণযোগ্য—

> "... সেজন্য কোনো কবি চুরির অভিযোগ করে না এবং কোনো সমালোচকও বিপর্যয়ের দোষ দেন না। বাস্তবিকই এই ছড়াগুলি মানসিক মেঘরাজ্যের লীলা, সেখানে সীমা বা আকার বা অধিকার নির্ণয় নাই।"[৪২]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছড়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য 'কামচারিতা' ও 'কামরূপধারিতা'র উল্লেখ করেছেন তাঁর 'ছেলে ভুলানো ছড়া-২' নিবন্ধে। 'কামচারিতা' শব্দের অর্থ কামনা মতো আচরণের ক্ষমতা, 'কামরূপধারিতা' শব্দের অর্থ কামনা মতো রূপ ধারণের ক্ষমতা। অর্থাৎ ছড়াগুলি তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ নির্ভর এবং পরিবেশের তারতম্যের উপর নির্ভর করে নিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে, যে কারণে সৃষ্টি হচ্ছে নানা পাঠান্তর। সেকারণে ছড়ার মূল পাঠ খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন।

লিখিত সাহিত্যের মতো ছড়ার বিশুদ্ধ পাঠ, বা আদিম পাঠ বলে কিছু নির্ণয় করবার প্রয়োজন নেই। কেননা সবগুলি পাঠ-ই সমান গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, ছড়ার অনেকগুলি পাঠ পাওয়া গেলেও কোনোটিই বর্জনীয় নয়।

আমাদের অলংকার শাস্ত্রে যে নয়টি রসের উল্লেখ আছে, ছড়ার রস তার বহির্ভূত। সে রস পুষ্পচন্দন, গোলাপজল আতর, ধূপের সুগন্ধের মতো নয়, তাতে আছে সদ্য মাটি কর্ষণের গন্ধ, অপূর্ব এক আদিমতা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যার নাম দিয়েছেন 'বাল্যরস'[৪৩], যা তীব্র নয়, গাঢ় নয়, স্নিগ্ধ-সরস এবং যুক্তি-সংগতিহীন।

ছড়ার জগৎ অবাস্তবতার জগৎ। যার এমন অনেক শব্দ আছে কল্পনার রাজ্যকে আভাসিত করে—ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানব, রাক্ষোস-খক্ষোস, রূপকথার রাজকন্যে, হাট্টিমা টিম টিম ইত্যাদি শব্দগুলো শিশুমনকে আনন্দ রাজ্য অবাস্তবতার জগতে নিয়ে যায়।

৩. লোকছড়ার ইতিবৃত্ত সন্ধান ঃ

লোকসংস্কৃতির চর্চা আজ বহুধারায় আলোচিত হচ্ছে। সাহিত্যপ্রেমী, লেখক, গবেষক শিক্ষিত মানুষের আন্তরিক প্রচেষ্টা, যত্ন, সংগ্রহ, প্রয়াস, কৌতূহল লোকসংস্কৃতির চর্চাকে এক উন্নতস্তরে পৌঁছে দিয়েছে। এই সফলতার শীর্ষস্থানে যাঁরা, তাঁরা হলেন দেশী-বিদেশী পণ্ডিত, খ্রীষ্টান মিশনারী, গবেষক, সাহিত্যপ্রেমী। লোকসংস্কৃতির পথ ধরে বাংলায় ছাপার অক্ষরে ছড়া চর্চা শুরু হয়, প্রবাদচর্চার প্রায় অর্ধশতাব্দীর আরও পরবর্তী সময়ে।[৪৪] ছড়া চর্চা শুরু হয় এদেশীয় মানুষদের দ্বারা। একথা স্মরণ রেখেও বলা যায় ছড়াচর্চার ক্ষেত্রে উইলিয়ম কেরী, উইলিয়ম মর্টন, রেভারেণ্ড জেমস্ লঙ্, গ্রীয়ারসন, রেভারেণ্ড লালবিহারী দে এঁদের নাম বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য।

বরুণকুমার চক্রবর্তীর তথ্যানুযায়ী বলা যায়, বাংলা ছড়া চর্চার কালানুক্রমিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যাবে, এদেশে বিদেশীয়দের দ্বারা প্রথম প্রবাদচর্চা শুরু হয় এবং তা ব্যবহারিক কারণে। বিদেশীয়রা এদেশে এসে এদেশের ভাষা, আচার-আচরণ, সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিতি লাভ করেছিল এবং খুব সহজেই প্রবাদের বক্তব্য তাদের কাছে অনুভবগম্য হয়েছিল, যা ছড়ার ক্ষেত্রে হয়নি। ব্যতিক্রমীদের স্বীকার করে নিয়েও বলা যায়, ছড়ার অর্থ অনুধাবনের জন্য চাই দেশীয় ভাষায় পরিপক্ক জ্ঞান, সময়, যা বিদেশীয়দের কাছে তৎক্ষণাৎ সহজসাধ্য ছিল না। তাই প্রবাদ চর্চার বহুপর শুরু হয় ছড়াচর্চা। কিন্তু তিমিরবরণ চক্রবর্তীর মতে, তখনকার লোকসংস্কৃতিবিদ্, দেশীয় এবং বিদেশীয়দের অনেকেরই প্রবাদ ও ছড়ার মধ্যেকার সূক্ষ্ম পার্থক্যটুকু সেভাবে চোখে পড়েনি। তাই তাঁরা প্রবাদ সংকলন নামেই ছড়া আর প্রবাদের সংমিশ্রিত উপাদানকে প্রবাদ সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেন।

এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্যটি সমধিক গ্রহণযোগ্য—

> "ছড়া এবং প্রবাদে সূক্ষ্ম পার্থক্যবোধ ইংরেজ সংগ্রাহকদিগের থাকিবার কথা ছিল না, স্বতন্ত্রভাবে ছড়া বলিয়া কোনো সংগ্রহ সেদিন পর্যন্ত নির্দেশ করা হয় নাই, সকলই প্রবাদ বলিয়াই গৃহীত হইয়াছিল। এমনকি এই পার্থক্যবোধ যে বাঙ্গালী সংগ্রাহকদিগের মধ্যেও সর্বদাই বর্তমান থাকিতে দেখা যায়, তাহা নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, নিম্নোদ্ধৃত বিষয়টি যে ছড়া তাহা অনেকে সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন—

'কাক কালো, কোকিল কালো, কালো ফিঙের বেশ।
তার চাইতে অধিক কালো, কন্যা, তোমার মাথার কেশ।'

অথচ একজন বিশিষ্ট বাঙ্গালী প্রবাদ সংগ্রাহক ও ইহাকে তাঁহার প্রবাদ সংগ্রহের মধ্যে স্থান দিয়াছেন। সুতরাং ইংরেজ সংগ্রাহকগণ এই শ্রেণীর ভুল করিবেন, তাহাতে অস্বাভাবিকতার কিছু নাই"[৪৫]

অধ্যাপক ভট্টাচার্যের এই সিদ্ধান্তটি সত্যই যুক্তিযুক্ত। কেননা, এই পার্থক্য অতি সূক্ষ্ম। ছড়া চর্চার ইতিহাস প্রসঙ্গে বরুণকুমার চক্রবর্তী তাঁর 'বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস' গ্রন্থে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। তাঁর মতে, প্রথমদিকে প্রবাদ চর্চায় যাঁরা মনোযোগী ছিলেন তাঁরা প্রায় কেউই ছড়া চর্চায় উৎসাহ দেখান নি, একমাত্র ব্রজসুন্দর সান্যাল ব্যতীত। তবে প্রবাদের তুলনায় ছড়া চর্চায় অনেক বেশি সংখ্যক মানুষ ব্রতী হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য বেশ কয়েকজন ব্যক্তিত্ব, যাঁরা শুধু ছড়া চর্চার জন্য নয়, সাহিত্যে ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও যশঃ প্রতিষ্ঠিত। এঁদের মধ্যে প্রথমেই যাঁর নাম করেছেন, তিনি কবি সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) এছাড়াও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯), অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১), দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার (১৮৭৭-১৯৫৭) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ প্রসঙ্গে তিনি এও বলেন, এঁরা ছড়া সংগ্রহের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় সেভাবে দেন নি, কেননা সংগ্রহের প্রতিই ছিল সংগ্রাহকদের নজর। যাইহোক্ ছড়া চর্চার ধারাবাহিক কালানুক্রমিক বিবরণ তিনি তাঁর 'বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস' গ্রন্থে যেভাবে আলোচনা করেছেন, তারজন্য বাংলা লোকসাহিত্য তথা ছড়া চর্চার ইতিহাসে গ্রন্থটিকে আকর গ্রন্থ বললেও অতুক্তি হয় না। তাই তাঁর আলোচনাকে পাথেয় করে ছড়া চর্চায়, যে সকল উল্লেখযোগ্য এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আলোকপাত করেছেন, আমরা তাঁদের সম্পর্কে এই নিবন্ধে আলোচনা করছি।

বাংলা ছড়া চর্চার ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের নাম গভীরভাবে স্মরণীয়। তবুও ঐতিহাসিক কালক্রমে উইলিয়ম কেরীর নাম (১৭৬১-১৮৩৪) অবিস্মরণীয়। তিনি অনুবাদমূলক রচনা কর্মে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর দুটি বিখ্যাত সংকলন 'কথোপকথন' (১৮০৯) এবং 'ইতিহাসমালা' (১৮১২)। দুটি গ্রন্থেই ছড়া চর্চার দৃষ্টান্ত রয়েছে।

'কথোপকথন'-এর ছড়া ঃ

১। "মুই লাচার কি
মহালয় তুই মা বাপ
তোমার চরণ ছাড়িমুনা..."[৪৬]

২। "তিন দিনে তাহার তিনটি বেটার মাথা খাউক
ঘাটে বসে মঙ্গাল গাউক।"[৪৭]

'ইতিহাসমালা' গ্রন্থে ও ছড়ার নির্দশন মেলে। প্রকৃতপক্ষে, লেখকের মতে 'ইতিহাসমালা' হল গল্প সংকলন। এতেই সর্বপ্রথম সার্থক ছড়া মুদ্রিত হয়,—

মাছ আনিলা ছয় গণ্ডা
চিলে নিলে দুগণ্ডা
বাকি রইল ষোল।
তাহা ধুতে আটটা জলে পলাইল,
তবে থাকিল আট।
দুইটায় কিনিলাম দুই আটি কাট,
তবে থাকিল ছয়।
প্রতিবাসিকে চারিটা দিতে হয়
তবে থাকিল দুই।
তার একটা চাখিয়া দেখিলাম মুই।
তবে থাকিল এক।
ঐ পাত পানে চাহিয়া দেখ।
এখন হইস যদি মানুষের পো,
কাঁটাখান খাইয়া মাছখান থো,
আমি যেঁই মেয়ে তেঁই হিসাব দিলাম কয়ে।
এইরূপ মৎসের হিসাবে কৃষকের প্রত্যয় জন্মাইল
ইতি "ইতিহাসমালা" ॥[৪৮]

— তিমিরবরণ চক্রবর্তী বলেন, প্রথম বাংলা ছড়া ও ধাঁধার মুদ্রিত রূপ এবং ছড়া চর্চার প্রথম সূত্রকার হিসেবে লোকসংস্কৃতির জগতে উইলিয়াম কেরীর নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ছড়া চর্চার ইতিহাসে রেভারেণ্ড উইলিয়াম মর্টন এর নাম (বিদেশী পাদ্রী হিসেবে) খুবই উল্লেখযোগ্য। তাঁর 'দৃষ্টান্ত বাক্য সংগ্রহ' নামে ৮০৩টি বাংলা প্রবাদ এবং ৭০টি সংস্কৃত প্রবাদের ইংরেজি অনুবাদ (১৮৩২) ও সংকলন সমধিক প্রসিদ্ধ। 'দৃষ্টান্ত বাক্য সংগ্রহে' 'ছড়া' সংগৃহীত হয়েছে ১৫টি। লেখক তিমিরবরণ চক্রবর্তী তাঁর প্রবন্ধে কয়েকটি ছড়া তুলে ধরেছেন —

১। "মন না মুড়ালে মুড়ালে কেশ।
গরু না চিনিলে ভ্রমিলে দেশ।" [৪৯]

২। "বড় ২ বানর বড় ২ পেট
লঙ্কায় ডিঙ্গাতে মাথা করে হেট।"[৫০]

লেখকের মতে, 'Calcutta Christion Observer' পত্রিকায় ১৮৩৫ খ্রিঃ এপ্রিল, জুন, অক্টোবর ও নভেম্বর সংখ্যায় মর্টন সাহেব ১৫৬টি প্রবাদ প্রকাশ করেন। এতেও প্রকৃত ছড়া হিসেবে তিনটি পাওয়া যায়।

রেভারেণ্ড জেমস লঙ-এর নামও ছড়া চর্চার ইতিহাসে খুবই উল্লেখ্য। লঙ সাহেবের 'প্রবাদমালা' (১৮৬৮) ৩য় খণ্ডে মোট ১৯টি ছড়ার সন্ধান পাওয়া যায়। তার দু-একটি তিমির বরণ চক্রবর্তীর মতে এইরকম ছিল ঃ

১। "চাউল দেবে যত তত,
জল দিবে তার তিন তত।
উথলিলে দিবে কাটী,
জাল দিবে উজান ভাটী,
তুলে দেখবে ফাটা ভাত
ফেন ঝরিবে পাত পাত।
তাতে যদি থাকে চাল
গিন্নির কথা আল থাল।।"[৫১]

২। "ভাতারমারি জলকুমারী জলার ধারে ঘর।
আপনার ভাতার মেরেছি কোন শালাকে ডর।।
মারি নাই ধরি নাই ধর্‍্যে ছিল জটে।
একটি কিল মেরেছিলাম সেই সত্য বটে।।"[৫২]

বাংলার লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব লালবিহারী দে। লেখক তিমিরবরণ চক্রবর্তী তাঁর 'ছড়া চর্চায় খ্রিষ্টান মিশনারীদের দান'— প্রবন্ধে বলেছেন, তিনি ধর্মে খ্রিষ্টান হয়েও মানসিক চেতনার রাজ্যে ছিলেন পুরোপুরি বাঙালি বা ভারতীয়। তাঁর আন্তরিক তাগিদ তাঁকে লোকসংস্কৃতির চর্চায় অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। তাঁর দুখানি গ্রন্থের জন্য তিনি লোকসংস্কৃতি জগতে পরিচিত। গ্রন্থ দুটি হলো 'Bengal Peasant's Life' বা গোবিন্দ সামন্ত, এবং 'Folk Tales of Bengal' বা বাংলার উপকথা। 'গোবিন্দ সামন্ত' গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য ছড়াটি হল—

'Chali Chali Pa Pa' (পরি ঃ ৯)[৫৩]

লেখক আরো বলেছেন, 'Folk Tales of Bengal' বা বাঙলার উপকথা গ্রন্থের সেই বহুপরিচিত ছড়া— 'আমার কথাটি ফুরুলো' ছড়াটির কথা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইংরেজীতে অনুবাদ করে উক্ত ছড়াটির সম্পর্কে লালবিহারী দে মন্তব্য করলেন ঃ

'Sambhu's mother used alway to end every one of the stories-and every orthodox Bengali story-teller does the same–with repeating the following formula–

Thus my story endeth.
The Natiya-thown, dost witherth.

"Why O Natiya–thown, dost wither?"
"Why does they cow on me browse?"
"Why O cow, dost thou browse?"
"Why does they neat-herd not tend me?"
"Why O neat-herd, dost not tend the cow?"
"Why does the doughter-in-low not give me rice?"
"Why O daughter-in-law, dost not give rice?"
"Why does my child cry?"
"Why O child, dost thou cry?"
"Why does the ant bite me?"
"Why O out does thou bite?"

Koot! Koot! Koot!

What these lines mean. Why they are repeated at the end of every story, and what the connection is of the serveral parts to one another, I do not know. Perhops the whole is a string on nonsewse purposely put together to amuse little children" [৫৪]

যাইহোক, ছড়ার স্বাভাবিক ধর্মই হল ছন্দে শব্দে আনন্দ-তরঙ্গো লোকমানসের হৃদয়কে দোলায়িত করা, আর এইভাবে প্রবাহিত হওয়া। ছড়ার এই চিরন্তন অনাবিল আনন্দের ঢেউ লালবিহারী দে-কেও আন্দোলিত করেছিল। বিশেষ করে তাঁর 'Koot! Koot! Koot!' শব্দ-ঝংকার আমাদের মতো লালবিহারী দে-র শিশু চিত্তকেও ঝংকৃত করেছিল।

ছড়ার জগতে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (১২৭৮-১৩২৯)-এর নাম প্রথম বাংলা ছড়ার সংকলক হিসেবে বিখ্যাত। অধ্যাপক বরুণকুমার চক্রবর্তীর তথ্যানুযায়ী লেখকের 'ছেলে ভুলানো ছড়া' গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশকাল ১৩০২, জনপ্রিয়তার কারণে গ্রন্থটির ছয় বছরের মধ্যেই তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৩। সুকুমার সেন উল্লেখ করেছেন 'আড়াইশটি ছড়া সংকলিত আছে।' বরুণকুমার চক্রবর্তীর মতে এতে সংকলিত ছড়ার সংখ্যা ছিল ২৫২টি। সংকলিত ছড়াগুলিকে মোট ৫টি পর্যায়ে ভাগ করেছেন,— ১। আদরের ছড়া, ২। ঘুমের ছড়া ৩। খেলার ছড়া ৪। বিয়ের ছড়া এবং ৫। বিবিধ। সুদীর্ঘ শতবৎসর পূর্বে ছড়া সংকলনে সংকলক পাঠান্তরগুলিকে পূর্ণ মর্যাদায় স্থান দেওয়ার মধ্যে তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয়-ই বেশি করে পাওয়া যায়। পাঠান্তরকে সংকলক 'অন্য রূপ পাঠ' শিরোনামে প্রকাশ করেছেন। ছড়াগুলি সংখ্যার দ্বারা নির্দিষ্ট। ছড়াগুলিকে তিনি অবিকৃত রূপেই সংকলনে স্থান দিয়েছেন।

সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার ১৩০২ বঙ্গাব্দের ৩য় সংখ্যায় 'সাঁওতাল পরগণার ছড়া' প্রকাশিত। এতে মোট ১৬টি ছড়া সংকলিত। বরুণকুমার চক্রবর্তীর মতে লেখক জানিয়েছেন—

> "বিগত মাঘ মাসের পত্রিকায় মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কতকগুলি ছেলে ভুলানো ছড়া প্রকাশ করিয়াছেন। সাঁওতাল পরগণার অশিক্ষিত বাঙালী সমাজে উহাদের কয়েকটি কথঞ্চিৎ রূপান্তরিত আকারে প্রচলিত দেখা যায়।

ছড়ার এইরূপ পরিবর্ত্তন বা রূপান্তর বিশেষ অবধানযোগ্য ও সমালোচ্য। একারণে এইরূপ কয়েকটি ছড়া এবং যে সকল ছড়া এ অঞ্চলে সর্বত্র প্রচলিত, তৎসমুদয় আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম। এই সকল ছড়া বঙ্গাদেশের অন্যত্র প্রচলিত আছে কি না, অথবা থাকিলেও সেগুলির পাঠ ঠিক এইরূপ কি না, সবিশেষ অবগত নহি। তবে এই সকল ছড়ার ভাষায় গ্রাম্যতা দোষ যেরূপ অধিক দৃষ্ট হয়, বঙ্গাদেশের অপর কোনও প্রদেশের ছড়ার ভাষায় সেরূপ না থাকিতে পারে। বঙ্গের প্রদেশ বিশেষে যেরূপ ল-কার স্থানে ন-কার আদেশ হয় এ প্রদেশে সেইরূপ ন-কার স্থানে ল-কারাদেশ হয়। এই সকল ছড়ায় তাহার উদাহরণ পাওয়া যায়।"[৫৫]

১৬টি ছড়ার মধ্যে দ্বিতীয় সংখ্যক ছড়াটি হল—

"নুলু খেলে কোন খানে।
শাল পিয়ালের বন খানে॥
সেখানে নুলু কি করে।
থোগা থোগা ফুল পাড়ে॥"[৫৬]

লেখকের সংগৃহীত সপ্তম সংখ্যক ছড়াটি হল—

"ধন ধন ধন।
দুখ পাসুরা খিদ্যাহারা চিতনেবারণ
ধনকে লিয়ে বনকে যাব রইব বনের মাঝে।
লাচ্ দেখি রে নীলমণি তুর, কেমন ঘুঙুর বাজে॥"[৫৭]

বর্তমানে লেখকের মতে, 'মেয়েলি ছড়া' পর্যায়ের ৫০টির অধিক ছড়া সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকার ১৩০২ বঙ্গাব্দের ৩য় সংখ্যায় সংকলিত হয়। লেখকের ২য় সংখ্যক ছড়াটি হল—

"খোকা আমাদের সোনা,
চার পুকুরের কোণা
বাড়ীতে স্যাক্‌রা ডেকে, মোহর কেটে,
গড়িয়ে দেব দানা,
তোমরা কেউ করোনা মানা॥"[৫৮]

৮নং ছড়াটি হল

"সুড় সুড়নি গুড় গুড়নি নদী এল বান,

শিব ঠাকুর বিয়ে কোল্লেন তিন কন্যে দান।
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন এক কন্যে খান,
এক কন্যে না পেয়ে বাপের বাড়ী যান।
বাপেদের তেল আমলা মালীদের ফুল,
এমন ক'রে চুল বাঁধবো হাজার টাকা মূল।
হাজারে বাজারে পড়ে পেলাম খাঁড়া,
সেই খাঁড়া দিয়ে কাটলাম নালকচুর দাঁটা।।" ৫৯

সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় ১৩০২ বঙ্গাব্দের ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, 'ছেলে ভুলানো ছড়া'। লেখক এই ছড়াগুলি বেলেতোড়, মেদিনীপুর, বনবিষ্ণুপুর থেকেও সংগ্রহ করেছিলেন বলে তিনি জানিয়েছেন। এখানে বাঁকুড়া বেলেতোড় থেকে সংগৃহীত ছড়া, যেটি প্রবন্ধের একেবারে প্রথম সংখ্যক ছড়া, তা ছিল এইরূপ—

"পুটু যদি রে কাঁদে।
আমি ঝাঁপ দেব রে বাঁদে।।
পুটু যদি রে হাসে।
উঠব্ হেসে হেসে।।
পুটু নাকি রে কেঁদেচে।
(আমার) ভিজে কাঠে রেঁধেছে।।
এবার যাব হাট।
কিনে আনব রাঙা খাট।।" ৬০

বরুণকুমার চক্রবর্তীর মতে, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁর সংকলিত ছড়াগুলি সম্পর্কে কোনো আলোচনা করেন নি।

বাংলা লোকছড়ার ইতিবৃত্ত আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম (১৮৬১-১৯৪১) সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয়। তিনিই প্রথম বাংলা ছড়াকে সর্বসাধারণের দৃষ্টিগোচর করেন। যে বয়সে শিশু তার মাতৃজননী বা মাতামহীর ক্রোড়ে বসে দোদুলমুখর হয়ে রূপকথার গল্পে মসগুল হয়, সেই বয়সে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দাস-দাসী, চাকর-বাকর, মাঝিমল্লা, কর্মচারী-গৃহশিক্ষক এঁদের সান্নিধ্যে দিনাতিপাত করেন। কবি বলেছেন—

"সেই কৈলাস মুখুজ্জ্যে আমার শিশুকালে অতি দ্রুতবেগে মস্ত একটা ছড়ার মত বলিয়া আমার মনোরঞ্জন করিত।"[৬১] — সেই ছড়া শুনে রবীন্দ্রনাথের চিত্ত উৎসুক হয়ে উঠত। তাই 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে কবির সেই ছেলেবেলার অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালে ছড়ার আঙ্গিকে প্রকাশিত হয়েছে—

"কিশোরী চাটুজ্জে হঠাৎ জুটত সন্ধ্যা হলে—
বাঁ হাতে তার খেলো হুঁকো, চাদর কাঁধে ঝোলে।
দ্রুতলয়ে আউড়ে যেত লবকুশের ছড়া—
থাকত আমার খাতা লেখা, পড়ে থাকত পড়া।"[৬২]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'লোকসাহিত্য' প্রবন্ধের চারটি বিষয়ের মধ্যে প্রথম দুটি বিষয়-ই ছড়া নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রথম দুটি বিষয় 'ছেলে ভুলানো ছড়া' এবং 'ছেলে ভুলানো ছড়া-২' নামে সংকলিত। তবে এবিষয়ে নির্মলেন্দু ভৌমিকের মতে, নাম নিয়ে কবির কিছু দ্বিধা ছিল। কেননা 'এ বিষয়ে তখনও কারো কোনো স্বচ্ছ ধারণা ছিল না।'[৬৩] রবীন্দ্রনাথ 'ছেলে ভুলানো ছড়া'-র নাম দিয়েছিলেন 'মেয়েলি ছড়া'[৬৪] বলে। পরে তা গ্রন্থাগারে প্রকাশের সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'মেয়েলি ছড়া' নাম পরিবর্তন করে নামকরণ করেন। 'ছেলে ভুলানো ছড়া'।[৬৫] লেখকের মতে, —নাম পরিবর্তন নিয়ে ভাবনা গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বেই কবির মনে ঘটে গিয়েছিল, তাই তাঁর পরবর্তী প্রবন্ধ 'ছেলে ভুলানো ছড়া' (মাঘ, ১৩০১ এবং কার্তিক, ১৩০২) নামে সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তারপরে 'ভারতী'তে 'গ্রাম্য সাহিত্য' (ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩০৫) নামে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাতেও তিনি ছড়া নিয়ে আলোচনা করেন।

নির্মলেন্দু ভৌমিকের মতে,—

"প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশের কিছুদিনের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ হর-গৌরী বা রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক ছড়ার সন্ধান পান, যা কেবল নারীর বা নাবালকের নয়। ছড়ার অন্য ও বিস্তৃত দিক সম্পর্কে সচেতন হবার সুযোগ কবি নিজেই করে নেন। সুতরাং ছেলে ভুলানো বা মেয়েলি ছড়ার প্রকৃতি ও রচনারীতি সম্বন্ধে কবি কোনো মন্তব্য করে থাকলে তা একান্ত ও বিশেষভাবে সেই ধরণের ছড়া সম্বন্ধেই প্রযোজ্য হবে মাত্র, নির্বিশেষভাবে সকল ছড়া নয়। অনেকেই এই

সহজ কথাটি ভুলে গিয়ে, ছড়ার একাংশ সম্বন্ধে কৃত রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যকে সর্বাংশে প্রয়োগ করতে চান বলে তিনি মনে করেন।"[৬৬]

রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গেই বাংলার লোকসাহিত্যের উপাদান সংগ্রহে ব্রতী হয়েছিলেন এবং আলোচনা করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের 'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন,

> "বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান' এই ছড়াটি বাল্যকালে আমার নিকট মোহমন্ত্রের মতো ছিল এবং সেই মোহ এখনো আমি ভুলিতে পারি নাই। আমি আমার সেই মনের মুগ্ধ অবস্থা স্মরণ করিয়া না দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিব না ছড়ার মাধুর্য এবং উপযোগিতা কী।"[৬৭]

এই কারণেই তিনি দেশের অগণিত তরুণ ছাত্রদের স্বদেশ সেবার্থে আহ্বান করে 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ'[৬৮] শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করেন। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে সেদিন ছাত্রসমাজকে বঙ্গদেশ ও বাঙালি জাতির যাবতীয় বিষয়াদির অনুসন্ধান কাজে আত্মনিয়োগ করতে বলেন। এ সম্পর্কে বরুণকুমার চক্রবর্তীর গ্রন্থে পাই,—

> "সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার বিষয় এমন কত আছে তাহার সীমা নাই। আমাদের ব্রত পার্বণগুলি বাংলার এক অংশে যেরূপ অন্য অংশে সেরূপ নহে। স্থানভেদে সামাজিক প্রথার অনেক বিভিন্নতা আছে। এছাড়া গ্রাম্যছড়া, ছেলে ভুলাইবার ছড়া, প্রচলিত গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত আছে। বস্তুত দেশবাসীর পক্ষে দেশের কোন বৃত্তান্তই তুচ্ছ নহে, এই কথা মনে রাখিয়াই সাহিত্য পরিষদ নিজে কর্তব্য নিরূপণ করিয়াছে।"[৬৯]

তাছাড়া ছড়াগুলি যে স্থায়ীভাবে সংগ্রহ করে রাখা কর্তব্য এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'ছেলেভুলানো ছড়া ঃ ২' গ্রন্থে বলেছেন,

> "ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি। বহুকাল হইতে আমাদের দেশের মাতৃভাণ্ডারে এই ছড়াগুলি রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে।"[৭০]

সুতরাং জাতীয় পুরাতন এই সম্পত্তিগুলিকে সংগ্রহ করবার জন্য তিনি যেমন এগিয়ে এসেছেন, তেমন সমগ্র দেশবাসীকেও আহ্বান জানিয়েছেন।

বরুণকুমার চক্রবর্তীর তথ্যানুযায়ী, রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছড়ার সংকলনে প্রকাশিত ছড়াগুলির সংগ্রহস্থল, সংগ্রহ সূত্র বিস্তারিতভাবে কিছু বলেননি। ১৩০১ সনের সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত 'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রবন্ধ থেকে জানা যায় 'কলিকাতায় সংগৃহীত ছড়া' বলে। বরুণকুমার চক্রবর্তীর মতে, তবে এগুলি কলকাতার নয়, কলকাতার বাইরে এমনকি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের ছড়া-ই তাতে স্থান পেয়েছে। তিনি আরো বলেন, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির উপকরণ সংগ্রহের জন্যে বিশুদ্ধতা রক্ষার ব্যাপারে সচেতন ছিলেন এবং কবি জানতেন এক্ষেত্রে রুচিবোধের কোনো স্থান নেই। এমনকি তাঁর ছড়ার সংকলনে একটিমাত্র ক্ষেত্র ছাড়া ('ভাতার খাকী' শব্দের পরিবর্তে 'স্বামী খাকী' শব্দের প্রয়োগ) সর্বত্রই তিনি বিশুদ্ধতা রক্ষা করেছেন।

'লোকসাহিত্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছড়া সম্পর্কে তাঁর যে রসজ্ঞ আলোচনা করেছেন, তাতে ছড়া সম্পর্কে তাঁর মূল বক্তব্যগুলি হল ঃ

১। ছড়া রচনা করা অতি সহজ ব্যাপার নয়। আপাতভাবে সহজ বলে মনে হলেও, তা যার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন, তা একেবারেই অসাধ্য। সহজের প্রধান লক্ষণ-ই তাই।

২। ছড়াগুলির মধ্যে একটি চিরন্তনত্ব আছে। শিশু যেমন চিরন্তন অপরিবর্তনীয়, ছড়াগুলিও তেমনি।

৩। ছড়াগুলিতে অসংলগ্ন ছবি যেন পাখির ঝাঁকের মতো উড়ে চলে।

৪। কোন্ মাসের কোন্ তারিখে ছড়া রচিত এ নিয়ে কেউ প্রশ্ন করে না। কবির মতে—"বাস্তবিকই এই ছড়াগুলি মানসিক মেঘরাজ্যের লীলা, সেখানে সীমা বা আকার বা অধিকার নির্ণয় নাই।" [৭১]

৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছড়াগুলিকে যদৃচ্ছা ভাসমান মেঘের সঙ্গো তুলনা করেছেন।

৬। ছড়াগুলি শ্রুতিনির্ভর, ছন্দে রচিত এবং স্বল্পমাত্রিক।

৭। কবির মতে, ছড়াগুলি যেন একটি আস্ত জগতের ভাঙা টুকরো। এদের মধ্যে বিচিত্র সুখদুঃখ শতধারায় বিভক্ত আছে। যেমন করে বহুযুগের আগে এই পৃথিবীর প্রাচীন সমুদ্রতীরের পঙ্কিলতটে বিলুপ্ত পাখিদের পদচিহ্ন পড়েছিল, অবশেষে তা পাথরে পরিণত— সে চিহ্ন আপনি পড়েছিল, আপনি রয়ে গেছে।

তেমনি এই ছড়াগুলিও অনেককালের ভাঙাচোরা ছন্দ, যেন এক-টুকরা মানুষের মনগুলিকে একালে উৎক্ষিপ্ত করে আমাদের মনরসে আবার সজীব করে তুলেছে।

৮। ছড়া আমাদের জাতীয় সম্পত্তি। বহুকাল ধরে আমাদের দেশের মাতৃভাণ্ডারে এই ছড়াগুলি রক্ষিত হয়ে আসছে।

৯। ছড়াগুলির আদিম পাঠ বলে নির্ণয় করবার উপায় বা প্রয়োজন নেই। কালে কালে মুখে মুখে ছড়াগুলি এতই মিশ্রিত এবং পরিবর্তিত হয়ে আসছে যে, ভিন্ন ভিন্ন পাঠের মধ্য থেকে কোনো একটি পাঠ নির্বাচন করে নেওয়া সংগত নয়। কারণ 'কামচারিতা' 'কামরূপধারিতা' ছড়াগুলির প্রকৃতিগত।

১০। আমাদের অলংকার শাস্ত্রে নয়টি রসের উল্লেখ আছে। কবির মতে, ছেলেভুলানো ছড়ায় যে রস আছে তা শাস্ত্রোক্ত নয়টি রসের বহির্ভূত, বাল্যরস। তা তীব্র নয়, গাঢ় নয়, অত্যন্ত স্নিগ্ধ সরস এবং যুক্তিসংগতিহীন।

১১। ছড়ার মধ্যে মর্তের শিশু স্বর্গের দেবপ্রতিমার সঙ্গে যখন-তখন এক হয়ে গিয়েছে।

১২। ছড়াগুলির মধ্যে একটি সহজ স্বাভাবিক কাব্যরস আছে, সেইটিই কবির কাছে অধিকতর আদরণীয়।

বাংলা ছড়া সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই আলোচনা তাঁর স্পর্শকাতর কবিমন এবং রসবোধের প্রকাশক। ছড়ার মধ্যে থাকা চিত্রমাধুর্য, ছন্দনির্মিত, অপূর্ব অনায়াস রচনা কৌশল কবিমনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং এ বিষয়ে তিনিই যে প্রথম পথ প্রদর্শক, নতুন পথের সন্ধানী, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানসাধক হিসেবে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর (১৮৬৪-১৯১৯) নাম বিশেষভাবে স্মরণীয় হলেও বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে জনপ্রিয়। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় 'ছেলে ভুলানো ছড়া' প্রকাশের পর বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ সরকার (১৮৬৬-১৯৩৭) 'খুকুমণির ছড়া' প্রকাশ করেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ঐ গ্রন্থের একটি ভূমিকা লিখেছিলেন। যে ভূমিকা কেবল ভূমিকার জন্য ভূমিকা নয়, যা

ছিল পৃথক একটি প্রবন্ধের সমতুল্য। যে কারণে ছড়া সাহিত্যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী আজও খ্যাতির শীর্ষে।

এই গ্রন্থের ভূমিকা রচনার আহ্বানে তাঁর তৎকালীন মানসিকতার চিত্রখানি যেভাবে ফুটে উঠেছিল তা হল—

"এই গ্রন্থের প্রকাশক মহাশয় যখন আমাকে এই ভূমিকা লিখিবার জন্য আহ্বান করেন, তখন, আহ্লাদের ও কৃতজ্ঞতার সহিত আমি এই ভার গ্রহণ করি। আহ্লাদের কারণ, আমি এইরূপ ছড়া সংগ্রহের অভাব অনুভব করিতেছিলাম।" [৭২]

তিনি এই গ্রন্থ সম্পর্কে বলেছেন—

"মনস্তত্ত্ববিদ্ ও সমাজতাত্ত্বিক এই সাহিত্য হইতে বিবিধ সত্যের আবিষ্কার করিতে পারেন। মনুষ্য জীবনের একটা বৃহৎ অংশের দুর্জ্ঞেয় রহস্য এই অনাদৃত সাহিত্যের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। মানুষের শৈশব জীবনের প্রকৃতি পর্যালোচনা করিতে হইলে আমাদিগকে অনেক সময় এই সাহিত্যের আশ্রয় লইতে হইবে।" [৭৩]

বিজ্ঞান সাধক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁর মনস্তাত্ত্বিক ভাবনার আলোকে কেবল শিশুদেরকেই নয়, প্রতিটি পরিণত মানুষের মধ্যে যে দুর্জ্ঞেয় শৈশব জীবনের রূপটির ছায়াপাত ঘটে, ছড়ার জগতে যা সর্বদা প্রতিফলিত হয়, সেই চরম সত্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছেন।

বরুণকুমার চক্রবর্তীর মতে, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 'খুকুমণির ছড়া' [৭৪] গ্রন্থের ভূমিকায় মোট আড়াই শতকেরও কম সংখ্যক ছড়ার কথা বললেও পরবর্তীকালে এই সংকলনে আরো দেড় শতাধিক ছড়া অর্থাৎ ৪১০টি ছড়া স্থান পায়। এদিক দিয়ে এটিকে প্রথম বৃহত্তম ছড়ার সংকলন গ্রন্থের মর্যাদা দিতে হয়। শিশুকে নিয়ে রচিত তাঁর ২১১ সংখ্যক ছড়াটি হল—

"ধন ধন ধন,
বাড়ীতে ফুলের বন।
এধন যার ঘরে নাই
তার কীসের জীবন ?
তারা কিসের গরব করে ?
আগুনে পুড়ে কেন না মরে ?" [৭৫]

খুকুমণির ছড়ায় সংকলিত ১৩৮ সংখ্যক ছড়াটি হল—

"হড়ম্ বিবির খড়ম্ পায়,
লাল বিবির জুতা পায়।
চল বিবি ঢাকা যাই,
ঢাকা যেয়ে ফল খাই,
সে ফলের বোঁটা নাই।
ঢাকা'য়েরা ঢাক বাজায়
খালে আর বিলে,
সুন্দরীরে বিয়ে দিলাম,
ডাকাতের মেলে।
আগে যদি জানিতাম,
ডুলি ধরে কাঁদিতামহ্ল" [৭৬]

বরুণকুমার চক্রবর্তীর মতে, যোগীন্দ্রনাথ সরকার তাঁর সংগৃহীত প্রতিটি ছড়ার নামকরণ সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত করেন নি। এর কারণ অনুমান করা যায় যে, বিশেষভাবে শিশুদের জন্য রচিত বলেই নামকরণের সঙ্গো কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু অনুযায়ী চিত্র ও সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। যোগীন্দ্রনাথ সরকার ছড়ার সংগ্রহে স্থানের নামও উল্লেখ করেন নি। এমনকি ছড়াগুলির আঞ্চলিক ভাষার পরিবর্তন সাধনও তাঁর ছড়ার এক মস্ত ত্রুটি। তবুও বলা যায় যে, ছড়ার সংখ্যাধিক্যে এবং বৈচিত্র্যের জন্য তাঁর সংকলনটি এক অমূল্য সম্পদ।

ছড়া সম্পর্কিত আলোচনায় উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১)। রবীন্দ্রনাথ যখন ছড়া সংগ্রহের জন্য বিশেষভাবে উৎসাহী হয়ে ওঠেন, তখন অবনীন্দ্রনাথ-ই এই বিষয়ে তাঁকে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেন। অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন চিত্রকর। তাই তিনি চিত্রের পরিভাষায় ছড়ার লক্ষণকে ব্যক্ত ও বিশ্লেষণ করেছেন। এখানেই অবনীন্দ্রনাথের দৃষ্টির বিশেষত্ব। ছড়া সম্পর্কে তাঁর অভিমত—

"ছড়াগুলি এমন জিনিস যে তাদের যেভাবেই সাজাও তা থেকে একটা না একটা রস পাওয়া যায়, সুতরাং ছড়ানো অবস্থাতেই ওগুলো হয়তো রাখাই ঠিক, শুধু মাঝে মাঝে নেড়ে চেড়ে দেখা নানারকম আলোতে ধরে।" [৭৭]

নির্মলেন্দু ভৌমিকের মতে, তিনি ছড়ার মধ্যে ক্যালিডোস্কোপ দেখতে পেয়েছেন। ক্যালিডোস্কোপে যেমন কয়েকটি কাঁচ-খণ্ড যেমন তেমন ঘোরালে নয়ন মনোহর figure দেখতে পাওয়া যায়, তেমনি ছড়াতেও দেখা যায়। তিনি ছড়াকে অসংগত ও অসংলগ্ন বলেননি। তাঁর মতে, সৃষ্টি কখনোই অসম্পূর্ণ হতে পারে না। তার পূর্ণতা অবশ্যই আছে, তবে তা দেখার চোখ চাই। যদি ছড়ার মধ্যে রচয়িতার সৃষ্টির পূর্ণতা না থাকত, তবে তা কখনোই সৌন্দর্যের প্রকাশ হত না। তাঁর এই মন্তব্য ছড়া আলোচনার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করতে পারে। তাঁর রচিত 'বাংলার ব্রত'[৭৮] এ বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর দু-একটি ব্রতমূলক ছড়া হল—

১। পৃথিবী ব্রতের শাস্ত্রীয় প্রণাম মন্ত্র —

"বসুমাতা দেবী গো। করি নমস্কার।
পৃথিবীতে জন্ম যেন না হয় আমার।"[৭৯]

২। পূর্ণিপুকুর ব্রতমূলক ছড়া ঃ

"পূর্ণিপুকুর পুষ্পমালা
কে পূজেরে দুপুরবেলা ?
আমি সতী লীলাবতী
ভাইয়ের বোন পুত্রবতী
হয়ে পুত্র মরবে না
পৃথিবীতে ধরবে না"[৮০]

৩। বসুধারা ব্রত ঃ

"অষ্টবসু অষ্টতারা তোমরা হলে সাক্ষী,
আট দিকে আট ফল আমরা রাখি।
অষ্টবসু অষ্টতারা তোমরা হলে সাক্ষী,
আট দিকে আট ফুল আমরা রাখি।"[৮১]

'বাংলার ব্রত' সর্বপ্রথম গ্রন্থাগারে প্রকাশিত হয় ১৯১৯ সালে। পরবর্তী সময়ে বিশ্বভারতী ও আরো পরে ২০১১ সালে প্রকাশ ভবন প্রকাশনা সংস্থা থেকে 'বাংলার ব্রত' প্রবন্ধটি 'অবনীন্দ্র রচনাবলী'র নবম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়।[৮২]

রবীন্দ্রনাথের 'মেয়েলি ছড়া' প্রবন্ধের প্রায় তিরিশ বছর পর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ছেলে ভুলানো ছড়া' প্রবন্ধটি লেখা হয়। প্রবন্ধটিতে তিনি একজন শিল্পরসিক ও আর্টিস্টের দৃষ্টিভংগীতে লোকছড়ার বর্ণনা দেন। তাঁর সেই গ্রন্থের কয়েকটি ছড়া এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ তুলে ধরা হল—

১। "দাদাগো দাদা শহরে যাও
তিন টাকা করে মাইনে পাও।" [৮৩]

২। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিল্পের তুলনা, 'Sun Set Landscape' —
"আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে সূর্যি গেল পাটে,
খুকু গেল জল আনতে পদ্মদিঘির ঘাটে।
পদ্মদিঘির কালো জলে হরেকরকম ফুল,
হাঁটুর নীচে দুলছে খুকুর গোছা ভরা চুল।" [৮৪]

৩। 'Decorative Painting' —
"এক যে গাছ ছিল,
লতায় লতিয়ে গেল
তার এক কুঁড়ি ছিল,
ফুল ফুল ফুল ফুটে গেল!" [৮৫]

মোহিনীমোহন সরদার তাঁর লেখায় ছড়া সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথের বক্তব্য বলতে গিয়ে বলেছেন—

> ইতিহাস যেভাবে ঘটনার খবর দেয় কিংবা খবরের কাগজের খবর যেভাবে আসে ছড়ার মধ্যে দিয়ে খবরগুলি ঠিক তেমনভাবে আসে না। ছড়াতে খবরটার সঙ্গে যে খবর দিচ্ছে, সে এবং তার তখনকার আনন্দ সুখ-দুঃখ সব জড়িয়ে রসালো হয়ে আসে, খবরটা যৎসামান্য হলেও।
>
> "ওপারে এক ময়রা বুড়ো রথ করেচে তেরো চুড়ো,
> বানরে ধরেছে ধ্বজা দিদিগো দেখতে মজা।"

অর্থাৎ কোনো এক ময়রা রথের মেলায় কী কী করেছিল উক্ত ছড়াটিতে তার খবর আছে। কিন্তু যাদের উদ্দেশে ছড়াটি বলা হয়েছে তারা উত্তর দিলো—

"তোদের হলুদ মাখা গা, তোরা রথ দেখতে যা,
আমরা হলুদ কোথা পাব ? আমরা উল্টো রথে যাবো।"

এই উক্তি প্রত্যুক্তিতে রথের খবর, রথের সাজ-সজ্জার খবর, বাঁধুনি এবং যারা রথ দেখতে যাবে, যারা যাবে না—সব খবরই আছে।"[৮৬]

লোকসাহিত্যের আলোচনায় আশুতোষ ভট্টাচার্যের (১৯০৯-১৯৮৪) নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। তাঁর 'বাংলার লোকসাহিত্য' (১৯৬২) গ্রন্থটি এ বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি এই গ্রন্থে 'ছড়া'র সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন —'যাহা মৌখিক আবৃত্তি (recite) করা হয়, তাহাই ছড়া।'[৮৭] ছড়ায় থাকে সুর তাল, অসংলগ্নভাব, কাহিনীহীন চিত্রময় কিছু খেয়ালী রেখা, যা শিশুর মনকে সহজেই আকর্ষণ করে। ছড়ার মধ্যে থাকে লোকসাহিত্যের সুনিবিড় বন্ধন। তাই তিনি 'ছড়া'কেই লোকসাহিত্যের আলোচনায় সর্বপ্রথম আলোচিত বস্তু হওয়া উচিত বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি ছড়া সম্পর্কে তাঁর গ্রন্থে বলেছেন—

"ইহা যাহাদের সাহিত্য তাহাদের মধ্যে বুদ্ধি ও বিচার অপেক্ষা রসের মূল্য বেশি, মস্তিষ্ক অপেক্ষা হৃদয় বড় ; অতএব হৃদয় ভরিয়া হৃদয়ের সৃষ্টি তাহারা গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করে না"[৮৮]।

তাঁর রসজ্ঞ দৃষ্টিতে মাতা ও শিশুর খেলা-খেলা ছড়া আবৃত্ত করার বিষয়টি সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে, যা আমাদের কাছে উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রার মতো বঙ্গজননী আর বঙ্গশিশুর এক মনোহর চিত্রে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তিনি তাঁর এই গ্রন্থে ছেলেদের খেলার ছড়ার সঙ্গে, মেয়েদের খেলার ছড়া (ব্রতমূলক ছড়া), নৈসর্গিক ছড়া, ডাকের ছড়া, সর্বশেষে ঐন্দ্রজালিক ছড়ার আলোচনার মধ্য দিয়ে লোকসাহিত্যের ইতিহাসে এক অনন্য মাত্রা সংযোজন করেছেন। ছড়ার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, ছড়ার একটি অংশের সঙ্গে অন্য অংশ সহজেই সংলগ্ন হয়ে যায়। তিনি আরো বলেছেন, ছড়ার ছন্দ-ই বাংলা কবিতার প্রাচীনতম ছন্দ যা শ্বাসাঘাতপ্রধান। প্রত্যেক পর্বের আদিতে ঝোঁক পড়ে বলে একে বলপ্রধান ছন্দও বলে। তাঁর দু-একটি সংগৃহীত ছড়া নিম্নরূপ—

১। "তোর উপর চড়া।
কিরা থাকল কড়া॥

ঢেঁকির উপর রক্ত।
আমার কিরা শক্ত॥
কাঁচা কঞ্চি পাকা বাঁশ।
কিরা থাকল বারমাস।।" [৮৯] (নারী বিষয় ছড়া, পৃ-১৯৫)

২। "দোল্ দোল্ দোলনি।
কাল যাব বেলুনি॥
কিনে আন্‌ব দোলনি॥
বেলুনির পাকা আমরা।
খেয়ে অম্বলে বুক চাব্‌ড়া।।" [৯০] (শিশু বিষয় ছড়া, পৃ-১৫৩)

৩। "থুর থুরি বিন্দা বুড়ী।
মাছ ধরব কুড়িকুড়ি॥
যেখানে মাছের ঘর।
সেখানে যাইয়া বনশী পড়॥
আমার নাম বান্যা।
মাছ তুলব ট্যান্যা।।" [৯১] (ঐন্দ্রজালিক ছড়া, পৃ-২০৪)

লোক ছড়ার আলোচনায় নির্মলেন্দু ভৌমিকের 'বাঙলা ছড়ার ভূমিকা' [৯২] বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই গ্রন্থের আলোচনার শুরুতে তিনি তাঁর পূর্ববর্তী লেখকদের ছড়া সম্পর্কিত ভাবনার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোকপাত করেছেন। লেখক তাঁর গ্রন্থের আলোচনাকে কতকগুলি সংখ্যাবাচক শিরোনামে চিহ্নিত করেছেন। ছড়া সম্পর্কে তাঁর অভিমত,

"ছড়াকে আমরা যে নামেই ডাকি না কেন (নারীসহিত্য, শিশুসাহিত্য, লোকসাহিত্য) ছড়া কিন্তু তার একটি জিনিস বদলায় নি রচনারীতি ও ভঙ্গি।" [৯৩]

একই রচনারীতি সবেতেই রয়েছে এবং এর মূল নিহিত লোক-মানসের চিরকালীন বিশেষত্বের মধ্যে। ছড়ার সংজ্ঞা এবং বিভিন্ন আলোচকের আলোচনার প্রসঙ্গে ছড়ার বিবর্তন সম্পর্কে তিনি বলেন, লোক ব্যবহারে 'ছড়া' শব্দটি বোধহয় ব্যাপকভাবে বাংলার সর্বত্র ব্যবহৃত হত না, 'ছড়া' শব্দের ব্যবহার কেবল পশ্চিমবঙ্গেই সীমাবদ্ধ ছিল। পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের উপভাষায় তখনও পর্যন্ত কোনো 'ছড়া' শব্দের ব্যবহার ছিল না। যদিও বর্তমানের লেখক-গবেষকরা 'ছড়া' নাম দিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছে।

বরুণকুমার চক্রবর্তীর মতে, লেখকের দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হয় প্রথম খণ্ডের এক বছর পূর্বে ১৩৮৫ (১৯৭৮)তে। এই গ্রন্থটি তাঁর বৃহত্তম ছড়া সংকলন। এতে মোট ৫২৫টি ছড়া স্থান পেয়েছে। নির্মলেন্দু ভৌমিক এই গ্রন্থের প্রতিটি ছড়ার সংগ্রহসূত্র নির্দেশ করেছেন, তাছাড়া এতে বহু ছড়াই একেবারে আনকোরা এবং ভিন্ন ভিন্ন জেলার আঞ্চলিক অনুষ্ঠানগুলি সম্পর্কে তিনি আলোকপাত করেছেন, তাঁর এই গ্রন্থদ্বয় লোকছড়ার ইতিহাসে এক অমূল্য সম্পদ।

বরুণকুমার চক্রবর্তীর মতে, নির্মলেন্দু ভৌমিকের সংকলনে অনেক অসম্পূর্ণতা রয়েছে, কিন্তু সেইসঙ্গে এও স্বীকার্য যে, তাঁর মত বহু বিস্তৃত পরিসর থেকে নিয়ে ছড়ার সংকলন ইতিপূর্বে আর কাউকেই করতে দেখা যায়নি। এই সংকলনে ছড়ার পাঠান্তরও স্থান পেয়েছে এবং সেগুলির উৎসও উল্লিখিত হয়েছে। সংকলক ছড়াগুলিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন, আবার প্রতিটি বিভাগের উপবিভাগও রয়েছে। বিস্তৃত বিষয়সূচী গ্রন্থটির একটি উল্লেখযোগ্য দিক। পাঠক বিশেষ কোনো ছড়ার সন্ধানে প্রয়াসী হলে, এই বিষয়সূচী সে বিষয়ে খুবই সহায়ক হবে, লেখক ছড়ার এই সংকলনে ছড়া সম্পর্কে কোনো আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়নি, তবে পাদটীকায় মাঝে মাঝে কিছু কিছু সংক্ষিপ্ত মন্তব্য স্থান পেয়েছে।

সুকুমার সেন (১৯০১-১৯৯২) বাংলা সাহিত্যে একজন ভাষাতত্ত্ববিদ্ হিসেবে পরিচিত হলেও বাংলার ছড়ার জগতেও তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। সুকুমার সেন 'শিশুবেদ' শীর্ষক ভূমিকাংশে তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে পাণ্ডিত্যের নিরসতা থেকে বেরিয়ে ছড়া সম্পর্কে যে নতুন তথ্য প্রকাশ করেছেন, বরুণকুমার চক্রবর্তীর গ্রন্থে তা ব্যক্ত হয়েছে এইভাবে ঃ—

> "যে রচনা কোন ব্যক্তি বিশেষের তৈরী বলে নির্দিষ্ট করা যায় না, যা কোন এক মানব গোষ্ঠীকে প্রায় অনাদিকাল ধরে জন্মে-কর্মে চিন্তায় নিয়ন্ত্রিত করে এসেছে তাকে যদি বেদ নাম দিয়ে থাকি তবে অপৌরুষের ছেলেমি ছড়া-গান-গল্পকে শিশু-বেদ বললে বোধ করি খুব অসঙ্গত হয় না। ... শিশু-বেদ হল মানুষের আদিম "সাহিত্য" যা পরবর্তী সাহিত্যের-কোন ভাষায় কিছু উদ্ভূত হয়ে থাকলে-বীজ। ... শিশুবেদ বয়স্কের সাহিত্য-ভুবন ধরে আছে বাসুকির মতো-শিশুবেদের মধ্যে ধরা রয়েছে সমগ্র মানবজাতির জন্মপত্রিকা।" [৯৪]

বরুণকুমার চক্রবর্তীর তথ্যানুযায়ী, সেন মহাশয়ের ভাষায়,

"শ্রোতার বয়স এবং বক্তার অথবা শ্রোতার অথবা উভয়েরই প্রয়োজন অনুসারে ছেলেমি ছড়াকে তিন প্রধান শ্রেণিতে ফেলা যায়, —ঘুম পাড়ানি, মন ভোলানি ও খেলাচালানি।" [৯৫]

যদিও এই তিন বিভাগের বাইরে চক্রবর্তীর মতে আরো অনেক ছড়া আছে বলে আমরাও মনে করি। তবুও ছড়ার আলোচনায় এবং ছড়া কথাটির বুৎপত্তিগত আলোচনার ব্যাখ্যা, সেনের পূর্বে এমনভাবে কেউ আলোচনা করেনি একথা বললে অত্যুক্তি হয় না।

বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ধারায় যে সমস্ত বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ আছেন, তাঁদের মধ্যে বরুণকুমার চক্রবর্তীর (১৯৪২) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যাঁর সংকলিত পুস্তক সংখ্যা কমবেশি পঞ্চাশটি। যে বইগুলি লোকসংস্কৃতির সীমানাকে নানাভাবে বর্ধিত করেছে, সেইরকম সব সাহিত্যেই তিনি সাবলীল পদচারণা করেছেন। একালের লেখক-গবেষক তাঁর এই আলোচিত গ্রন্থ থেকে বহু রসদ সংগ্রহ করে চলেছে এবং ভবিষ্যতেও করে থাকবে সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই। তাই বিদগ্ধ পণ্ডিত লোকসংস্কৃতিবিদ্ হিসেবে সকল লোকসাহিত্য রসিকের কাছে তিনি চিরনমস্য। বিভিন্ন পুস্তকের সঙ্গে সঙ্গে তিনি 'লোকসংস্কৃতি ও নৃবিদ্যার অভিধান' [৯৬] এবং 'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতিকোষ' [৯৭] প্রণয়ন করে বিশেষ দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছেন। তাঁর 'বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস' [৯৮] (৭ম সংস্করণ) গ্রন্থটির ছড়া বিষয়ক আলোচনা যথেষ্ট তথ্য সমৃদ্ধ এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ সমন্বিত। এছাড়াও 'ছড়া'র আলোচনায় তাঁর সম্পাদিত 'বাংলা ছড়া পরিক্রমা' [৯৯] ও বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য।

তিনি তাঁর 'বাংলা লোকসসাহিত্য চর্চার ইতিহাস' গ্রন্থে উইলিয়ম কেরির (১৭৬১—১৮৩৪) 'ইতিহাসমালা' (১৮১২), মর্টন সাহেবের 'দৃষ্টান্ত বাক্যসংগ্রহ' (১৮৩২), রেভারেণ্ড লঙের 'প্রবাদমালা' (১৮৬৮), আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (১২৭৮—১৩২৯) 'ছেলে ভুলানো ছড়া' (১৩০২), যোগীন্দ্রনাথ সরকারের (১৮৬৭—১৯৩৭) 'খুকুমণির ছড়া' (১৮৯৯), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১—১৯৪১), অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১—১৯৫১), দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার (১৮৭৭—১৯৫৭), নির্মলেন্দু ভৌমিক সহ একালেরও বহু বিদগ্ধ পণ্ডিত লোকসংস্কৃতিবিদ্‌দের ছড়া সম্পর্কিত পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন।

তাঁর মতে, ছড়া চর্চার ক্ষেত্রে বেশ কয়েকজন মহিলার সন্ধান পাওয়া যায়। যদিও ছড়ার কোনো পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনার তেমন কোনো কৃতিত্ব তাঁদের ছিল না, তবুও বেশ

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ রচনার কৃতিত্ব যে তাঁদের, সেকথা স্বীকার করতেই হবে বলে তাঁর অভিমত। তিনি এই প্রসঙ্গে শতদল বাসিনী বিশ্বাস জায়া, রেণুকাবালা দাসী, নিরুপমা দেবী (১৮৮৩—১৯৫১) প্রমুখের নাম স্মরণ করেছেন।

তাঁর এই ছড়ার আলোচনায় শিশু, নারী, নারীমূলক ব্রত, আগমনির ছড়া, কুলাইর ছড়া, ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন ছড়া, প্রভৃতি তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ছড়াগুলির তথ্য নিপুণতার সঙ্গে উত্থাপন করেছেন, যেগুলি 'ছড়া'র ইতিহাসে আগামীর ভবিষ্যৎ পাথেয় শুধু নয়, সাহিত্যের নব নব দিক যে সূচিত করবে, সে বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই।

ছড়ার আলোচনায় আশ্‌রাফ সিদ্দিকীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ছড়ার আলোচনা করতে গিয়ে তিনি তাঁর 'লোকসাহিত্য' [১০০] (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থে বলেন—

"শিশু-সম্পর্কীয় ছড়াগুলো যে শিশুকে ঘুমপাড়ানো বা ভুলাইবার জন্যই কোনো এক সময় কোনো মাতৃ স্থানীয়া নারী কর্তৃক আবৃত্তিকৃত হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বস্তুত বিচিত্র ঘুম পাড়ানী (Lullaby) ছড়ায় বিশ্বের ছড়ার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ, এতে শিশুর সুন্দর স্বভাব, ভবিষ্যৎ বীরপনা, দেশের ঐতিহ্য, কথার অবহেলা করলে বিপদ, তার ভবিষ্যৎ ইত্যাদিই কীর্তিত। যেসব ছড়ার মধ্যে 'অসংগতি' অপেক্ষাকৃত বেশি সেগুলো যে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন তা সম্ভবত সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে।" [১০১]

লেখক তাঁর ছড়াগুলিকে 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করেছেন, এবং কোনটি কোন্ জেলা বা অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত সেকথাও উল্লেখ করেছেন। তবে ছড়াগুলি সংগ্রহের দিনক্ষণ এবং তারিখ উল্লেখ করেন নি। যাইহোক তাঁর সংগৃহীত দু-একটি ছড়া হল—

১। "তোমার আমার ঠিকানা। পদ্মা মেঘনা যমুনা॥ নৌকা চলে ভাসিয়া। ভোট দিবেন হাসিয়া॥ সাইকেলে পাম্প নাই। নৌকা দিয়া হাটে যাই॥ হারিকেনে তেল নাই। নৌকা ছাড়া গতি নাই॥ চিন্তা কইরা দেখলাম ভাই। নৌকা ছাড়া উপায় নাই॥ নৌকা চলে টিকটিক। ভোট দিবে ঠিকঠিক॥" [১০২]

এই ছড়াটি তাঁর ১৯৭০-এর ইলেকশন ক্যাম্পেইনে আওয়ামী লীগের স্বপক্ষে রসালো ইলেকশন স্লোগান থেকে শোনা লোক ঐতিহ্যে প্রতিধ্বনিত।

২। রাজশাহী অঞ্চলের একটি ছড়া—

"আমার মাছ কৈগো? — বকে নিছে। বক কইগো? —ডালে বইছে। ডাল কইগো? —ভাইঙ্গা পড়ছে। খড়-কুটা কইগো? — ধোপায় নিছে। ধোপা কইগো? হাটে গেছে। হাট কইগো? —ভাইঙ্গা গেছে।" [১০৩]

৩। হা-ডু-ডু খেলা সম্পর্কিত ছড়া—

"এল রাণী ঘন্টা বেলরাণী ফুল। ছলে ঘন্টা মধুপুর॥ মধুপুরের কাচারী। ডাল ভাত খিচুরী॥" [১০৪]

পরিশেষে বলা যায় যে, বহু বিদগ্ধ পণ্ডিত ছড়া বিষয়ক তাঁদের স্ব স্ব ভাবনার প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন গ্রন্থকার ও গবেষক হলেন—যেমন মানস মজুমদার 'লোকসাহিত্য পাঠ' [১০৫] (১৯১৯), পল্লব সেনগুপ্ত 'লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ' [১০৬] (১৯৯৫) শেখ মকবুল ইসলাম 'লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞান তত্ত্ব, পদ্ধতি ও প্রয়োগ' [১০৭] (২০১১), সৌগত চট্টোপাধ্যায় 'বাংলার ছড়া ছড়ার বাংলা' [১০৮] (২০০৮), দেবশ্রী পালিত 'ছড়া লোকায়ত জীবনের কারুভাষ' [১০৯] (২০১২) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য।

প্রসঙ্গা নির্দেশ ও মন্তব্য ঃ

১. গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৯ খ্রিঃ, প্রকাশ সাহিত্যশ্রী, কলি-৯। বিস্তারিত বিবরণের জন্য পরিশিষ্ট-১, চিত্রসংখ্যা -১, পৃ-৪৫০ দ্রষ্টব্য।

২. 'গ্রাম্য কবিতা' বলতে গবেষকগণ বুঝিয়েছেন—লোকসাধারণের মুখে মুখে চর্চিত ছড়া। যা স্মৃতি ও শ্রুতিনির্ভর।

৩. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নির্মলেন্দু ভৌমিক, বাঙলা ছড়ার ভূমিকা, প্রথম খণ্ড, সাহিত্যশ্রী ১৯৭৯, কলি-৯, পৃ-২৩।

৪. গ্রন্থটি ১৯৭১ সালে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত, বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য Vols–I & II।

৫. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নির্মলেন্দু ভৌমিক, বাঙলা ছড়ার ভূমিকা প্রথম খণ্ড, সাহিত্যশ্রী, ১৯৭৯, কলি-৯, পৃ-৬।

৬. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-৮, দ্রষ্টব্য।
৭. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য প্রথম খণ্ড, ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৬২, কলি-১২, পৃ-১৩৩।
৮. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নির্মলেন্দু ভৌমিক, বাঙলা ছড়ার ভূমিকা, প্রথম খণ্ড, সাহিত্যশ্রী, ১৯৭৯, কলি-৯, পৃ-১৩।
৯. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঞ্চয়িতা, প্রকাশক-বিশ্বভারতী ; প্রকাশ-১৯৯৫।
১০. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য সৌগত চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত বাংলার ছড়া ঃ ছড়ার বাংলা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৮ গ্রন্থে বরুণকুমার চক্রবর্তী লিখিত প্রবন্ধ ছড়া ঃ সংজ্ঞা স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য, পৃ-১১।
১১. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-১১ দ্রষ্টব্য।
১২. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-১১ দ্রষ্টব্য।
১৩. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় শব্দকোষ, প্রথম খণ্ড, বৈঠকখানা রোড, ২০১১, কলি-৯, পৃ-৮৯৮। বিস্তারিত বিবরণের জন্য পরিশিষ্ট-১, চিত্রসংখ্যা-২, পৃ-৪৫২ দ্রষ্টব্য।
১৪. পরিমার্জিত নবম সংস্করণ ২০১৩, প্রকাশ নিউ বেঙ্গাল প্রেস, কলি-৬৮। বিস্তারিত বিবরণের জন্য পরিশিষ্ট-১, চিত্রসংখ্যা-৩, পৃ-৪৫৩ দ্রষ্টব্য।
১৫. সুবলচন্দ্র মিত্র, সরল বাঙলা অভিধান, পরিমার্জিত নবম সংস্করণ ২০১৩, পৃ-৫১৮ দ্রষ্টব্য।
১৬. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রী দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, সংসদ বাংলা অভিধান, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ, ১৯৯৪, কলি-৯, পৃ-২৪৩।
১৭. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য রাজশেখর বসু, চলন্তিকা, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, ১৯৬২, কলি-১২, পৃ-২২৮।
১৮. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নির্মলেন্দু ভৌমিক, বাঙলা ছড়ার ভূমিকা, প্রথম খণ্ড, সাহিত্যশ্রী, ১৯৭৯, কলি-৯, পৃ-২।

১৯. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-৪ দ্রষ্টব্য।

২০. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-৫ দ্রষ্টব্য।

২১. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-১৩১ দ্রষ্টব্য।

২২. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোকসাহিত্য, বিশ্বভারতী, ২০০৪, কলি-১৭।

২৩. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য আশ্‌রাফ সিদ্দিকী, লোকসাহিত্য ১ম খণ্ড, নয়া উদ্যোগ, ২০১২, কলি-৬, পৃ-১৭১।

২৪. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য সৌগত চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত বাংলার ছড়া ঃ ছড়ার বাংলা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৮, কলি-৯, পৃ-১১।

২৫. ভারতী ঃ বৈশাখ সংখ্যা ১৩৩০।

২৬. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নির্মলেন্দু ভৌমিক, বাঙলা ছড়ার ভূমিকা, প্রথম খণ্ড, সাহিত্যশ্রী, ১৯৭৯, কলি-৯, পৃ-৩৪।

২৭. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য বরুণকুমার চক্রবর্তী, বাংলা ছড়া পরিক্রমা, অক্ষর প্রকাশনী, ২০১৪, কলি-৬, পৃ-১৩।

২৮. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নির্মলেন্দু ভৌমিক, বাঙলা ছড়ার ভূমিকা, প্রথম খণ্ড, সাহিত্যশ্রী, ১৯৭৯, কলি-৯, পৃ-১৯।

২৯. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-২০ দ্রষ্টব্য।

৩০. গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ২০১২ খ্রীঃ, প্রকাশক বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, বিস্তারিত বিবরণের জন্য পরিশিষ্ট-১, চিত্রসংখ্যা-৪, পৃ-৪৫৪ দ্রষ্টব্য।

৩১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দেবশ্রী পালিত, ছড়া লোকায়ত জীবনের কারুভাষ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১২, কলি-৯, পৃ-১১।

৩২. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লোকসাহিত্য, বিশ্বভারতী, ২০০৪, কলি-১৭, পৃ-৫।

৩৩. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য সৌগত চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত বাংলার ছড়া ঃ ছড়ার বাংলা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৮, কলি-৯, পৃ-১৩।

৩৪. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৬২, কলি-১২, পৃ-১৩১।

৩৫. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য বরুণকুমার চক্রবর্তী, বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, পুস্তক বিপণী, ২০০৮, কলি-৯ ; পৃ-৯৪।

৩৬. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-৯৪ দ্রষ্টব্য।

৩৭. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য বরুণকুমার চক্রবর্তী, বাংলা ছড়া পরিক্রমা, অক্ষর প্রকাশনী, ২০১৪, কলি-৬, পৃ-৭৮।

৩৮. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোকসাহিত্য, বিশ্বভারতী, ২০০৪, কলি-১৭, পৃ-৪৭।

৩৯. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-৩৬ দ্রষ্টব্য।

৪০. 'ভাতারখাকী' শব্দটি কথ্য ভাষায় অশ্লীল শব্দ বলে পরিচিত। যার অর্থ হল স্ত্রীর সান্নিধ্যে স্বামীর ক্ষতি বা মৃত্যুর সম্ভাবনা।

৪১. কথ্য বাংলায় 'ভাতার' শব্দটি স্বামী অর্থে ব্যবহৃত হলেও শব্দটিতে যে রূঢ়তা ও অশ্লীলতা আছে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তা গ্রহণ করতে পারেন নি। তাই তিনি 'ভাতার' শব্দটির পরিবর্তে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য ও মার্জিত 'স্বামী' শব্দটির প্রয়োগ করেছেন।

৪২. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোকসাহিত্য, বিশ্বভারতী, ২০০৪, কলি-১৭, পৃ-১৮।

৪৩. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-৪৯ দ্রষ্টব্য।

৪৪. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য বরুণকুমার চক্রবর্তী, বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, পুস্তক বিপণী, ২০০৮, পৃ-৮৮।

৪৫. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য সৌগত চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত বাংলার ছড়া ঃ ছড়ার বাংলা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৮, কলি-৯, পৃ-৪২৯ দ্রষ্টব্য।

৪৬. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য সৌগত চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত বাংলার ছড়া ঃ ছড়ার বাংলা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৮, তিমিরবরণ চক্রবর্তী লিখিত ছড়া চর্চায় খ্রীষ্টান মিশনারীদের দান প্রবন্ধ, পৃ-৪৩১।

৪৭. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-৪৩১ দ্রষ্টব্য।

৪৮. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-৪৩২-৪৩৩ দ্রষ্টব্য।

৪৯. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-৫১৯ দ্রষ্টব্য।

৫০. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-৫৬৭ দ্রষ্টব্য।

৫১. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-৪৩৭ দ্রষ্টব্য।

৫২. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-৪৩৭ দ্রষ্টব্য।

৫৩. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-৪৩৮ দ্রষ্টব্য।

৫৪. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-৪৩৮-৪৩৯ দ্রষ্টব্য।

৫৫. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য বরুণকুমার চক্রবর্তী, বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, পুস্তক বিপণী, ২০০৮, পৃ-১০৪।

৫৬. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-১০৪ দ্রষ্টব্য।

৫৭. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-১০৪ দ্রষ্টব্য।

৫৮. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-১০৫ দ্রষ্টব্য।

৫৯. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-১০৫ দ্রষ্টব্য।

৬০. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-১০৬ দ্রষ্টব্য।

৬১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য সৌগত চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত বাংলার ছড়া ঃ ছড়ার বাংলা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৮, প্রণয় কুণ্ডু লিখিত ছড়া চর্চায় রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ, পৃ-৪৬৭।

৬২. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-৪৬৭ দ্রষ্টব্য।

৬৩. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নির্মলেন্দু ভৌমিক, বাঙলা ছড়ার ভূমিকা, সাহিত্যশ্রী, ১৯৭৯, পৃ-২০।

৬৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মেয়েলি ছড়া, সাধনা আশ্বিন-কার্তিক ১৩০১, বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নির্মলেন্দু ভৌমিক বাংলা ছড়ার ভূমিকা, সাহিত্যশ্রী, ১৯৭৯, পৃ-১৯।

৬৫. গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৩১৪ বঙ্গাব্দে, প্রকাশক বিশ্বভারতী।

৬৬. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নির্মলেন্দু ভৌমিক, বাঙলা ছড়ার ভূমিকা, সাহিত্যশ্রী, ১৯৭৯, পৃ-২০।

৬৭. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোকসাহিত্য, বিশ্বভারতী ২০০৪, কলি-৭৩, পৃ-৬।

৬৮. প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৩১১ খ্রীঃ ১৬ই চৈত্র।

৬৯. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য বরুণকুমার চক্রবর্তী, বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, পুস্তক বিপণী, ২০০৮, পৃ-৯১।

৭০. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোকসাহিত্য, বিশ্বভারতী, ২০০৪, কলি-৭৩, পৃ-৪৯।

৭১. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-১৮ দ্রষ্টব্য।

৭২. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য বরুণকুমার চক্রবর্তী, বাংলা ছড়া পরিক্রমা, অক্ষর প্রকাশনী, ২০১৪, কলি-৬, পৃ-৮১।

৭৩. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য বরুণকুমার চক্রবর্তী, বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, পুস্তক বিপণী, ২০০৮, পৃ-১৪৪।

৭৪. গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৮৯৯ খ্রীঃ।

৭৫. বরুণকুমার চক্রবর্তী, বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, পুস্তক বিপণী, ২০০৮, পৃ-১১৫ দ্রষ্টব্য।

৭৬. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-১১৬ দ্রষ্টব্য।

৭৭. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নির্মলেন্দু ভৌমিক, বাঙলা ছড়ার ভূমিকা, সাহিত্যশ্রী, ১৯৭৯, পৃ-৩৪।

৭৮. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলার ব্রত বিশ্বভারতী, ১৪১৭।

৭৯. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-৯ দ্রষ্টব্য, বিস্তারিত বিবরণের জন্য পরিশিষ্ট-১, চিত্রসংখ্যা-৫, পৃ-৪৫৫ দ্রষ্টব্য।

৮০. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-১০ দ্রষ্টব্য।

৮১. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-১৫ দ্রষ্টব্য।

৮২. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দেবশ্রী পালিত, ছড়া লোকায়ত জীবনের কারুভাষ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১২, কলি-৯, পৃ-৪২।

৮৩. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-৩৮ দ্রষ্টব্য।

৮৪. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-৪১ দ্রষ্টব্য।

৮৫. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-৪১ দ্রষ্টব্য।

৮৬. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য বরুণকুমার চক্রবর্তী সমাপ্তি বাংলা ছড়া পরিক্রমা, অক্ষর প্রকাশনী ২০১৪ গ্রন্থের মোহিনীমোহন সরদার লিখিত বাংলা ছড়ার গুরুত্ব অনুসন্ধানে রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দর ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াস প্রবন্ধ, পৃ-৮৪-৮৫।

৮৭. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য, ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৬২, কলি-১২, পৃ-১৩১।

৮৮. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-১৯৫ দ্রষ্টব্য।

৮৯. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-১৯৫ দ্রষ্টব্য।

৯০. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-১৯৫ দ্রষ্টব্য।

৯১. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-২০৪ দ্রষ্টব্য।

৯২. গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৯ খ্রীঃ, প্রকাশক সাহিত্যশ্রী, কলি-৯।

৯৩. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-১০ দ্রষ্টব্য।

৯৪. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য বরুণকুমার চক্রবর্তী, বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, পুস্তক বিপণী, ২০০৮, পৃ-১৯৩।

৯৫. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-১৯৩ দ্রষ্টব্য।

৯৬. গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ২০০৯ খ্রীঃ, প্রকাশক-অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলি-৯। বিস্তারিত বিবরণের জন্য পরিশিষ্ট-১, চিত্রসংখ্যা-৬, পৃ-৪৫৬ দ্রষ্টব্য।

৯৭. গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ২০০৭, প্রকাশক-অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলি-৯। বিস্তারিত বিবরণের জন্য পরিশিষ্ট-১, চিত্রসংখ্যা-৭, পৃ-৪৫৭ দ্রষ্টব্য।

৯৮. গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ২০০৮ খ্রীঃ, প্রকাশক-পুস্তক বিপণী, কলি-৯। বিস্তারিত বিবরণের জন্য পরিশিষ্ট-১, চিত্রসংখ্যা-৮, পৃ-৪৫৮ দ্রষ্টব্য।

৯৯. গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ২০১৪ খ্রীঃ প্রকাশক-অক্ষর বিপণী, কলি-৬। বিস্তারিত বিবরণের জন্য পরিশিষ্ট-১, চিত্রসংখ্য-৯, পৃ-৪৫৯ দ্রষ্টব্য।

১০০. গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ২০১২ খ্রীঃ প্রকাশক-নয়া উদ্যোগ, কলি-৬। বিস্তারিত বিবরণের জন্য পরিশিষ্ট-১, চিত্রসংখ্যা-১০, পৃ-৪৬০ দ্রষ্টব্য।

১০১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য আশ্‌রাফ সিদ্দিকী, লোকসাহিত্য ১ম খণ্ড, নয়া উদ্যোগ ২০১২, কলি-৬।

১০২. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-১৯৯ দ্রষ্টব্য।

১০৩. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-১৯৩ দ্রষ্টব্য।

১০৪. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-১৯৩ দ্রষ্টব্য।

১০৫. গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯১৯ খ্রীঃ প্রকাশক- দে'জ পাবলিশিং, কলি-৭৩। বিস্তারিত বিবরণের জন্য পরিশিষ্ট-১, চিত্রসংখ্যা-১১, পৃ-৪৬১ দ্রষ্টব্য।

১০৬. গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৯৫ খ্রীঃ, প্রকাশক-পুস্তক বিপণী, কলি-৯। বিস্তারিত বিবরণের জন্য পরিশিষ্ট-১, চিত্রসংখ্যা-১২, পৃ-৪৬২ দ্রষ্টব্য।

১০৭. গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ২০১১ খ্রীঃ, প্রকাশক-বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলি-৯। বিস্তারিত বিবরণের জন্য পরিশিষ্ট-১, চিত্রসংখ্যা-১৩, পৃ-৪৬৩ দ্রষ্টব্য।

১০৮. গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ২০০৮, প্রকাশক-বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলি-৯। বিস্তারিত বিবরণের জন্য পরিশিষ্ট-১, চিত্রসংখ্যা-১৪, পৃ-৪৬৪ দ্রষ্টব্য।

১০৯. গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ২০১২, প্রকাশক-বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলি-৯।

—ঃঃ—

দ্বিতীয় অধ্যায়

ক্ষেত্রসমীক্ষা ঃ নির্বাচিত ভৌগোলিক অঞ্চলের পরিচয় উদ্ধার ও তার পর্যালোচনা।

ক্ষেত্রসমীক্ষা অধ্যায়ের আলোচনা পূর্ণতা পেয়েছে নিম্নলিখিত কয়েকটি উপ-বিভাগীয় আলোচনার মধ্য দিয়ে। উপবিভাগগুলি হল ঃ

১। পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলের মানচিত্র।[১]

২। ভৌগোলিক অবস্থান ঃ নদী উপকূল[২] এবং সমুদ্র উপকূল।[৩]

৩। ক্ষেত্রসমীক্ষা অঞ্চল।

৪। লোকজীবন ও অর্থনৈতিক অবস্থা (প্রধান জীবিকা ও উপজীবিকা)।

৫। সামাজিক ও পারিবারিক পরিকাঠামো।

৬। বিনোদন।

৭। শিক্ষা পরিকাঠামো।

৮। ভাষা।

৩। ক্ষেত্রসমীক্ষা অঞ্চল ঃ (মহকুমা এবং থানা এলাকা)

"পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাপ্ত ছড়ায় লোকজীবন ও সমাজচিত্রের পরিচয় অন্বেষণ ও তার পর্যালোচনা" শীর্ষক এই গবেষণার একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় ক্ষেত্রসমীক্ষা। আমার এই গবেষণার ক্ষেত্রসমীক্ষা অঞ্চলটিকে দুটি উপ-পর্বে ভাগ করেছি ঃ

১।নদী উপকূল।

২।সমুদ্র উপকূল।

এই দুই উপকূল অঞ্চল মিলেই গড়ে উঠেছে এই জেলার বিপুল উপকূলীয় অঞ্চল। পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় মোট চারটি মহকুমা[৪] আছে। এগুলি হল ঃ

১। তমলুক মহকুমা,

২। কাঁথি মহকুমা,

৩। হলদিয়া মহকুমা,

৪। এগরা মহকুমা।

প্রতিটি মহকুমার আবার কতগুলি করে থানা এলাকা রয়েছে।

১। তমলুক মহকুমায় রয়েছে মোট ছয়টি থানা-এলাকা। যথা ঃ—

১।তমলুক

২।কোলাঘাট

৩।পাঁশকুড়া

৪।চণ্ডীপুর

৫।নন্দকুমার

৬।ময়না

২। কাঁথি মহকুমায় রয়েছে পাঁচটি থানা এলাকা, যথা ঃ—

১।কাঁথি

২।দীঘা

৩।রামনগর

৪।মারিশদা

৫।খেজুরী

৩। হলদিয়া মহকুমায় রয়েছে মোট ছয়টি থানা এলাকা। যথা ঃ—

১।হলদিয়া

২।মহিষাদল

৩।ভবানীপুর

৪।দুর্গাচক

৫।সুতাহাটা

৬।নন্দীগ্রাম

৪। এগরা মহকুমায় রয়েছে চারটি থানা এলাকা। যথা ঃ—

১। এগরা

২। ভগবানপুর

৩। ভূপতিনগর

৪। পটাশপুর।

উপরোক্ত এই একুশটি থানা এলাকার নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিসরে আমার ক্ষেত্রসমীক্ষার কাজ পরিচালিত হয়েছে। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট 'ভৌগোলিক পরিসর' বলতে আমি বেছে নিয়েছি উপকূলীয় ভূ-ভাগগুলিকে। এই গবেষণার ক্ষেত্রটি মূলত সমুদ্র তীরবর্তী ও নদী তীরবর্তী জনজীবনের সামগ্রিক জীবনচর্চার পরিধিকে নিয়ে আবর্তিত। নদী তীরবর্তী ও সমুদ্র তীরবর্তী থেকে অদূরবর্তী গ্রামগুলি ও জনপদগুলি আমার গবেষণার ক্ষেত্র। মোট কথা নদী নির্ভর ও সমুদ্রনির্ভর জীবনবৃত্তের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছড়াগুলির অন্বেষণ এবং সেই ছড়াগুলির বর্গীকরণ ও বিষয় বিশ্লেষণই এই গবেষণার আলোচ্য বিষয়।

এই অঞ্চলের লোকজীবন ও অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনার পূর্বে উপকূল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা করে নেব। 'উপকূল' শব্দটি পারিভাষিক। নদী বা সমুদ্রের কূলভূমির সমীপস্থ বা নিকটবর্তী এলাকাকে সাধারণভাবে উপকূল বলা হয়। কূলভূমি বা তীরভূমির এই সমীপস্থ এলাকা পরিমাণে কতটা দূরত্ব নিয়ে উপকূলভাগ হিসাবে গণ্য হবে, সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। মূলত সৈকতভূমি পেরিয়ে উপকূলভাগ চিহ্নিত হয়। চিহ্নিতকরণের এই কাজটি যথেষ্ট কঠিন সন্দেহ নেই। বলা যেতে পারে, নদী ও সমুদ্রের অববাহিকা অঞ্চলই উপকূলভাগ হিসেবে গণ্য হয়। সমুদ্র তটভূমি বা সৈকত যেখানে শেষ সেইখান থেকে উপকূলভাগের শুরু।

সাধারণ অর্থে উপকূল হল সমতলভূমি। ব-দ্বীপ অঞ্চল, পাহাড়-পর্বতের সানুদেশে বাহিত নদী অববাহিকা, মরু নদীর অববাহিকা অঞ্চল, সাধারণভাবে উপকূল হিসেবে গণ্য হয় না। নদী সমুদ্রের উপকূলভাগ প্রাকৃতিক কারণে যতটা পলি-বিধৌত হতে পারে, সেই ভূমিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা জনবসতি, গাছপালা, কৃষিক্ষেত্র-ইত্যাদি ইত্যাদি উপকূল হিসেবে গণ্য হওয়ার উপযুক্ত। এছাড়া নদী সমুদ্রের আবহাওয়া ও জলবায়ুর ওপর নির্ভরশীল। প্রাকৃতিকভাবে নিয়ন্ত্রিত কিছুটা ব্যাপক এলাকা উপকূলভাগ হিসেবে চিহ্নিত হয়।

৪। লোকজীবন ও অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ

"পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাপ্ত ছড়ায় লোকজীবন ও সমাজচিত্রের পরিচয় অন্বেষণ ও তার পর্যালোচনা" শীর্ষক গবেষণার এক উল্লেখযোগ্য অংশ হল লোকজীবন ও তার অর্থনৈতিক অবস্থা। উপরোক্ত চারটি মহকুমাকে নিয়ে আবর্তিত হয়েছে ক্ষেত্রসমীক্ষার

কাজ। এই চার মহকুমার বেশিরভাগ মানুষ সাধারণ শ্রমজীবী, মৎস্যজীবী, খেটে খাওয়া জনমজুর। বেশকিছু মানুষ জীবিকার ক্ষেত্রে সরকারী চাকুরীজীবী হলেও প্রধান জীবিকা হিসেবে কৃষিকাজ বা মৎস্যশিকারকে গ্রহণ করেছেন। লোকজীবন তাই আজও গোষ্ঠী জীবনের সমষ্টির বৈশিষ্ট্য বহন করে চলেছে। বহু পূর্ব থেকে এই সমস্ত উপকূলীয় অংশগুলি বিদেশীয়দের দ্বারা বিশেষভাবে প্রবাহিত হলেও লোকায়ত গোষ্ঠীচেতনা, দলতান্ত্রিক জীবনধারা আজও অক্ষুণ্ণ। এখনও এমন অনেক গ্রাম বা নদীকূলবর্তী মানুষজন আছে, যারা শহরের আদবকায়দা, নাগরিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য, যন্ত্রসভ্যতার যান্ত্রিকতাকে সুনজরে দেখে না। তারা তাদের মতো প্রকৃতির স্নেহচ্ছায়ায় সরল সহজ জীবনের পূজারী। যাইহোক, এই অঞ্চলের লোকজীবন ও অর্থনৈতিক অবস্থানকে দুটি উপধারায় বিভাজন করতে পারি। যথাঃ

১। স্বাভাবিক বা প্রধান জীবিকা

২ ।পার্শ্বজীবিকা

প্রধান জীবিকার মধ্যে কৃষিকর্ম এবং মৎস্যশিকার প্রভৃতি রয়েছে, এবং পার্শ্বজীবিকার মধ্যে রয়েছে— কামার, কুমোর, গোয়ালা, গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগী পালন, কটাতি, ঘরামি, ডোম, বিড়ি শ্রমিক, হাটুরে-মাঝি, বাদাম, চুল ছাড়ানো, জরির কাজ, ক্ষুদ্র ব্যবসা, চাকুরীজীবী প্রভৃতি।

ক) স্বাভাবিক বা প্রধান জীবিকা ঃ

বহু ধরনের জীবিকা থাকলেও উপকূলীয় অঞ্চলের লোকজীবনের স্বাভাবিক বা প্রধান জীবিকা কৃষিকর্ম[৫] ও মৎস্যশিকার।[৬] কৃষিজ ফসলের মধ্যে প্রধান ধান। ধান চাষ বৎসরে দু-প্রকারের হয়— আমন এবং বোরো। আমন চাষ বর্ষাকালে হয়। জৈষ্ঠ্য ও আষাঢ় মাস থেকে শুরু করে চাষীরা কার্তিক অঘ্রাণ মাস পর্যন্ত এই চাষে লেগে থাকে। তারপর পাকাধান ঘরে তোলে। বিভিন্ন নামের ধান চাষ হয়, যেমন—বাঁশকাটা, লাটাশাল, পাটনি, দুধেশ্বর, ভুঁড়িয়া প্রভৃতি। বোরো চাষ হয় অঘ্রাণ-পৌষে, ধান তোলা হয় চৈত্র-বৈশাখ মাসে। এই অঞ্চলের অর্থকরী ফসল হল ধান। পরে মাঠে সরষে, কলাই, আলু, বিভিন্ন সব্জি চাষও হয় আজকাল। উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষ ধান থেকে চাল তৈরী করেও রোজগার করে, যা কাঁচা পয়সা উপার্জনের পথ দেখায় এবং ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার দিশা দেখায়।

ধানচাষের পর-ই গুরুত্বপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য জীবিকা হল মৎস্যশিল্প। মৎস্য শিল্প গড়ে ওঠার মূল কারণ এই এলাকার বিস্তৃত উপকূলীয় পরিবেশ। একদিকে নদী এবং অন্যদিকে সমুদ্রের হাতছানি মানুষকে নিয়ে যায় সমুদ্রের অভিসারে মৎসজীবী মানুষজন অজানার দূর সমুদ্রপারে ট্রলারে তাঁদের জীবন ভাসায় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, পালন করে জল নির্ভর জীবনযাপন। পরিবার, পরিজনহীন জেলে মাঝিরা সমুদ্রের নোনা আবহাওয়ায় হৃদয় নিংড়ানো হাহাকারে চোখের জলে ভাসে আর ছড়া কাটে। সাদামাটা দৈনন্দিন জীবনের ছায়াপাত ঘটেছে ছড়াগুলিতে। তাই এখানকার ছড়াগুলি হয়ে উঠেছে খেটে-খাওয়া জেলে-মাঝিদের জীবন্ত দলিল। ঝড়-ঝঞ্ঝা, সাইক্লোন, বিপদকে উপেক্ষা করে সমুদ্র গর্ভ থেকে ফসল তুলে আনে নৌকা ভর্তি করে। নদীর সোনালী রূপালী শস্য ভরা ঝুড়ি নিয়ে জেলে মাঝি মৎস্য ব্যবসায়ীগণ সাইকেলে করে পাশাপাশি বাজারে বিক্রি করে। তবে বেশির ভাগ মাছ-ই জলপথে ও স্থলপথে বাইরে রপ্তানি হয়। কিছু মাছ আবার শুকনো করে, (স্থানীয় কথ্যভাষায় যাকে শুকা বা শুটকি বলে) রপ্তানি করা হয়। সামুদ্রিক নোনা মাছের জন্যও উপকূলীয় অঞ্চল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই মাছগুলি যথা—ভোলা, তপ্‌সে, তেলতাপ্‌ড়া, রুলি, বাব্‌লা, রূপাপাটিয়া, চাবুক, পটল, সমুদ্র মুরলা, ইলিশ, পমফ্রেট প্রভৃতি। পাশাপাশি বাজার গুলোতে দেশীয় মিষ্টি জলের মাছের থেকে নোনা জলের আমদানি বেশি হয়।

শুধু সমুদ্র কিংবা নদী থেকে জালে ধরা মাছই আমদানি হয় তা নয়, কৃত্রিম উপায়েও এখানে প্রচুর মাছ চাষ হয়। এই চাষে চাষযোগ্য জমির পরিবর্তে চাষহীন জমির-ই প্রয়োজনীয়তা বেশি। এই চাষকে বলা হয় ‘ফিসারী’। মাঠ কেটে অগভীর জলাশয় খনন করে জল ধরে তাতে মাছ চাষ করা হয়। এই মাছগুলির একদম ছোট অবস্থাকে বলে ‘মীন’। এই মীনগুলিকে জলসমেত প্যাকেটে আনা হয় এবং চাষ করা হয়। এইভাবে এখানে বাগদা, ভেনামী[৭], ভেনামী হল বড় চাবড়া চিংড়া। যা খেতে অত্যন্ত সুস্বাদু। তেলাপিয়া, গলদা আঞ্চলিক ভাষায় যাকে বলে চিংড়া, দেশীয় পোনা প্রভৃতি চাষ করা হয়। তিনমাস, ছয়মাস খুব বেশি হলে এক বছরের মধ্যে সব মাছ বিক্রি করে দেওয়া হয়, এবং চাষীরা এই টাকায় সংসার চালিয়ে পরবর্তী চাষের জন্য প্রস্তুতি নেয়। মৎস্য চাষে অল্প সময়ের মধ্যে অনেক বেশি উপার্জনও করা যায়।

মৎস্য চাষের মতো একটি অন্যতম জীবিকা হল মাছকে শুকিয়ে বিক্রি করা। যার আঞ্চলিক নাম শুটকি। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে বহুমানুষ তাদের সংসার অতিবাহিত করে। জেলে মাঝিরা যখন মাসের পর মাস দূর সমুদ্রে পাড়ি দেয়, তখন বাড়ি ফিরে আসা আর সম্ভব হয় না, ঐ সময়ের মধ্যে সামুদ্রিক বিভিন্ন ধরনের যে মাছগুলি জালে উঠে আসে, সেগুলি 'শুটকি' হিসেবে তৈরী হয়। লঞ্চের উপর দড়ি খাটিয়ে, কাঁচা মরা মাছকে গেঁথে রোদে শুকানো হয়। সামুদ্রিক এই ফসলগুলি তেমন কোনো মূল্যবান মাছ না হলেও, বিদেশে এই শুটকি মাছ রপ্তানী করা হয় বস্তা বস্তা। এখানকার পেটুয়াঘাট খেয়াঘাটে প্রচুর শুটকি তৈরী করা হয়। সাধারণত—চিংড়ি, রূপাপাটিয়া (ফিতে), বাব্‌লা (লটে), ভোলা, তাপড়া ও রুলি (বেলে) মাছ দিয়ে শুটকি[৮] বানানো হয়।

বহু-মানুষের সহযোগিতা, নিযুক্তিকরণ ফিসারী শিল্প ও শুটকি পদ্ধতিতে মাছ রপ্তানি একটি অন্যতম জনপ্রিয় অর্থ উপার্জনকারী ব্যবসা বলে চিহ্নিত হয়েছে, তেমনি সমুদ্র শস্য ঝিনুক সংগ্রহও খেটে খাওয়া মানুষগুলির রুজি-রোজগারের ভরসা। ঝিনুক দিয়ে তৈরী হয় নানা ধরনের শিল্প। তাই ঝিনুক শিল্প একটি বড় শিল্প হয়ে উঠেছে। নারী ও পুরুষের অঙ্গশোভায় ঝিনুক অতুলনীয়। শুধু ঝিনুক নয়, শঙ্খ শিল্পের সঙ্গেও বহুমানুষ যুক্ত। সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষজন শঙ্খশিল্পের উপর তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। পাশাপাশি দীঘা উপকূলে পর্যটকরা এই শিল্পটিকে একটি ভিন্ন মাত্রায় নিয়ে গেছে। তাই একথা বললে অত্যুক্তি হয় না যে, এটিও একটি অর্থকরী ফসল। এখানকার উপকূলবর্তী মানুষের রুজিরোজগারের উপর এই শিল্পের প্রভাব অভাবনীয় প্রশংসার দাবী রাখে। সেই সঙ্গে সঙ্গে দীঘাগামী পর্যটকদের কাছে এই শিল্পও অত্যন্ত সমাদরণীয়।

খ) পার্শ্বজীবিকা ঃ

কামার ঃ বর্তমানে গ্রামজীবনে আধুনিকতার ছোঁয়া লক্ষণীয়। পুরোণো আমলের কাঁচাবাড়ি অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাকাবাড়িতে পরিণত। নতুন করে মাটির বাড়ি তেমন করে আর তৈরী হচ্ছে না। এই বাড়ি তৈরীর ও জীবন যাপনের সরঞ্জাম আসে এই কামারশালা থেকে। দা, কাটারি, পেরেক, স্ক্রু, শিকল, কাঁটা, পিন, কড়া, বালা ছুরি কাঁচি, সাঁড়াসি, কোদাল, রামদা, বঁটি প্রভৃতি কামারের দান। কামারের কাছে তাই এই শিল্প, জীবিকা অর্জনের অন্যতম পন্থা। সাধারণ মানুষ তার দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটায় কামারশালাতেই তৈরী জিনিষপত্র দিয়ে।

কুমোর ঃ উপকূলীয় অঞ্চলের অন্যতম একটি উপজীবিকা কুমোর শিল্প। কুমোর আমাদের মাটির তৈরী যাবতীয় জিনিসপত্রের জোগানদার। হাঁড়ি, কলসী, ঘট, সরা, তাবা, মাটির পুতুল, এছাড়াও হাতের তৈরী নানা শিল্প কর্ম যথা, ফুল, ফল, পাখি, সব্জি, ফুলদানি, গাছ, ঠাকুর প্রভৃতি শিল্পকর্মের দ্বারা তারা তাদের জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।

গোয়ালা ঃ বাঙালির কাছে দুধভাত অতি প্রিয় খাদ্য এবং পুষ্টিকরও বটে। দুধ আমাদের সেই পিপাসা চরিতার্থ করে। এখানকার লোক সাধারণও তার ব্যতিক্রম নয়। দুধজাত তৈরী খাদ্য যথা,— মিষ্টি, পনির, ছানা, ঘি এগুলি গোয়ালা আমাদের সরবরাহ করে, কেননা সবই দুধজাত। এইসব খাদ্যের কোনো বিকল্প-ই নেই। বাঙালির 'বারো মাসে তেরো পার্বণ।' আর পূজা-পার্বণ মানেই দুধের প্রয়োজন। দুধ ছাড়া এইসব ভাবাই যায় না। গোয়ালা সম্প্রদায় দুধ বিক্রি করে রুজিরোজগার করে থাকে। উপকূলীয় অঞ্চলে এই ধরণের জীবিকাবাহী সহজেই লক্ষ্য করা যায়। দেশীয় গোরুর পাশাপাশি সংকর বা জার্সি গোরুও প্রতিপালন হয় বর্তমানে। কেননা এই জার্সি বা সংকর জাতের গরু দিনে ২০-২৫ লিটার পর্যন্ত দুধ দেয়। গোয়ালা সম্প্রদায়ের মানুষ এবং সাধারণ দুগ্ধজাত দ্রব্যের ব্যবসায়ী উভয়ই অর্থ উপার্জন করে এই একইভাবে।

গরু-ছাগল-হাঁস-মুরগী প্রতিপালন ঃ যারা সাধারণত খেটে খাওয়া মানুষ, তাদের অনেকেই গরু-ছাগল-হাঁস-মুরগী চাষ করে আয়-উপার্জন করে। বিশেষ করে যে সকল মা-বোনেরা বাড়ীতে থাকে, তারা আর্থিক স্বচ্ছলতা আনতে এ ধরনের চাষবাস করে। এতে প্রচুর টাকা আয় হয়। গরু-ছাগল-হাঁস-মুরগী খুব তাড়াতাড়ি বংশবিস্তার করে এবং উপকূলীয় অঞ্চলে এখনও এদের চারণ ভূমিও আছে। তাই জীবিকা নির্বাহের জন্য এই চাষ একটি অপরিহার্য উপায়।

কটাতি ঃ পূর্বে যখন প্রযুক্তিবিজ্ঞান উন্নত ছিল না, তখন এই উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষজন ধান থেকে চাল বের করত ঢেঁকিতে। আমাদের ছোট্ট বেলায় যখন গ্রামে ছিলাম দেখেছি, কিছু কিছু বাড়িতে তখনও ঢেঁকি ছিল। ঢেঁকিছাটা চালের ভাতও খেয়েছি। ঢেঁকি কাঠের তৈরী, এর একপ্রান্তে চাপ দিলে অন্য প্রান্ত উঁচুতে উঠে পড়ে এবং ছেড়ে দিলে পুনরায় নিচে গর্তে এসে পড়ে। আর সেই আঘাতে ধান থেকে খোসা পৃথক হয়ে যায় এবং বেরিয়ে আসে চাল। একপ্রান্তে মা-বোনেরা পা দিয়ে চাপ দিলে অন্য প্রান্তে 'মুষণ্ডা' [৯] গর্তে

পড়ে এবং অপর আর একজন ধানে 'তা' দেয়, এই কারবার যারা করত, তাদের বলে কটাতি। ভূপতিনগর সহ অন্যান্য[১০] অঞ্চলে প্রচলিত ঢেঁকি নিয়ে প্রবাদমূলক একটি ছড়া সংগ্রহ করেছি আমরা আরতি মান্না মাইতির মুখ থেকে। ছড়াটি এইরূপ—

ছিল কটাতির ঝি
ঢেকি দেখিয়া বলে, এটা কী?

এখন এই অঞ্চলে কটাতির সংখ্যা নেই বললেই চলে, কিন্তু ঢেঁকিশাল, ঢেঁকিঘর নিয়ে ছড়া, প্রবাদ আজও প্রচলিত আছে। তবে বর্তমানে সেই সব কটাতি, ভিন্ন ভিন্ন কর্ম করে জীবিকা নির্বাহ করছে।

ঘরামি ঃ প্রবাদে আছে 'ঘরামির ঘর কাঁ' / 'ঘরামির ঘরে জল পড়ে' অর্থাৎ ঘরামির নিজের ঘর কানা (ফুটো)। বর্ষা-বাদলে-শীত-গ্রীষ্মে সাধারণ মানুষদের ঘর নিয়ে খুবই সমস্যা। ঘরামি তাদের নিজেদের জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দের কথা ভুলে অপরের ঘরকে মজবুত করে বানায়। গ্রামের বেশিরভাগ ঘরামি এই কাজে খুবই পারদর্শী। আজও গ্রামের ভিতর বহু মাটির বাড়ি রয়েছে যা, খড় অথবা টালি দিয়ে ছাউনি, কোথাও কোথাও টিন, অ্যাসবেসটস, পলিথিন বা ত্রিপল দিয়েও ছাউনি হয়, যেখানে পল্লীবাংলার খেটে খাওয়া মানুষজন কোনো রকমে কষ্টে শিষ্টে দিন কাটায়, আর এইসব ঘর, ঘরামি-ই তৈরি করে। প্রায় ৩—৪ মাস ধরে ঘরামিরা এই ঘর বানায়। জীবন ধারণের জন্য এইসব শিল্পীদের দাম আমরা টাকায় মিটিয়ে দিলেও বাস্তবে এদের মূল্য দেওয়া যায় না। ছড়া—[১১]

খরা বেয়া ঘুমি যায়
ঝড়ুয়া বেয়া ঘর ছায়।

ডোম ঃ ডোমরা বাঁশ ও বেতের কাজ করে। বাঁশ, বেত দিয়ে নানান প্রকার ছোটো ছোটো হাতের শিল্প সৃষ্টি করে আমাদের ঘর ভরিয়ে তোলে। শিল্পগুলি যথা—ঝুড়ি, কুলা, চালুনি, পাখা, টলা[১২], ধানের গোলা, মাচা, জান্‌লা, দর্‌জা, বসার মোড়া, মান[১৩], ধামা[১৪], কঁচা[১৫], দাবোড়[১৬], ঠাকা[১৭] প্রভৃতি। এরা এই কাজে ভীষণভাবে দক্ষ। এছাড়াও ছোটো খাটো নদী, খাল, বিলের উপর দিয়ে পারাপারের জন্য পুল, সাঁকো, জমি-বাড়ির চারিদিক ঘেরার জন্য কঞ্চি দিয়ে বেড়া, সব্জি চাষের মাচা, ফুলের বাগান, সিঁড়ি প্রভৃতি নান্দনিক ও সৃষ্টিধর্মী কাজের দ্বারা ডোমেরা জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।

বিড়ি শ্রমিক ঃ এই অঞ্চলে উপরোক্ত জীবিকাবাহীর পাশাপাশি বিড়ি শ্রমিকদের লক্ষ্য করা যায়, যারা বিড়ি বেঁধে তাদের রুজি-রোজগার করে। এজন্য বহু বিড়ি শ্রমিক সরকারের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য লাভ করে তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের বৃদ্ধি করে থাকে। বিড়ি শ্রমিকরা বিড়ি বেঁধে গ্রাম বা শহরের বড় বড় দোকানে দিয়ে আসে, বিনিময়ে যা রোজগার হয়, তাই দিয়ে সংসার চালায়। সংসারের ভালোমন্দ, সুখ-দুঃখ, অভাব-অনটনে এই জীবিকা ; এই অঞ্চলের বহু মানুষের বেঁচে থাকার অন্যোন্য উপায়। এই অঞ্চলে এদের একটা বড় অংশও রয়েছে। তবে এদের বিড়ি বাঁধা কর্মটি একমাত্র জীবিকা নয়, কেননা সারা বছরের সংসারের সব চাহিদা এতে পূরণ হয় না, তাই সংসারের প্রয়োজনীয় কাজকর্মের পর অবসর সময়ে বাড়ির ছেলে-বউ, বুড়োবুড়ি সবাই মিলে গল্প করতে করতে এই কাজ করে থাকে। তবে খুব সহজেই বাড়ির অন্যান্য কাজের সঙ্গে সঙ্গে এই বিড়ি শিল্পও চলে।

হাটুরে ঃ হাটুরেগণ বাড়িতে কৃষিজ ফসল ফলিয়ে কিংবা এক হাট থেকে জিনিষপত্র ক্রয় করে অন্য হাটে জিনিসপত্র বিক্রি করে। জীবনযাপনের এক জনপ্রিয় অবলম্বন এই হাটে জিনিস বিক্রি করা। গ্রাম্য বাজারে বহু বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, সাধারণ গরীব, খেটে-খাওয়া মানুষ বাড়ির বাগানে তৈরি করা শাক্-সব্জি নিয়ে বাজারে বিক্রি করে দুটো পয়সা পায়। সপ্তাহে দুইদিন হাট বসে। হাটে গৃহস্থ, আটপৌরে জীবনের নানান জিনিস ওঠে। মানুষ বেচাকেনার মধ্যদিয়ে তাদের সংসার চালায়। বেশির ভাগ ফসল কৃষকদের বাগানেই ফলানো হয়। তবে আজকাল চালানী দ্রব্যও প্রচুর পাওয়া যায়। এই বিষয়ক ছড়াটি[১৮] হল

লাজির বাজার যাবে যে
কম দামে মাল পাবে সে

জেলে ও মাঝি ঃ স্বাভাবিক বা প্রধান জীবিকায় মৎস চাষ প্রসঙ্গে জেলে[১৯] ও মাঝিদের প্রসঙ্গ আলোচিত হলেও এই অংশে কেবল জেলেমাঝিদের জীবনের কথা তুলে ধরা হল। উপকূলীয় অঞ্চল যেহেতু নদী ও সমুদ্র নির্ভর তাই মাঝি-মাল্লার ও নদী-সমুদ্র সম্পৃক্ত জীবন-জীবিকার চিত্র সহজেই চোখে পড়ে। উপকূলীয় অঞ্চলে, সমুদ্রবক্ষে ও নদীবক্ষে, জেলেদের কার্যকলাপ, মাছ ধরা লঞ্চ-এর আসা-যাওয়া, মাছ ধরার জাল টানা, নৌকা, শুট্কি মাছের বস্তা, সমুদ্রের নোনামাছ সরবরাহ, বরফের লরি, মাথায় মাথায় প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ, এসব কিছু নিত্য দিনকার অতি স্বাভাবিক চিত্র। জেলে মাঝিরা

মাছ ধরার জন্য কখনো কখনো বাড়ির মেয়েদেরও সঙ্গো নেয়। মাছ ধরার লঞ্চগুলি হয় অতীব সুন্দর সাজানো গুছানো। ছবিতে যা অবশ্যই দেখানো হয়েছে।[২০] সেখানে থাকবার সুবন্দোবস্ত, রান্নাঘর, বাথরুম, কলতলা, অন্যদিকে মাছ ধরবার জাল, দড়ি, বরফ ভাঙা মেসিন, কপিকল, মাছ সংগ্রহের স্থান, শুট্‌কির দড়ি খাটানো ইত্যাদি ইত্যাদি। জেলে মাঝিরা গভীর সমুদ্রে চলে যায় মাছ ধরতে, সংসারের সুখ ত্যাগ করে মাসের পর মাস তারা পাড়ি দেয় দূর সমুদ্রে সোনালী রূপালী ফসলের সন্ধানে। প্রথমে জাল ফেলে ফেলে চলে যায় বহু দূর সমুদ্রবক্ষে, তারপর আবার ফিরে আসে জাল তুলে তুলে মাছ ধরে। মাছ যা পড়ে তা বরফ দিয়ে সংরক্ষণ করে, তীরে এসে সেই মাছকে বাছাই করে বাজারে বাজারে দেশে বিদেশে রপ্তানী করে। বর্তমান দিনে তো সামুদ্রিক নোনা মাছের চাহিদাই বেশি। এইসব উপকূলীয় অঞ্চলের বাজারে দেশীয় মিষ্টি জলের মাছের সঙ্গো সঙ্গো নোনা মাছও প্রচুর আমদানি হয় এবং সমাদরে বিক্রিও হয়। মাছ ধরবার জন্য জাল বেশ বড় হয়, তাই একবার জাল ফেলে সেই জাল থেকে মাছ সংগ্রহ করতে অনেকটা সময় লাগে। এতো গেল লঞ্চে মাছ ধরবার বিষয়। লঞ্চ ছাড়াও বেশ কিছু মাঝি আছে যারা শুধু, নদীতে মাছ ধরে ডিঙ্গি নৌকায় করে। এই মাঝিদের সঙ্গোও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সঙ্গো সঙ্গো বাড়ির বৌ-মেয়েরা থাকে। এখানকার উল্লেখযোগ্য নদী হল রসুলপুর নদী, গেঁওখালি নদী, হল্‌দী নদী, রূপনারায়ণ নদী প্রভৃতি। নদীঘাটগুলিও থাকে জনমানব পরিপূর্ণ। যেমন, রসুলপুর নদীঘাট, পেটুয়াঘাট, টেংগুয়া ঘাট প্রভৃতি ঘাটে জেলে মাঝিরা যেমন মাছ ধরে তেমনি মানুষজনদের পারাপারও করে। রসুলপুরের নদীঘাট জনপ্রিয় একটি নদীঘাট। খেজুরী হলদিয়ার প্রচুর মানুষের সংযোগের মাধ্যম হল এই ঘাট। খেজুরীর সমুদ্রবক্ষের মানুষ এই পথেই যাতায়াত করে। উল্লেখ্য হিজলী বন্দর অর্থাৎ বাবাসাহেবের কোড়কোড়া, জেলিংহোম, সমুদ্রবক্ষ, ব্রিটিশ আমলে স্থাপিত ভারতের প্রথম ডাকঘর[২১], পেটুয়া মৎস্য বন্দর এ সবই জেলে মাঝিদের জীবনের সঙ্গো ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কান্বিত। রসুলপুর নদীবক্ষ আজও সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'[২২] উপন্যাসকে জীবন্ত করে রেখেছে। পূর্বে এই নদীবক্ষের দুকূল ঘন নিবিড় জঙ্গালে পরিপূর্ণ ছিল, তবে বর্তমানে সে জঙ্গাল আর নেই, আছে ডিঙ্গি,[২৩] ভুটভুটি,[২৪] সরকারী ভ্যাসেল।[২৫] যে ভ্যাসেলে দু-পারের বহু মানুষ সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত পারাপার করে। মানুষ, গরু-বাছুর, ছাগল, হাঁস-মুরগী, ঠাকুর দেবতা, মহাপ্রভুর প্রতিমূর্তি, বরকনে, রোগী, রিক্সা, বাইক, সাইকেল, মাছ, সব্জি, নানান

জিনিসপত্র, সবকিছুই পারাপার হয়। নিত্যযাত্রীরা বেশির ভাগই চাকুরীজীবী ও ব্যবসায়ী। পূর্বে মাঝিদের জোয়ার ভাটায় কাদায় নেমে যেভাবে কষ্ট করতে হত, বর্তমানে লোহার জেঠিঘাট নির্মাণের জন্য সেই কষ্ট অনেকখানি লাঘব হয়ে গিয়েছে।

মাঝিরা পূর্বে তাদের পারিশ্রমিক যা পেত তা খুবই সামান্য। বর্তমানে ভ্যাসেল হওয়ার পর, তাদের আর্থিক দিক কিছুটা হলেও স্বচ্ছল হয়েছে। তবুও তারা যা পায়, তাদের পরিশ্রমের তুলনায় সামান্য। তাই, বলা যায় এই সামান্য রোজগার জেলে-মাঝিদের জীবনে আশীর্বাদ তুল্য। কেননা এটাই তাদের জীবিকার অন্যতম পন্থা।

বাদাম ছাড়ানো ঃ উপকূলীয় অঞ্চলের অনেক অংশই বালিযুক্ত। বালুকাময় এই মাটিতে বাদাম গাছ ভালো হয়। খেজুরী, কাঁথি, দীঘা, রামনগর প্রভৃতি জায়গায় বালিয়াড়ী রয়েছে। বালির কারণে এই অঞ্চলে বাদাম চাষও প্রচুর পরিমাণে হয়। তাই এই অঞ্চল কাজুবাদামের জন্য বিখ্যাত এবং জনপ্রিয়। এই কাজুবাদাম চাষে বহু মানুষ নিযুক্ত আছে। এছাড়া বেশকিছু মানুষ বাদামের খোসা ছাড়িয়ে প্রচুর পয়সা রোজগার করে। প্রতি কিলোগ্রাম কাজুবাদাম ছাড়ালে পারিশ্রমিক হিসেবে পায় ৮—৯ টাকা। দিনে এই কাজুবাদাম ছাড়ানো এক একজন শ্রমিক, প্রায় ২০—২৫ কিলোগ্রাম বাদাম ছাড়াতে পারে। এই অর্থ দিয়ে তাদের জীবিকা নির্বাহ হয়। এছাড়া বাদাম এবং চিনি দিয়ে তৈরি হয় জনপ্রিয় মুখরোচক পাটালি, সন্দেশ, নাড়ু যা এখানকার চল্তি বাসে, দোকানে দোকানে পাওয়া যায়। লস্যি, দই সরবত, মিষ্টান্ন, পায়েস, তরকারী প্রভৃতিতে বাদাম সু-স্বাদ এনে দেয়। বিদেশে রপ্তানিও হয়, তাই এটি একটি অর্থকরী ফসল হিসেবে এখানকার মানুষদের জীবনধারণে সাহায্য করে আসছে। কথায় বলে 'বালিকা বাদাম বালি / তিন নিয়ে হয় কাঁথি।'[২৬] ছড়াটি কাঁথি থেকে সংগৃহীত।

চুল ছাড়ানো ঃ এতদিন দেখেছি মানুষ তার মাথার ওঠা চুল ফেলে দিত। কিন্তু বেশ কিছু বছর ধরে গ্রামবাংলার সাধারণ জীবনযাপনে পরিত্যক্ত চুল অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এইসব পরিত্যক্ত চুল আর বিফলে যায় না। তাই মাথার ওঠা চুলের ও খুব চাহিদা। সে কারণেই গ্রামের বউ-ঝিরা এখন ব্যাগ ব্যাগ মাথার চুল নিয়ে কাজের অবসরে বসে যায় চুল 'ছাড়ায়।'[২৭] চুল ছাড়ানোর পারিশ্রমিক হিসেবে প্রতি এক কিলোগ্রামে পায় ১৪০ টাকা। এইভাবে সংসার চালানোর ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরাও আজ সমান পারদর্শী হয়ে

উঠেছে। বর্তমানে এই সমস্ত চুল দিয়ে তৈরী হচ্ছে বিভিন্ন ধরণের হেয়ার স্টাইল (Wig), যার বাণিজ্যিক মূল্য অনেক বেশি।

জরির কাজ ঃ পোষাকের দুনিয়ায় কাপড়ের উপর জরি বসানো এক চমৎকার শিল্পকার্য। বর্তমানে গ্রাম-গঞ্জের অভ্যন্তরে ও এই বার্তা পৌঁছে গেছে। তাই সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষজন বাড়ির বাইরে যেতে নারাজ। কেননা এতে ঘরে বসে বসে কাজের ফাঁকে ফাঁকে বাড়ির অন্যান্য কাজও করা যায়। অথচ মাঝখান থেকে উপার্জনও হচ্ছে। তাই বহু মানুষ বিদেশে, অন্য রাজ্যে না গিয়ে এখানেই কাজ-কর্ম করে জীবিকা নির্বাহ করে। এই নিয়ে ছড়াও শুনি—

জরির কাজে মন দিছি
দিল্লি বোম্বাই ভুলিছি

ছড়াটি অমিয়বরণ মান্না, এগরা অঞ্চল থেকে সংগৃহীত।[২৮]

এই রকম বর্তমান জীবন জীবিকামুখী নানান ছড়াও রচিত হচ্ছে, যা আমার ছড়া সংকলনে[২৯] অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মেয়েদের শাড়ী, জামা, কাপড়, চুড়িদার, ছেলেদের জামা, পর্দা, প্যাণ্ডেল, প্রতিমা, ব্যাগ, যাত্রার পোষাক, নৃত্যের পোষাক, ঠাকুরের পোষাক প্রভৃতিতে জরির কাজ হয়। জরির কাজে একই কাপড়ে একসঙ্গে অনেকে বসে কাজ করে। কথায় কথায় কাজের একঘিয়েমিও দূর হয় এবং আনন্দের সঙ্গে কাজ এগিয়ে চলে। এই কাজ গ্রামাঞ্চলের জীবিকা নির্বাহের এক অন্যতম পন্থা।

ইট ভাটার কাজ ঃ এই অঞ্চল নদী ও সমুদ্র উপকূল হওয়ায় ইট তৈরির ভাটা[৩০] ব্যাপকভাবে রয়েছে। ছোটো ছোটো লরি, বড় লরি, ম্যাটাডোর করে উপকূল অঞ্চল থেকে মাটি তুলে এনে ভাটার পাশে স্তূপাকার করা হয়। এমনও হয় অনেক সময় এই মাটির স্তূপকে ছোটো খাটো পাহাড় বলেও মনে হয়। তারপর শ্রমিকরা নির্দিষ্ট কাঠের কিংবা লোহার ফ্রেমে মাটি দিয়ে কাঁচা ইট তৈরী করে, পরে ঐ ইটকে কাঠ কিংবা, কয়লার চুল্লীতে পোড়ানো হয়। ইট পোড়ানোর জায়গাটি দেখতে গোলাকৃতি, তার ভেতরে জ্বালানী দিয়ে আগুন জ্বালানো হয়। আগুন নিভলে ইট বার করা হয়। তারপর তা বাড়ি তৈরীর কাজে লাগে। বহুমানুষ এই ইটের ভাটায় কাজ করে। পুরুষদের সঙ্গে নারীরাও এই কাজে যোগ দেয়। মিলেমিশে কাজ করায় কাজও দ্রুত গতিতে হয়ে থাকে। আজকাল কাঁচা বাড়ি প্রায়

দেখাই যায় না। পাকা বাড়ি মানেই ইটের প্রয়োজন। তারজন্য ইটভাটা রয়েছে। তাই ইটের ব্যবসায় মালিকসহ অন্যান্য বহুমানুষ তাদের রুজি-রোজগার নির্বাহ করে।

বড়ি শিল্প ঃ 'বড়ি'[৩১] গৃহস্থ মানুষের পাতে না পড়লে খাওয়ার আনন্দ যেন মাটি হয়ে যায়। এই শিল্প শীতকালেই হয়। কথ্য ভাষায় যাকে 'বিরি কড়ি'[৩২] বলা হয়, সেই বিরি কড়ি এবং চালকুমড়া দিয়ে হয় বড়ি। এখানকার মানুষ এই বিরি কলাইয়ের চাষও করে থাকে। তারপর চাল কুমড়া দিয়ে বিভিন্ন ধরনের বড়ি তৈরী করে। বড়ি দিয়ে নানারকম শিল্প তৈরী করে বাড়ির মেয়ে-বউরা। এই নক্‌সা করা বড়ি এখানে 'নক্সা বড়ি'[৩৩] বা 'ফুলবড়ি'[৩৪] নামে পরিচিত। এগুলি বাজারেও বিক্রি হয়। বহু মানুষ এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত। ফুল বড়ি পোস্ত দিয়ে হয়। আর বিচাবড়ি[৩৫] ও ভালো বড়ি চালকুমড়া ও বিরি সহযোগে হয়। গ্রাম্য নারীদের শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গীর ছাপ বড়ি শিল্পে বিদ্যমান। এছাড়াও অন্যান্য উপকরণ সহযোগে তৈরী বড়ি পাওয়া যায়।

উপরোক্ত জীবিকাগুলির বাইরেও আরো বহু রকম কাজের মধ্য দিয়ে আঞ্চলিক মানুষ তাদের দিনাতিপাত করে, যথা—দড়ির কাজ, অন্যান্য ফসল উৎপাদনমূলক কাজ, পাতার কাজ, বাঁশ ও বেতের কাজ, টালির কাজ, ঝাঁটা[৩৬]-ছেনিয়া[৩৭] তৈরীর কাজ, উল-সূতোর কাজ, ঝিনুক শিল্পের কাজ, ফুলের চাষ, জাল তৈরীর কাজ, একশ দিনের কাজ প্রভৃতি।

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ঃ কিছু কিছু মানুষ উপরের জীবিকা ছাড়াও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায় লিপ্ত, ক্ষুদ্র ব্যবসামূলক পার্শ্বজীবিকায় বহু মানুষ নিযুক্ত। এই ব্যবসা এরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একক প্রচেষ্টায় করে থাকে। যেমন— রড্, বালি, সিমেন্টের ব্যবসা, বাঁশের ব্যবসা, গোরু-ছাগলের ব্যবসা, মাছের ব্যবসা, ফল-ফুলের ব্যবসা, কস্‌মেটিক্‌স, আইসক্রিম, মিষ্টি, চানাচুর, চক্‌লেট, পান, ফার্ণিচার, বই-খাতা-পেন, জল, অসুধ, চশমা, কাঁসা-পিতলের ব্যবসা, থালা-বাসনের ব্যবসা ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ধরনের ব্যবসাগুলি বেশির ভাগ-ই পরিবারকেন্দ্রিক। পরিবারের বাকি সদস্যগণও এই ব্যবসায় সাহায্য করে থাকে। তেমন এই সকল ব্যবসায় লাভ অনেক বেশি, উপার্জন ও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।

চাকুরীজীবী ঃ উপকূলীয় অঞ্চলের প্রায় আশি (৮০) শতাংশ মানুষ খেটে খাওয়া সাধারণ শ্রমজীবী। বাকি প্রায় কুড়ি (২০) শতাংশ মানুষ চাকুরীজীবী। শিক্ষার প্রসারের ফলে সরকারী, বেসরকারী নানা কর্মস্থলে ২০ শতাংশ মানুষ নিজেদের নিয়োগ করেছে। তবে

এই সমস্ত চাকুরীজীবী সরকারী স্কুলে, কলেজে, অফিসে, আদালতে যেখানেই করুক না কেন এঁরা প্রায় সকলেই অল্পবিস্তর চাষবাসও করেন। তাই এঁদের প্রথম পরিচয় এঁরা কৃষিজীবী, তারপরে এঁরা চাকুরীজীবী।

৫। সামাজিক ও পারিবারিক পরিকাঠামো ঃ

নাগরিক সভ্যতার প্রভাব উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষজনকে যে প্রভাবিত করেনি তা নয়, তা সত্ত্বেও সাধারণ গ্রাম্যমানুষ খুব সহজে আধুনিক জীবনকে তাদের বাঁধাধরা জীবনবৃত্তের মধ্যে সেভাবে প্রবেশ করতে দেয়নি। এই অঞ্চলের গ্রাম্য মানুষদের মধ্যে লোকজীবন তথা গোষ্ঠী কেন্দ্রিক জীবনের পারস্পরিক এক অচ্ছেদ্য বন্ধন রয়েছে। এরা প্রত্যেকেই পারস্পরিক বোঝাপড়া নিয়ে বেঁচে থাকে, একের দুঃখে অন্যজন ঝাঁপিয়ে পড়ে, আবার কখনো একের সুখ তাদের সকলের সুখের আভাস দেয়। সংহত জীবনের স্নেহ-প্রেম-প্রীতি-মায়া-মমতার গোষ্ঠীবদ্ধ সহাবস্থান-ই তাদের মূল শক্তি। একই ছাদের নীচে এরা বাঁচে, একই আবেগে প্লাবিত হয়, একজনের আয়-উপার্জনে সকলেই সুখে কাটায়, এরমধ্যে না থাকে কোনো খেদ, না থাকে হিংসা, না থাকে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা। অক্ষম হলেও বাড়ির বড়কে সবাই মেনে চলে। সংসারে তাই শান্তি বিরাজ করে। লোকসংখ্যার চেয়ে যেহেতু কৃষিজমি তুলনায় বেশি, তাই চাষ-আবাদ ফসল ফলানোর দিকে ঝোঁক বেশি। আসলে সব মিলিয়ে বলতে পারি, গোষ্ঠীকেন্দ্রিক লোকজীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ জীবনচর্যার প্রতিফলন ঘটেছে এখানে, যা আমার গবেষণার একটি অন্যতম পর্যায়। আর যার জীবন্ত চিত্র আজও এই গ্রামাঞ্চলে সহজলভ্য। যাইহোক্ গ্রামজীবনের এই চিত্রকে মোটামুটি তিন পর্যায়ে দেখানো যেতে পারে—

১। ভগ্নপ্রায় একান্নবর্তী পরিবার

২। ক্ষুদ্র পরিবারে বিভক্ত সমাজ

৩। নিশ্চিহ্ন মোড়লী ব্যবস্থা এবং নিয়মতান্ত্রিক পঞ্চায়েতি শাসন।

১। ভগ্নপ্রায় একান্নবর্তী পরিবার ঃ

গ্রাম জীবনে নগর জীবনের ছায়া পড়লেও গ্রাম এখনও গ্রাম-ই আছে। গ্রামীন জীবনের ভাবনা, সংস্কার, বিশ্বাস, সংস্কৃতিকে নগর সংস্কৃতি গ্রাস করতে পারেনি। একান্নবর্তী পরিবারের চিত্র আজও বহু রয়েছে। যে সংসারে বহুজন, তাতে বহু রকম সমস্যা,

অভাব-অভিযোগ, ভালোমন্দ, সুখ দুঃখ থাকলেও তবে অত্যন্ত কঠিন সময়ে বাড়ির সব সদস্য তা সহজেই ভাগ করে নেয়। তাই কোনো কাজ দুরহ বা কঠিন বোঝা বলে মনে হয় না। বিপদে ও অত্যন্ত কঠিন সময়গুলো কেটে যায় নির্বিঘ্নে। এই একান্নবর্তী পরিবারে অনেক সদস্যই থাকে, বাবার যদি চার-পাঁচ সন্তান-সন্ততী থাকে, সেখান থেকে ২০-২৫ জন সদস্য সহজেই বেড়ে যায়। এইভাবে একান্নবর্তী পরিবার অনেক সদস্যের জন্য সবসময় খুব জমজমাট ও আনন্দমুখর হয়ে থাকে। যা বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকের জীবনে খুব-ই জরুরী হয়ে পড়েছে।

কিন্তু পূর্বে এই একান্নবর্তী পরিবার যত সংখ্যক ছিল, এখন সেভাবে নেই। যৌথ পরিবারে ভাঙনের ছায়া পড়েছে, মানুষের সহণশীলতা, মানিয়ে নেওয়ার প্রবণতা, অর্থনৈতিক ভোগ-লালসা প্রভৃতি নেতিবাচক অভিমুখগুলি আজ যৌথ-পরিবারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থেকে তাকে অনেক দূরে সরিয়ে এনেছে। ক্রমে ক্রমে তাই যৌথ পরিবার নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিতে পরিণত হচ্ছে। এর কারণে জন্ম হচ্ছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একক পরিবার। তাছাড়া মানুষ জীবিকার সন্ধানে শহরমুখী, কার্যপোলক্ষে দূরে বিচ্ছিন্নভাবে ও জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। জীবন গতিময়, সেইসঙ্গো সমাজ ও গতিশীল, আর সেই সমাজের সঙ্গো খাপ-খাওয়ানোর জন্য মানুষ ও বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো জীবন যাপন করছে। ফলে একান্নবর্তী পরিবার ভেঙ্গো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবারের জন্ম হচ্ছে।

উপকূলীয় অঞ্চলে বহু পূর্বে গ্রামজীবনে মোড়লী ব্যবস্থা বহাল ছিল। তখন গ্রামের মাতব্বর হতো গ্রামের সবচেয়ে প্রবীণ প্রতাপশালী ব্যক্তি। গল্প, উপন্যাস, নাটকে এই ধরণের চরিত্র আমরা অনেক পেয়ে থাকি। এই অঞ্চলও তার ব্যতিক্রম ছিল না। গোটা গ্রামের ভালো-মন্দ, বিচার-আচার, শান্তি-শৃঙ্খলা মোড়ল-ই ঠিক করত। সেই মোড়লী ব্যবস্থা আজ আর নেই। এখন গণতান্ত্রিক দেশে সকল নাগরিক সচেতন। সমাজ রাষ্ট্র এখন গণতান্ত্রিক। ভোট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গ্রামবাসী নির্দিষ্ট করেন তাদের ভালো-মন্দ দেখবার পঞ্চায়েত শাসককে। যিনি নির্দিষ্ট নিয়মতান্ত্রিকভাবে শাসন করবেন গ্রামের মানুষজনকে। তেমনি গ্রামজীবনের সুখ-দুঃখ, সমস্যা-বিপত্তির দিনে পঞ্চায়েত নিজে সমাজের বাকি গণ্য-মান্যদের দ্বারা সুষ্ঠুভাবে সমস্যার সমাধানও করে দেন। যেকোনো বিপদে শালিসের মাধ্যমে সমাজকে গতিশীল রাখার সু-পরামর্শও দিয়ে থাকেন। তিনি প্রকৃত বন্ধু, মুসকিল আসান, যিনি সরকার কর্তৃক পোষিত।

৬। বিনোদন ঃ

মানুষ যেখানেই থাকুক না কেন তার চারপাশের পরিবেশে এক সাংস্কৃতিক আবহ গড়ে তোলে। সারাদিনের বিভিন্ন ক্লান্তিকর কাজ-কর্মের পর প্রত্যেকেই চায় আমোদ-আনন্দ, উৎসব-উল্লাস। সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল এমন এক বিনোদনমূলক ব্যবস্থা, যেখানে মানুষ নিজেকে দু-দণ্ড জিরিয়ে, নতুন উদ্যমে বেঁচে থাকার আশ্বাস পায়। তবে এই সাংস্কৃতিক বিনোদন শহরের তুলনায় গ্রামে ভিন্ন রূপের এবং তা অনেক বেশি অন্তরঙ্গ, যা বেঁচে থাকার অন্যোন্য উপায়। পল্লী জীবনের ব্রত-উৎসব-উদ্দীপনা, পল্লীসংস্কৃতিতে ঘিরে-ই আবর্তিত। পল্লী জীবনের এই পল্লী সংস্কৃতিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

১। প্রায় অবলুপ্তমান পল্লীসংস্কৃতি এবং

২। প্রচলিত পল্লীসংস্কৃতি।

১। প্রায় অবলুপ্তমান পল্লীসংস্কৃতি ঃ

লোকায়ত পল্লীবাসীগণ প্রতিনিয়ত কতকগুলি বিশ্বাস, সংস্কার নিয়ে বেঁচে আছে। অনেক কাল পূর্বে যখন মানুষের কাছে শিক্ষাদীক্ষা ছিল না, বিজ্ঞান চেতনা ছিল অস্পষ্ট, প্রকৃতির মধ্যে ঘটে যাওয়া নানা কার্য-কারণের তারা ব্যাখ্যা পেত না, বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য একমাত্র দেবতার পায়ে নিজেদেরকে সঁপে দিত। যা কিছু হচ্ছে, যা কিছু হবে, যাতে ভালো হয়, সুখের হয়, বিপদ কেটে যায়, সমস্যা না আসুক, ধন-সম্পদে সংসার ভরে উঠুক, পতি-পুত্র সুখে থাকুক, যারা বাইরে গেছে, তারা ভালোয় ভালোয় ফিরে আসুক, এইরকম নানান আকাঙক্ষায় বাড়ির মেয়েরাই (পুরুষেরাও ব্যতিক্রম নয়) বেশি করে নানা ধরনের পূজা, ব্রতনুষ্ঠান, মানত, পালন ও উদ্‌যাপন করত। সার্বিক মঙ্গাল-ই ছিল এইসব অনুষ্ঠানের মূল চাওয়া। এই ধরনের কিছু পল্লীসংস্কৃতি তখনকার সমাজে ছিল, (যার অনেক কিছুই বর্তমানে নেই বললেই চলে) এখন হয়তো সবটা নেই, সেই সবগুলোর বেশ কিছুকে এখানে অবলুপ্তমান পল্লীসংস্কৃতি বলে তুলে ধরছি। যেমন ঃ

ব্রত (হরিতালী চতুর্থীব্রত)

বট ও অশ্বত্থ বিবাহ

ধর্ম ঠাকুর (লোকায়ত ধর্ম)

গোয়াল পূজা (ভাদ্র মাসে রাখী পূর্ণিমায় হয়)

চিতি অমাবস্যা (শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে)

কঁ ষষ্ঠী পূজা

উনুন পূজা (অরন্ধন, ভাদ্রের শুক্লাচতুর্থী)

বকুল আমিষ্যা (পৌষ মাসে হয়)

চাঁচর উৎসব (দোল পূর্ণিমার সন্ধ্যায়)

ল-বাঁধা সংক্রান্তি— ইত্যাদি ইত্যাদি।

ব্রত, হরিতালী চতুর্থীব্রত ঃ

হরিতালী চতুর্থীব্রত সাধারণত ভাদ্র মাসে হয়। একে গণেশ চতুর্থীও বলে। গোস্বামী মতে, এই ব্রতকে শ্রীকৃষ্ণ কলঙ্কিনী ব্রতও বলে। এই হরিতালী ব্রতের অন্যনাম নষ্টচন্দ্র, অর্থাৎ চাঁদ দেখতে নাই। চতুর্থী সন্ধ্যার চাঁদকে দেখতে নাই, দেখলে অমঙ্গাল হয় বলে এই সন্ধ্যায় বাড়ির সকলে ঘরে থাকে, বাইরে যায় না। এই সুযোগকে কাজে লাগায় ছিঁচকে চোর, তারা এই সন্ধ্যাবেলায় অল্প আলোয় বাড়ি থেকে চাল, কুমড়ো, শসা, কলা, বেগুন ইত্যাদি চুরি করে এবং যা চুরি করবে তার অর্ধেক মালিকের ঘরে রেখে যাবে, —এই ধরণের একটি লোককথা আছে। তবে বর্তমানে এই ব্রত উপকূলীয় অঞ্চলে পালন হয় না, পূর্বে একসময় হতো।

বট ও অশ্বত্থ বিবাহ ঃ

উপকূলীয় অঞ্চলে পূর্বে পল্লী সংস্কৃতিতে বট ও অশ্বত্থ গাছের বিবাহ দেওয়া প্রচলন ছিল। আজ থেকে প্রায় ৩০-৩৫ বছর পূর্বেও এই অঞ্চলে এই ধরনের অনুষ্ঠান হতো, কিন্তু এখন তা নেই বললেই হয়। আমি আমার ছোটোবেলায় এই অনুষ্ঠান দেখেছি। যার ফল স্বরূপ এইসব অঞ্চলে প্রায় দেখা যায় যে, বটগাছ এবং অশ্বত্থ গাছ একসঙ্গো লাগানো রয়েছে। তারমূলে আছে ঐ পূর্বেকার প্রথা। এটা বট ও অশ্বত্থের বিবাহের নিদর্শন। এই দুটি গাছ দীর্ঘস্থায়ী গাছ। লোকায়ত মানুষ বটকে পুরুষ ও অশ্বত্থ গাছকে নারীরূপে কল্পনা করে, বৈবাহিক নিয়মনীতি মেনে উভয় গাছের বিয়ে দিত। অর্থাৎ দুটি গাছের উপর মানবধর্ম আরোপ করে বিয়ে দেওয়া হত। আবার অনেক সময় লোকায়ত মানুষ বিশ্বাস করতো যে কোনো ছেলে বা মেয়ের বিবাহের পরে বিপত্নীক বা বৈধব্যযোগ যদি থাকে, ঐ বৈধব্য বা বিপত্নীক হওয়ার দোষ কাটানোর অভিপ্রায়ে তাদেরকে বট ও অশ্বত্থের সঙ্গো প্রকৃত

বিবাহের আগে বিবাহ দেওয়া হত। তবে বর্তমানে এই ধরনের পল্লীসংস্কৃতি হারিয়ে গেছে, যাচ্ছে, উত্তর প্রজন্মের কাছে এই ধরণের সংস্কৃতির বিষয়টি একেবারেই হয়তো অজানা থেকে যাবে।

ধর্ম ঠাকুরের পূজা ঃ

মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্য ধারার প্রভাবে পল্লী বাংলায় মনসাদেবী, চণ্ডীদেবী, ধর্মঠাকুর, শিবঠাকুরের প্রাধান্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। ঘটা করে এইসব দেব-দেবীদের পূজা হতো। আজও হয় তবে ধর্মঠাকুরের তেমন করে পূজা প্রচলন এই উপকূলীয় অঞ্চলে এখন আর নেই। বহুপূর্বে রাস্তার ধারে, গাছের তলায় বিভিন্ন আকারের পাথর লক্ষ্য করা যেত। সেইসব পাথর ছিল সিঁন্দুর মাখানো, জলস্নান করানো, ফুল-পাতা দিয়ে পূজিত বিচিত্র বাহারের, যা ছিল ধর্মঠাকুরের চিহ্ন স্বরূপ। প্রতি শনি-মঙ্গালবারে পূজা হতো। পাথরগুলোও প্রতিদিন বিভিন্ন সংখ্যার মিলত। কোনোদিন ৩টি, কোনোদিন ৫টি, কোনোদিন বা ৭টি। এই ছিল গ্রাম্য লোকায়ত ধর্মঠাকুর।

গোয়াল পূজা ঃ

রাখী পূর্ণিমা বাঙালীর কাছে প্রীতি-ভালোবাসার বন্ধন, সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পথ ধরে আজ তা সকলের কাছে অতি সমাদরপূর্ণ। রাখীবন্ধন আজ মানববন্ধনের প্রতিমূর্তি। রাখীপূর্ণিমা সাধারণত ভাদ্রমাসে হয়। তবে এই ভাদ্রমাসে পূর্ণিমার শুভক্ষণে গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে আরো একটি অনুষ্ঠান পালিত হয়, যাকে বলে 'গুমা পূর্ণিমা'। এই গুমা পূর্ণিমার দিন গোরুকে সন্ধ্যেবেলায় পূজা করা হতো। তাই এর আরেক নাম গোয়াল পূজা। পূজার উপকরণ হিসেবে থাকত ফুল, দুর্বা, সিঁন্দুর, তুলসী, বেলপাতার সঙ্গো শালুক ফুল। গ্রামের বউ মেয়েরা মাঠ থেকে, খাল থেকে শালুক ফুল তুলে, ফুলের লম্বা বৃন্তকে মালার মতো নক্সা করে গোরুকে পরানো হত। শালুক সাদা ফুলটি মালার একদম মাঝখানে এমনভাবে রাখা হতো, যেন দেখতে ঠিক পদ্ম ফুলের মতো লাগে। গোরুর কপালে সিঁন্দুরের টিপ এবং গোরুকে খেতে দেওয়া হতো চালবাটা আর গুড় সহযোগে গুড়ের পিঠা। পূজা হতো সন্ধ্যে নামার পর। কিন্তু বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যার আশীর্বাদে চাষ-আবাদ, ঝাড়াই-মাড়াই সবই মেসিন, ট্রাক্টরের সাহায্যে হচ্ছে। গো-পূজা তো দূরের কথা, সেভাবে কেউ-ই গো-পালনও করছে না। সকাল হলে মাঠে মাঠে গোরুর পালের

সৌন্দর্য খুব কমই দেখা যায়। তাই গোরুকেন্দ্রিক পল্লীসংস্কৃতি প্রায় হারিয়ে যাচ্ছে। গোয়াল পূজোও তাই অবলুপ্তির পথে।

চিতি অমাবস্যা ঃ

শ্রাবণ-ভাদ্রমাসে আর একটি অনুষ্ঠান এই উপকূলীয় অঞ্চলে ব্যাপকভাবে হতো, তা চিতি অমাবস্যা বলে সবার কাছে পরিচিত, একে 'চিতি আমিষ্যাও' বলে। উপকূলীয় মানুষজন আমিষ্যার সন্ধ্যাবেলায় চাল বেটে পিঠে করতো। চালবাটা, নারকেল কুরো[৩৮], অল্প চিনি, পরিমানমতো নুন ও জল দিয়ে, কড়াইতে কলাগাছের বৃন্তে সরিষা তৈল বা ঘি দিয়ে পিঠে তৈরী করা হতো। তারপর মাটির সরা ঢাকা দিয়ে ২-৩ মিনিটের মধ্যে প্রস্তুত হতো, চিতি পিঠে। শ্রাবণ মাসের অমাবস্যার সন্ধ্যেবেলায় হয় বলে একে 'চিতালগী অমাবস্যা'ও বলে। কিন্তু এখন এই পিঠের অনুষ্ঠান হয়-ই না। বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা এই পিঠের কথা জানে না বললেই চলে।

কঁ ষষ্ঠী পূজা ঃ

উপকূলীয় অঞ্চলের গ্রামবাংলার মায়েরা প্রসব করার পর যে ঘরে থাকে, তাই আতুড় ঘর বলে পরিচিত। ঐ আতুড়ঘর থেকে মা এবং নবজাতক বা নবজাতিকা পাঁচদিন কোথাও বেরোতে পারবে না, একে পাঁচুটিও বলে। পাঁচদিনের দিন ঐ ঘরের কোণে ষষ্ঠীদেবীর পূজা হয়, যা এই অঞ্চলে কঁ-ষষ্ঠী পূজা বলে পরিচিত। এই পূজায় ব্রাহ্মণ ডেকে শাড়ী, কাপড়, ঘট, খই ও পূজার অন্যান্য উপকরণাদি দিয়ে ষষ্ঠীদেবীর পূজা হয়, এখন এই কঁ ষষ্ঠীদেবীর পূজা উঠেই গেছে। কেননা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, মায়েরা বাড়ির বাইরে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সন্তান সন্ততি প্রসব করে। তাই বর্তমানে এই অনুষ্ঠান মানুষ ভুলে যেতে বসেছে।

বকুল আমিষ্যা ঃ

পৌষমাসের অমাবস্যা তিথিতে আমগাছের গোড়ায় জল ঢালতে হয়। আম আমাদের জাতীয় ফসল। এই সময় আমগাছে প্রচুর বকুল আসে। সেই বকুল যাতে না ঝরে যায়, ঐদিন অর্থাৎ বকুল আমিষ্যার দিন গাছের গোড়ায় জল ঢালতে হয়, কথায় বলে, 'গোড়ায় জল /খড় বাঁধতে হয়।'[৩৯] ছড়াটি অমলেন্দুবিকাশ জানার থেকে সংগৃহীত। পূর্বে এই প্রথা পালন হলেও এখন আর হয় না। এইরকম প্রথাটি এখন অবলুপ্তির পথে।

চাঁচর উৎসব ঃ

দোল উৎসব এখানকার একটি জনপ্রিয় উৎসব। ফাল্গুনি পূর্ণিমার দিন হয় দোল উৎসব। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ দোল উৎসবকে কেন্দ্র করে গোটা দেশ মেতে ওঠে। দোলযাত্রার দিন দুপুরে রঙের হোলি চলে, দোলযাত্রার দিন সন্ধ্যেবেলায় উপকূলীয় অঞ্চলে একটি অনুষ্ঠান হয়। দশ-বারোদিন পূর্ব থেকেই চলে এর পরিকল্পনা। বড় বড় খেজুর গাছ বা কলাগাছ কেটে, সেইসঙ্গো অন্যান্য গাছের ডালপালা কেটে রৌদ্রে শুকানো হয়। তারপর দোলের দিন সন্ধ্যায় ফাঁকা মাঠে খেজুরগাছ বা কলাগাছকে শুকনো ডালপালায় সাজিয়ে বড় দৈত্যাকৃতি আকার দেওয়া হয়, নিচের দিকে প্রচুর পরিমাণে শুকনো ডালপালা, পাতা, খড় জড়ো করা হয়, তারপর পাড়ার সবাই ঐ ফাঁকা জায়গায় উপস্থিত হয় আলু, বেগুন, নিম, পেঁয়াজ-এর মালা গেঁথে। এইসব খাদ্যদ্রব্য ঐ হোলির আগুনে পোড়ানো হয়। প্রথমে বড়রা গাছে আগুন লাগায়, তারপর আগুন কিছুটা কমে এলে ছোটোরাও হাত লাগায় বড়দের সঙ্গো। আগুনে সমস্ত কিছু পোড়ানো হয়ে গেলে ছোট ডাল বা লাঠি দিয়ে যে যার পোড়ানো খাদ্যদ্রব্যগুলো খুঁজে পরস্পরকে খাওয়ায় এবং বাড়ির জন্য নিয়ে যায়। এই অনুষ্ঠান-ই চাঁচর[৪০] অনুষ্ঠান। সমগ্র উৎসবটি অতীব চমৎকার ও সুন্দর, রাতের আকাশ আলোর অঞ্জলিতে আলোকিত হয়ে ওঠে। এই অনুষ্ঠান দিন দিন নিষ্প্রভ হয়ে উঠছে। বাস্তব জীবনের অর্থনৈতিক দিক মানুষকে ততখানিই প্রয়োজনের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, যতখানি না টানছে হৃদয়াবেগের দিকে, অফুরন্ত আনন্দের দিকে। তাই গ্রামগঞ্জের লোক কর্মপোলক্ষে আজ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, নগরমুখী, একসঙ্গো থাকে না, প্রত্যেকে পৃথকভাবে দিন কাটালে এমন মধুরস্মৃতি বিস্মৃতির মতো-ই মনে হয়।

ল-বাঁধা সংক্রান্তি ঃ

এটিও একটি উপকূলীয় পল্লীসংস্কৃতি। নল খাগড়ার গাছে নতুন কাপড়ের অংশে তেঁতুল, হলুদ, ওল এবং বেনে বাজারকে একসঙ্গো বেঁধে দিয়ে আসতে হয় আশ্বিন মাসের শেষ দিনে। ঐ সময় ধানের গর্ভ সঞ্চার হয়। তাই মা লক্ষ্মীকে সন্তুষ্ট করার জন্য সাধ দিয়ে এই ল-বাঁধা সংক্রান্তি[৪১] পালিত হতো। তারপর ধান মাঠে খুব ভোর ভোর উঠে ধানগাছের শিশির ধরে সকালে খালি পেটে 'আলি'[৪২] খাওয়া হতো। আলি খাওয়ার পর পিঠে খাওয়ার পালা। পূর্বের দিন রাত্রে 'পোড়াপিঠে'[৪৩] তৈরী করা হয় এবং তার পরদিন অর্থাৎ সংক্রান্তির

দিন সকালে আলি খাওয়ার পর ঐ পিঠে খেতে হয়। দুপুরে খেতে হয় সাত রকমের শাকের রান্না এবং ওল ও তেঁতুলের তরকারী। তবে বর্তমানে এই সংস্কৃতিও হারিয়ে যাচ্ছে। নল খাগড়ার গাছে বেঁধে ধান মাঠে তা মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়, এইভাবে একসময় ধানগাছকে সাধ খাওয়ানোর সংস্কৃতি-ই, ল-বাঁধা সংক্রান্তি হিসেবেই এই অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। ঐ দিন ভোরে নিম কাঠিতে দাঁত মাজতে হয় এবং ঝাঁটা দিয়ে ঝাঁট দিতেও হয়, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ছড়া বলা হয়—

এতে আছে ঝোটপাট্
সব পকার মাথা কাট্[৪৪]

সংগ্রাহক অমলেন্দুবিকাশ জানার কুমিরদা গ্রাম থেকে প্রাপ্ত।

২। প্রচলিত পল্লীসংস্কৃতি ঃ

পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলে পল্লীসংস্কৃতির যে আলোচনা আলোচিত হল, তা প্রায় অবলুপ্তির পথে, কিন্তু বেশকিছু পল্লীসংস্কৃতি আজও অটুট। সেই সমস্ত সংস্কৃতি গ্রামবাংলার স্নেহ শীতল বারোমাসের তেরো পার্বণকে আজও ধরে রেখেছে। এখানে সেই পার্বণগুলির কয়েকটি হল ঃ

১। পড়ুয়া অষ্টমী
২। বিপত্তারিণী পূজা
৩। শিবচতুর্দশী পূজা
৪। রাখী পূর্ণিমা
৫। মনসা পূজা
৬। জামাই ষষ্ঠী
৭। চড়ক পূজা
৮। নববর্ষ উৎসব
৯। থপা দেওয়া দুর্গাষষ্ঠী উৎসব

১. পড়ুয়া অষ্টমী ঃ অগ্রাণমাসে অষ্টমী তিথিতে উপকূলীয় অঞ্চলে 'পড়ুয়া অষ্টমী'[৪৫] পূজা হয়। পরিবারের যে ছেলে বা মেয়ে বড় হয়, সে হয় ঐ পরিবারের পড়ুয়া ছেলে বা পড়ুয়া মেয়ে। ঐদিন পড়ুয়া ছেলে বা মেয়েরা নতুন বস্ত্র পরিধান করে বাড়ির হরিমন্দিরের

পাশে গোমাই, ধানছড়া ও গোটাসুপারি বসিয়ে পূজা করে, সঙ্গো তুলসী, দুর্বা, ফুল, ফল, বেলপাতাও দেওয়া হয়। এইভাবে পূজায় পড়ুয়া সন্তান বা সন্ততির আয়ু ও মঙ্গাল কামনা করা হয়। পূজার পর পড়ুয়াকে পায়েস রান্না করে খাওয়ানো হয়। এই প্রথা এই উপকূলীয় অঞ্চলের ঘরে ঘরে আজও পালিত হয়।

২. বিপত্তারিণী পূজা ঃ আষাঢ় মাসের শুক্লা তৃতীয়া থেকে নবমী তিথির মধ্যে যেকোনো শনিবার বা মঙ্গালবারে এই ব্রত পালিত হয়। এই ব্রত পালন করলে সংসারের সকল বিপদ কেটে যায় বলে এর নাম বিপত্তারিণী পূজা।[৪৬] ঘটস্থাপন করে, পুরোহিত ডেকে, তেরোরকম ফলপ্রদান করে এই পূজার আয়োজন করা হয় এবং পূজার শেষে ফলমূল খেয়ে ব্রতর উপবাস ভঙ্গা করা হয়।

৩. শিবচতুর্দশী ব্রত ঃ ব্রতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রত শিবচতুর্দশী ব্রত।[৪৭] ফাল্গুনমাসের চতুর্দশী তিথিই শিবচতুর্দশী। এই ব্রত সাধারণত মেয়েরাই পালন করে থাকে। চতুর্দশীর আগের দিন নিরামিষ আহার করে, খড় বা কম্বলের আসনে শয্যা গ্রহণ করে। তারপর দিন সারাদিন উপবাস থেকে সন্ধ্যা বেলায় শিবের মন্দিরে ডাব, দুধ, ঘৃত, মধু, গঙ্গাজল, বেলপাতা, ফলফুল শিবের মাথায় ঢালে এবং বাড়ি এসে মন্দিরের থেকে আনা চরণামৃত পান করে। পরে ফলমূলাদি খেয়ে ব্রতকথা শোনে ও রাত্রি জাগরণ করে। সর্বশেষে চতুর্দশী অতিক্রান্ত হলে রন্ধন করে আহার গ্রহণ করে। এই ব্রতে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্বিধ ফললাভ হয়। প্রচলিত আছে এই ব্রত কুমারী মেয়েরা পালন করলে শিবের মতো বর পায়।

৪. রাখীপূর্ণিমা ঃ শ্রাবণী পূর্ণিমাই রাখীপূর্ণিমা।[৪৮] সাধারণত এই পূর্ণিমা শ্রাবণমাসের শেষের দিকে পড়ে। রাখী পূর্ণিমা প্রথম প্রচলন করেন কবি সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।[৪৯] তাঁর-ই হাত ধরে এই পূর্ণিমা উপকূলীয় অঞ্চলের সমাজ ও সংস্কৃতিতেও ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছে। ছোটোরা এই উপলক্ষে বড়দের হাতে এবং বড়রাও ছোটোদের হাতে শ্রদ্ধা ও আশির্বাদের রাখী পরিয়ে দেয়।

৫. মনসা পূজা ঃ মনসা আমাদের লৌকিক দেবতা। পূর্বে মানুষ ছিল দেবতা নির্ভর। প্রকৃতির মধ্যে ঘটে যাওয়া ঘটনার কার্যকারণ না বুঝতে পেরে ঈশ্বরকেই সকল কিছুর চালক বলে ভাবত। জীবনের বাধা বিপত্তির মুশকিল আসান ছিল ঈশ্বর। তাই নিজেদেরকে বাঁচাতে, মনসার প্রকোপ থেকে রক্ষা পেতে, মা চণ্ডীর দয়ার দানকে হাসিমুখে সহ্য

করতে, জনসাধারণ ঈশ্বরের স্মরণাপন্ন হতো। তেমনি পুরো আষাঢ় মাস ধরে সাপের ছোবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শ্রীশ্রীমনসাদেবী ও অষ্টনাগ পূজা হয়ে থাকে। সিঁন্দুর, ঘট, মনসাগাছ[৫০], মধু, ঘি, দধি, ফুল, দুর্বা, দুধ, তুলসী, বেলপাতা ও ধূপ ইত্যাদি ইত্যাদি সবকিছুই পূজার উপকরণ। এখন মাটির তৈরী দেবীপ্রতিমাই অধিক প্রচলিত। এই পূজায় গৃহস্থের সবরকম কল্যাণ হয়ে থাকে। পূর্বে এই পূজা কেবল গৃহস্থ বাড়িতেই হতো, এখন বিভিন্ন ক্লাব, সংগঠন ও পূজা করে থাকে। তাই মনসাদেবীর পূজোর জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৬. জামাইষষ্ঠী ঃ জৈষ্ঠ্য-আষাঢ় মাসে শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে বাংলার ঘরে ঘরে জামাইষষ্ঠী[৫১] উৎসব পালিত হয়। মেয়ে-জামাই ঐদিন পিত্রালয়ে আসে। শাশুড়িমাতা জামাই-এর কল্যাণে ষষ্ঠী পূজা করেন এবং এই অনুষ্ঠানে জামাই এবং শাশুড়ি পরস্পর পরস্পরকে নতুন বস্ত্র উপহার দেয়, পরে লোভনীয় ভোজনের ব্যবস্থা করে শাশুড়ি জামাইকে পরিবেশন করে। এই অনুষ্ঠান এখনও খুব আড়ম্বরের সঙ্গে পল্লীবাংলায় হয়ে আসছে।

৭. চড়কপূজা ও নববর্ষ উৎসব ঃ চৈত্রমাসের শেষদিন চড়ক সংক্রান্তি[৫২] নামে পরিচিত। এতে জল, ফল এবং অন্নদান করা হয়। শিবকে কেন্দ্র করে এই লৌকিক পূজা হয়। ব্রতীরা বার করেন। এখানে বহু জায়গায় শিবমন্দিরে এই চড়ক অনুষ্ঠিত হয়। নন্দীগ্রামের রায়াপাড়া গ্রামে শতাধিক বৎসরের শিবমন্দির আছে, ঐ মন্দির প্রাঙ্গণে চড়ক অনুষ্ঠিত হয়। মন্দির সম্পর্কিত লোক বিশ্বাস যে, ঐ মন্দিরের মহাদেব জাগ্রত এবং মাহাত্মপূর্ণ। দিনের কোনো সময় মন্দিরের ছায়া পড়ে না এবং মন্দিরখানি একরাত্রিতেই তৈরী হয়েছিল। এছাড়া পালপাড়া, হলদিয়া, বাজকুল, কাঁথি, রামনগর, খেজুরী, কাজলাগড় বহু স্থানে মাহাত্ম্যপূর্ণ শিবমন্দির আছে। এবং এই মন্দিরগুলিতে চড়কে উৎসবও হয়ে থাকে। চড়কের দিন ব্রতীরা শিব-পার্বতী সেজে বাড়ি বাড়ি চাইতে আসে। বাঁশের উপরে উঠে বিভিন্ন খেলা দেখায়। যথা ঃ আগুনে ঝাঁপ, বঁটিতে ঝাঁপ, বাঁশের দুই দিকে দুজন অনেক উঁচুতে নানা রকম কসরত করে। মন্দির পুকুরে থাকে মহাদেবের নীলকাঠ, ব্রতীরা ঐদিন নীলকাঠকে তোলে। এই কাঠ তোলা নিয়ে প্রচলিত বিশ্বাস হল— যারা মহাদেবের আশির্বাদধন্য তারা তুলতে পারবে, আর যারা মহাদেবকে তুষ্ট করতে পারেনি, তারা ঐ কাঠ তুলতে পারবে না, এই সবকিছুই দেবাদিদেব মহাদেবের মাহাত্ম। তাই ব্রতীরা এত

বিপদের মাঝে খেলা দেখিয়েও বিপদ থেকে রক্ষা পান। এই চড়ক উৎসব বিভিন্ন জায়গায় আজও সমানভাবে পালিত হচ্ছে

৮. নববর্ষ উৎসব ঃ নববর্ষ হলো পুরোনো জীর্ণ বৎসরের সমস্ত মালিন্যকে ঝেড়ে ফেলে নতুন বছরকে বরণের আয়োজন। চৈত্র সংক্রান্তির পরের দিন নববর্ষ, অর্থাৎ ১লা বৈশাখ। বাঙালির প্রতি ঘরে ঘরে নববর্ষের প্রবাহ আজও সমানভাবে চলে। দোকানদার, ব্যবসায়ীগণ হালখাতা খোলে পুরোনো হিসেব মিটিয়ে, আর মিষ্টিমুখে সবাইকে আশ্বাস দেয় আগামীর কেনাকাটায়। পয়লা বৈশাখ এই উপকূলীয় অঞ্চলের প্রতি ঘরে ঘরে সবাই খুব ভোরে উঠে বাস্তুতে খড়কুটো দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে ধোঁয়া দেয়, এতে বাস্তুর কল্যাণ হয়। পরে স্নান করে বাড়ির সবাই নতুন বস্ত্র পরিধান করে। ছোটোরা বড়দের প্রণাম করে। এবং কথায় আছে, ঐদিন যা যা করা হবে, সারা বছর ধরে তাই তাই হবে, তাই বড়রাও ছোটোদের দু-হাত তুলে আশীর্বাদ করেন তবে এখন এই অঞ্চলের মানুষ বাংলা নববর্ষ পালনের সঙ্গে সঙ্গে English New Year (১লা জানুয়ারী)-এর আনন্দেও মেতে ওঠে।

৯. থপা দেওয়া দুর্গা ষষ্ঠী ঃ বাঙালির সবচেয়ে বড় এবং প্রিয় উৎসব দুর্গা পূজা। শরৎকালে দেবী দুর্গার আগমনে বাঙালির আঙিনায় দেখা যায় 'দুর্গা[৫৩] থপা'। যেকারণে একে 'থপা দেওয়া দুর্গা ষষ্ঠী' ও বলে থাকে। 'থপা' দেওয়া হয় ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যার পূর্বে। 'থপা' দেওয়ার আয়োজন চলে পূর্বদিন থেকে। মা-বোনেরা অর্থাৎ বাড়ির নারীদের দ্বারাই-এর আয়োজন। এতে আতপচাল পূর্বরাত্রে ভিজিয়ে ষষ্ঠীর দিন বিকেলে বাটা হয়। তারপর ঐ আতপচালের বাটা বেশ 'তরল'[৫৪] করে 'ধারাচাটু[৫৫]', 'গাছের পাতা[৫৬]' কিংবা 'জাল[৫৭]' দিয়ে দেওয়ালে অলংকরণ করা হয়। আর সিঁন্দুরকে নারকেল তেল দিয়ে মাখিয়ে 'টিকরি ফল[৫৮]' দিয়ে ঐ দেওয়ালের চিত্রের ওপর মাঝখানে বসানো হয় যা দেখতে অপূর্ব সুন্দর লাগে। এই থপা কালীপূজার পূর্বদিন পর্যন্ত থাকে। এবং কালীপূজার পূর্বদিনে জল দিয়ে মুছে ফেলতে হয়, না হলে কালীঠাকুর রাগ করবেন বলে এমন ধারণা প্রচলিত আছে। এই দুর্গাথপা শুভলক্ষণযুক্ত। বাড়িতে মায়ের আগমনের বার্তা ঘোষণা করে। পূর্বে এই অঞ্চলে প্রচুর মাটির বাড়ি ছিল। তাই মাটির দেওয়ালের ওপর এই অলংকরণ বাড়ির মেয়েরা করত। বর্তমানে মাটির বাড়ি পূর্বের তুলনায় অল্প, তবুও উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষ এই ঐতিহ্যকে আজও সম্মান দেয়, শ্রদ্ধা করে। কেননা গ্রাম-শহর, কি পাকা, কি কাঁচা, সব বাড়িতে এই থপা দেওয়া দুর্গা-ষষ্ঠীর অনুষ্ঠান আজও সমানভাবে বহাল আছে।

এছাড়াও এই অঞ্চলে বহুপূজা গ্রামবাংলায় অনুষ্ঠিত হয়, যথা—লক্ষ্মীপূজা (কার্তিক অঘ্রাণ মাসে), অক্ষয়তৃতীয়া, জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, পৌষ সংক্রান্তির পূজা (মই পূজা) ইত্যাদি ইত্যাদি।

৭। শিক্ষা পরিকাঠামো ঃ

"পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাপ্তছড়ায় লোকজীবন ও সমাজ চিত্রের পরিচয় অন্বেষণ ও তার পর্যালোচনা" এই গবেষণায় অন্যান্য সবকিছুর মতো উপকূলীয় অঞ্চলে শিক্ষার আলোও প্রসারিত। যদিও এই অঞ্চলে সমুদ্র ও নদী উপকূল, মাঝি-মাল্লা-কৃষক-শ্রমিক খেটে খাওয়া জন মজুর মানুষের সংখ্যাই বেশি, তবুও শিক্ষা মানুষের জীবন থেকে সরে যায়নি। এলাকার ছোট্ট ছোট্ট শিশুরা এখন শিক্ষা-আঙিনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শিক্ষামূলক নানা প্রতিষ্ঠানে প্রতিটি শিশু নিজেদেরকে সমাজ ও জীবনের প্রয়োজনে তৈরী করে নিচ্ছে। অভিভাবকগণ ও যথেষ্ট সচেতন। তাই পূর্বের তুলনায় বর্তমানে শিক্ষা-পরিকাঠামোও যথেষ্ট ভালো। এই ছাত্র-ছাত্রীদের বই, খাতা, ডায়েরী, জামা, ব্যাগ, সাইকেল, মিড-ডে-মিল, স্কলারশিপ প্রায় সবকিছুই এখন সরকার কর্তৃক পোষিত। সাধারণভাবে বর্তমানের এই শিক্ষা-পরিকাঠামোকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করতে পারি ঃ

১। সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা পরিকাঠামোযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

২। সরকারী সাহায্যহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা পরিকাঠামোহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

১। সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা পরিকাঠামোযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ এই ধরনের পরিকাঠামোযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখানে সংখ্যায় প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। শিশুদের জন্য প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে রয়েছে—আই.সি.ডি.এস (Integreted Child Devolpment Scheme), অঙ্গানওয়াড়ী শিশু শিক্ষা নিকেতন, এছাড়া ব্যক্তিগত উদ্দ্যোগে বর্তমানে বহু নার্সারী, উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। তবে বেশিরভাগ শিশু, সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলেই আছে। যেহেতু এই অঞ্চলে এখনও বহুমানুষ আর্থিকভাবে পিছিয়ে, দরিদ্রসীমার নীচে, তাই তারা বেশিরভাগই সরকারী প্রতিষ্ঠানে আসে। বর্তমানে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে 'মিড-ডে মিল' [৫৯] খাওয়ানোর ব্যবস্থা শিশুদের অনেকবেশি শিক্ষানুগামী ও শিক্ষা অভিমুখী করে তুলেছে। এখনও এমন অনেক পরিবার আছে, যাদের

দুপুরের হাড়ি উনুনে চড়ে না, তাদের ছেলেমেয়েরা দুপুরের ভাত বিদ্যালয়েই এসে খায়। তাই দুটি খাওয়ার জন্য বিদ্যালয়েও আসে। শুধু খাওয়া নয়, সেই সঙ্গে শিক্ষার যাবতীয় সামগ্রীও পেয়ে থাকে। এজন্য সরকার পোষিত বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা বেশি ভর্তি হয়। এছাড়া উচ্চ-প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতেও ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কম নয়, এই পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলে বহু সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় আছে, যেগুলি খুব সুনামের সঙ্গে পরিচালিত হচ্ছে। সেইসঙ্গে উপকূলীয় মহাবিদ্যালয়গুলির কথাও উল্লেখ্য। যেহেতু বেশিরভাগ মানুষ আর্থিকভাবে পিছিয়ে রয়েছে, এই অঞ্চলের অনেক পরিবারের শিক্ষার্থীরা পাশাপাশি মহাবিদ্যালয়গুলিতে ঘরের খেয়ে এবং পরিবারের কাজ-কর্ম করার পরও পড়াশুনা করতে পারে। এই ধরনের সুযোগদানে কলেজগুলিও সুনামের অধিকারী।

এছাড়া সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত প্রথা বহির্ভূত বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই উপকূলীয় অঞ্চলে রয়েছে, যেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করে। অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। সেক্ষেত্রে অল্প সময়ের মধ্যে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য, —'Vocational Education' বা কারিগরি শিক্ষার খুব প্রয়োজন। ভোকেশনাল ডিগ্রি ২ বছর বা ৪ বছর মেয়াদের হয়ে থাকে। এই শিক্ষায় সহজে পাশ করা যায়। ভোকেশনাল শিক্ষার কয়েকটি বিষয় হল—ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন ফিশারিজ, ডিপ্লোমা ইন ফরেষ্টি, হেলথ টেকনোলজি, মেরিন টেকনোলজি ইত্যাদি ইত্যাদি।

সরকারী সাহায্যযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পাশাপাশি, সরকারী সাহায্যহীন প্রতিষ্ঠান বা পরিকাঠামোহীন প্রতিষ্ঠান-ই বেশি গুরুত্বপূর্ণ এখানকার জনজীবনে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ হাতে নাতে কাজ করেই গ্রাম-জীবনে বেঁচে থাকে। মাঠ, ঘাট, নদী, খাল, বিলের মানুষ এরা। রোদে জলে পুড়ে, পোড় খাওয়া জীবনে পরিশ্রমই এদের সম্বল। এই পরিশ্রমকে পাথেয় করে বংশানুক্রমিক ভাবে প্রাপ্ত ধারাকে বজায় রাখতে এই অঞ্চলের মানুষগণ বংশবৃত্তিকেই বেশি করে প্রাধান্য দেয়। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে তাই ঘর-ই হলো আসল বিদ্যালয়, পিতা মাতা-পরিবার-পরিজন-ই এদের সত্যিকারের শিক্ষক-শিক্ষিকা। জন্ম থেকে বাবা মার সঙ্গে থাকে। বড় হতে হতে কবে, কীভাবে, কখন যে পরিবারের পেশাকে

আয়ত্ত করে ফেলে, তা নিজেরাও জানতে পারে না। যেমন, কামার-কুমোরের কাজ, স্বর্ণকারের কাজ, মিষ্টি বানানোর কাজ, বেতের ও বাঁশের কাজ, জালবোনা, নৌকা চালানো, মাছধরা, চাষকরা, বাগান ও নার্সারি চাষ, চাল তৈরী করা, বিড়ি বাঁধা, বই বাঁধ, ঠোঙ্গা বানানো, দোকান চালানো, তাঁত বোনা, হাঁস-মুরগি, গোরু-ছাগল প্রতিপালন, লোহার কাজ, শাঁখা তৈরী করা, সূতো-উলের কাজ, পানচাষ, বাড়ি সাজানো, হাতের কাজ, মাদুর বোনা, পাখ্যিয়া তৈরী করা, বাদাম ছাড়ানো, চুল ছাড়ানো, চামড়ার কাজ, ওঝার কাজ, গাছ কাটার কাজ, পৌরোহিত্যের কাজ প্রভৃতি। গৃহে প্রশিক্ষিত এই ধরণের নানা বৃত্তিমুখী শিক্ষাকে নিম্নলিখিতভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা—

১। কৃষিকাজ মূলক শিক্ষা

২। ছোটো-শিল্প সৃষ্টিমূলক শিক্ষা।

এছাড়া নীতিশিক্ষা, মোড়লীশিক্ষা ও রয়েছে। বাবা-মা বাড়ির পরিবারবর্গের কাছ থেকে প্রজন্ম ধরে নানা ধরনের নীতিশিক্ষা, মোড়লীশিক্ষা এবং ওঝার শিক্ষা ও গ্রহণ করে থাকে। জীবনে সঠিকভাবে বেঁচে থাকার শিক্ষা, কোন্টা ভালো, কোন্টা মন্দ, কোন্টা সঠিক কোন্টা বেঠিক এই সত্য নির্বাচনে উত্তরসূরীদের সাহায্য করে তার পূর্বগামীরা। আর তাই দিয়ে তারা তাদের জীবিকাও নির্বাহ করে থাকে। সংগ্রাহক নিকুঞ্জ বেরার লাক্ষী[৬০] অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত এরকম কয়েকটি ছড়া হল—

১। খালা দেখ্‌বু যেঠি / মাছ ধরবু সেঠি। (মোড়লী ভাবনার প্রকাশ)।

২। জানার কুন শেষ নাই / মার খাবার কুন বয়স নাই। (মোড়লী)।

৩। ময়নামতী ফুঁক ঝাড়ে / বাত-বেদ্‌না কাটিয়া পড়ে। (ওঝা ব্যবস্থা)।

৪। মা মনসা বিষ ঝাড়ে / বিষ যা তুই গোবর বাড়ে। (ওঝা ব্যবস্থা)।

৫। আসতে যাইতে করে হিত / তার নাম পুরোহিত। (নীতি শিক্ষা)।

৬। দূরে যত থাকবু / আদর তত পাইবু। (নীতি শিক্ষা)।

তবে একথা ঠিক যে, উপকূলীয় মানুষজন সরকারী কাজ-কর্মের সাথে যুক্ত থাকলেও পূর্বগামীদের করে আসা চাষ-আবাদ বা ছোটো ছোটো সৃজনশীল শিল্পের কাজ, অবসর সময়ে করে থাকে। জন্মগতভাবে শেখা এই কর্মগুলি জীবনের সঙ্গে অন্যান্য প্রবৃত্তিগুলির মতো ওতপ্রোতভাবে গাঁথা। বর্তমান জীবনমুখী শিক্ষার আলোক গ্রাম-গঞ্জের আনাচে কানাচে প্রতিভাত হলেও, পিতামাতার দীর্ঘদিনের করে আসা কাজগুলোকে তারা মন্ত্রের মতো করে

আসছে। আর এরমধ্যে বেঁচে রয়েছে তাদের হাসি-কান্না, আনন্দস্রোত। খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রজন্মগত শিক্ষাদীক্ষা উত্তর প্রজন্মের আয়ত্বে চলে আসে। নানা অবহেলায়, অনাদরে এখনো গ্রামের মানুষ বংশানুক্রমিক বৃত্তিকে ধরে রেখেছে। ঢাক ঢোল বাজানো, বাঁশি বাজানো, নাটক যাত্রা শিল্পগুলিও এর ব্যতিক্রম নয়। মাঝিমল্লার ভাইরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মাঝ সমুদ্রে তুফানের বুকে নিজেদের সঁপে দিয়ে আমাদের ক্ষুণিবৃত্তির জোগাড় করে। এর পেছনে যে কত অশ্রু লুকিয়ে থাকে, কত জীবন ঝরে যায় তার খোঁজ কে-বা রাখে। তবুও টিকে থাকে সরকারী সাহায্যহীন এইসব দুঃখী জীবনের ফেরিওয়ালারা। এছাড়া বাড়ীর বড়রা সন্ধ্যার অলস মুহূর্তে ঘুম পাড়ানি মাসি পিসির সাথে নানা নীতিকথার গল্পও ভাঁজে। বুঝতে শিখে ঠিক ভুলের পরিমাণটা। এই মোড়লী ব্যবস্থা পূর্বেও ছিল। গ্রামের মোড়ল-ই দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা। তার সিদ্ধান্ত মানুষকে মেনে নিতে হতো। বর্তমানে এই মোড়লী ব্যবস্থার পরিবর্তে এসেছে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা। পঞ্চায়েত এবং গ্রাম প্রধান এই দু'জন সাধারণ মানুষের সুখ-দুখের সাথী। গ্রাম জীবনের সামাজিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রভৃতি বিষয়ের সহজ সমাধান করে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখে এই দু'জন মানুষ।

পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলের বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ

ভগবানপুর

১. Bachhipur S.S.K.

২. Banamalipur Pry School.

৩. Banamalipur S.S.K.

৪. Bhagwanpur High School.

৫. Bhagwanpur Pry. School.

৬. Bhimchak S.S.K.

৭. Bibhisonpur S.P. Pry. School.

৮. Dr. B.R. Ambedkar Sisu Vidyamandir.

৯. Jalibarh S.S.K.

১০. Kalaberia Dakshin S.S.K.

১১. Dwarikapur Board Pry. School.

১২. Dwarikapur B.D. Jr. High School.

কন্টাই-১

১. Amratalya Pry.

২. Badalpur Pry.

৩. Baksispur Pry.

৪. Dakshin Ektarpur S.S.K.

৫. Dakshin Ektarpur Pry.

৬. Dakshin Gopinath S.S.K.

৭. Durgapur Pry.

৮. Majilapur Pry.

৯. Paschim Rasalpur Pry. School.

১০. Sister Margaret School.

১১. Thakurchak Pry.

১২. Sabajput Shishu Siksha Tirtha.

কন্টাই-২

১. Bankiput High School.

২. Bankiput Pry School.

৩. Basantia Balika Vidyalaya.

৪. Basantia High School.

৫. Champatala High School.

৬. Chandberia Purba Para S.S.K.

৭. Dholmari Pry. School.

৮. Mirjapur High School.

৯. Namaldiha Nursery School.

১০. Namaldiha Pry. School.

১১. Petua Pry. School.

কন্টাই-৩

১. Daisai Dakshin Pry. S.S.K.

২. Kumirda B.R. Ambedkar MSK.

৩. Lauda S.S.K.

৪. Marishda Dihimal S.S.K.

৫. Marisda Telipukur Tapsil Para S.S.K.

৬. Nachinda J.K. Girls High School.

৭. Nachinda J.K. High School.

৮. Sarpai Nursery School.

৯. Sarpai Model Institution.

১০. Uttar Kanaidighi Bani Bhavan.

কন্টাই মিউনিসিপ্যালিটি

১. Contai C.B.G. School.

২. Contai Dishari Public School.

৩. Contai Hari Sava High School.

৪. Contai Hindu Girls School.

৫. Contai High School.

৬. Contai Model Institution.

৭. Contai Public School.

৮. Contai Muslim Girls' High School.

৯. Contai Kishore Nagar High School.

১০. Contai Khetramohan Bidyabahan

১১. Contai Chandramoni Bramha Balika Vidyalaya

১২. Contai Rakhal Chandra Vidyapith

১৩. Contai Mount Litera Zee School.

এগরা-১

১. Astichak Pry. School.

২. Astichak S.J. Vidyapith.

৩. Basudevpur H.P. Institution.

৪. Balighai Pry. School.

৫. Balighai Fakir Chand High School.

হলদিয়া মিউনিসিপ্যালিটি

১. Alichak New Pry. School.

২. Basudevpur Paschim Pry. School.

৩. Champai S.P. School.

৪. Durgachak Town School.

৫. Haldia High School.

৬. Haldia Punarbasan Vidyaniketan.

৭. Sutahata Sarbodaya Pry. School.

৮. Balughata Pry. School.

খেজুরী

১. Khejuri Kamarda High School.

২. Kalagachiya High School.

৩. Khejuri Vidyapith Girls School.

৪. Khejuri Adarsha Vidyapith.

৫. Khejuri Guruprasad Balika Vidyaniketan.

৬. Khejuri Gopichak High School.

৭. Khejuri Banimancha High School.

৮. Khejuri Haludbari High School.

৯. Khejuri Kasaria High School.

১০. Henria Pitambar High School.

১১. Lakshi Avinaba Vidyalaya.

১২. Begunabari High School.

ভগবানপুর-১

১. Kotbarg Pry. School.

২. Gopalchak Pry. School.

৩. Kalaberia P.K. High School.

৪. Kajlagarh MSBCM High School.

৫. Munda Bhanga S.S.K.

৬. Garbari Jr. High School.

৭. Fhatepur B.D. Jr. High School.

৮. Ektarpur High School.

৯. Deulibarh K.P. Vidyamandir.

ভগবানপুর-২

১. Nazirbazar Harendra High School.

২. Barabari High School.

৩. Gobindachak Shree Durga High School.

৪. Baghadari High School.

৫. bajkul Balai Chandra Vidyapith.

৬. Bajkul Janakalyan Siksha Niketan.

নন্দীগ্রাম

১. Joykali High School.

২. Amdabad High School.

৩. Amdabad Uttar Pally S.S.K.

৪. Amdabad R. Talia S.S.K.

৫. Barachiria High School.

চণ্ডীপুর

১. Gajipur Prymary School.

২. Kalikakhali Girls School.

৩. Kulbari Pry School.

৪. Erashal Jr. High School.

৫. Ranichak Jr. High School.

ময়না

১. Moyna Vivekananda Kanya Vidyapith.

২. Moyna Balai Panda Prathmik Vidyalaya.

৩. Moyna High School. (Boys)

উপকূলীয় অঞ্চলের কয়েকটি কলেজের নাম ঃ

১. Tamralipta Mahavidyalaya.

২. Haldia Government College.

৩. Contai Pravat Kumar College.

৪. Mahisadal Raj College.

৫. Contai Polytechnic College.

৬. Haldia Institute Technology College.

৭. Moyna College.

৮. Khejuri College.

৯. Mugberia Gangadhar College.

১০. Bajkul Milani Mahavidyalaya.

১১. Desapran Mahavidyapith.

১২. Kolaghat Government College.

১৩. Egra Sarada Shashibhusan College

৮। ভাষা ঃ

"পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাপ্ত ছড়ায় লোকজীবন ও সমাজচিত্রের পরিচয় অন্বেষণ ও তার পর্যালোচনা" শীর্ষক গবেষণার তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা ছড়ার ভাষাতাত্ত্বিক দিকটি তুলে ধরেছি এবং তার বিভিন্ন রূপগত আলোচনাও করেছি। সেই কারণে ক্ষেত্র সমীক্ষার এই অধ্যায়ে কেবল কিছু বৃত্তিগত মানুষের ভাষা ও তার, বিভিন্ন ধরন কিভাবে ছড়ায় প্রতিফলিত হয়েছে, এখানে শুধুমাত্র সেই দিকের প্রতি আলোকপাত করব।

আমরা জানি, পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষ খেটে খাওয়া, শ্রমজীবী মানুষ। শ্রম-ই তাদের ধারক ও বাহক। প্রতিদিনের সূর্যের মতো পরিশ্রম-ই তাদের চরম সত্য। দু-মুঠো অন্নের ও পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উত্তাপ পেতে, সকাল থেকে ঘুমানো পর্যন্ত তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়। পরিশ্রমকে লাঘব করার জন্য অনেক সময় তারা বিভিন্ন ধরনের ছড়া কাটে, শব্দ প্রয়োগ করে, যা দিয়ে তাদের কিছুটা হলেও কষ্ট লাঘব হয়। তাদের চোখের জল হাসি-ঠাট্টার মোড়কে ঢেকে যায়, ঢেকে যায় ছড়ায়। তাই ছড়া যেন জীবন্ত মানুষের কথা কয়। তার ফলস্বরূপ কখনো গাছকাটার ছড়া, কল তৈরীর ছড়া, শ্মশানের ছড়া, হাটের ছড়া, যাত্রার ছড়া, হাসি-ঠাট্টা-মজ্‌লিসের ছড়া ইত্যাদি ইত্যাদি এই গবেষণায় উঠে এসেছে। এইসবের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে ক্ষেত্রসমীক্ষা অঞ্চলের কথ্য ভাষা বৈচিত্র্য ও ভাষাছাঁদ।

মাঝি-মাল্লারের ভাষা ঃ

উপকূলীয় অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য নদীগুলি হল, রূপনারায়ণ, হলদি নদী, রসুলপুরের নদী, বাগদী নদী প্রভৃতি। নদীগুলিতে বহুমানুষ প্রতিদিন পারাপার করে, মাঝিরা খেয়া পারে নিয়ে যায়। তারা কষ্ট লাঘবের জন্য ছড়াও বলে ;

তার একটি ছড়া হল ঃ

১। আমি নৌকা ধরিয়া বুসিয়া আছি সকাল থেকে সন্ধিয়া
    পারানি কাই কত হইল বিড়ি খাইতে নাই পইসা[৬১] (নিজস্ব সংগ্রহ)

ভাটায় যখন নৌকা, কাদায় আটকে পড়ে, তখন খেয়া-মাঝিরা গায়ের জোরে কাদায় নেমে নৌকা জলের দিকে ঠেলে হয় আর কষ্ট লাঘবের জন্যে কিছু ছড়া ও বলে। তার একটি ছড়া, ছড়াটি শংকর বেরার কাছ থেকে প্রাপ্ত, স্থান খেজুরী।

২। জোরসে ঠেলো হ্যেইয়া
শুকা দুব হ্যেইয়া
গরমভাতে মইয়্যা
নৌকা চলে হ্যেঁইয়া।[৬২]

গাছকাটার ছড়া ঃ নিম্নোক্ত ছড়া দুটি কার্তিক ডিঙ্গালের[৬৩] কাছ থেকে প্রাপ্ত। স্থান-কট্‌কাদেবীচক, খেজুরী।

১। হ্যেই চাবাসি হেইলো
জোর্‌সে টানো হ্যেইলো
হিচ্‌কা মারো হ্যেইলো
টান মারো টান হ্যেইলো

২। হ্যেই চাবাসি হ্যেইয়া
আরো জোরে হ্যেইয়া
টানরে কাছি হ্যেইয়া
গাচ্‌ লড়েঠে হ্যেইয়া

শ্মশানের ভাষা ঃ ছড়া দুটি রঘু বারিকের[৬৪] কাছ থেকে প্রাপ্ত। স্থান-রসুলপুর, খেজুরী।

১। হরিবলা হরিবোল
বলহরি হরিবোল
শ্মশানে চ হরিবোল
বুড়া মর্‌ছে হরিবোল
বলহরি হরিবোল

২। বলহরি হরিবোল
আবার বল হরিবোল
জোর্‌সে বল হরিবোল
হরিবলা হরিবোল

হাটের ভাষা ঃ ছড়াগুলির সংগ্রাহক অনিমা মাইতি দাস[৬৫] স্থান-নাচিন্দা।

১। দসে দস
টিপলে রস (লেবু দশটাকায় দশটা)

২। শেষ হয়্যালে
আর পাবনি
জড়া তিরিশ
গটে কুড়ি (ফুলকপি)

৩। ঢ্যাড়স পটল কড়ি
কিলো মাত্র কুড়ি

৪। মাউসিমনে আইস গো
চার গছার দাম পনর গো (শাকের আঁটি ৫টাকা করে একসঙ্গে নিলে ১৫ টাকা)

৫। পাঁচশ বারো কিলো কুড়ি
ঝিঙা লও ঝুড়ি ঝুড়ি

৬। চালের বস্তা বড়ো সস্তা
কম লিনে ষাইট্ বেশি। (একবস্তা অর্থাৎ ৬০ কিলো নিলে যা দাম তার চেয়ে কম নিলে ৬০ টাকা বেশি পড়বে)

আড্ডা, ঠাট্টা ও মজলিশের ভাষা ঃ ছড়াগুলির সংগ্রাহক ননীবালা বেরা,[৬৬] স্থান-লাক্ষী।

১। পেট করছি ভারি
কুন শালার ধারি

২। ভাতারের গাঁইঠে ধন রইনে
মাউগের নাম লক্ষ্মীপ্রিয়া

৩। আমি মরিঠি পানের তরে
গাঁড়্পসানে ঠাট্টা করে

৪। বারতি বার করছে

মুক্ করছে লেউল

রাইত পাইনে লিয়া বুসবে

এগ্‌রার দেউল

যাত্রার বিজ্ঞাপনের ভাষা ঃ ছড়াগুলির সংগ্রাহক বৃহস্পতি মণ্ডল, [৬৭] স্থান-অজানবাড়ি, খেজুরী।

১। তোমার ঠিকানা যাই হোক না

আমার দক্ষিণবঙ্গা

বাঁশগড়ার বাজারে হবে

ঠিকানা পশ্চিমবঙ্গা

২। নিমাই সন্ন্যাসী হইল

কাঁদে শচীর হিয়া

চারিদিকে শূন্য দ্যাখে

ওগো বিষ্ণুপ্রিয়া

৩। জীবন যখন রঙ্গামঞ্চ

বাসর হলো ভেলা

রামনগরের মোড়ে হবে

সিঁন্দুর নিয়ে খেলা

৯। মানচিত্র

মানচিত্র সংখ্যা -১

পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলের মানচিত্রের প্রতিলিপি

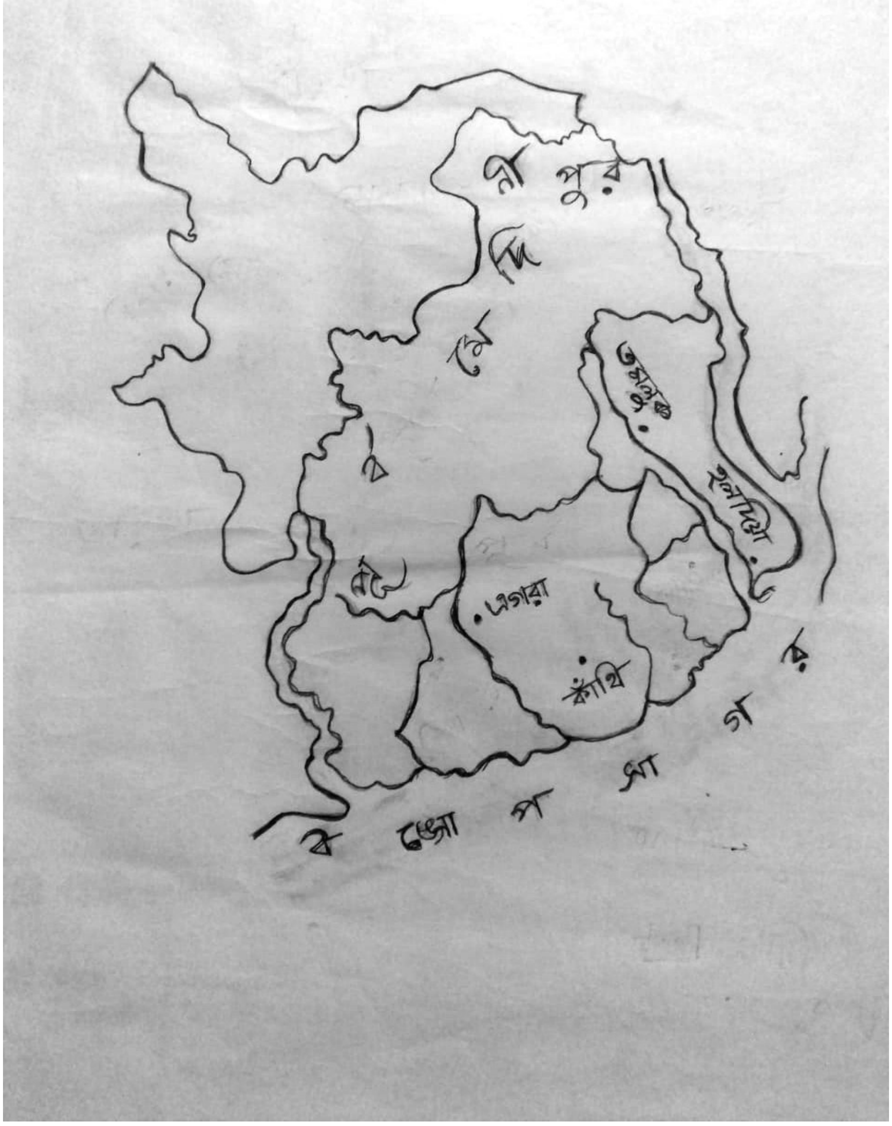

পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলের মানচিত্র। মানচিত্রটি গবেষিকা কর্তৃক অঙ্কিত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য গবেষণা অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-১, পৃ-১২২।

মানচিত্র সংখ্যা -১.ক

পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলের মানচিত্রের প্রতিলিপি

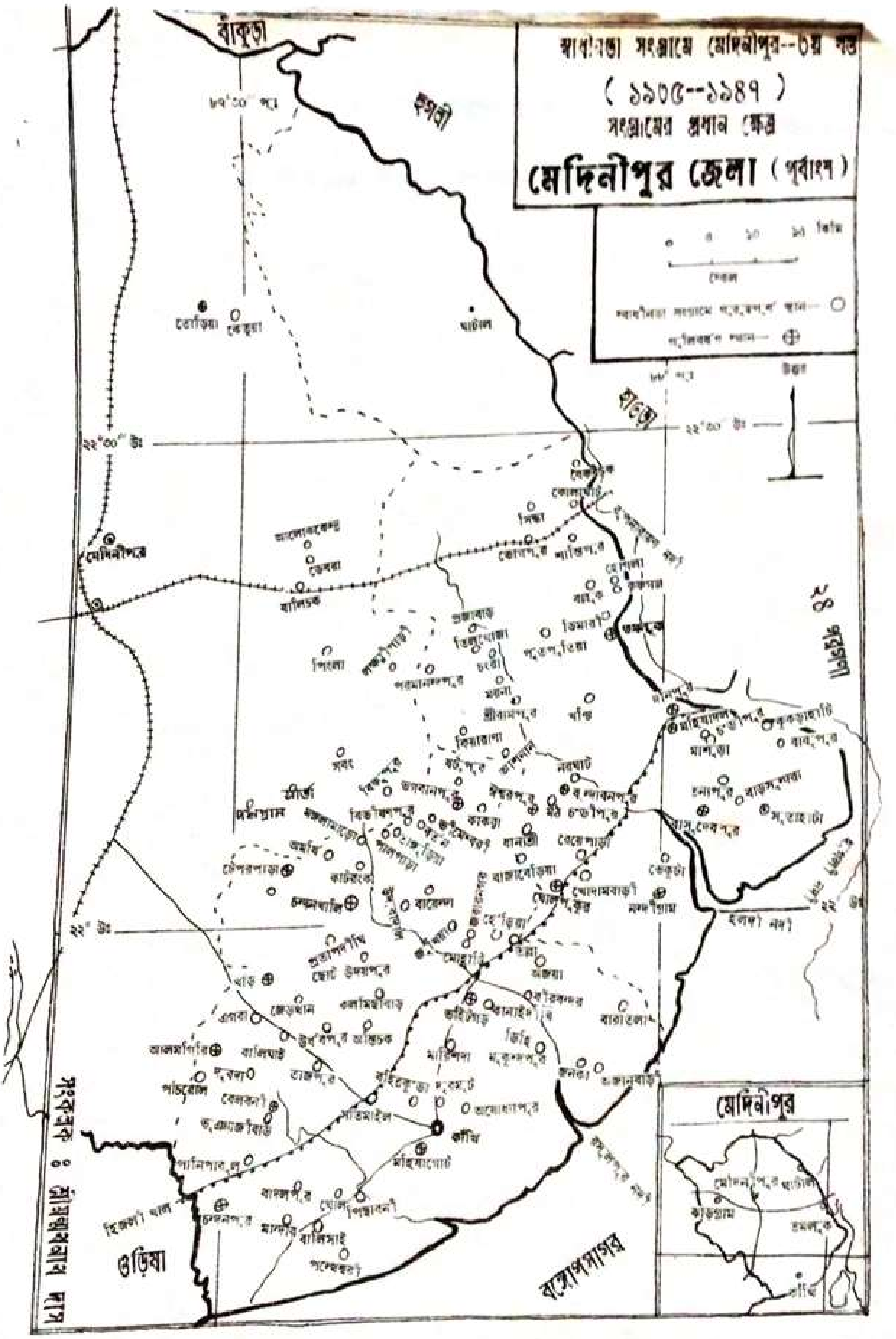

পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলের মানচিত্র। মানচিত্রটি B.L.L.R.O. Office Tamluk থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য গবেষণা অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-১, পৃ-১২২।

মানচিত্র সংখ্যা -১.খ

পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলের নির্দেশিকা মানচিত্রের প্রতিলিপি

পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলের নির্দেশিকা মানচিত্র। মানচিত্রটি B.L.L.R.O. Office Tamluk থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য গবেষণা অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-১, পৃ-১২২।

মানচিত্র সংখ্যা -২

পূর্ব মেদিনীপুরের নদী মানচিত্র। মানচিত্রটি অন্তর্জাল (Internet) থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য গবেষণা অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-২, পৃ-১২২।

মানচিত্র সংখ্যা -৩

পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলের সমুদ্র মানচিত্রের প্রতিলিপি

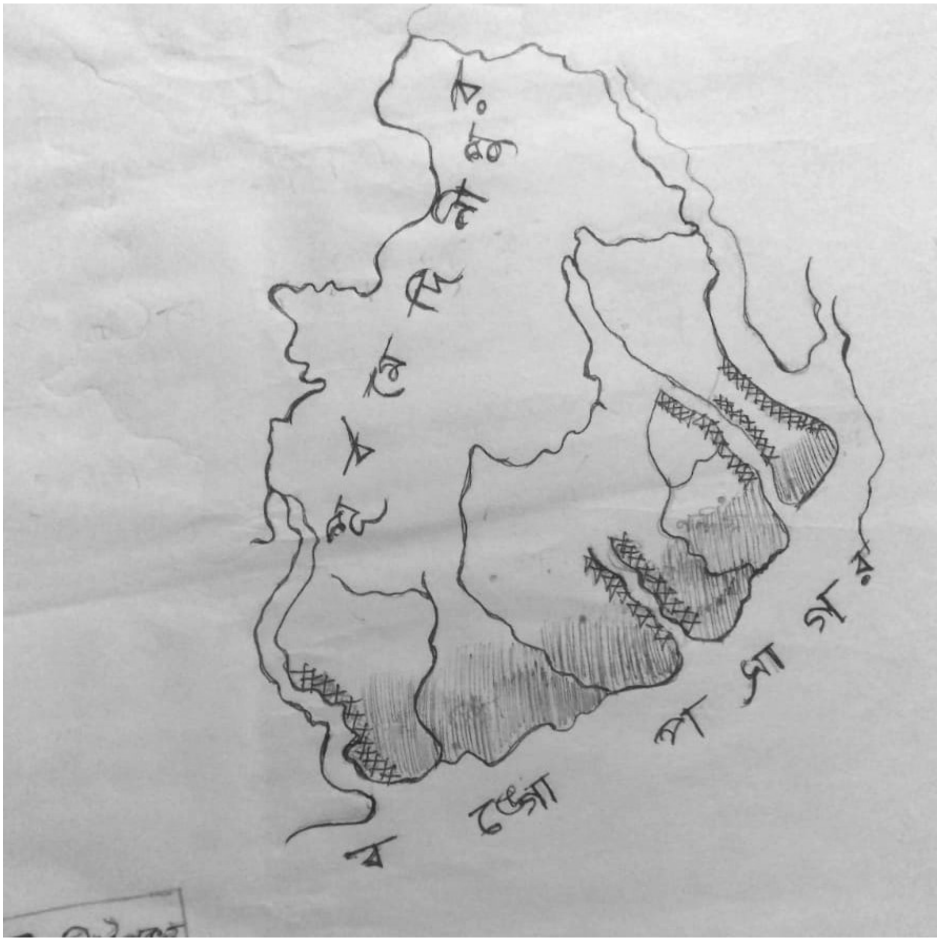

স্কেল অনুসারে অঙ্কিত নয়।

পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলের সমুদ্র মানচিত্র। মানচিত্রটি গবেষিকা কর্তৃক অঙ্কিত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য গবেষণা অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৩, পৃ-১২২।

মানচিত্র সংখ্যা -৪

পূর্ব মেদিনীপুর উপকূলীয় অঞ্চলের মহকুমা মানচিত্রের প্রতিলিপি

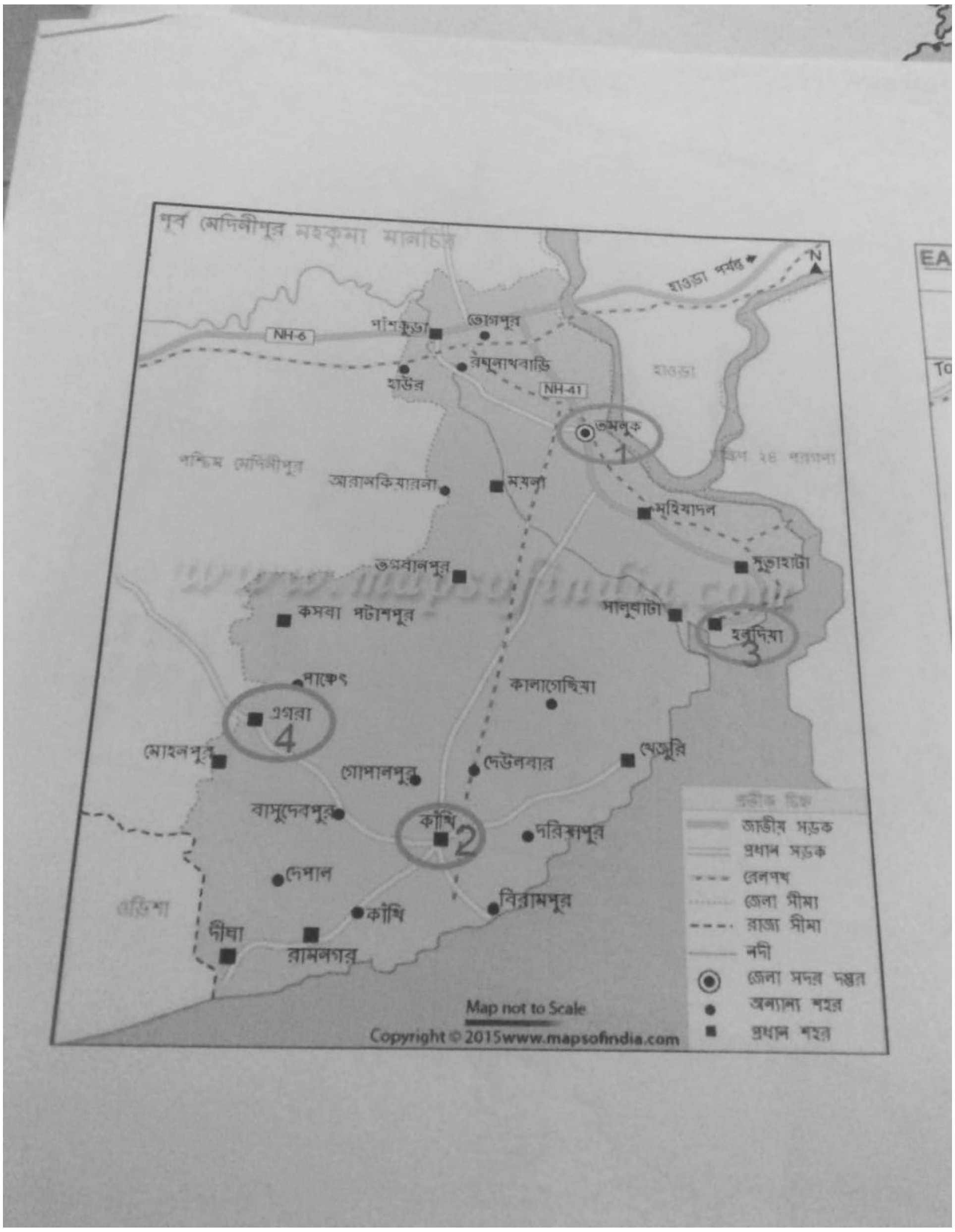

স্কেল অনুসারে অঙ্কিত নয়।

পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলের মহকুমা মানচিত্র। মানচিত্রটি অন্তর্জাল (Internet) থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য গবেষণা অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৪, পৃ-১২২।

মানচিত্র সংখ্যা -৪.ক

পুর্ব মেদিনীপুর উপকূলীয় অঞ্চলের কাঁথি মহকুমার মানচিত্রের প্রতিলিপি

চিত্রটি কাঁথি মহকুমার মানচিত্র। মানচিত্রটি অন্তর্জাল (Internet) থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য গবেষণা অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৪, পৃ-১২২।

মানচিত্র সংখ্যা -৪.খ

পূর্ব মেদিনীপুর উপকূলীয় অঞ্চলের তমলুক মহকুমার মানচিত্রের প্রতিলিপি

চিত্রটি তমলুক মহকুমার মানচিত্র। মানচিত্রটি অন্তর্জাল (Internet) থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য গবেষণা অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৪, পৃ-১২২ ।

১০। সাক্ষাৎকার

ঃ সাক্ষাৎকার ঃ

ঐতিহ্যবাহী ছড়া বাহকের সাক্ষাৎকারগুলি কাঁথি, এগরা, হলদিয়া, তমলুক মহকুমায় বসবাসকারী জনসাধারণের কাছ থেকে সংগৃহীত। আমরা একাধিক ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করলেও গবেষণা অভিসন্দর্ভের ব্যাপ্তির কথা ভেবে বক্ষ্যমাণ অধ্যায়ে মাত্র পঁয়ত্রিশ (৩৫)টি সাক্ষাৎকার সম্বলিত তথ্যাবলী সংযোজন করেছি।

ক্ষেত্রসমীক্ষা লব্ধ তথ্য এবং ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকার – ৯
(Fieldwork Data and Traditional Bearer's Interview)

১. ঐতিহ্যবাহী বাহকের পরিচিতি ঃ

ক. নাম ঃ ডঃ প্রসূনেন্দুবিকাশ জানা

খ. গ্রাম ঃ কুমিরদা

গ. মহকুমা ঃ কাঁথি

ঘ. বয়স ঃ ৭১

ঙ. পেশা ঃ অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক

চ. লিঙ্গ ঃ পুরুষ

ছ. বিবাহিত / অবিবাহিত ঃ বিবাহিত

জ. শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এম.এ; এম.ফিল্

ঝ. জাতি ঃ হিন্দু

ঞ. বর্ণ ঃ মাহিষ্য

ট. জীবিত / মৃত ঃ জীবিত

ঠ. সংগ্রহের তারিখ ঃ ২১।০৬।২০১৪

২. ঐতিহ্যবাহী বাহকের প্রতিচ্ছবি ঃ

স্বাক্ষর ঃ ডঃ প্রসূনেন্দুবিকাশ জানা

তারিখ ঃ ২৪।০৭।২০২০

৩. ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকারজনিত প্রশ্নোত্তর ঃ

ক. হ্যাঁ / না ঃ প্রশ্ন ঃ ছড়া কি আগামীদিনে রচিত হবে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ

খ. ঠিক / বেঠিক ঃ প্রশ্ন ঃ ছড়া নিয়ে ব্যাপকভাবে চর্চা করা — এসব কি প্রকৃত ঠিক হচ্ছে?

উত্তর ঃ ঠিক

গ. বিবরণধর্মী ঃ প্রশ্ন ঃ আপনার মতে উপকূলীয় অঞ্চলের ছড়া কিভাবে আন্তর্জাতিকতা লাভ করেছে?

উত্তর ঃ মানুষের মধ্যে জগতজোড়া ঐক্য আছে। বিশেষতঃ মনুষ্যত্বের দিকে স্নেহ, বন্ধুতা, প্রেম, সমত্ববোধ — এ-সবের মৌল ভূমি কর্ষিত হয় মানুষেরই হৃদয়ে। ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, লোকনাট্য — এ-সবের মৌখিক রচনা ও চর্চার মধ্যে গড়ে ওঠে বিশ্বজনীন ঐক্য, আন্তর্জাতিক বোধসমূহ।

ঘ. মতামত ঃ

এই ছড়া সংগ্রহের কাজ বেশ সজীব এবং প্রাণবান। কেবল জীববৃত্তি-পালনই মানুষের ধর্ম নয়; হৃদয়যুক্ত বিনোদন, আনন্দ, হাসি-গান — ইত্যাদি অবস্তুগত জীবনস্পন্দন বরাবর অব্যাহত থাকবে। এই কাজে এগিয়ে আসবেন ভবিষ্যতের উৎসাহী গবেষক এবং সংগ্রাহকবৃন্দ। তাঁরা সংগ্রহ করবেন, এই সূত্রে প্রস্তুত হয়ে যাবে লোকসাহিত্য সংগ্রহের ঐতিহাসিক ধারা।

ক্ষেত্রসমীক্ষা লব্ধ তথ্য এবং ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকার – ২
(Fieldwork Data and Traditional Bearer's Interview)

১. ঐতিহ্যবাহী বাহকের পরিচিতি ঃ

ক. নাম ঃ আরতি মান্না মাইতি।

খ. গ্রাম ঃ মধুসূদন চক্

গ. মহকুমা ঃ কাঁথি

ঘ. বয়স ঃ ৭৪

ঙ. পেশা ঃ প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা (প্রাইমারী)

চ. লিঙ্গ ঃ মহিলা

ছ. বিবাহিত / অবিবাহিত ঃ বিধবা।

জ. শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চ মাধ্যমিক।

ঝ. জাতি ঃ হিন্দু

ঞ. বর্ণ ঃ মাহিষ্য

ট. জীবিত / মৃত ঃ জীবিত

ঠ. সংগ্রহের তারিখ ঃ ৩.৬.২০০৭

২. ঐতিহ্যবাহী বাহকের প্রতিচ্ছবি ঃ

স্বাক্ষর ঃ আরতি মান্না মাইতি।

তারিখ ঃ ২০.০২.২০

৩. ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকারজনিত প্রশ্নোত্তর ঃ

ক. হ্যাঁ / না ঃ প্রশ্ন ঃ ছড়া শোনাতে ভালো লাগে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ

খ. ঠিক / বেঠিক ঃ প্রশ্ন ঃ ছড়া চর্চা হওয়া কি ঠিক?

উত্তর ঃ ঠিক

গ. বিবরণধর্মী ঃ প্রশ্ন ঃ ছড়া ভালো লাগে কেন?

উত্তর ঃ ছড়াগুলোর মধ্যে আনন্দ থাকে।

ঘ. মতামত ঃ ছড়া হোক আরও চর্চা হোক।

ক্ষেত্রসমীক্ষা লব্ধ তথ্য এবং ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকার – ৬
(Fieldwork Data and Traditional Bearer's Interview)

১. ঐতিহ্যবাহী বাহকের পরিচিতি ঃ

ক. নাম ঃ বিভাস মাইতি,
খ. গ্রাম ঃ শেরপুর তেলেঙ্গাবাড়ি,
গ. মহকুমা ঃ কাঁথি,
ঘ. বয়স ঃ ৫২
ঙ. পেশা ঃ চাকুরীজীবী,
চ. লিঙ্গ ঃ পুরুষ,
ছ. বিবাহিত / অবিবাহিত ঃ বিবাহিত,
জ. শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এম.কম.
ঝ. জাতি ঃ হিন্দু,
ঞ. বর্ণ ঃ মাহিষ্য
ট. জীবিত / মৃত ঃ জীবিত,
ঠ. সংগ্রহের তারিখ ঃ ০৩/০৪/২০১৪

২. ঐতিহ্যবাহী বাহকের প্রতিচ্ছবি ঃ

স্বাক্ষর ঃ বিভাস মাইতি,
তারিখ ঃ ১০/১০/২০২০।

৩. ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকারজনিত প্রশ্নোত্তর ঃ

ক. হ্যাঁ / না ঃ প্রশ্ন ঃ আপনি ছড়া বলেন?
উত্তর ঃ হ্যাঁ,

খ. ঠিক / বেঠিক ঃ প্রশ্ন ঃ ছড়ার মধ্যে অল্প কথায় অনেক কথা বলা – একথা কি ঠিক?
উত্তর ঃ ঠিক,

গ. বিবরণধর্মী ঃ প্রশ্ন ঃ লোকছড়া কবে থেকে শুনছেন, এবং তা কেন চর্চা করেন?
উত্তর ঃ আমাদের ছোটবেলা থেকে আমরা সমাজের বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে নানা কথা বলার সময় বা গল্প-আড্ডা করার সময় যে সব লোকছড়া শুনি তা আমাদের মনকে খুব আনন্দ দেয়।

ঘ. মতামত ঃ আগে মানুষের গল্প আড্ডা করার অনেক সময় থাকতো, কিন্তু বর্তমানে মানুষ অধিক কর্মব্যস্ত হয়ে পড়ায়, তাই লোকছড়া ও লোকঐতিহ্য গুলি ধীরে ধীরে সমাজ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। আমাদের উচিত এই লোকঐতিহ্য গুলিকে চর্চার মাধ্যমে বাঁচিয়ে রাখা। বর্তমান প্রজন্ম এবং লোকছড়া গুলোকে ধরে রাখা তার তাদের জন্য বা ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য নি, এককথায় আমাদের উচিত অন্যান্য সাহিত্যের মতো এগুলির চর্চা করা,

ক্ষেত্রসমীক্ষা লব্ধ তথ্য এবং ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকার – ৪
(Fieldwork Data and Traditional Bearer's Interview)

১. ঐতিহ্যবাহী বাহকের পরিচিতি ঃ

ক. নাম ঃ নিকুঞ্জ বেরা (ময়রা)

খ. গ্রাম ঃ সাখী

গ. মহকুমা ঃ কাঁথি

ঘ. বয়স ঃ ৭৪

ঙ. পেশা ঃ ময়রা

চ. লিঙ্গ ঃ পুংলিঙ্গ

ছ. বিবাহিত / অবিবাহিত ঃ বিবাহিত

জ. শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আ.প্র - পাস

ঝ. জাতি ঃ হিন্দু

ঞ. বর্ণ ঃ মাহিষ্য

ট. জীবিত / মৃত ঃ জীবিত

ঠ. সংগ্রহের তারিখ ঃ ৭/১০/২০ , ২৭/১২/২১

২. ঐতিহ্যবাহী বাহকের প্রতিচ্ছবি ঃ

স্বাক্ষর ঃ নিকুঞ্জ বেরা

তারিখ ঃ ০৭. ০৭. ২০২০

৩. ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকারজনিত প্রশ্নোত্তর ঃ

ক. হ্যাঁ / না ঃ প্রশ্ন ঃ আপনার নিজে অনেক ছড়া লেখেছি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ

খ. ঠিক / বেঠিক ঃ প্রশ্ন ঃ আপনি যে এ যায় কথায় ছড়া বলেন?

উত্তর ঃ ঠিক

গ. বিবরণধর্মী ঃ প্রশ্ন ঃ আপনার এত ছড়া মনে থাকে কী করে?

উত্তর ঃ আমরা গ্রামের সহজ সরল সাধারণ মানুষ। দৈনন্দিন জীবনের খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরা, ঘুমানো, গল্প করা, হাসি-ঠাট্টা, রাগ-অভিমান সবকিছুর মধ্যেই ছড়া রয়েছে এবং ছড়া চর্চা আদি অনন্তকালের, এর কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। মুখে মুখে শুনে শুনেই আমরা ছড়ার মুখে ভরপুর। সেইজন্যই আমরা স্মৃতিতে ধরে রেখেছি।

ঘ. মতামত ঃ ছড়া বলতে অনেক দুঃখ ভুলে থাকা যায়, এগুলো আমাদের হাসির খোরাক। সহজসরল শিশুর মতো ছড়াগুলো অনাবিল চিরন্তন। এগুলো আমাদের আগামীতেও থাকবে।

ক্ষেত্রসমীক্ষা লব্ধ তথ্য এবং ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকার – ৫
(Fieldwork Data and Traditional Bearer's Interview)

১. ঐতিহ্যবাহী বাহকের পরিচিতি ঃ

ক. নাম ঃ মাধব সামন্ত

খ. গ্রাম ঃ কুঞ্জপুর

গ. মহকুমা ঃ কাঁথি

ঘ. বয়স ঃ ৪০

ঙ. পেশা ঃ চাকুরিজীবি (শিক্ষাকর্মী)

চ. লিঙ্গ ঃ পুরুষ

ছ. বিবাহিত / অবিবাহিত ঃ বিবাহিত

জ. শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চ-মাধ্যমিক

ঝ. জাতি ঃ হিন্দু

ঞ. বর্ণ ঃ মাহিষ্য

ট. জীবিত / মৃত ঃ জীবিত

ঠ. সংগ্রহের তারিখ ঃ ০১.০৭.২০১২

২. ঐতিহ্যবাহী বাহকের প্রতিচ্ছবি ঃ

স্বাক্ষর ঃ মাধব সামন্ত

তারিখ ঃ ২০.১১.২০

৩. ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকারজনিত প্রশ্নোত্তর ঃ

ক. হ্যাঁ / না ঃ প্রশ্ন ঃ – ছড়া বলা কি ~~অ~~ তোমার প্রিয় বিষয়?

উত্তর ঃ হ্যাঁ

খ. ঠিক / বেঠিক ঃ প্রশ্ন ঃ 'নন্দিনী রায়' কাহিনী ছড়াটি কি ঠিক?

উত্তর ঃ ঠিক

গ. বিবরণধর্মী ঃ প্রশ্ন ঃ ছড়া কেন বলব?

উত্তর ঃ জীবনের সাথে ছড়া জড়িত, বাচ্চাদের কাছে ঘর করতে পারি। ঘরের কাছে চাকরি করতে পারি — ছড়া থেকেই আমরা এবং পরবর্তী প্রজন্ম ঐতিহ্যশিক্ষা পাবে,

ঘ. মতামত ঃ ছড়া চর্চা থামানো যাবে না, এ চলতে থাকবে এবং চলবে,

ক্ষেত্রসমীক্ষা লব্ধ তথ্য এবং ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকার ~৬
(Fieldwork Data and Traditional Bearer's Interview)

১. ঐতিহ্যবাহী বাহকের পরিচিতি ঃ

ক. নাম ঃ সিন্ধু মহাপাত্র

খ. গ্রাম ঃ মৈতানা

গ. মহকুমা ঃ কাঁথি

ঘ. বয়স ঃ ৫১

ঙ. পেশা ঃ শিক্ষিকা

চ. লিঙ্গ ঃ মহিলা

ছ. বিবাহিত / অবিবাহিত ঃ বিবাহিত

জ. শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বাংলা এম.এ, বি.এড

ঝ. জাতি ঃ হিন্দু

ঞ. বর্ণ ঃ ব্রাহ্মণ

ট. জীবিত / মৃত ঃ জীবিত

ঠ. সংগ্রহের তারিখ ঃ ০৭.০২.২০০৯, ২৩.০২.২০১১

২. ঐতিহ্যবাহী বাহকের প্রতিচ্ছবি ঃ

স্বাক্ষর ঃ সিন্ধু মহাপাত্র

তারিখ ঃ ০৩.১০.২০২৩

৩. ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকারজনিত প্রশ্নোত্তর ঃ

ক. হ্যাঁ / না ঃ প্রশ্ন ঃ আপনি কি শিক্ষিকা?

উত্তর ঃ হ্যাঁ

খ. ঠিক / বেঠিক ঃ প্রশ্ন ঃ আপনার পেশার সঙ্গে এই লোকছড়ার যোগ আছে, ঠিক না বেঠিক?

উত্তর ঃ ঠিক

গ. বিবরণধর্মী ঃ প্রশ্ন ঃ ছড়া একসঙ্গে কতগুলো মুখস্থ বলতে পারবেন?

উত্তর ঃ অন্তত ১০-১৫ টা ছড়া আমি একসঙ্গে বলতে পারব।

ঘ. মতামত ঃ ছড়া অনন্য বিষয়, যা আমাদের অতীত স্মৃতি জাগরিত করে।

ক্ষেত্রসমীক্ষা লব্ধ তথ্য এবং ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকার – ৭
(Fieldwork Data and Traditional Bearer's Interview)

১. ঐতিহ্যবাহী বাহকের পরিচিতি ঃ

ক. নাম ঃ অমিতা মাইতি

খ. গ্রাম ঃ টিকাপুর

গ. মহকুমা ঃ হলদিয়া

ঘ. বয়স ঃ 44

ঙ. পেশা ঃ গৃহবধূ

চ. লিঙ্গ ঃ মহিলা

ছ. বিবাহিত / অবিবাহিত ঃ বিবাহিতা

জ. শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চ মাধ্যমিক

ঝ. জাতি ঃ হিন্দু

ঞ. বর্ণ ঃ মাহিষ্য

ট. জীবিত / মৃত ঃ

ঠ. সংগ্রহের তারিখ ঃ ৩।১২।২০২৩

২. ঐতিহ্যবাহী বাহকের প্রতিচ্ছবি ঃ

স্বাক্ষর ঃ অমিতা মাইতি

তারিখ ঃ ০৩/১২/২০২৩

৩. ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকারজনিত প্রশ্নোত্তর ঃ

ক. হ্যাঁ / না ঃ প্রশ্ন ঃ আপনার বাড়ীতে লোক ছড়া চর্চা হয়?

উত্তর ঃ হ্যাঁ।

খ. ঠিক / বেঠিক ঃ প্রশ্ন ঃ ঘুমপাড়ানি ছড়া বলতে আপনি খুব পছন্দ করেন?

উত্তর ঃ ঠিক

গ. বিবরণধর্মী ঃ প্রশ্ন ঃ আপনি যে গৃহবধূ লোকছড়া কিভাবে জানলেন?

উত্তর ঃ লোকছড়া শুনতে ভালোলাগে, আগে আগে বয়স্ক মানুষের মুখে কথায় কথায় এগুলো শুনতে পেতাম, এই লোককথাগুলি নাটক থিয়েটার, সমাজ যত দিনের পর দিন আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে।

ঘ. মতামত ঃ

• – আমাদের উচিত এই লোকছড়াগুলি বেশী করে চর্চা করা।

ক্ষেত্রসমীক্ষা লব্ধ তথ্য এবং ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকার – ৮

(Fieldwork Data and Traditional Bearer's Interview)

১. ঐতিহ্যবাহী বাহকের পরিচিতি ঃ

ক. নাম ঃ শ্রী [illegible] শেখ,

খ. গ্রাম ঃ [illegible],

গ. মহকুমা ঃ কাঁথি

ঘ. বয়স ঃ ৪৬

ঙ. পেশা ঃ কৃষিজীবী,

চ. লিঙ্গ ঃ পুরুষ,

ছ. বিবাহিত / অবিবাহিত ঃ বিবাহিত,

জ. শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক,

ঝ. জাতি ঃ হিন্দু

ঞ. বর্ণ ঃ মাহিষ্য,

ট. জীবিত / মৃত ঃ জীবিত

ঠ. সংগ্রহের তারিখ ঃ ০২/০৯/২০১৩, ০৪/০৭/২০১৮.

২. ঐতিহ্যবাহী বাহকের প্রতিচ্ছবি ঃ

স্বাক্ষর ঃ শ্রী [illegible]

তারিখ ঃ ১১/১০/2020.

৩. ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকারজনিত প্রশ্নোত্তর ঃ

ক. হ্যাঁ / না ঃ প্রশ্ন ঃ আপনার দাদু-ঠাকুমারা কি ছড়া বলত?

উত্তর ঃ হ্যাঁ।

খ. ঠিক / বেঠিক ঃ প্রশ্ন ঃ শুনেছি আপনি নাকি অনর্গল লোকছড়া বলতে পারেন?

উত্তর ঃ ঠিক,

গ. বিবরণধর্মী ঃ প্রশ্ন ঃ লোকছড়াকে আপনি কিভাবে চর্চা এবং ভালোবাসেন?

উত্তর ঃ [illegible] আমি সবসময় ছড়া বলি তবে [illegible] – সব থেকে [illegible] লোকছড়া প্রয়োগ করতে পারি, [illegible] কথা বলতে বলতে লোকছড়া [illegible] করে তাহলে সে যেন খুব আনন্দ পায়।

ঘ. মতামত ঃ আমরা যারা লোকছড়া বলতে পারি, আমাদের উচিত বাড়ির ছোটদের মাঝে এই ছড়াগুলো বলা, যাতে পরবর্তী প্রজন্ম এই [illegible] [illegible] ও বাঁচিয়ে রাখে।

ক্ষেত্রসমীক্ষা লব্ধ তথ্য এবং ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকার — ৯

(Fieldwork Data and Traditional Bearer's Interview)

১. ঐতিহ্যবাহী বাহকের পরিচিতি ঃ বাড়ীর সদস্য দ্বারা লিখিত :

ক. নাম ঃ সন্ধ্যা রানী বেরা

খ. গ্রাম ঃ কমলপুর

গ. মহকুমা ঃ হলদিয়া

ঘ. বয়স ঃ ৬১

ঙ. পেশা ঃ গৃহবধূ

চ. লিঙ্গ ঃ স্ত্রীলিঙ্গ

ছ. বিবাহিত / অবিবাহিত ঃ বিধবা

জ. শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অষ্টম শ্রেণী

ঝ. জাতি ঃ হিন্দু

ঞ. বর্ণ ঃ মাহিষ্য

ট. জীবিত / মৃত ঃ মৃত

ঠ. সংগ্রহের তারিখ ঃ ~~২০~~ ২৭/১০/২০১১

২. ঐতিহ্যবাহী বাহকের প্রতিচ্ছবি ঃ

ছবি উদ্ধার করা যায়নি,

স্বাক্ষর ঃ

তারিখ ঃ

৩. ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকারজনিত প্রশ্নোত্তর ঃ বর্তমান প্রয়াত হয়েছেন বলে সাক্ষাৎকার অসম্পূর্ণ থেকে গেছে।

ক. হ্যাঁ / না ঃ প্রশ্ন ঃ

উত্তর ঃ

খ. ঠিক / বেঠিক ঃ প্রশ্ন ঃ

উত্তর ঃ

গ. বিবরণধর্মী ঃ প্রশ্ন ঃ

উত্তর ঃ

ঘ. মতামত ঃ

ক্ষেত্রসমীক্ষা লব্ধ তথ্য এবং ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকার – ১০
(Fieldwork Data and Traditional Bearer's Interview)

১. ঐতিহ্যবাহী বাহকের পরিচিতি ঃ

ক. নাম ঃ প্রতিমা নায়ক

খ. গ্রাম ঃ কুলবুড়ি

গ. মহকুমা ঃ কাঁথি

ঘ. বয়স ঃ ৫৭

ঙ. পেশা ঃ গৃহবধূ

চ. লিঙ্গ ঃ মহিলা

ছ. বিবাহিত / অবিবাহিত ঃ বিবাহিত

জ. শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চ মাধ্যমিক

ঝ. জাতি ঃ হিন্দু

ঞ. বর্ণ ঃ একাদশ তিলি

ট. জীবিত / মৃত ঃ জীবিত

ঠ. সংগ্রহের তারিখ ঃ ২১. ৮. ২০১৭

২. ঐতিহ্যবাহী বাহকের প্রতিচ্ছবি ঃ

স্বাক্ষর ঃ প্রতিমা নায়ক

তারিখ ঃ ১৮. ৭. ২০১৭

৩. ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকারজনিত প্রশ্নোত্তর ঃ

ক. হ্যাঁ / না ঃ প্রশ্ন ঃ ছড়া কি ছোটো থেকে শুনে আসছেন ?

উত্তর ঃ হ্যাঁ

খ. ঠিক / বেঠিক ঃ প্রশ্ন ঃ এই যে এগুলির চর্চা হচ্ছে, তা কি ঠিক হচ্ছে ?

উত্তর ঃ ঠিক

গ. বিবরণধর্মী ঃ প্রশ্ন ঃ কখন বেশি ছড়া বলেন ?

উত্তর ঃ এখন বিকালে আড্ডা বসে, তখন,

ঘ. মতামত ঃ ছড়া বলতে দারুণ লাগে,

ক্ষেত্রসমীক্ষা লব্ধ তথ্য এবং ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকার – ১১
(Fieldwork Data and Traditional Bearer's Interview)

১. ঐতিহ্যবাহী বাহকের পরিচিতি ঃ লেখিকা কর্তৃক লিখিত :

ক. নাম ঃ সন্ধ্যারানী রানা
খ. গ্রাম ঃ পুর্বচক
গ. মহকুমা ঃ কাঁথি
ঘ. বয়স ঃ ৭০
ঙ. পেশা ঃ গৃহবধু
চ. লিঙ্গ ঃ মহিলা
ছ. বিবাহিত / অবিবাহিত ঃ বিধবা
জ. শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নিরক্ষর
ঝ. জাতি ঃ হিন্দু
ঞ. বর্ণ ঃ মাহিষ্য
ট. জীবিত / মৃত ঃ জীবিত
ঠ. সংগ্রহের তারিখ ঃ ২২, ৭, ২০১৫

২. ঐতিহ্যবাহী বাহকের প্রতিচ্ছবি ঃ

স্বাক্ষর ঃ

তারিখ ঃ ২২,১১,২০২০

৩. ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকারজনিত প্রশ্নোত্তর ঃ

ক. হ্যাঁ / না ঃ প্রশ্ন ঃ ছড়া বলতে কি ভালো লাগে?
উত্তর ঃ হ্যাঁ

খ. ঠিক / বেঠিক ঃ প্রশ্ন ঃ তুমি কি ঠিক জানো, তোমার দাদু - ঠাকুমা, তারাও ছড়া বলত?
উত্তর ঃ ঠিক জানি না.

গ. বিবরণধর্মী ঃ প্রশ্ন ঃ ছড়া কখন বল?
উত্তর ঃ যখন কথা বলি, কথা বলতে বলতে, কথার মিল আছে এমন ছড়া মনে আসে, তাই বলি

ঘ. মতামত ঃ এগুলো এখন তেমন চর্চা হয় না, কিন্তু আমাদের মতো গ্রামের সাধারণ মানুষ আজও ছড়া বলি, আমাদের ভালো লাগে.

ক্ষেত্রসমীক্ষা লব্ধ তথ্য এবং ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকার – ১২
(Fieldwork Data and Traditional Bearer's Interview)

১. ঐতিহ্যবাহী বাহকের পরিচিতি ঃ
- ক. নাম ঃ সুচরিতা বর্মন
- খ. গ্রাম ঃ বারানিধি
- গ. মহকুমা ঃ এগরা
- ঘ. বয়স ঃ ৩০
- ঙ. পেশা ঃ শিক্ষিকা
- চ. লিঙ্গ ঃ মহিলা
- ছ. বিবাহিত / অবিবাহিত ঃ অবিবাহিত
- জ. শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ~~এম.এ.~~ এম.এ., বি.এড,
- ঝ. জাতি ঃ হিন্দু
- ঞ. বর্ণ ঃ S.C.
- ট. জীবিত / মৃত ঃ জীবিত
- ঠ. সংগ্রহের তারিখ ঃ ২৮.৭.২০২৪

২. ঐতিহ্যবাহী বাহকের প্রতিচ্ছবি ঃ

স্বাক্ষর ঃ সুচরিতা বর্মন

তারিখ ঃ ৩.১০.২০

৩. ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকারজনিত প্রশ্নোত্তর ঃ

ক. হ্যাঁ / না ঃ প্রশ্ন ঃ তুমি কি শিক্ষিকা?

উত্তর ঃ হ্যাঁ।

খ. ঠিক / বেঠিক ঃ প্রশ্ন ঃ শুনেছি তুমি নাকি ছড়া বলতে ভালোবাসো?

উত্তর ঃ ঠিক।

গ. বিবরণধর্মী ঃ প্রশ্ন ঃ তুমি কি এখনকার, তোমার ছড়া কেমন লাগে?

উত্তর ঃ ছড়া তো দারুন লাগে, যারা আরো বেশি বেশি বলে, মনে হয় তাদের কাছে বসে থাকি।

ঘ. মতামত ঃ আমরা জানি তবে বড়রা, বুড়ো-মানুষরা আরও ভালো বলে।

ক্ষেত্রসমীক্ষা লব্ধ তথ্য এবং ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকার – ১৬
(Fieldwork Data and Traditional Bearer's Interview)

১. ঐতিহ্যবাহী বাহকের পরিচিতি ঃ

ক. নাম ঃ অমিয় কুমার মাপ্পা

খ. গ্রাম ঃ পেঙ্গুয়া

গ. মহকুমা ঃ এগরা

ঘ. বয়স ঃ ৮৫

ঙ. পেশা ঃ অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক,

চ. লিঙ্গ ঃ পুরুষ

ছ. বিবাহিত / অবিবাহিত ঃ বিবাহিত

জ. শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বি এস সি, বি এড,

ঝ. জাতি ঃ হিন্দু

ঞ. বর্ণ ঃ মাহিষ্য

ট. জীবিত / মৃত ঃ জীবিত

ঠ. সংগ্রহের তারিখ ঃ ২৭/০৯/২০১৬

২. ঐতিহ্যবাহী বাহকের প্রতিচ্ছবি ঃ

স্বাক্ষর ঃ অমিয় কুমার মাপ্পা,

তারিখ ঃ ০৩/১২/২০২০

৩. ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকারজনিত প্রশ্নোত্তর ঃ

ক. হ্যাঁ / না ঃ প্রশ্ন ঃ ছড়া বলতে ভালো লাগে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ

খ. ঠিক / বেঠিক ঃ প্রশ্ন ঃ ছড়া নিয়ে গবেষণা হচ্ছে — তা কি ঠিক হচ্ছে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ ঠিক হচ্ছে,

গ. বিবরণধর্মী ঃ প্রশ্ন ঃ কবে থেকে আপনি ছড়া শুনে আসছেন?

উত্তর ঃ আমি আমার ছোটবেলা থেকে ছড়া শুনে আসছি, ছোটবেলায় আমার মা, বাবা দাদু দিদার মুখেও ছড়া বলতে শুনেছি, এ গুলো মুখে মুখে বলা হত, আমরা সেভাবে বলে আসছি,

ঘ. মতামত ঃ এ গুলো শুনতে খুব ভালো লাগে, ছড়া চর্চা সে ভাবে শোনা যায় না, আমরা বয়স্করা যারা জানি, এখন কিছু কিছু বলি, তবে সকলে বলতে পারলে ভালো লাগে,

ক্ষেত্রসমীক্ষা লব্ধ তথ্য এবং ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকার — ১৪
(Fieldwork Data and Traditional Bearer's Interview)

১. ঐতিহ্যবাহী বাহকের পরিচিতি ঃ

ক. নাম ঃ শ্রী রত্তন হাজরা,
খ. গ্রাম ঃ চন্দন নগর
গ. মহকুমা ঃ হলদিয়া,
ঘ. বয়স ঃ ৭৬,
ঙ. পেশা ঃ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক (প্রাথমিক)
চ. লিঙ্গ ঃ পুরুষ,
ছ. বিবাহিত / অবিবাহিত ঃ বিবাহিত,
জ. শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বি.এ.
ঝ. জাতি ঃ হিন্দু
ঞ. বর্ণ ঃ সাধারণ
ট. জীবিত / মৃত ঃ জীবিত,
ঠ. সংগ্রহের তারিখ ঃ ২২/০৫/২০২০, ৮/৬/২০২১

২. ঐতিহ্যবাহী বাহকের প্রতিচ্ছবি ঃ

স্বাক্ষর ঃ শ্রী রত্তন হাজরা,
তারিখ ঃ ২০/০৯/২০২০.

৩. ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকারজনিত প্রশ্নোত্তর ঃ

ক. হ্যাঁ / না ঃ প্রশ্ন ঃ আপনি শিক্ষক এবং একসময়ের বড় নেতাও ছিলেন শুনেছি?
উত্তর ঃ হ্যাঁ

খ. ঠিক / বেঠিক ঃ প্রশ্ন ঃ এই অঞ্চলের সঙ্গে সংযোগের জন্যই কি প্রচুর ছড়া জেনেছেন?
উত্তর ঃ ঠিক

গ. বিবরণধর্মী ঃ প্রশ্ন ঃ আপনি বর্তমানের প্রজন্মকে এই নিয়ে কি বলতে চান?
উত্তর ঃ আমাদের সমসাময়িক বয়সের লোকেদের মধ্যে [illegible] বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা [illegible] বলে না, এই [illegible] কী আনন্দ [illegible] মাধ্যমে [illegible] টিকিয়ে রাখা।

ঘ. মতামত ঃ
এই ছড়ার মাধ্যমে আমরা জীবনকে খুঁজে পাই, তাই যতটুকু পারবো বলবো আর শুনবো [illegible] বর্তমান প্রজন্মকে [illegible] আরো এই [illegible] আনবে।

ক্ষেত্রসমীক্ষা লব্ধ তথ্য এবং ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকার - ১৫
(Fieldwork Data and Traditional Bearer's Interview)

১. ঐতিহ্যবাহী বাহকের পরিচিতি ঃ লেখিকা কর্তৃক লেখা :

ক. নাম ঃ ননীবালা বেরা

খ. গ্রাম ঃ শাঙ্কী

গ. মহকুমা ঃ কাঁথি

ঘ. বয়স ঃ ৭০

ঙ. পেশা ঃ গৃহবধূ

চ. লিঙ্গ ঃ মহিলা

ছ. বিবাহিত / অবিবাহিত ঃ বিবাহিত

জ. শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নিরক্ষর

ঝ. জাতি ঃ হিন্দু

ঞ. বর্ণ ঃ মাহিষ্য

ট. জীবিত / মৃত ঃ জীবিত

ঠ. সংগ্রহের তারিখ ঃ ০৬. ১২. ২০

২. ঐতিহ্যবাহী বাহকের প্রতিচ্ছবি ঃ

স্বাক্ষর ঃ

তারিখ ঃ ২৬.০৯.২০

৩. ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকারজনিত প্রশ্নোত্তর ঃ

ক. হ্যাঁ / না ঃ প্রশ্ন ঃ ছড়া এখনও বলেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ,

খ. ঠিক / বেঠিক ঃ প্রশ্ন ঃ ছড়াগুলোতে মুখেমুখে বলছেন? ঠিক বলছেন না ভুল বলছেন?

উত্তর ঃ ঠিক,

গ. বিবরণধর্মী ঃ প্রশ্ন ঃ আপনার ছোট বয়সে এগুলি সমাজের লোকজন বলত?

উত্তর ঃ হ্যাঁ বলত, তখনকার দিনে লোকজন কথায় কথায় ছড়া শোলোক, হেঁয়ালী বক্তি কইত, এখন আমারেও বলি, আমাদের নাতি-পুতিদের,

ঘ. মতামত ঃ ছড়া বলছি; ভালো লাগে, সবাই বললে ভালো হবে,

ক্ষেত্রসমীক্ষা লব্ধ তথ্য এবং ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকার – ২৬
(Fieldwork Data and Traditional Bearer's Interview)

১. ঐতিহ্যবাহী বাহকের পরিচিতি ঃ বাড়ির লোক কর্তৃক লিখিত:

ক. নাম ঃ অনন্ত পানিগ্রাহী

খ. গ্রাম ঃ কুঞ্জপুর

গ. মহকুমা ঃ কাঁথি

ঘ. বয়স ঃ ৭৫

ঙ. পেশা ঃ অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক

চ. লিঙ্গ ঃ পুংলিঙ্গ

ছ. বিবাহিত / অবিবাহিত ঃ বিবাহিত

জ. শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ সংস্কৃত এম.এ, বি.এড.

ঝ. জাতি ঃ হিন্দু ব্রাহ্মণ

ঞ. বর্ণ ঃ ব্রাহ্মণ

ট. জীবিত / মৃত ঃ মৃত

ঠ. সংগ্রহের তারিখ ঃ ২৬/৯/২০২০

২. ঐতিহ্যবাহী বাহকের প্রতিচ্ছবি ঃ

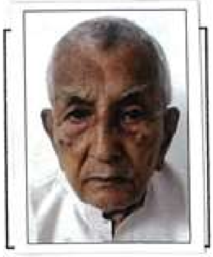

স্বাক্ষর ঃ

তারিখ ঃ

৩. ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকারজনিত প্রশ্নোত্তর ঃ বর্তমানে প্রয়াত হয়েছেন বলে সাক্ষাৎকার অসম্পূর্ণ থেকে গেছে।

ক. হ্যাঁ / না ঃ প্রশ্ন ঃ

উত্তর ঃ

খ. ঠিক / বেঠিক ঃ প্রশ্ন ঃ

উত্তর ঃ

গ. বিবরণধর্মী ঃ প্রশ্ন ঃ

উত্তর ঃ

ঘ. মতামত ঃ

ক্ষেত্রসমীক্ষা লব্ধ তথ্য এবং ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকার - ১৭
(Fieldwork Data and Traditional Bearer's Interview)

১. ঐতিহ্যবাহী বাহকের পরিচিতি ঃ

ক. নাম ঃ ইন্দুবালা মন্ডল

খ. গ্রাম ঃ হাটুরিয়া

গ. মহকুমা ঃ কাঁথি

ঘ. বয়স ঃ ৭২

ঙ. পেশা ঃ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা (মাধ্যমিক)

চ. লিঙ্গ ঃ মহিলা

ছ. বিবাহিত / অবিবাহিত ঃ বিবাহিতা

জ. শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এম. এ, বি.এড (ইংরাজি)

ঝ. জাতি ঃ হিন্দু

ঞ. বর্ণ ঃ মাহিষ্য

ট. জীবিত / মৃত ঃ জীবিত

ঠ. সংগ্রহের তারিখ ঃ ২৭. ০৯. ২০২২

২. ঐতিহ্যবাহী বাহকের প্রতিচ্ছবি ঃ

স্বাক্ষর ঃ ইন্দুবালা মন্ডল

তারিখ ঃ ০২. ১০. ২০

৩. ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকারজনিত প্রশ্নোত্তর ঃ

ক. হ্যাঁ / না ঃ প্রশ্ন ঃ আপনার বাড়ীতে অন্যান্য গান ছড়া বলেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ

খ. ঠিক / বেঠিক ঃ প্রশ্ন ঃ আপনার মতে ছড়া বলা ঠিক না বেঠিক?

উত্তর ঃ ঠিক

গ. বিবরণধর্মী ঃ প্রশ্ন ঃ কবে থেকে ছড়া বলছেন?

উত্তর ঃ ছোট্ট বয়স থেকে বিভিন্ন রকম ছড়া বলতে শিখেছি, এখনও বলি, কথায় কথায় বলা হয়ে যায়,

ঘ. মতামত ঃ ছড়া যে প্রাচীন সম্পদ, এগুলো আমাদের চর্চা করা উচিত।

ক্ষেত্রসমীক্ষা লব্ধ তথ্য এবং ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকার - ১৮
(Fieldwork Data and Traditional Bearer's Interview)

১. ঐতিহ্যবাহী বাহকের পরিচিতি : লেখিকা কর্তৃক লিখিত:

ক. নাম : অনিমা মাইতি দাস

খ. গ্রাম : বেন্যাবনি

গ. মহকুমা : কাঁথি

ঘ. বয়স : ৫০

ঙ. পেশা : গৃহবধূ

চ. লিঙ্গ : মহিলা

ছ. বিবাহিত / অবিবাহিত : বিবাহিত

জ. শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর

ঝ. জাতি : হিন্দু

ঞ. বর্ণ : মাহিষ্য

ট. জীবিত / মৃত : জীবিত

ঠ. সংগ্রহের তারিখ : ২২. ১২. ২০১৫

২. ঐতিহ্যবাহী বাহকের প্রতিচ্ছবি :

স্বাক্ষর :

তারিখ : ১০. ০২. ২০

৩. ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকারজনিত প্রশ্নোত্তর :

ক. হ্যাঁ / না : প্রশ্ন : ছড়া ভালো লাগে?

উত্তর : হ্যাঁ, খুব ভালো লাগে,

খ. ঠিক / বেঠিক : প্রশ্ন : 'খেলিয়ার দু-টানিয়া চাষ' এ ছড়াটির মানে কি ঠিক?

উত্তর : ঠিক

গ. বিবরণধর্মী : প্রশ্ন : তোমরা কখন বেশি ছড়া বল?

উত্তর : যখন তখন, ছড়া বলার সময় কোন ঠিক ঠিকানা নাই, কথা বলতে বলতে দু-একটা ছড়ার বলা হয়ে যায়,

ঘ. মতামত : ছোটবেলা থেকে শুনি, আমার খুব ভালো লাগে,

ক্ষেত্রসমীক্ষা লব্ধ তথ্য এবং ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকার - ১৭
(Fieldwork Data and Traditional Bearer's Interview)

১. ঐতিহ্যবাহী বাহকের পরিচিতি ঃ

ক. নাম ঃ তনুশ্রী মাইতি,

খ. গ্রাম ঃ মধুসুদনচক,

গ. মহকুমা ঃ কাঁথি

ঘ. বয়স ঃ ২০

ঙ. পেশা ঃ ছাত্রী

চ. লিঙ্গ ঃ মহিলা

ছ. বিবাহিত / অবিবাহিত ঃ অবিবাহিত

জ. শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ জি. এন. এম. ট্রেনিং

ঝ. জাতি ঃ হিন্দু

ঞ. বর্ণ ঃ মাহিষ্য,

ট. জীবিত / মৃত ঃ জীবিত,

ঠ. সংগ্রহের তারিখ ঃ ২২/০৭/২০১৫

২. ঐতিহ্যবাহী বাহকের প্রতিচ্ছবি ঃ

স্বাক্ষর ঃ তনুশ্রী মাইতি

তারিখ ঃ ২২/১০/২০

৩. ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকারজনিত প্রশ্নোত্তর ঃ

ক. হ্যাঁ / না ঃ প্রশ্ন ঃ ছোটো থেকে ছড়া বল?

উত্তর ঃ হ্যাঁ

খ. ঠিক / বেঠিক ঃ প্রশ্ন ঃ বেশির ভাগ ছড়া কি খেলার সময় বল?

উত্তর ঃ ঠিক

গ. বিবরণধর্মী ঃ প্রশ্ন ঃ এক - দুটো খেলার ছড়া বল?

উত্তর ঃ খেলতে গিয়ে আমরা খুব ছড়া বলি,
১। আতা পাতা তুলসী পাতা / যে হবে সে সবার রাজা,
২। আয়লারে আয়লা / জেঠি মাসের পইলা ......।

ঘ. মতামত ঃ ছড়া আমরা প্রায়ই বলি এবং আরো বলব।

ক্ষেত্রসমীক্ষা লব্ধ তথ্য এবং ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকার -২০
(Fieldwork Data and Traditional Bearer's Interview)

১. ঐতিহ্যবাহী বাহকের পরিচিতি ঃ বাড়ীর লোক কর্তৃক লিখিত :

ক. নাম ঃ বৃহস্পতি মন্ডল

খ. গ্রাম ঃ অজানবাড়ি

গ. মহকুমা ঃ কাঁন্দি

ঘ. বয়স ঃ ৭৮

ঙ. পেশা ঃ প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক (মাধ্যমিক)

চ. লিঙ্গ ঃ পুরুষ

ছ. বিবাহিত / অবিবাহিত ঃ বিবাহিত

জ. শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ইংরেজিতে এম.এ, বি.এড.

ঝ. জাতি ঃ হিন্দু

ঞ. বর্ণ ঃ S.C

ট. জীবিত / মৃত ঃ মৃত

ঠ. সংগ্রহের তারিখ ঃ ১০.০৬.২০১০

২. ঐতিহ্যবাহী বাহকের প্রতিচ্ছবি ঃ

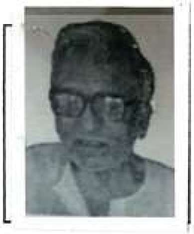

স্বাক্ষর ঃ

তারিখ ঃ

৩. ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকারজনিত প্রশ্নোত্তর ঃ বর্তমানে প্রয়াত হয়েছেন বলে সাক্ষাৎকার অসম্পূর্ণ থেকে গেছে।

ক. হ্যাঁ / না ঃ প্রশ্ন ঃ

উত্তর ঃ

খ. ঠিক / বেঠিক ঃ প্রশ্ন ঃ

উত্তর ঃ

গ. বিবরণধর্মী ঃ প্রশ্ন ঃ

উত্তর ঃ

ঘ. মতামত ঃ

ক্ষেত্রসমীক্ষা লব্ধ তথ্য এবং ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকার –২৯
(Fieldwork Data and Traditional Bearer's Interview)

১. ঐতিহ্যবাহী বাহকের পরিচিতি ঃ
- ক. নাম ঃ তুষার প্রধান,
- খ. গ্রাম ঃ টাউনশিপ,
- গ. মহকুমা ঃ হলদিয়া
- ঘ. বয়স ঃ ৫০
- ঙ. পেশা ঃ অবসর প্রাপ্ত জওয়ান কর্মী
- চ. লিঙ্গ ঃ পুরুষ
- ছ. বিবাহিত / অবিবাহিত ঃ বিবাহিত
- জ. শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বি.এ. পাশ
- ঝ. জাতি ঃ হিন্দু
- ঞ. বর্ণ ঃ মাহিষ্য
- ট. জীবিত / মৃত ঃ জীবিত
- ঠ. সংগ্রহের তারিখ ঃ ১২/১০/২০২১

২. ঐতিহ্যবাহী বাহকের প্রতিচ্ছবি ঃ

স্বাক্ষর ঃ তুষার প্রধান,

তারিখ ঃ ২৬/১০/২০২০

৩. ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকারজনিত প্রশ্নোত্তর ঃ
- ক. হ্যাঁ / না ঃ প্রশ্ন ঃ আপনি কি লোকসংগীতে চর্চা করেছেন?
  উত্তর ঃ হ্যাঁ
- খ. ঠিক / বেঠিক ঃ প্রশ্ন ঃ দধি রইলে জামাইর আদর / নাইলে জামাই গাধার আদর — কথাটা কি ঠিক?
  উত্তর ঃ ঠিক
- গ. বিবরণধর্মী ঃ প্রশ্ন ঃ ছোটবেলার একটি ছড়া বলুন।
  উত্তর ঃ আমি ছোটবেলায় দাদু দিদার মুখে মুখে শুনতাম, তারপর কখন আমিও ছড়া বলতে শিখে গেছি, ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এল দেশে,
- ঘ. মতামত ঃ ছড়া শুনতে ও বলতে ভালো লাগে,

ক্ষেত্রসমীক্ষা লব্ধ তথ্য এবং ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকার - ২২
(Fieldwork Data and Traditional Bearer's Interview)

১. ঐতিহ্যবাহী বাহকের পরিচিতি ঃ

- ক. নাম ঃ তাপসী দে
- খ. গ্রাম ঃ এঁড়াশালি
- গ. মহকুমা ঃ হলদিয়া
- ঘ. বয়স ঃ ৫৯
- ঙ. পেশা ঃ শিক্ষিকা
- চ. লিঙ্গ ঃ মহিলা
- ছ. বিবাহিত / অবিবাহিত ঃ বিবাহিত
- জ. শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বি. এস.সি, বি. এড, বিটি,
- ঝ. জাতি ঃ হিন্দু
- ঞ. বর্ণ ঃ কায়স্থ
- ট. জীবিত / মৃত ঃ জীবিত
- ঠ. সংগ্রহের তারিখ ঃ ২৯. ৯. ২০১৭

২. ঐতিহ্যবাহী বাহকের প্রতিচ্ছবি ঃ

স্বাক্ষর ঃ তাপসী দে

তারিখ ঃ ২০.১০.২০

৩. ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকারজনিত প্রশ্নোত্তর ঃ

ক. হ্যাঁ / না ঃ প্রশ্ন ঃ শুনেছি আপনি ছড়া বলতে ভালোবাসেন?
উত্তর ঃ হ্যাঁ

খ. ঠিক / বেঠিক ঃ প্রশ্ন ঃ আপনার মনে হয় ছড়ার চর্চা করা ঠিক?
উত্তর ঃ ঠিক

গ. বিবরণধর্মী ঃ প্রশ্ন ঃ ছড়া কেন চর্চা করেন?
উত্তর ঃ ছড়া চর্চায় আনন্দ আছে, ভালো লাগে, অপরেরও আনন্দ লাগে।

ঘ. মতামত ঃ অনেক সময় অনেক কথা না বলে ছড়ার বলে অনায়াসে সহজে বুঝানো যায়, এদের চর্চা করা উচিত, এগুলি আমাদের পূর্বপুরুষরা বলতো আমরা বলি, পরের ছেলেমেয়েরাও বলবে, নিত্য নতুন সাহিত্য সৃষ্টি হবে, এই চর্চা করা দরকার।

ক্ষেত্রসমীক্ষা লব্ধ তথ্য এবং ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকার -২৩
(Fieldwork Data and Traditional Bearer's Interview)

১. ঐতিহ্যবাহী বাহকের পরিচিতি ঃ

ক. নাম ঃ শ্রী সুভাষ চন্দ্র চক্রবর্তী।

খ. গ্রাম ঃ কসবা।

গ. মহকুমা ঃ আগরা।

ঘ. বয়স ঃ ৫৫

ঙ. পেশা ঃ মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ।

চ. লিঙ্গ ঃ পুরুষ।

ছ. বিবাহিত / অবিবাহিত ঃ বিবাহিত।

জ. শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বি. এ.

ঝ. জাতি ঃ হিন্দু

ঞ. বর্ণ ঃ ব্রাহ্মণ।

ট. জীবিত / মৃত ঃ জীবিত।

ঠ. সংগ্রহের তারিখ ঃ ০৭/০২/২০১৪

২. ঐতিহ্যবাহী বাহকের প্রতিচ্ছবি ঃ

স্বাক্ষর ঃ সুভাষ চন্দ্র চক্রবর্তী।

তারিখ ঃ ০৭/০৯/২০২০.

৩. ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকারজনিত প্রশ্নোত্তর ঃ

ক. হ্যাঁ / না ঃ প্রশ্ন ঃ আপনি কি ছোট থেকে ছড়া বলেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ।

খ. ঠিক / বেঠিক ঃ প্রশ্ন ঃ আমার এই যে ছড়া নিয়ে লেখালেখি আপনার কি ঠিক বলে মনে হচ্ছে?

উত্তর ঃ ঠিকই

গ. বিবরণধর্মী ঃ প্রশ্ন ঃ আপনি [illegible] প্রথম কিভাবে, কার কাছ থেকে ছড়া জানলেন?

উত্তর ঃ আমি প্রথম দাদুর কাছ থেকে শুনেছি। প্রায়ই সন্ধ্যাবেলা গল্পের আসর বসত, গল্প বলার ফাঁকে ফাঁকে ছড়া ও শ্লোক বলত, তাদের জিজ্ঞেস করলে বলত এগুলো মুখে মুখে কথা যা এই ছড়ার মাধ্যমে সহজে বোঝানো যায়।

ঘ. মতামত ঃ এই ছোট ছোট ছড়া ও শ্লোকগুলির মাধ্যমে যত সহজে ও সরল ভাষায় মজার এক অভিজ্ঞতার অর্থের প্রকাশ হয়, তা এক কথায় অনবদ্য।

ক্ষেত্রসমীক্ষা লব্ধ তথ্য এবং ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকার - ২৪
(Fieldwork Data and Traditional Bearer's Interview)

১. ঐতিহ্যবাহী বাহকের পরিচিতি ঃ

ক. নাম ঃ প্রেয়সী পান্ডা

খ. গ্রাম ঃ মেছেদা

গ. মহকুমা ঃ তমলুক

ঘ. বয়স ঃ ২৪

ঙ. পেশা ঃ গৃহবধু

চ. লিঙ্গা ঃ

ছ. বিবাহিত / অবিবাহিত ঃ বিবাহিতা

জ. শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এম.এ. বাংলা

ঝ. জাতি ঃ হিন্দু

ঞ. বর্ণ ঃ ব্রাহ্মণ

ট. জীবিত / মৃত ঃ জীবিত

ঠ. সংগ্রহের তারিখ ঃ ২৭.৩.২০১৬

২. ঐতিহ্যবাহী বাহকের প্রতিচ্ছবি ঃ

স্বাক্ষর ঃ প্রেয়সী পান্ডা

তারিখ ঃ ১১.১৫.২০

৩. ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকারজনিত প্রশ্নোত্তর ঃ

ক. হ্যাঁ / না ঃ প্রশ্ন ঃ তুমি কি ছড়া বল?

উত্তর ঃ হ্যাঁ।

খ. ঠিক / বেঠিক ঃ প্রশ্ন ঃ তুমি যে খেলার ছড়া দিয়েছো, ঠিক এগুলি কি খেলার সময় বলা হয়?

উত্তর ঃ ঠিক বলা হয়।

গ. বিবরণধর্মী ঃ প্রশ্ন ঃ তুমি কোথায় বড় হয়েছো? কিভাবে শিখলে?

উত্তর ঃ গ্রামে বড় হয়েছি, গ্রামের সবাই বলে আমিও বলি।

ঘ. মতামত ঃ আমার বলতে খুব ভালো লাগে।

ক্ষেত্রসমীক্ষা লব্ধ তথ্য এবং ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকার – ২৫

(Fieldwork Data and Traditional Bearer's Interview)

১. ঐতিহ্যবাহী বাহকের পরিচিতি ঃ

ক. নাম ঃ রবিউল আলি খান

খ. গ্রাম ঃ মনোহর চক

গ. মহকুমা ঃ কাঁথি

ঘ. বয়স ঃ ৪৫

ঙ. পেশা ঃ ইলেকট্রিশিয়ান

চ. লিঙ্গ ঃ পুরুষ

ছ. বিবাহিত / অবিবাহিত ঃ বিবাহিত

জ. শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ক্লাস টেন

ঝ. জাতি ঃ মুসলমান

ঞ. বর্ণ ঃ পাঠান

ট. জীবিত / মৃত ঃ জীবিত

ঠ. সংগ্রহের তারিখ ঃ ২০.৭.১৮

২. ঐতিহ্যবাহী বাহকের প্রতিচ্ছবি ঃ

স্বাক্ষর ঃ রবিউল আলি খাঁন

তারিখ ঃ ২২.৭.১০

৩. ঐতিহ্যবহী বাহকের সাক্ষাৎকারজনিত প্রশ্নোত্তর ঃ

ক. হ্যাঁ / না ঃ প্রশ্ন ঃ তোমাদের সমাজেও কি লোকজন ছড়া বলে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ

খ. ঠিক / বেঠিক ঃ প্রশ্ন ঃ আপনার কি কথায় কথায় ছড়া মুখে চলে আসে?

উত্তর ঃ ঠিক তাই

গ. বিবরণধর্মী ঃ প্রশ্ন ঃ ছড়া বলতে কেমন লাগে?

উত্তর ঃ খুব ভালো লাগে

ঘ. মতামত ঃ ছড়া বলতে আনন্দ হয়

ক্ষেত্রসমীক্ষা লব্ধ তথ্য এবং ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকার-২৬
(Fieldwork Data and Traditional Bearer's Interview)

১. ঐতিহ্যবাহী বাহকের পরিচিতি ঃ

ক. নাম ঃ সুদর্শন খাটুয়া

খ. গ্রাম ঃ কচুড়ি

গ. মহকুমা ঃ কাঁথি

ঘ. বয়স ঃ ৫৩

ঙ. পেশা ঃ সম্পাদক ও প্রকাশক

চ. লিঙ্গ ঃ পুরুষ

ছ. বিবাহিত / অবিবাহিত ঃ বিবাহিত

জ. শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক

ঝ. জাতি ঃ হিন্দু

ঞ. বর্ণ ঃ মাহিষ্য

ট. জীবিত / মৃত ঃ জীবিত

ঠ. সংগ্রহের তারিখ ঃ 20.03.2018

২. ঐতিহ্যবাহী বাহকের প্রতিচ্ছবি ঃ

স্বাক্ষর ঃ সুদর্শন খাটুয়া

তারিখ ঃ 05/12/2020

৩. ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকারজনিত প্রশ্নোত্তর ঃ

ক. হ্যাঁ / না ঃ প্রশ্ন ঃ আপনার কি মনে হয় ছড়াগুলি আমাদের 'জাতীয় সম্পত্তি'?

উত্তর ঃ হ্যাঁ

খ. ঠিক / বেঠিক ঃ প্রশ্ন ঃ ছড়া মানুষ ভুলে যাচ্ছে এ কথা কি ঠিক?

উত্তর ঃ ঠিক

গ. বিবরণধর্মী ঃ প্রশ্ন ঃ আপনি কেন ছড়া বলেন?

উত্তর ঃ নিজেকে ও অপরকে আনন্দ দেওয়ার জন্য

ঘ. মতামত ঃ যত বেশি চর্চা হবে তত মানুষ তার শিকড়কে ফিরে ফিরে পাবে।

ক্ষেত্রসমীক্ষা লব্ধ তথ্য এবং ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকার-২৭
(Fieldwork Data and Traditional Bearer's Interview)

১. ঐতিহ্যবাহী বাহকের পরিচিতি ঃ

ক. নাম ঃ সমীর সামন্ত

খ. গ্রাম ঃ কুণ্ডুপুর,

গ. মহকুমা ঃ কাঁথি

ঘ. বয়স ঃ ৮৭

ঙ. পেশা ঃ অবসর প্রাপ্ত শিক্ষা কর্মী,

চ. লিঙ্গ ঃ পুরুষ

ছ. বিবাহিত / অবিবাহিত ঃ বিবাহিত

জ. শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নাইন পাশ,

ঝ. জাতি ঃ হিন্দু

ঞ. বর্ণ ঃ মাহিষ্য

ট. জীবিত / মৃত ঃ জীবিত

ঠ. সংগ্রহের তারিখ ঃ ০৬/১২/২০২০

২. ঐতিহ্যবাহী বাহকের প্রতিচ্ছবি ঃ

স্বাক্ষর ঃ সমীর সামন্ত,

তারিখ ঃ ১২/১২/২০২০

৩. ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকারজনিত প্রশ্নোত্তর ঃ

ক. হ্যাঁ / না ঃ প্রশ্ন ঃ দাদু আপনার বয়স তো অনেক মনে হয়?

উত্তর ঃ হ্যাঁ,

খ. ঠিক / বেঠিক ঃ প্রশ্ন ঃ আপনার বাবা-মাও নাকি ছড়া বলতো?

উত্তর ঃ ঠিক,

গ. বিবরণধর্মী ঃ প্রশ্ন ঃ ছড়া কি ভেবে চিন্তে বলেন না এমনি এমনি চলে আসে?

উত্তর ঃ ভালো লাগে, কথা বলার ঠিক, আপসে ছড়া চলে আসে, তবে মনে নাই, তবে কথায় কথায় বলা হয়ে যায়,

ঘ. মতামত ঃ মজার মজার ছড়া বলি, এখনকার ছেলে মেয়ে খালি হাসে, তবে ছড়া বলে আনন্দ পাই,

ক্ষেত্রসমীক্ষা লব্ধ তথ্য এবং ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকার-২৮
(Fieldwork Data and Traditional Bearer's Interview)

১. ঐতিহ্যবাহী বাহকের পরিচিতি ঃ

- ক. নাম ঃ বিশ্বদীপ মান্না,
- খ. গ্রাম ঃ নেলুয়া
- গ. মহকুমা ঃ বনগাঁ
- ঘ. বয়স ঃ ১৬
- ঙ. পেশা ঃ ছাত্র
- চ. লিঙ্গ ঃ ছেলে
- ছ. বিবাহিত / অবিবাহিত ঃ অবিবাহিত
- জ. শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ দশম
- ঝ. জাতি ঃ হিন্দু
- ঞ. বর্ণ ঃ মাহিষ্য
- ট. জীবিত / মৃত ঃ জীবিত
- ঠ. সংগ্রহের তারিখ ঃ ২২.১২.২০১৯

২. ঐতিহ্যবাহী বাহকের প্রতিচ্ছবি ঃ

স্বাক্ষর ঃ বিশ্বদীপ মান্না

তারিখ ঃ ২৫/১১/২০

৩. ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকারজনিত প্রশ্নোত্তর ঃ

ক. হ্যাঁ / না ঃ প্রশ্ন ঃ তুমি কি ছড়া বল?

উত্তর ঃ হ্যাঁ

খ. ঠিক / বেঠিক ঃ প্রশ্ন ঃ তোমরা খেলতে খেলতে বল- 'দাবরি সরকার, মাছে ভাতে দের কার' — ঠিক বলছি তো?

উত্তর ঃ ঠিক বলছেন।

গ. বিবরণধর্মী ঃ প্রশ্ন ঃ তুমি কিভাবে ছড়া বলতে শিখেছিলে?

উত্তর ঃ আমি খেলতে গিয়ে, এবং স্কুলে বন্ধুদের কাছ থেকে ছড়া বলতে শিখেছি।

ঘ. মতামত ঃ ছড়া আমার ভালোই লাগে।

ক্ষেত্রসমীক্ষা লব্ধ তথ্য এবং ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকার – ২৯

(Fieldwork Data and Traditional Bearer's Interview)

১. ঐতিহ্যবাহী বাহকের পরিচিতি ঃ

ক. নাম ঃ রুমিলি মাইতি

খ. গ্রাম ঃ মধুসূদন চক

গ. মহকুমা ঃ কাঁথি

ঘ. বয়স ঃ ১৮

ঙ. পেশা ঃ ছাত্রী

চ. লিঙ্গ ঃ মহিলা

ছ. বিবাহিত / অবিবাহিত ঃ অবিবাহিত

জ. শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক

ঝ. জাতি ঃ হিন্দু

ঞ. বর্ণ ঃ মাহিষ্য

ট. জীবিত / মৃত ঃ জীবিত

ঠ. সংগ্রহের তারিখ ঃ ১২.৭.২০১৫

২. ঐতিহ্যবাহী বাহকের প্রতিচ্ছবি ঃ

স্বাক্ষর ঃ রুমিলি মাইতি

তারিখ ঃ ২১. ১১. ২০

৩. ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকারজনিত প্রশ্নোত্তর ঃ

ক. হ্যাঁ / না ঃ প্রশ্ন ঃ তোরা খেলতে খেলতে ছড়া বলিস?

উত্তর ঃ হ্যাঁ

খ. ঠিক / বেঠিক ঃ প্রশ্ন ঃ টুমলাকে টুমলা / গলায় তোর গামছা কি খেলার ছড়া।

উত্তর ঃ ঠিক

গ. বিবরণধর্মী ঃ প্রশ্ন ঃ খেলার দু-একটা ছড়ার নাম বল তো — ।

উত্তর ঃ ১। এলাটিং বেলাটিং সইলো,
২। ইচিং বিচিং চিচিং চা

ঘ. মতামত ঃ ছড়া বলতে খুব ভালো লাগে।

ক্ষেত্রসমীক্ষা লব্ধ তথ্য এবং ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকার ৩০
(Fieldwork Data and Traditional Bearer's Interview)

১. ঐতিহ্যবাহী বাহকের পরিচিতি ঃ লেখকের কর্তৃক লিখিত

ক. নাম ঃ কার্তিক ডিন্ডাল

খ. গ্রাম ঃ কটকা দেবীচক

গ. মহকুমা ঃ কাঁথি

ঘ. বয়স ঃ ৬৪

ঙ. পেশা ঃ মাঝি

চ. লিঙ্গ ঃ পুরুষ

ছ. বিবাহিত / অবিবাহিত ঃ বিবাহিত

জ. শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অক্ষর জ্ঞানহীন

ঝ. জাতি ঃ

ঞ. বর্ণ ঃ হিন্দু

ট. জীবিত / মৃত ঃ জীবিত

ঠ. সংগ্রহের তারিখ ঃ ১৭.৬.১৬

২. ঐতিহ্যবাহী বাহকের প্রতিচ্ছবি ঃ

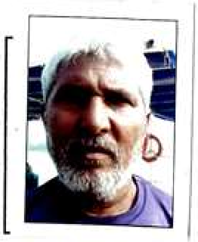

স্বাক্ষর ঃ

তারিখ ঃ ২২. ১২. ২০

৩. ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকারজনিত প্রশ্নোত্তর ঃ

ক. হ্যাঁ / না ঃ প্রশ্ন ঃ আপনি নৌকো চালান?

উত্তর ঃ হ্যাঁ

খ. ঠিক / বেঠিক ঃ প্রশ্ন ঃ ছড়া কী মাঝিরা সবাই বলে?

উত্তর ঃ ঠিকই ~~তা নয়~~, তবে অনেকেই বলে,

গ. বিবরণধর্মী ঃ প্রশ্ন ঃ একটা ছড়া বলুন?

উত্তর ঃ আমি নৌকো লইয়্যা বইসা আছি সকাল থেকে সন্ধ্যা
পারানি কোই কত হইল কিড়ি যাইতে নাই পইসা

ঘ. মতামত ঃ আমি সারাদিন নদীতে পারাপার করি আর বহুমানুষের সঙ্গে কথায় কথায় ছড়া বলি, বলতে আমার খুব ভালো লাগে,

ক্ষেত্রসমীক্ষা লব্ধ তথ্য এবং ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকার ৩১

(Fieldwork Data and Traditional Bearer's Interview)

১. ঐতিহ্যবাহী বাহকের পরিচিতি ঃ লেখিকা কর্তৃক লিখিত

ক. নাম ঃ শঙ্কর বেরা

খ. গ্রাম ঃ কাটকা দেবীচক

গ. মহকুমা ঃ কাঁথি

ঘ. বয়স ঃ ৫৫

ঙ. পেশা ঃ মাঝি

চ. লিঙ্গ ঃ পুরুষ

ছ. বিবাহিত / অবিবাহিত ঃ বিবাহিত

জ. শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এইট পাশ

ঝ. জাতি ঃ ~~হি~~ হিন্দু

ঞ. বর্ণ ঃ মাহিষ্য

ট. জীবিত / মৃত ঃ জীবিত

ঠ. সংগ্রহের তারিখ ঃ ৭. ৫. ১৪

২. ঐতিহ্যবাহী বাহকের প্রতিচ্ছবি ঃ

স্বাক্ষর ঃ শংকর বেরা

তারিখ ঃ ২২. ১২. ২০

৩. ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকারজনিত প্রশ্নোত্তর ঃ

ক. হ্যাঁ / না ঃ প্রশ্ন ঃ শঙ্করদা আপনি তো খেয়া মাঝি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ

খ. ঠিক / বেঠিক ঃ প্রশ্ন ঃ খেয়া ঘাটে কী সারাদিন থেকে যায়?

উত্তর ঃ ঠিক তাই, ৮ ঘণ্টা ১০ ঘণ্টা প্রায় থাকতে হয়

গ. বিবরণধর্মী ঃ প্রশ্ন ঃ মাঝি মাল্লার ছড়া আপনি বলেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ বলি, মাঝে মধ্যে নদীর মোহনায় বা দূর সমুদ্রে চলে গেলে নৌকা বাইতে বাইতে ছড়া বলি,

ঘ. মতামত ঃ আমাদের মাঝি জীবনে আর কি আছে, ছড়ার মধ্যে জীবনের সুখ-দুঃখের কথা কই, ভালো লাগে, আপনারা নিচ্ছেন, এগুলো নিয়ে কাজ করছেন, ভালো লাগছে।

ক্ষেত্রসমীক্ষা লব্ধ তথ্য এবং ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকার ৩২
(Fieldwork Data and Traditional Bearer's Interview)

১. ঐতিহ্যবাহী বাহকের পরিচিতি ঃ লেখিকা কর্তৃক লিখিত

ক. নাম ঃ ব্যায়া বর

খ. গ্রাম ঃ বোড়া

গ. মহকুমা ঃ কাঁথি

ঘ. বয়স ঃ ৬৫

ঙ. পেশা ঃ মাঝি

চ. লিঙ্গ ঃ পুরুষ

ছ. বিবাহিত / অবিবাহিত ঃ বিবাহিত

জ. শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ফোর পাশ (IV)

ঝ. জাতি ঃ হিন্দু

ঞ. বর্ণ ঃ S.C

ট. জীবিত / মৃত ঃ জীবিত

ঠ. সংগ্রহের তারিখ ঃ ৩.২.২০২২

২. ঐতিহ্যবাহী বাহকের প্রতিচ্ছবি ঃ

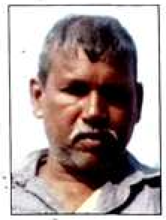

স্বাক্ষর ঃ ব্যায়া বর

তারিখ ঃ ১৬.১২.২০

৩. ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকারজনিত প্রশ্নোত্তর ঃ

ক. হ্যাঁ / না ঃ প্রশ্ন ঃ আপনি আগে কি নৌকা চালাতেন ?

উত্তর ঃ হ্যাঁ

খ. ঠিক / বেঠিক ঃ প্রশ্ন ঃ এখন ভেসেলে কাজ করেন ?

উত্তর ঃ ঠিক

গ. বিবরণধর্মী ঃ প্রশ্ন ঃ ভেসেলে ~~চালাতে চালাতে কি~~ এপার ওপার করতে গিয়ে কি ছড়া বলেন? কিছু বল ?

উত্তর ঃ ভেসেলেই কাজ করি, কত মানুষকে নিয়ে যাতায়াত করি, তাদের দেখি আর মনে যা আসে তাই দিয়ে নানা রকম ছড়া বলি।

ঘ. মতামত ঃ এই ছড়া বলতে বেশ ভালো লাগে, মনে আনন্দ হয়, শান্তি লাগে, মাঝি জীবনের কতকথা ছড়ায় ছড়ায় বলা হয়ে যায়।

ক্ষেত্রসমীক্ষা লব্ধ তথ্য এবং ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকার ৩৬
(Fieldwork Data and Traditional Bearer's Interview)

১. ঐতিহ্যবাহী বাহকের পরিচিতি ঃ লেখিকা কর্তৃক লিখিত

ক. নাম ঃ রঘু বাড়ুই

খ. গ্রাম ঃ রসুলপুর

গ. মহকুমা ঃ কাঁথি

ঘ. বয়স ঃ ৩৭

ঙ. পেশা ঃ মাঝি

চ. লিঙ্গ ঃ পুরুষ

ছ. বিবাহিত / অবিবাহিত ঃ বিবাহিত

জ. শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নাইন

ঝ. জাতি ঃ হিন্দু

ঞ. বর্ণ ঃ S.C

ট. জীবিত / মৃত ঃ জীবিত

ঠ. সংগ্রহের তারিখ ঃ ২৫.১১.১৭

২. ঐতিহ্যবাহী বাহকের প্রতিচ্ছবি ঃ

স্বাক্ষর ঃ রঘু বাড়ুই

তারিখ ঃ ২০.১২.২০.

৩. ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকারজনিত প্রশ্নোত্তর ঃ

ক. হ্যাঁ / না ঃ প্রশ্ন ঃ ছড়া জানেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ

খ. ঠিক / বেঠিক ঃ প্রশ্ন ঃ বাড়িতে অন্যান্যরা ছড়া বলা কি ঠিক চোখে দেখে?

উত্তর ঃ ঠিক চোখেই দেখে।

গ. বিবরণধর্মী ঃ প্রশ্ন ঃ একটা ছড়া বলুন

উত্তর ঃ বল হরি হরিবোল / আবার বল হরিবোল /
জোরসে বল হরিবোল / হরিবোলা হরিবোল

ঘ. মতামত ঃ -হরিবোল ছড়া আছে — বাকিগুলো ভুলে গেছে / সব গেল ভুলে

ক্ষেত্রসমীক্ষা লব্ধ তথ্য এবং ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকার
(Fieldwork Data and Traditional Bearer's Interview) - ৬৪

১. ঐতিহ্যবাহী বাহকের পরিচিতি ঃ

ক. নাম ঃ সুপ্রভা ভূঞ্যা

খ. গ্রাম ঃ কসতলা

গ. মহকুমা ঃ খে কাঁথি

ঘ. বয়স ঃ ১৮

ঙ. পেশা ঃ ছাত্রী

চ. লিঙ্গ ঃ মহিলা

ছ. বিবাহিত / অবিবাহিত ঃ অবিবাহিত

জ. শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ XII

ঝ. জাতি ঃ হিন্দু

ঞ. বর্ণ ঃ মাহিষ্য

ট. জীবিত / মৃত ঃ জীবিত

ঠ. সংগ্রহের তারিখ ঃ ১২.৭.১৬

২. ঐতিহ্যবাহী বাহকের প্রতিচ্ছবি ঃ

স্বাক্ষর ঃ সুপ্রভা ভূঞ্যা

তারিখ ঃ ২৫.১০.২০

৩. ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকারজনিত প্রশ্নোত্তর ঃ

ক. হ্যাঁ / না ঃ প্রশ্ন ঃ খেলতে খেলতে ছড়া বলো কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ

খ. ঠিক / বেঠিক ঃ প্রশ্ন ঃ তুমি তো বেশি খেলার ছড়াই জান?

উত্তর ঃ ঠিক

গ. বিবরণধর্মী ঃ প্রশ্ন ঃ একটা খেলার ছড়া বল?

উত্তর ঃ আবিনী সরকার / সাধু উঠল দরকার / গাছ থেকে
পাড়ে গেলে / অসুরের দরকার
আমলাতে আমলা / জোষ্ঠ মাসের পাইলা

ঘ. মতামত ঃ ছড়া বলতে ভালো লাগে, একরকম অনেক ছড়া আমরা বলি।

ক্ষেত্রসমীক্ষা লব্ধ তথ্য এবং ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকার

(Fieldwork Data and Traditional Bearer's Interview) - ৬৫

১. ঐতিহ্যবাহী বাহকের পরিচিতি ঃ

ক. নাম ঃ সমাপ্তি সামন্ত

খ. গ্রাম ঃ কৃষ্ণপুর

গ. মহকুমা ঃ কাঁথি

ঘ. বয়স ঃ ১৮

ঙ. পেশা ঃ ছাত্রী

চ. লিঙ্গ ঃ মহিলা

ছ. বিবাহিত / অবিবাহিত ঃ অবিবাহিত

জ. শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ স্না

ঝ. জাতি ঃ হিন্দু

ঞ. বর্ণ ঃ মাহিষ্য

ট. জীবিত / মৃত ঃ জীবিত

ঠ. সংগ্রহের তারিখ ঃ ১৭.৩.১৭

২. ঐতিহ্যবাহী বাহকের প্রতিচ্ছবি ঃ

স্বাক্ষর ঃ সমাপ্তি সামন্ত

তারিখ ঃ ২৮.১১.২০

৩. ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকারজনিত প্রশ্নোত্তর ঃ

ক. হ্যাঁ / না ঃ প্রশ্ন ঃ তোমার পরিচিত সবাই কি ছড়া বলে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ

খ. ঠিক / বেঠিক ঃ প্রশ্ন ঃ -

উত্তর ঃ ঠিক

গ. বিবরণধর্মী ঃ প্রশ্ন ঃ খেলার ছড়া ব্যতীত অন্য কি ছড়া জান?

উত্তর ঃ ঘুম পাড়ানী মাসী পিসি / ঘুম দিয়ে যাও / বাটা ভরা পান দেব / গাল ভরিয়ে খাও, যা যা হাটে যা রা হাটে / কিয়া কুত্তার বায়া হাটে

ঘ. মতামত ঃ খেলতে খেলতে ছড়া বলি, তা থেকে বিশিষ্টকার বলব কেমন। ছড়া বলতে আমার খুব ভালো লাগে।

প্রসঙ্গ নির্দেশ ও মন্তব্য ঃ

১. পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলের মানচিত্রের প্রতিলিপি। প্রতিলিপিটি বক্ষ্যমাণ অধ্যায়ের শেষে চিত্রসংখ্যা-১, পৃ-৭৮ দ্রষ্টব্য।

২. পূর্ব মেদিনীপুরের নদী উপকূলের মানচিত্রের ফটোকপি। ছবিটি বক্ষ্যমাণ অধ্যায়ের শেষে চিত্রসংখ্যা-২, পৃ-৮১ দ্রষ্টব্য।

৩. পূর্ব মেদিনীপুরের সমুদ্র উপকূলের মানচিত্রের প্রতিচ্ছবি। ছবিটি বক্ষ্যমাণ অধ্যায়ের শেষে চিত্রসংখ্যা-৩, পৃ-৮২ দ্রষ্টব্য।

৪. পূর্ব মেদিনীপুরের চারটি মহকুমার (হলদিয়া, তমলুক, কাঁথি, এগরা) মানচিত্রের ফটোকপি। ছবিটি বক্ষ্যমাণ অধ্যায়ের শেষে চিত্রসংখ্যা-৪, পৃ-৮৩ দ্রষ্টব্য।

৫. কৃষিকাজ হল এই উপকূলীয় অঞ্চলের প্রধান জীবিকা। ধান, পাট, আলু, গম, সবরকম সব্জি-কলাই প্রভৃতি এখানে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। যে যে পেশায় থাকুক না কেন কৃষিকাজ সবাই কম-বেশি করে থাকে। পরিশিষ্ট-১, চিত্রসংখ্যা—১৫, পৃ-৪৬৫ দ্রষ্টব্য।

৬. মৎস্যশিকার ও অন্যতম একটি প্রধান জীবিকা। নদী এবং সমুদ্র উপকূলীয় ভাগ দিয়ে ঘেরা এই অঞ্চল মৎস্য চাষের জন্য খুবই অনুকূল। পরিশিষ্ট-১, চিত্রসংখ্যা—১৬, পৃ-৪৭০ দ্রষ্টব্য।

৭. 'ভেনামী' হল বড় চাবড়া চিংড়ি। যা খেতে অত্যন্ত সুস্বাদু। পরিশিষ্ট-১, চিত্রসংখ্যা—১৭, পৃ-৪৭০ দ্রষ্টব্য।

৮. 'শুটকি' রৌদ্রে শুকানো মাছ শুটকি বলে পরিচিত। শুটকিতে সামুদ্রিক প্রায় সমস্ত রকম মাছকে দড়িতে গেঁথে রৌদ্রে শুকিয়ে বিক্রির উপযোগী করে তোলা হয়। পরিশিষ্ট-১, চিত্রসংখ্যা—১৮, পৃ-৪৭১ দ্রষ্টব্য।

৯. 'মুষণ্ডা' ঢেঁকির যে অংশ সরাসরি গর্তে গিয়ে ধানের উপর আঘাত করে, অর্থাৎ ঢেঁকির অগ্রভাগ। মুষণ্ডা > মুষল লৌকিক শব্দ থেকে এসেছে, অর্থ 'গদা' ঢেঁকির অগ্রভাগের নীচে থাকে লোহার বেড়ি, যাকে বলে 'সামা'। 'তা' অর্থাৎ হাত দিয়ে ঢেঁকির 'মুষণ্ডা'র গর্তে ধানকে গুছিয়ে ফেলে দেওয়া হয়, একে বলে 'তা'।

১০. ছড়াবাহকের ছবি সহ সাক্ষাৎ আমরা গবেষণা অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায় সাক্ষাৎকার সংখ্যা—২, পৃ-৮৮, শিরোনামে সংযুক্ত করেছি।

১১. গবেষণা অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায় সাক্ষাৎকার—, সংখ্যা—২, পৃ-৮৮ দ্রষ্টব্য।

১২. 'টলা' হল ধান রাখবার ছোট্ট পাত্র। যাতে খুব বেশি হলে ৮-১০ মন ধান থাকবে।

১৩. 'মান' অর্থে বেতের বোনা ধান রাখবার পাত্র। এতে ১০ সের (কেজি) ধান রাখা যায়। পরিশিষ্ট-১, চিত্রসংখ্যা-১৯, পৃ-৪৭৫ দ্রষ্টব্য।

১৪. 'ধামা' অর্থে বেতের বোনা ধান রাখবার বড় পাত্র বিশেষ। যা 'মান'-এর চেয়ে বড়। পরিশিষ্ট-১, চিত্রসংখ্যা—২০, পৃ-৪৭৭ দ্রষ্টব্য।

১৫. 'কঁচা' হল বেতের বোনা পাত্র বিশেষ, যাতে ১ সের (কেজি) চাল মাপা যায়। পূর্বে এই 'কঁচা' দিয়ে চাল ধার ফের করা হত। এতে শুকনো মুড়িও খাওয়া যায়।

১৬. 'দাবোড়' অর্থে ধান ঝাড়ানোর বড় পাটা। যেখানে ৪-৫ জন একসঙ্গে দাঁড়িয়ে ধান ঝাড়াতে পারে। এটি বাঁশ দিয়ে তৈরী।

১৭. 'ঠাকা' হল ছোট কঞ্চি দ্বারা নির্মিত। যাতে ধান বা যে কোনো দ্রব্য রাখা এবং এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সহজেই নিয়ে যাওয়া যায়। পরিশিষ্ট-১, চিত্রসংখ্যা—২১, পৃ-৪৭৮ দ্রষ্টব্য।

১৮. সংগ্রাহকের ছবিসহ সাক্ষাৎ আমরা গবেষণা অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায় সাক্ষাৎকার সংখ্যা—৩, পৃ-৮৯, শিরোনামে সংযুক্ত করেছি।

১৯. 'জেলে', উপকূলীয় অঞ্চলের কারণে বহুমানুষ জেলে-এর পেশায় যুক্ত। মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। পরিশিষ্ট-১, চিত্রসংখ্যা—২২, পৃ-৪৮০ দ্রষ্টব্য।

২০. বিস্তারিত বিবরণের জন্য পরিশিষ্ট-১, চিত্রসংখ্যা—২৩, পৃ-৪৮২ দ্রষ্টব্য।

২১. ডাকঘরটি ১৭৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত শেষ চিঠি বিলি হয় ১৮৯৪তে। পরাধীন ভারতবর্ষে প্রথম জনগণের ডাকঘর এই খেজুরীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও অনেকেই মনে করেন মাদ্রাজে অবস্থিত ডাকঘরটি ভারতবর্ষের প্রথম ডাকঘর, তবে তাতে কেবল ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নিজেদের চিঠিপত্র বিলি হত, জনগণের চিঠিপত্র নয়। বিস্তারিত বিবরণের দ্রষ্টব্য। পরিশিষ্ট-১, চিত্রসংখ্যা—২৪, পৃ-৪৮৫ দ্রষ্টব্য।

২২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে এই রসুলপুর নদীর-ই বর্ণনা দিয়েছেন, যে নদী দিয়ে উপন্যাসের নায়ক নবকুমার গঙ্গাসাগর থেকে প্রত্যাবর্তন কালে কাঠ সংগ্রহের জন্য অবতরণ করেছিলেন। পরিশিষ্ট-১, চিত্রসংখ্যা—২৫, পৃ-৪৮৯ দ্রষ্টব্য।

২৩. ‘ডিঙি’ রসুলপুর নদীতে ডিঙি নৌকাগুলি আজও মানুষের কায়িক শ্রমে মূলত মাছ ধরার জন্য চালিত হয়। পরিশিষ্ট-১, চিত্রসংখ্যা—২৬, পৃ-৪৯২ দ্রষ্টব্য।

২৪. ‘ভুটভুটি’ যন্ত্রচালিত নৌকা। প্রায় ৫০ জন মানুষ নিয়ে নদী পারাপার করতে পারে। পরিশিষ্ট-১, চিত্রসংখ্যা—২৭, পৃ-৪৯৩ দ্রষ্টব্য।

২৫. ‘ভ্যাসেল’ জলধারা নামক আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর এই জলযান-ই হল ভ্যাসেল। এতে একসঙ্গে বহুমানুষ পারাপার করতে পারে। পরিশিষ্ট-১, চিত্রসংখ্যা—২৮, পৃ-৪৯৪ দ্রষ্টব্য।

২৬. গবেষণা অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ছড়া বাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা—৩, পৃ-৮৯ শিরোনামে সংযুক্ত হয়েছে।

২৭. মাথার ওঠা চুল ছাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। জট পাকানো, গিঁট পড়া, নোংরা চুলকে গুছিয়ে রাখা হয়, পরে চুল ব্যবসায়ীগণ বেকার যুবক-যুবতীদের দিয়ে চুলকে পরিষ্কার ও ছাড়ানোর কাজ করায়। পরিশিষ্ট-১, চিত্রসংখ্যা—২৯, পৃ-৪৯৬ দ্রষ্টব্য।

২৮. দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট-২, ছড়া সংকলনে বর্তমানের ছড়া, সংখ্যা—২০০, পৃ-৫৬০।

২৯. ছড়ার সংকলন হল আমার গবেষণার ক্ষেত্র সমীক্ষা অঞ্চলে প্রাপ্ত ছড়াগুলির তালিকা।

৩০. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট-১, চিত্রসংখ্যা—৩০, পৃ-৪৯৭ দ্রষ্টব্য।

৩১. ‘বড়ি’ মূলত বিরি কলাই এবং চাল কুমড়া সহযোগে তৈরী হয় বড়ি। বর্তমানে বিভিন্ন উপকরণ দিয়েও বড়ি তৈরী হচ্ছে। পরিশিষ্ট-১, চিত্রসংখ্যা—৩১, পৃ-৫০০ দ্রষ্টব্য।

৩২. ‘বিরি কড়ি’, বিউলির ডাল থেকে এই বড়ি তৈরী করা হয় বলে একে বিরি কড়ি বলে। বিউলির সংক্ষিপ্ত রূপ ‘বিরি’ এবং কলাই বা কড়াই এর সংক্ষিপ্ত রূপ কড়ি শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। পরিশিষ্ট-১, চিত্রসংখ্যা—৩২, পৃ-৫০১ দ্রষ্টব্য।

৩৩. ‘নক্সা বড়ি’ এই বড়িতে বিভিন্ন রকম নক্সা ফুটিয়ে তোলা হয়। যথা কানের দুল, গলার হার, নাকচাবি প্রভৃতি গোটা পোস্ত সহযোগে সুস্বাদু করে তোলা হয়। পরিশিষ্ট-১, চিত্রসংখ্যা—৩৩, পৃ-৫০২ দ্রষ্টব্য।

৩৪. ‘ফুলবড়ি’, মুসুর ডাল দিয়ে এই বড়ি হয়। এই বড়ি বেশি পরিমাণে ফেটানোর ফলে খুব ফাঁপা হয় এবং জলেও ভাসে। এগুলি সহজেই ভঙ্গুর হয়ে যায় এবং মুচমুচে হয়।

৩৫. ‘বিচাবড়ি’, চাল কুমড়ার বীজ এবং বিউলী ডালের খোসাযুক্ত ডালগুলি দিয়ে এই বড়ি হয় বলে এর নাম বিচাবড়ি। এই বড়ি দেখতে হয় কালো ধরণের। সাধারণত এই অঞ্চলে পান্তাভাতে খাওয়া হয়। পরিশিষ্ট-১, চিত্রসংখ্যা—৩৪, পৃ-৫০৪ দ্রষ্টব্য।

৩৬. ‘ঝাঁটা’, নারকেল কাঁঠি দিয়ে তৈরী হয়। পরিশিষ্ট-১, চিত্রসংখ্যা—৩৫, পৃ-৫০৫ দ্রষ্টব্য।

৩৭. ‘ছেনিয়া’ এটি খেজুর পাতাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে তৈরী হয়। পরিশিষ্ট-১, চিত্রসংখ্যা—৩৬, পৃ-৫০৬ দ্রষ্টব্য।

৩৮. ‘কুরো’ কুরো < কুরা শব্দটি এসেছে। যার অর্থ নারকেলকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিশ্লিষ্ট করা।

৩৯. গবেষণা অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকার। সংখ্যা—১, পৃ-৮৭ দ্রষ্টব্য।

৪০. ‘চাঁচর’ দোলযাত্রার দিন সন্ধ্যেবেলায় হুলি পেড়ানোকে বলে চাঁচর অনুষ্ঠান।

৪১. ‘ল বাঁধা’, নল খাগড়ার গাছে নতুন কাপড়ে তেঁতুল, হলুদ ওল ইত্যাদি সহযোগে বেঁধে ধান মাঠে পুঁতে দেওয়া হয় একে নল > ল-বাঁধা বলে। যার দ্বারা ধানকে সাধ খাওয়ানো হয়, ভালো ধান হওয়ার বাসনায়। পরিশিষ্ট-১, চিত্রসংখ্যা—৩৭, পৃ-৫০৭ দ্রষ্টব্য।

৪২. ‘আলি’, টুমোর কলাই গাছের পাতা, কাঁচা হলুদ, আপং গাছের শিকড়, কাঁচা তেঁতুল, বেলপাতা, ঝোটপাতা, ধানগাছের শিশির সবকিছুকে একসঙ্গে বেটে যে মিশ্রণ, সেই মিশ্রণ হল আলি।

৪৩. ‘পোড়াপিঠে’, চালকে গুঁড়ো করে, নারকেল, তালের মাড় এবং চিনি দিয়ে তৈরী মিশ্রণকে সারারাত ধরে আগুণে পুড়িয়ে তৈরী হয় বলে একে পোড়াপিঠে বলে। পোড়া যে পিঠে, তাই পোড়াপিঠে।

৪৪. গবেষণা অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা—১, পৃ-৮৭ দ্রষ্টব্য।

৪৫. ‘পড়ুয়া’ বাবা মায়ের প্রথম সন্তান বা সন্ততিকে পড়ুয়া বলে। এক্ষেত্রে বলে রাখি, যদি বাবা-মায়ের প্রথম সন্তান বা সন্ততি জন্মের পর মারা যায়, সেক্ষেত্রে আর পরের জনকে পড়ুয়া বলে গণ্য করা হয় না।

৪৬. 'বিপত্তারিণী পূজা' সকল রকম বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এই পূজা করলে। এই পূজায় লাল ডুরী হাতে বাঁধতে হয় এবং নারী-পুরুষ সবাই এই ব্রত পালন করে থাকে।

৪৭. 'শিবচতুর্দশী ব্রত' পালন হয় ফাল্গুন মাসের চতুর্দশী তিথিতে। এই ব্রত পালন করলে চতুর্বিধ মোক্ষ লাভ হয় এবং রাতে শিব মাহাত্ম-ব্রত কথা শুনতে হয়। নারী-পুরুষ সকলে এই ব্রত পালন করে।

৪৮. রাখী পূর্ণিমা মূলত প্রীতির বন্ধন। উপকূলীয় অঞ্চলে বর্তমানে ঘরে ঘরে পালিত হয়।

৪৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাখীবন্ধন উৎসব প্রচলন করেন। তিনি এই উৎসব শান্তিনিকেতনে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সর্বপ্রথম শুরু করেন এই জন্য যে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে জাতীয় সম্প্রীতি ও ঐক্য স্থাপন করে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে রোধ করার জন্য।

৫০. মনসাগাছ হল একধরণের ক্যাকটাস, এই অঞ্চলে প্রত্যেক বাড়িতে মন্দিরের পার্শ্বে থাকে। পরিশিষ্ট-১, চিত্রসংখ্যা—৩৮, পৃ-৫০৮ দ্রষ্টব্য।

৫১. জামাইষষ্ঠী অনুষ্ঠানে শাশুড়ী জামাই-এর কল্যাণ কামনা করে। পরিশিষ্ট-১, চিত্রসংখ্যা—৩৯, পৃ-৫০৯ দ্রষ্টব্য।

৫২. 'চড়ক সংক্রান্তি', চৈত্রমাসের সংক্রান্তিতে চড়ক উৎসব পালিত হয়। এটি মূলত শিব মাহাত্ম কেন্দ্রিক উৎসব।

৫৩. **'দুর্গাথপা'** ঃ দুর্গাদেবীর উদ্দেশ্যে এই 'থপা' তাই দুর্গাথপা। থপা হল আতপচালের অলংকরণ। আবার থপ করে আওয়াজ হয় বলেও থপা। পরিশিষ্ট-১, চিত্রসংখ্যা-৪০, পৃ-৫১১ দ্রষ্টব্য।

৫৪. **'তরল'** ঃ তরল অর্থাৎ আতপচালের মাড়। তাতে এমনভাবে জল মেশানো হয়, যা দেওয়ালে যেন ফুটে ওঠে, এবং দেখতে যেন চমৎকার হয়।

৫৫. **'ধারাচাটু'** ঃ যাতে করে আতপচালের মাড় দেওয়ালে দেওয়া হয়, এটি দেখতে অনেকটাই হাতার মতো, তবে এই হাতার গোল মাথার চওড়া অংশে অসংখ্য ছিদ্র থাকে। ঐ ছিদ্র দিয়ে চালের মাড় দেওয়ালে পড়ে ও নক্সা হয়ে ওঠে। পরিশিষ্ট-১, চিত্রসংখ্যা-৪১, পৃ-৫১২ দ্রষ্টব্য।

৫৬. **'গাছের পাতা'** ঃ ধারাচাটু ছাড়া বর্তমানে নিমগাছের পাতা, চালতা পাতা দিয়েও নক্সা করা হয়।

৫৭. **'জাল'** ঃ এছাড়া জালকে গ্লাস বা বাটির মুখে বেঁধে চালের মাড়ে ডুবিয়ে ও থপা দেওয়া হয়।

৫৮. **'টিকরি ফল'** ঃ এটি একধরণের জংলা গাছের গোলাকার ফল বিশেষ। ঐ সময় গ্রামের বাড়ি-ঘরে জংলা জায়গায় লক্ষিত হয়। দেখতে গোলাকার খাঁজকাটা যুক্ত ফলটি।

৫৯. 'মিড ডে মিল', বর্তমানে শ্রেণী পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সমস্ত বিদ্যালয়ে মিড ডে মিল খাওয়ানো হয়। এর ফলে শিশুরা অনেক বেশি বিদ্যালয় অঙ্গানে সামিল হচ্ছে এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হচ্ছে। সরকারের এটি একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

৬০. দ্বিতীয় অধ্যায়ে ছড়া সংগ্রহকারী বাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৪, পৃ-৯০ দ্রষ্টব্য।

৬১. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৩২, পৃ-১১৮ দ্রষ্টব্য।

৬২. দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৩১, পৃ-১১৭ দ্রষ্টব্য।

৬৩. দ্বিতীয় অধ্যায়ে ছড়া সংগ্রহকারী বাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৩০, পৃ-১১৬ দ্রষ্টব্য।

৬৪. গবেষণা অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ছড়াবাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৩৩, পৃ-১১৯ দ্রষ্টব্য।

৬৫. গবেষণা অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ছড়াবাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা-১৮, পৃ-১০৪ দ্রষ্টব্য।

৬৬. গবেষণা অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ছড়াবাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা-১৫, পৃ-১০১ দ্রষ্টব্য।

৬৭. গবেষণা অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ছড়াবাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা-২০, পৃ-১০৬ দ্রষ্টব্য।

—ঃঃ—

তৃতীয় অধ্যায়

ছড়ায় বিজ্ঞান মনস্কতা, অর্থবিজ্ঞান এবং ভাষাবিজ্ঞান চেতনার অনুসন্ধান ও তার বিশ্লেষণ।

ছড়ায় শব্দার্থবিজ্ঞান [Sementics] চেতনার অনুসন্ধান এবং ভাষাবিজ্ঞান চেতনার অনুসন্ধান এই আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে তৃতীয় অধ্যায়ের অন্যতম বিষয় 'ছড়ায় বিজ্ঞান মনস্কতা' সম্পর্কে অল্প-বিস্তর জেনে নেবো। জেনে নেবো বিজ্ঞান কী? ছড়ায় এই বিজ্ঞান মনস্কতাই বা কী?

'বিজ্ঞান' শব্দের আভিধানিক অর্থ হল, কোনো বিষয়ে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার ফলে ক্রম অনুসারে লব্ধ জ্ঞান[১]। ইংরেজি পরিভাষায় যাকে 'Science' বলে। কোনো বিষয়ের বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা করতে গেলে উক্ত বিষয়টি সম্পর্কে প্রমাণিত তথ্য আমাদের খুঁজে নিতে হবে, এবং তথ্যটি দীর্ঘসময়ের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের দ্বারা বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান বলে আমাদের কাছে বিজ্ঞানরূপে পরিগণিত হয়। তবে এই বিজ্ঞান বিবিধ। তাদের কয়েকটি হল ঃ

১। পদার্থবিজ্ঞান (Physics)

২। ভৌতবিজ্ঞান (Physical Science)

৩। রসায়নবিজ্ঞান (Chemistry)

৪। প্রাণীবিজ্ঞান (Zoology)

৫। উদ্ভিদবিজ্ঞান (Botany)

৬। সমাজবিজ্ঞান (Sociology)

৭। নৃবিজ্ঞান (Anthropology)

৮। অনুবিজ্ঞান (Micro-Biology)

৯। শব্দার্থবিজ্ঞান (Sementics)

১০। ভাষাবিজ্ঞান (Lingustics) প্রভৃতি।

উপরিউক্ত বিবিধ বিষয়ের বিজ্ঞানীগণ তাঁদের স্ব-স্ব বিষয়ে ল্যাবরেটরিতে, পরীক্ষাগারে, পরীক্ষামূলকভাবে বিষয়ের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হন।

ছড়ায় 'বিজ্ঞান মনস্কতা' [২] এই বিষয়ের আলোচনায় আমরা ছড়ার মধ্যে অবতীর্ণ হবো ছড়ার বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা সাপেক্ষে। যদিও এর কোনো পরীক্ষাগার নেই, তথাপি রয়েছে গভীর পর্যবেক্ষণগত বর্তমান পরিস্থিতিবাহক নানা মানদণ্ড। কোনো বিষয় কেবল বিজ্ঞান হলেই যে তার বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা হয়, না হলে হয় না, এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। 'বিজ্ঞান বহির্ভূত বিষয়ের বিশ্লেষণের ভঙ্গী দারুণভাবে বৈজ্ঞানিক হতে পারে' [৩]। সেই অর্থে লোকসাহিত্যের অন্যতম উপাদান ছড়ায়ও সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান মনস্কতা রয়েছে।

ছড়া হল সেই শিল্পকর্ম যা লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম রূপ। এগুলি পরিবর্তনশীল, মানবমনে আপনি জন্মায়। ছড়ায় থাকে অসংলগ্নভাব, উদ্দেশ্যবিহীন আচরণ, এবং শ্রুতিনির্ভর পদ্যধর্মীতা। ছড়াগুলি সমষ্টির সম্পদ, লোকায়ত সমাজনির্ভর, সংক্ষিপ্ত যদৃচ্ছাভাসমান ও পাঠান্তরমূলক। ছড়ার এই সকল বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে রয়েছে গভীর পর্যবেক্ষণমূলক জ্ঞান। এই জ্ঞানের মধ্যে আছে বিজ্ঞানমনস্কতা। সুতরাং বিষয় আলোচনা করতে হলে ছড়া যে কতখানি বিজ্ঞানভিত্তিক বা বিজ্ঞানমূলক বিশেষ জ্ঞানের সমন্বয়, তা আলোচনাযোগ্য।

পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাপ্ত ছড়াগুলির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সেই সমস্ত ছড়ার মধ্যেও বিজ্ঞান মনস্কতার ধ্যান-ধারণার খণ্ড ও অখণ্ডরূপ পাওয়া যাচ্ছে। বর্তমান অধ্যায়টিতে প্রাসঙ্গিক ছড়ার দৃষ্টান্ত, ছড়ায় বিজ্ঞান-মনস্কতা তুলে ধরার পাশাপাশি ছড়ায় ব্যবহৃত শব্দগুলির শব্দার্থবিজ্ঞান ও ভাষাবিজ্ঞান নিয়েও অনুসন্ধান এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ছড়ায় বিজ্ঞান-মনস্কতা এই আলোচনা প্রসঙ্গে ছড়ায় দর্শন এর কথা সহজেই চলে আসে। কেননা দর্শন হল যুক্তি এবং কল্পনার বাণীমূর্তি। যুক্তির সঙ্গে কল্পনার মেলবন্ধন ঘটিয়ে চরম উপলব্ধির প্রকাশ ঘটে সৃজনশীলতায়। তৈরী হয় অনুকরণমূলক নতুন সৃষ্টি বা মাইমেসিস। ছড়াকারদের ছড়া হল এই রকম সৃজনরীতি। সমাজের লোকসাধারণ হঠাৎ করে, অনায়াস এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছড়া রচনা করলেও তারমধ্যে থাকে কিছু চিত্র, অসংলগ্নতা, স্বপ্নবৎ অদ্ভুত সত্যতা, যার মধ্যে আপাতভাবে কোনো অর্থ না থাকলেও সামগ্রিক এক অর্থ পরিস্ফুট হয়, থাকে কিছু কিছু সৃজনধর্মীতা এবং থাকে কল্পনা মিশ্রত

জীবনের উপরিতলের সহজ সরল খাপছাড়া মেঠোসুর। অতি সূক্ষ্মভাব পোষণকারী না হলেও তারমধ্যে থাকে হৃদয় দোলায়িত হবার নানা কল্পজাল, যা কেবল ভাবায় না, ভালো লাগায়, জ্ঞানদান করে না, অনুপ্রাণিত করে। তাই প্রতিটি ছড়ায় রয়েছে দর্শন। দার্শনিক চিন্তাধারা নিয়ে লোকায়ত জনজীবন ছড়া রচনায় প্রবৃত্ত হয়নি, আপনা-আপনিভাবে ছড়া রচিত হলেও তারমধ্যে দার্শনিক ভাবনা সংযোজিত হয়েছে। আর এই দার্শনিকতার মধ্যে রয়েছে বিশেষ জ্ঞান অর্থাৎ লোকজ্ঞান, যাকে ছড়ায় বিজ্ঞান মনস্কতা বলতে পারি। সংক্ষিপ্তভাবে দু-একটি ছড়ার উল্লেখ করে বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনায় যাওয়া যায়। যথা ঃ

১। বাবুভায়াদের দিলে ধার
আস্‌তে যাইতে নমস্কার[৪]

২। মাচ্‌ ধর্‌বু খাবু সুখে
পাট্‌ পড়্‌বু মর্‌বু দুখে[৫]

৩। পাট্‌ পড়িয়া বা হবে
ঘসি গুড়িলে জা হবে[৬]

৪। কাই করিয়ার কে
দুটা আমড়া ভাতে দে[৭]

আলোচ্য ছড়াগুলিতে লোকায়ত মানুষের জীবনদর্শন প্রতিফলিত। যদিও আমরা জানি যে, ছড়া স্বতঃস্ফূর্ত লোকায়ত মৌখিক সাহিত্য, কোনোরূপ যুক্তি-তর্ক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মানদণ্ডে রচিত নয়। গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ হঠাৎ করে এক দর্শন লাভ করল—যারজন্যে মুহূর্তের মধ্যে বাস্তব জীবনাভিজ্ঞতামূলক মনের ভাবনাকে ভাষায় রূপদান করে রচনা করল ছড়া, এবং এরফলে ছড়াগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে এক দার্শনিক মনোভাবের।

সমাজ-মানুষ নিজেদের মতো করে ভাবনাগুলিকে ছড়ায় ব্যক্ত করেছেন এই বলে যে, বাবুভায়া অর্থাৎ সমাজের মাপকাঠিতে যারা উচ্চমানের তাদের কখনও কখনও অপেক্ষাকৃত নিম্ন বা তুলনায় ছোট্ট গরীবদের কাছ থেকেও ঋণ পরিগ্রহ করতে হয়। এটি গ্রাম্য লৌকিক জীবনযাপনের অন্যতম চিত্র। পারস্পরিক লেনদেন, এধার-ওধার, বিনিময়, কখনও কখনও কাউকে অভাবের প্রয়োজনে প্রতিবেশি হিসাবে করতে হয়, আবার ধার দিতেও হয়। পরে তা নির্দিষ্ট সময়মতো পরিশোধ করা হয়। ১নং ছড়ায় দেখা যাচ্ছে যে, বাবুভায়ারা ধার নিলে

তা সহজে পরিশোধ করে না। আজ দেবো, কাল দেবো বলে বলে বৃথা কালক্ষেপ করে, তথাপি শোধ করে না। এ বিষয়ে সমাজের মানুষ তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়, এবং তারা নিজের বিশেষ জ্ঞান দিয়ে সেই অভিজ্ঞতা ছড়ার ভাষায় ব্যক্ত করে। এইভাবে প্রকাশ পায় ছড়ায় বিজ্ঞান ভাবনা, বিজ্ঞান মনস্কতা।

সমাজ জীবনের একদিকে আছে লোকজীবন আর একদিকে আছে নাগরিক জীবন—এই দুয়ের-ই মিলিত অনুভূতিতে জন্ম নিয়েছে ছড়া। মূলত ছড়া লোকজীবনের লৌকিক সম্পদ। অজ্ঞাতপূর্বকাল সময়ে লোকায়ত মানুষ যখন ছড়া রচনা করে, তখন শিক্ষার আলোক এতদূর প্রসারিত ছিল না যে, পড়াশোনা নিরুদ্বিগ্নভাবে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হবে। তাদের কাছে পড়তে যাওয়ার নানান ঝঞ্ঝাট, তার চেয়ে মাছ ধরে ভাত খেয়ে বাড়ির ছেলে বাড়িতে নিরুদ্বিগ্নভাবে জীবনযাপন করাই বাঞ্ছনীয়। আসলে লোকায়ত মানুষের ভাবনা ছিল সীমাবন্ধ। জীবনযাত্রার মান ও তাই সীমায়িত। সীমার বাইরে অসীমতায় নয়, বাইরে যাওয়া, বিদেশী ভাষা শেখা ফিরিঙ্গি সাজা নয়, পারিবারিক জীবনালেখ্যর মধ্যে নিজেদের অস্তিত্ত্বকে টিকিয়ে রাখা। তাই ২নং ছড়ার বক্তব্য মনে করিয়ে দেয় ভারতচন্দ্রের মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণাকে, যেখানে ঈশ্বরী পাটনী অন্নপূর্ণার কাছে বলেছে ;

'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে' [৮]

খুব সাধারণ চিন্তা-ভাবনা। এই রকম সাধারণ ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে লোকায়ত আরও একটি ছড়ায়। যথা—

পড়াশুয়াঁ করে যে
গাড়ি চাপা খায় সে [৯]

ছড়াটি সমাজবিজ্ঞান মনস্কতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সাধারণ মানুষের ভাবনায় পড়াশুনা করাটাই মস্ত অভিশাপ। ছড়াটি যে বেশ প্রাচীন, এ বিষয়ে কোনো দ্বি-মত নেই। কেননা বর্তমানে পড়াশোনার গুরুত্ব সবাই বোঝে। কিন্তু বেশ কিছুকাল পূর্বে পর্যন্ত মানুষের কাছে পড়াশোনা করার অর্থ গাড়ি চাপা খেয়ে বেঘোরে জীবন দেওয়া ছাড়া অন্য কিছু নয়। এরকম একই চিন্তাভাবনার ফলশ্রুতি ৩নং ছড়াটিও। যেখানে পাঠ পড়বার চেয়ে 'ঘসি' [১০] কুড়ানো অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত।

৪নং ছড়াটিতে প্রকাশিত, সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা। যেহেতু খুব নিকট জন নয়, তাই তার জন্য 'দুটা আমড়া'ই [১১] যথাযথ। এবং 'আমড়া' এই শব্দটিও সম্পর্কের সমীকরণ প্রকাশের জন্য উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত, কেননা, 'আমড়া' হল টক জাতীয় ফল। সুতরাং সম্পর্ক যে তত মধুর নয়, সেকথা স্পষ্ট, তাই দু'টা আমড়া-ই এখানে যথাযথ। আলোচ্য ছড়াটি যে, লোকবিজ্ঞান মনস্কতার সার্থক দৃষ্টান্ত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আত্মীয়-স্বজন-পরিজন-এর সেবায় বাঙালি আত্মোৎসর্গীকৃত প্রাণ। কিন্তু যার সঙ্গে হয়তো কোনো দূর সম্পর্কের সম্পর্ক, আবার অপরিচিতও নয়, তার প্রতি পরিবার কৃপণতা পোষণ করে। তার-ই জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি ৪নং ছড়াটিতে। মধুর সম্পর্ক বোঝাতে আমরা মিষ্টত্ব আর টক-ঝাল শব্দগুলি চয়ন করি সাধারণত খারাপ সম্পর্ক বোঝাতে। তাই এখানে এই রকম আত্মীয়ের জন্য দুটো আমড়া-ই যথেষ্ট বলে ছড়ায় ব্যক্ত হয়েছে।

আমরা জানি ব্রাহ্মণ জাতি শ্রেষ্ঠ। সমাজ মানুষ তাই ব্রাহ্মণদের যথেষ্ট মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখে। একটি ছড়ায় পাই—

বাম ঠাকুর বাম ঠাকুর
ঘোলে শাদ্দ হয়?
কুন্‌শালা কয়?
তুমার বেটা শালা কয়
ও তিথি অনুসারে হয়। [১২]

এই ছড়াটিতে ব্রাহ্মণের ভণ্ডামি সাধারণ মানুষের চোখে ধরা পড়েছে। ঘোলে যে শ্রাদ্ধ হয় না, তা সধারণ মানুষ জানে। অথচ ব্রাহ্মণ-পুত্র এই কথা বলায়, তাই সেক্ষেত্রে তিথি অনুযায়ী কখনো কখনো হয় বলে ব্রাহ্মণ পিতা মন্তব্য করেছেন, — তাতে লোকায়ত মানুষের কাছে ভুল-ঠিক-এর প্রশ্ন উদিত হয়েছে।

এইভাবে উপকূলীয় অঞ্চলের বহু ছড়ায় প্রতিফলিত হয়েছে দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে ছড়ায় বিজ্ঞান মনস্কতা, সেই সঙ্গে সাধারণ সমাজ জীবন থেকে উঠে আসা নানা প্রশ্ন, যাতে রয়েছে জীবনদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান মনস্কতাও।

ছড়া ঠিক কবে রচিত হল এই কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন—

"কোনোটির কোনো কালে কোনো রচয়িতা ছিল বলিয়া পরিচয়মাত্র নাই এবং কোন্ শকের কোন্ তারিখে কোন্‌টা রচিত হইয়াছিল এমন প্রশ্নও কাহারো মনে উদয় হয় না [১৩]।"

তবে আমরা একথা বলতে পারি যে, যখন থেকে মানুষ যাযাবর জীবন অতিক্রম করে দলবদ্ধভাবে এক জায়গায় বসবাস করতে শিখল, গোষ্ঠী চেতনায় সংঘবদ্ধ হল, সংহত সমাজ গড়ে তুলল, তখন থেকে তার মৌখিক সৃজনশীলতার ফসল সৃষ্টি হল, আর তারই নিরাবয়ব প্রকাশ হল এই ছড়া।

গোষ্ঠীনির্ভর সংহত লোকায়ত সমাজ সেদিন অবসরে বসে কিছুটা ভাবনা, কিছুটা কল্পনা, আর সামান্য যুক্তির মেলবন্ধনে তৈরী করল ছড়ার কায়া। তাই ছড়া হল লোকসাহিত্যের আদিতম রূপ। সেদিনের সেই লোকসমাজের অনেকটাই পরিবর্তিত হয়ে বর্তমান নাগরিক জীবনের রূপ পরিগ্রহ করেছে। সেখানে এসেছে নানা প্রযুক্তি বিদ্যার ঢল, বিজ্ঞাননির্ভর নাগরিক জীবনের প্রবহমানতা। কিন্তু এখনো এমন অনেক গ্রাম জনাঞ্চল আছে, যেখানে নেই কোনো বৈদ্যুতিক আলো, পিচ-ঢালা কালো পথ, বিলাসিতাময় জীবনের আড়ম্বর, নেই সস্তাদরের ভদ্রতা, মিথ্যে আন্তরিকতা, সৌজন্যমূলক সম্ভাষণ, আছে গভীর জীবনবোধ, জীবনের প্রতি অফুরন্ত আকর্ষণ, পারস্পরিক বাদানুবাদ অথচ গোষ্ঠীনির্ভর সহাবস্থান, কামগন্ধহীন আন্তরিকতা, আছে বন্য-ইতর জীবনের সরলতা, আছে স্বাভাবিক ছন্দ, একের সমস্যায় অন্যের রুদ্ধশ্বাস। সেখানে এখনো লণ্ঠনের আলোয় বিনিপিসি ছেলেমেয়েদের সাথে আলো-আবছায়া-রাতজাগা মুখে রূপকথার গল্প ভাঁজে। এখনো শিশুরা অ, আ, ক, খ পড়তে বসে মেঝেতে চাঁটাই[১৪] বিছিয়ে বইয়ের পাতা ছিঁড়ে খেলার অনুশীলন করে, বাড়ির মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের ভাগ্যে জোটে সকল প্রত্যাশা, মেয়েরা পড়ে থাকে রান্না-বান্না হেঁসেলের দায়িত্বে। এখনও অভাবী কত মানুষ ছটপট করে নিজেকে বিকিয়ে দেয়, সারি সারি মাছ ধরা জাল নিয়ে মেয়েরা যায় নদীর ঘাটে, মাঠের ধান, গম, ফসল ফলানো পুরুষের ক্ষুণ্নিবৃত্তির পর অবশিষ্টাংশ খাদ্য খেয়ে এখনো মেয়েরা যায় হাটে, জঙ্গালে, গাছের ডাল পাতা কুড়াতে, যাতে বাড়ির সবাই সুখে থাকে। এখনও কত পিতামাতার চোখের জল গড়িয়ে আসে অনাহারে অপমানে, এখনো নারী হয় নির্যাতিতা, ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ, দ্বন্দ্ব-মামলা-মোকদ্দমা সম্পত্তির বেদখল অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক টানাপোড়েন। আর এই সকল বিষয়ের মূলে যে ঘাটতি, তা হল শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা। শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ[১৫] কি এই সমাজের চিত্র নয়? নাকি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'[১৬]র প্রতিফলিত রূপ এতে নেই? সবই আছে, যা আমাদের উপকূলীয় দক্ষিণবঙ্গের বহু গ্রাম-জনপদ জীবনেরও জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এই অঞ্চলের বহু গ্রামে এখনও এই ছবি রোজকার তথ্যচিত্র।

সংগৃহীত বহু ছড়ার মধ্যে এই রকমই বাস্তবচিত্র ফুটে উঠেছে, যার মধ্যে রয়েছে বহুরকম বিজ্ঞান, বিজ্ঞান-মনস্কতা, দর্শন ও জ্ঞান, শব্দার্থবিজ্ঞান এবং ভাষাবিজ্ঞানের সমন্বয়। স্বতঃস্ফূর্তভাবে রচিত এই অঞ্চলের ছড়াগুলি কেমন প্রাকৃতিক নিয়মের মতো আপনাআপনি বিজ্ঞান দ্বারা শৃঙ্খলিত, যা প্রতিটি ছড়ার বিশ্লেষণে চোখে পড়বে। আমার সংগৃহীত ছড়াতে বৈচিত্র্য এবং আধুনিকতার ছোঁয়া থাকলেও ছড়াগুলি যে, গ্রাম জীবন থেকে উঠে আসা, সে বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। বর্তমানের গ্রামজীবন পূর্বে আরো অনুন্নত গ্রাম-অতিগ্রাম্য ছিল। আজকের যে জীবনধারা পাচ্ছি, তা পূর্বোক্ত উভয় প্রকার জীবনধারার-ই প্রকাশ। আর এই উভয় ধারার সহাবস্থানে সংগৃহীত হয়েছে পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় ছড়া, যা পূর্বের মতো আজও অকৃত্রিম। সেই অকৃত্রিম মাটির ফসলগুলির অর্থবিজ্ঞান এবং ভাষাবিজ্ঞান চেতনার অনুসন্ধান আমরা এইভাবে করতে পারি—

১. ছড়ায় অর্থবিজ্ঞান চেতনার অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ

২. ছড়ায় ভাষাবিজ্ঞান চেতনার অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ।

১. ছড়ায় অর্থবিজ্ঞান চেতনার অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ ঃ

ছড়ার আলোচনা প্রসঙ্গে অর্থবিজ্ঞান চেতনার অনুসন্ধান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অর্থবিজ্ঞান হল ভাষাবিজ্ঞানের একটি বিভাগ। যে কোনো ভাষার রয়েছে তিনটি প্রধান বিভাগ ঃ

১। ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology)

২। রূপতত্ত্ব (Morphology)

৩। বাক্যতত্ত্ব (Syntax)

এছাড়াও ভাষার আলোচনার আরও একটি অন্যতম বিভাগ রয়েছে, যে বিভাগটি ভাষার অর্থ নিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক ভাবে আলোচনা করে তাই হল তার অর্থবিজ্ঞান, যাকে শব্দার্থতত্ত্ব (Sementics) ও বলা হয়। ভাষার আলোচনায় ভাষার অর্থবিজ্ঞানকে আমাদের জানতে হবে। ড. রামেশ্বর শ' তাঁর 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাঙলাভাষা' [১৭] গ্রন্থে বলেছেন—

"...অর্থই ভাষার অন্তরের মূল সত্তা। এই অর্থকে বাদ দিয়ে ভাষা সম্পর্কিত কোনো আলোচনাই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না।" [১৮]

আমরা জানি, শব্দের অর্থ চিরকাল এক বা অপরিবর্তিত নয়, প্রতিটি শব্দের অর্থ দেশ-কাল-ভৌগোলিক সীমার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। তাই একই শব্দের নানা অর্থ প্রকাশ পায়। তবে প্রতিটি শব্দের নিজস্ব মূল অর্থ থাকলেও কখনও তা আবার ভিন্ন ভিন্ন অর্থেও প্রযুক্ত হয়।

"পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাপ্ত ছড়ায় লোকজীবন এবং সমাজচিত্রের পরিচয় অন্বেষণ ও তার পর্যালোচনা" শীর্ষক —গবেষণার এই তৃতীয় অধ্যায়ে ছড়ার অর্থবিজ্ঞান চেতনার অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই অধ্যায়ে ক্ষেত্র সমীক্ষায় প্রাপ্ত ছড়াগুলির শব্দার্থবিজ্ঞান তথা অর্থবিজ্ঞান চেতনার দিকটি আলোচিত হবে।

ছড়ার দেহ-কাঠামো গঠনে একদিকে যেমন আঙ্গিকগত দিক আছে, তেমনি আছে তার শব্দার্থগত দিকও। আমরা ছড়ার এই শব্দার্থগত বিজ্ঞান চেতনার দিকটির প্রতি-ই যত্নবান হব। প্রতিটি শব্দের আছে নির্দিষ্ট অর্থ। এই অর্থ-ই শব্দ চয়নের মানদণ্ড। কবি সাহিত্যিকগণ তাঁদের লেখার বিষয়বস্তু অনুযায়ী অর্থপূর্ণ শব্দযোজন করেন। তবেই সে লেখা হয়ে ওঠে যথাযথ সাহিত্যপ্রতিমা। শব্দ বা বাক্য তার অভিধানিক অর্থের বাইরে আরও অতিরিক্ত কিছু বলে, যা তার মূল অর্থকে ছাপিয়ে যায়, শব্দ বা বাক্যের এই অতিরিক্ত কিছু-ই হল তার ব্যঞ্জনা অর্থ। তা মূলকে আশ্রয় করে গড়ে উঠলেও মূলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাপ্ত বহু ছড়ায় এরকম বাহ্যিক রূপের আড়ালে আছে এক গভীর অর্থবিজ্ঞান মনস্কতা, যাতে সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের ভাবনাটিও ব্যক্ত। ছড়ার অর্থবিজ্ঞান আলোচনার সময় আমরা সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের দিকটিও তুলে ধরার চেষ্টা করব। ভাষা কীভাবে সমাজে কাজ করে এবং সমাজও কীভাবে ভাষার ওপর প্রভাব বিস্তার করে, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের বিভিন্ন ভাষা, নারীর ভাষা, পুরুষের ভাষা, পেশাগত ভাষা প্রভৃতি সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। তাছাড়া বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানে আছে, "... কোন ভাষার চরিত্র নির্ভর করে বক্তা (Sender), শ্রোতা (Receiver), এবং উপলক্ষ্য (Setting)-এর ওপর।"[১৯] ছড়ার রকম ভেদ হচ্ছে, কখনও পুরুষ অনুযায়ী কখনও বাচ্য অনুযায়ী কখনও বা স্থান অনুযায়ী আবার কখনও সংখ্যানুযায়ী। যাইহোক প্রাপ্ত ছড়ার নিরিখে এই আলোচনায় প্রবিষ্ট হওয়া যায়। ছড়া ঃ

দিনে দিনে করিয়া
খাইলি মাসে
এক্কাদিনা পৌঁছি গেল
জঁ তিরিশে[২০]

—ছড়াটি অসাধারণ একটি অর্থবিজ্ঞানের দৃষ্টান্ত। গ্রামের অন্তেবাসী খেটে খাওয়া মানুষ, 'দিন আনতে যাদের পান্তা ফুরোয়', অভাবের সংসারে যারা চিন্তা করে কীভাবে দু-মুঠো সঞ্চয় করবে, বাস্তবিক তাদের সঞ্চয় হয়ও না। আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি বাড়ি ঘুরে কোনো রকমে দিন কাটায়, 'খাইলি মাসে' অর্থাৎ তিরিশটা দিন। এখানে 'মাস'টা কেবল 'মাস' অর্থে নয়, এরমধ্যে দরিদ্র জীবনের তিরিশ দিনের অভাব ঘোচানোর এক কৌশল ধরা পড়েছে, এখানে সমাজ মানুষের ভাষাই ব্যক্ত, যেখানে বক্তা এক শ্রোতা এক বা বহু থাকতে পারে, বক্তার এই ভাবনায় পরের তিরিশ দিন অর্থাৎ গোটা মাসটা ভালো কাটানোর একটা স্বপ্নও সুপ্তভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু দুঃখের রাত্রি আর পোহায় না, তার সংবাদ পরবর্তী চরণে —'এক্কাদিনা পৌঁছি গেল জঁ তিরিশে' —এই চরণের 'এক্কাদিনা' পৌঁছি গেল, জঁ তিরিশে শব্দগুলি এককথায় অপূর্ব। 'জঁ তিরিশ' অর্থাৎ তিরিশ জন মানুষ মানেই এখানে তিল তিল করে সঞ্চিত একমাসের খাদ্যসামগ্রী খাওয়ার মতো এক ঝাঁক আত্মীয়ের 'পৌঁছি গেলা' হঠাৎ আসার কথা বলা হয়েছে। এখানে সমাজভাষা 'এক্কাদিনা', 'ক' ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব প্রয়োগ ঘটেছে এবং 'জঁ' নাসিক্যীভবনও ঘটেছে। যার মাধ্যমে ছড়াটি অনেক বেশি, সমাজ মানসিকতা তথা সমাজ বিজ্ঞানের ভাবনাকে প্রকাশ করেছে, গভীর অর্থবিজ্ঞানের দিকটিকে প্রকটিত করেছে, যা খেটে-খাওয়া লোকায়ত জীবনের দুর্বিসহ অভাবের জ্বালাকে বেদনার চিত্রে আভাসিত করে তুলেছে।

প্রতিটি শব্দের নিজস্ব এক সঞ্জীবনী শক্তি আছে। যে শক্তির বলে শব্দগুলি সমাজ মানুষের মনে এক গভীর অনুভূতির সৃষ্টি করে। আর ঐ অনুভূতির ফলে আমরা ঐ শব্দের বিশেষ এক অর্থ লাভ করি, যাকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় অর্থবিজ্ঞান বলে থাকি। এই রকম একটি উল্লেখযোগ্য অর্থবিজ্ঞানের চিত্র পাওয়া যাবে নিম্নোক্ত ছড়ায়—

আমার নাম চিন্তামণি
ভালো পান ভাঙ্গাতে জাঁয়ি

আমার অসুদ কড়াকড়া

ছেলে হবে জড়া জড়া[২১]

পান এখানকার উল্লেখযোগ্য কৃষিজাত ফসল। পান সকলে স্বাদপূর্ণ করে 'ভাঙ্গাতে' অর্থাৎ সাজাতে পারে না। পান সাজানো একটি শিল্পকর্ম। চিন্তামণি নামের জড়িবুটিওয়ালা এ বিষয়ে বিশেষ দক্ষ। এই জড়িবুটিওয়ালা একজন লোক-চিকিৎসক। এই চিকিৎসার সঙ্গে রয়েছে সংস্কার, বিশ্বাস, টোট্কা, লোকায়ত ভেষজ বিদ্যা। এই লৌকিক জ্ঞান পূর্বপুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত। সমাজ ভাষা বিজ্ঞানের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি এখানে ফুটে উঠেছে। সমাজে বাস করে, তাই ছেলে না হওয়ার কষ্ট সমাজের সব মানুষের। সমাজের বাকি লোকজন তাই খুঁজে নিয়ে এসেছে এই জড়িবুটিওয়ালাকে, যাতে করে ছেলে না হওয়ার কষ্ট তার লাঘব হয়। আর এইখানেই সমাজ-মানুষের জীবনের অর্থটাও প্রকাশিত। এই চিন্তামণির অসুদের গুণে ছেলে হবে জড়াজড়া[২২]। এখানে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ইঙ্গিত থাকলেও থাকতে পারে। যেখানে মেয়ের স্থান নেই। কড়াকড়া অসুদে ছেলে-ই হবে জড়াজড়া। মেয়ে কিন্তু নয়। আসলে খেটে খাওয়া শ্রমজীবনে মানুষ চায় ছেলে হোক, তা আবার একসঙ্গে যমজ, যাতে করে বাচ্চা হওয়ার খরচ ও অনেকখানি সাশ্রয় হবে এবং যে ভবিষ্যতে বংশে বাতি জ্বালাবে। ছড়ায় এইভাবে শব্দার্থবিজ্ঞান ধরা পড়েছে, যা এককথায় অনবদ্য, চমৎকার।

অপর একটি ছড়ায় পাই—

মা মর্‌ল মাউগ্ বেইল

যৌ তিন্‌কে সৌ তিন্ হইল[২৩]

— আলোচ্য ছড়াটিতে অপূর্ব এক গাণিতিক হিসাব রয়েছে। 'মা মরল' এবং 'মাউগ বেইল' এখানে 'মাউগ' শব্দটির অর্থ স্ত্রী, যার ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তন হয়েছে মাগ > মাউগ (অপিনিহিতি)। অর্থাৎ মা মারা গেল এবং স্ত্রী প্রসবও করল। যাতে পরিবারের একজন সদস্য হ্রাস পেলেও পুনরায় স্ত্রী প্রসব করায় সেই সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধিও পেলো। এতে পরিবারের সদস্য 'যৌ তিনকে সৌ তিন' জন-ই থাকল। ছড়াটিতে আমাদের কেবল পরিবারের কয়েকটি সংখ্যা শুধু নয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্থের হাড়ির সংবাদও পোষণ করে। অভাবের সংসারে একজন লোক খেতে কমে যাওয়া মানে গরীবের অনেক স্বস্তি, কিন্তু ভাগ্য তা হতে দেয় না, পরক্ষণে ছড়া জানায় স্ত্রী আবার এক সদস্যের জন্ম দিয়ে

খরচের শিকা-ই বহাল রেখেছে। ছড়াকারগণ উপরোক্ত ছড়াটির মধ্যদিয়ে বাস্তবজীবনের দুর্বিষহ এক সংবাদ দেয়, যেখানে নিরুপায় মানুষ এ-ও ভাবে কখন একজন সদস্য কমবে। তাহলে জীবনের গতিটা যেমন করেই হোক্ চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে। ছড়াটিতে এক গভীর অর্থবিজ্ঞান দ্যোতিত হয়েছে। আরো একটি ছড়ায় পাই—

ঝি রইনে জামির আদর
নাইনে জামি গাছের বাঁদর [২৪]

'ঝি' শব্দের আদি অর্থ কন্যা বা মেয়ে। কন্যা থাকলে তবে জামাই-এর আদর। 'জামি' এসেছে জামাই থেকে, যেখানে 'ই' ধ্বনি লোপ পেয়েছে এবং 'আ' স্বরধ্বনি 'ই' স্বরধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়েছে। দ্বিতীয় চরণে 'নাইলে' ধ্বনিতাত্ত্বিক রূপ 'না হইলে' থেকে এসেছে। বাঁন্দর > বাঁদরে পরিণত হয়েছে। সমাজ মূল্যায়ন সবচেয়ে বড় মূল্যায়ন। প্রকৃতপক্ষে মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার ফলে জামাই সম্পর্কের সূচনা হয়। মেয়ের জন্য জামাইও হয় অতি আদরের ধন। বাঙালি ঘরের এই দু'জন অতি প্রাণের সম্পদ, যার চিত্র 'আগমনী-বিজয়া' [২৫] পর্যায়ে পাই। তেমনি লৌকিক জীবনেও তাদের মর্যাদা কোনো অংশে কম নয়। বাঙালি ঘরের 'বারো মাসে তের পার্বনে' তারা নিত্য সঙ্গী, সেই মর্যাদার পদস্খলন ঘটে যদি কন্যা রত্নটি না থাকে। এই চরম সত্যই, এখানে আভাসিত। কন্যা বিহীন জামাই গাছের 'বাঁদরে'র-ই সমান, অমর্যাদার বিষয়, গাছের 'বাঁদর' যেমন গাছের, অর্থাৎ দূরের, যে সমাজ ছাড়া, ঐ জামাইও ঠিক যেন সমাজ-সম্পর্কহীন, দূর অজানা। অর্থবিজ্ঞান এখানে এই রূপ গভীর অথচ বাস্তব সত্যজ্ঞানকে রঙ্গ-তামাসার মোড়কে প্রকাশ করেছে।

কাছের কুটুম্ ছঁচের লাতা
দূরের কুটুম্ ফুলের ছাতা [২৬]

—উপরোক্ত ছড়াটিতে বলা হয়েছে, 'কাছের কুটুম ছঁচের লাতা' এবং 'দূরের কুটুম ফুলের ছাতা।' এখানে কুটুম শব্দটি কুটুম্ব-র পরিবর্তিত ধ্বনিরূপ। 'ছঁচের লাতা' শব্দদুটির অর্থ গোমাই এবং জল সহযোগে একপ্রকার মিশ্রণ, যা কাপড়ের অংশ দিয়ে পল্লীগ্রামের বধূরা প্রাতকালীন গৃহের মাঙ্গালিক সূচনা করে পরিবেশ পরিশুদ্ধতার মধ্য দিয়ে। ঐ মিশ্রণ যে কাপড়ের অংশতে মাটির দাওয়ায় দেওয়া হয়, তাকে 'লাতা' (অর্থাৎ নাতা) বলা হয়। 'ল' ব্যঞ্জন 'ন' ব্যঞ্জনধ্বনিতে পরিণত। নাতাটির সমাদর তার কার্যকারণের উপর নির্ভরশীল

বলে কাজ ফুরালেই ঐ নাতা অযত্নে, অনাদরে দূরে ছুঁড়ে দেওয়া হয়। ঠিক তেমনি বাড়ির পাশাপাশি বা কাছাকাছি থাকা আত্মীয়-স্বজনরা সমাদরহীন 'ছঁচের লাতা'র মতোই অনাদরিত হয়। কিন্তু ছড়ায় শুনি যারা দূরের আত্মীয়, তারা ফুল ভরা ছাতার সৌন্দর্যের মত সমাদরপূর্ণ। আদর-আপ্যায়ণ, সৌজন্য সমাদর তাদের জন্য চিরকাল থাকে। আসলে এর কারণ যারা কাছে থাকে তারা সবসময় আসা-যাওয়া করে, আর যারা দূরবর্তী, দীর্ঘদিন পর পর বাড়িতে আসে, তাদের প্রতি আন্তরিকতা যেন তাই অনেকটাই বেশি হয়। প্রবাদ আছে 'গেঁও যোগী ভিক্ পায় না।' এর মূলে আছে সমাজ অর্থবিজ্ঞানগত ভাবনা। ঠিক এই ভাবনায় ভাবিত আরো দুটি ছড়া হল ঃ

১। কাই করিয়ার কে
দুটা আম্ড়া ভাতে দে[২৭]

২। আয়ু ভাতে ভাত্
কুটুম থাক্বু কত থাক্[২৮]

উপরের ১নং ছড়াটি পূর্বে আলোচিত, তবু বলা যায়, 'কাই করিয়ার কে' অর্থাৎ কোথাকার কে, তারজন্য দুটা (দুটা > দুইটা), আমড়া ভাতে দেওয়াই যথেষ্ট। আমড়া হল টকফল, আত্মীয়তা যখন প্রগাঢ় না হয়, তখন তা টকফলের মতই অপ্রিয় হয়, তাই সেই অপ্রিয় আত্মীয়ের জন্য ঐ 'আমড়া' শব্দের প্রয়োগ যথার্থই অর্থবহ। অর্থাৎ অর্থগত গভীর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে। তেমনি ২নং ছড়ায় ও একই মনস্তাত্ত্বিক ভাবনা দ্যোতিত হয়েছে, যেখানে কুটুমকে[২৯] আপ্যায়ণ করবার মানসিকতাই নেই, তাই সেইখানে খাদ্যদ্রব্যের অতিশয্য দেখিয়ে আর কাজ নেই। শুধু 'আয়ু ভাতে ভাত'[৩০] খেয়ে যদি কুটুম থাকে তবে থাক্, নয়তো চলে যাক্। অর্থাৎ ইতিবাচক মন্তব্যের আড়ালে নেতিবাচক ভাবনা কাজ করছে। সমাজ মনোবিজ্ঞানগত দিকটি এখানে প্রতিফলিত, যার মধ্যে অর্থবিজ্ঞানের ভাবনা খুঁজে পাচ্ছি।

সমাজ আজ বড় কৃত্রিমতায় ভরপুর। সেখানে যে যত বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ হয়, তার চটকদারিতে মানুষ সহজেই বিচলিত হয়। ধন-দৌলত, অর্থ-সম্পদ, মানুষের কাছে অতিপ্রিয়, যার এইসব আছে, সমাজ মানুষ তার দাম দেয়। আর যার নেই, তার এ সংসারে কোনো দাম-ই নেই। এরকম ভাবনায় প্রকাশিত গ্রাম্য একটি ছড়া হল ঃ

গরীবের মাউগ

সকলের শালা ভাউজ্ [৩১]

আমরা পূর্বে জেনেছি, 'মাউগ' [৩২] শব্দের অর্থ স্ত্রী। গরীব মানুষের জীবনের মতো গরীব 'স্ত্রীর' ও কোনো মর্যাদা নেই অপরের কাছে ছড়াটিতে সেই বক্তব্যই প্রকাশিত। গরীবের স্ত্রী বড় সস্তা, সামাজিক অর্থবিজ্ঞান ঠিক এই দিকটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। গ্রাম-সংস্কৃতি তথা উপকূলীয় অঞ্চলে শালা ভাই-এর 'বউ' ও রসিকতার পাত্রী, যাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা, সস্তা মুখরোচক দু-চার কথা প্রায় সবাই যেন বলতে পারে, এ যেন সমাজের কাছে এক অলিখিত ছাড়পত্র, এ নিয়ে কেউ কিছু অভিযোগ যেমন করে না, তেমনি কেউ সমালোচনা বা তর্কও করে না। যেজন্যে গরীবের স্ত্রীগণ উপহাস্যের পাত্রী হয়ে ওঠে। সমাজের সকলের কাছে তাদের যেন একটাই পরিচয়, —'শালাভাউজ'।[৩৩] ছড়াটিতে বক্রোক্তির ভঙ্গীতে সমাজ মনস্কতার সঙ্গো অর্থবিজ্ঞান চেতনার অসাধারণ উপমা প্রকাশিত। এই ভাবনার মতো আরও দু-একটি ছড়া হল ঃ

১। ধনিয়ার মু ধনিয়া চায়
    নিধনিয়ার মু গড়াগড়ি খায় [৩৪]

২। তেলুয়া মুড়ি তেল পায়
    উখ্‌লা [৩৫] মুড়ি চাইয়্যা যায় [৩৬]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় পাই 'এ জগতে হায় সেই বেশি চায়, আছে যার ভুরি ভুরি' [৩৭] (দুই বিঘা জমি) —এখানেও দুটি ছড়ায় সমাজ ভাবনার এই দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। 'ধনিয়া' শব্দটির অর্থ অধিক ধন আছে যার, এবং 'নিধনিয়া' শব্দটির প্রচলিত অর্থ 'ধন' নেই যার। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় ধনবান ব্যক্তি ধনবান ব্যক্তিকেই চায়, এই 'চাওয়ার' অর্থ দেখা নয়, উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে সবকিছুর সঙ্গো সঙ্গো আর্থিকভাবে ও সাহায্য করা। কিন্তু যার কিছু নেই, তার ভয়ঙ্কর বিপদের দিনে পাশে দাঁড়ানোর জন্য কোনো বন্ধুও নেই। সমাজের এ যেন অলঙঘনীয় নিয়ম। তেমনি ২নং ছড়ায় আছে যার মাথায় তেল (তৈল > তেল) আছে, তাকেই সবাই তেল দান করে, যার চুলে এক ফোঁটা তেল নেই, 'উখলা' হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তাকে কারোর চোখেও পড়ে না। মুড়ি শব্দটি মণ্ড < মুঁড় < মুড়া < মুড়ি—এভাবে ধ্বনিগত পরিবর্তনের ফলে এসেছে। ছড়া তাই নিছক ছড়া নয়, এর সমাজ মনোবিজ্ঞান, সমাজ ভাষাবিজ্ঞান এবং অর্থবিজ্ঞানের দিকও ভেবে দেখবার মতো।

জঁতায় [৩৮] ন দেলু [৩৯] তুঁড়ে [৪০]
মইনে দিলু মুঁড়ে [৪১]

— অর্থাৎ ছড়াটিতে ব্যক্ত হয়েছে, জীবনে বেঁচে থাকতে যা মুখে দেওয়া হয়নি মৃত্যুকালে মাথার কাছে তাই দেওয়া হয়েছে। মরা মানুষ কথা বলে না, বলে সমাজ, সমাজের লোক কবিরা। জীবদ্দশায় যথাযথ সেবা কর্তব্য না করে মৃত্যুকালে লোক দেখানো কিছু আতিশয্য, আদিখ্যেতা, লোকছড়ায়ও চাপা থাকে না, লোকমানুষ তা ছড়ার ভাষায় ব্যক্ত করে মানুষকে শিক্ষা দেয়, অন্তরের যাতে শুভবোধ জাগ্রত হয়। উপরোক্ত ছড়ায় সে কথাই ব্যক্ত হয়েছে। এটি একটি সমাজ প্রতিবাদমূলক ছড়াও।

অন্য একটি ছড়ায়ও আর্ত দরিদ্র মানুষের ঈশ্বরের প্রতি, প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। সরল সহজ মানুষ সমাজ-সংসারে পিষ্ট হতে হতে যখন নিজের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে, তখন তারা নিজেদেরকে সঁপে দেয়, ঈশ্বরের পায়ে, ভাবে ঈশ্বর-ই আশা-ভরসা, এ জীবনের কাণ্ডারী। কিন্তু তাতেও যখন সুরাহা হয় না, মুখের ভাষা তখন হয় প্রতিবাদী ঃ

চিরকাল গেল ঝোট্‌পাতা খাইয়্যা
বুড়া শিবকে সেলাম করে চিৎপিটিয়া শুইয়্যা [৪২]

—সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে, বক্তা এখানে ভক্ত নন, ভক্তের ভক্তিকে তিনি কটাক্ষ করেছেন। কেননা, এত ভক্তির পরেও ভক্তের অবস্থার পরিবর্তন নেই। ঝোটপাতা-ই তার জীবন। তাহলে দেবাদিদেব মহাদেব অর্থাৎ 'বুড়াশিবকে সেলাম' করে লাভ-ই বা কী হল ? 'ঝোটপাতা' হল পাটপাতা, যাকে শাগ হিসেবে রান্না করা হয়। খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ এখানে সংসার চালাতেই ওষ্ঠাগত প্রাণ, জীবনে বেঁচে থাকার জন্য নূন্যতম দু-মুঠো ভাত পায় না, তার পরিবর্তে 'ঝোটপাতা'কে আহার্য হিসেবে মেনে নিয়ে ক্ষুনিবৃত্তি করে, তখন আর ঈশ্বর আছেন একথা ভেবে কী লাভ ? তখন আদি দেবতা মহাদেবকে যে 'চিৎপিটিয়া' [৪৩] (চিৎ হয়ে শুয়ে নমস্কার) সেলাম ও তো হাস্যকর হয়ে ওঠে। তাই কোনো সচেতন প্রতিবেশি বক্তার এমন কটাক্ষ খুবই স্বাভাবিক। এই ছড়া শুধু ভক্তকে নয়, সেই সঙ্গে সমাজের অনেককেই চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, প্রতিটি শব্দ নিছক শব্দ নয়, অর্থের ব্যাপকতায়, অর্থাতিরিক্ত ভাব ফুটিয়ে তুলেছে, ছড়াটি অর্থবিজ্ঞানের অন্যতম দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে।

প্রতিটি মানুষের নিজ নিজ স্বাদ-আহ্লাদ থাকে। সেই সঙ্গে থাকে জীবিকা নির্বাহের চিন্তাও। কিন্তু বাস্তবিকই সবকিছুর ইচ্ছেপূরণ হয়ে ওঠে না। কারণ সবার অর্থনৈতিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সহায়ক নয়। এইরকম একটি পরিস্থিতির কি চমৎকার মোকাবিলা ঘটে গেল, নিম্নোক্ত ছড়ায়—

বিনা পইসায় চাক্‌রি আছে
এ বাংলার বুকে
মেধা তালিকায় রইনে নাম
পরোয়া করি কাকে? [৪৪]

—ছড়াটি খুবই সমসাময়িক। এর আক্ষরিক অর্থ, বিনা পয়সায় এখনো এই বাংলায় চাকরি আছে। যদি নাম মেধা তালিকায় থাকে, তাহলে কাউকেই পরোয়া করতে হয় না। কিন্তু এর পক্ষান্তরে যা বলা হলো না, অব্যক্ত থেকে গেলো, তা হলো, পয়সা দিয়েও চাকরি পাওয়া যায় গণতান্ত্রিক দেশে এহেন অগণতান্ত্রিক ক্রিয়া-কলাপের দিকেই হয়তো ইংগিত করেছে ছড়াটি।

এভাবে বহু ছড়া পাওয়া যাবে, যার মধ্যে গভীর অর্থবিজ্ঞানগত দিকটি ফুটে উঠেছে। আলোচনা দীর্ঘায়িত না করে বলা যায় যে, ছড়ায় অর্থবিজ্ঞান চেতনার অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

২. ছড়ায় ভাষাবিজ্ঞান চেতনার অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ ঃ

মনের ভাবনাগুলোর প্রকাশ মাধ্যম হল ভাষা। ভাষার মধ্যদিয়ে আমরা একে অপরের কাছে সহজেই পৌঁছে যাই, অন্যের কথা বুঝতে পারি। ছড়ার আলোচনায় ভাষা তাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই ভাষাকে আবার বিজ্ঞানভিত্তিকভাবে আলোচনা করা ভাষাবিজ্ঞানের বিষয়। ভাষাবিজ্ঞান হল, যে বিজ্ঞান ভাষার বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা করে, তাই ভাষাবিজ্ঞান। এই উপ-অধ্যায়ে 'ছড়ায় ভাষাবিজ্ঞান চেতনার অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ' বিষয়ে আলোকপাত করবো। তারপূর্বে উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাপ্ত ছড়ার ভাষায় ভৌগোলিক স্তরগত বিভাজনটি দেখে নেবো।

উপকূলীয় অঞ্চলের লোকভাষায় (Folk Speech) ছড়াগুলি প্রচারিত রয়েছে। মৌখিক কথ্যের দিকে প্রবলভাবেই ঝুঁকে রয়েছে এই ভাষা। কথন নির্ভর বলেই ছড়াগুলির ভাষা

বেশ সহজবোধ্য। তবে তাতে থাকা বিভিন্নতা তথা বৈচিত্র্যগুলিকে অনেক সময় পৃথক চিহ্নে সমীক্ষিত এলাকার ছড়ার ভাষাকে কয়েকটি স্থান নির্ভর উপস্তরে পৃথক করে দেখা চলে। শব্দের ব্যবহারে তথা অন্বয় রীতির পার্থক্যে স্থানগত বিভাজন সম্ভব। ভৌগোলিক স্তরে বিভাজনটি এইরূপ—

মূল উপকূলীয় অঞ্চল

ক.	খেজুরী	মালঝিটা স্তবক	]
	কাঁথি	দণ্ডভুক্তি স্তবক	
	এগরা	সুহ্মক স্তবক	
খ.	রামনগর		]
	দীঘা	ওড়িয়া প্রভাবিত বাংলা	
	সাতমাইল		
গ.	তমলুক		]
	কোলাঘাট	রাঢ়ী কেন্দ্রিক	
	হলদিয়া		
ঘ.	চণ্ডীপুর		]
	নন্দীগ্রাম	রাঢ়ী ঝাড়খণ্ডী	
	বাজকুল		

—এইরূপ স্তরগত বিভাজনে সংগৃহীত ছড়াগুলির ভাষার ভৌগোলিক অবস্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে এইরূপ বিভাজনের রেখাগুলি সরল নয়, বরং অনেকটাই বক্র। কারণ ভাষাগত স্রোত কোথাও কোথাও অবরুদ্ধ, কোথাও কোথাও আবার বহমান। তাই ভৌগোলিক সীমারেখায় ছড়ার ভাষাগুলিকে নির্দিষ্টভাবে বেঁধে ফেলা যায়নি। কেবল ভাষার ও ভাষা ব্যবহারের মোটা দাগগুলি যে পার্থক্য চিহ্ন গড়েছে, সেগুলিকে প্রতিপন্ন করা গিয়েছে।

খেজুরী, কাঁথি, এগরা—তিনটি স্থানের মধ্যে কাঁথি এবং এগরা পৃথক পৃথক মহকুমা হিসেবে গণ্য। কাঁথি মহকুমার অন্তর্ভুক্ত হল খেজুরী, সমগ্র খেজুরী থানা অঞ্চল। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বাঙলাভাষাতত্ত্বের ভূমিকা'[৪৫] গ্রন্থে আলোচ্য এলাকার লোকায়ত

ভাষাকে 'সুহ্মক বাংলা'[৪৬] নামে অভিহিত করেছেন। প্রাচীন সূহ্মভূমির নামেই ভাষাটির এরূপ নামকরণ করেছেন তিনি। ভাষাতাত্ত্বিক সুকুমার সেন তাঁর 'ভাষার ইতিবৃত্ত'[৪৭] গ্রন্থে 'দণ্ডভুক্তি স্তবক'[৪৮] এবং প্রোমনন্দ প্রধান মহাশয় তাঁরা 'হিজলীনামা'[৪৯] গ্রন্থে 'মালঝিটা বাংলা'[৫০] —এইসব নামে এলাকার প্রচলিত ভাষাকে চিহ্নিত করেছেন। সন্দেহ নেই যে, আঞ্চলিক স্তরের বাংলা ভাষার এই ধরণের নামকরণ করা হয়েছে প্রাচীন তথা ঐতিহাসিক স্থান নাম অনুসারে।

খেজুরী কাঁথি এবং এগরা জনবিন্যাসগত ভাবে মাহিষ্য প্রধান এলাকা হলেও এই স্থানগুলিতে অন্যান্য জাতিগত পরিচয়ে পরিচিত বিচিত্র বিচিত্র পেশার মানুষরা বসবাস করে। তুলনায় কাঁথি মহকুমার অন্তর্ভুক্ত সাতমাইল (কাঁথি সদর থানা), রামনগর থানা, দীঘা থানা—বিস্তৃত অঞ্চলে ওড়িয়া প্রভাবিত লোকায়ত বাঙলা ভাষার প্রচলন আছে। মোটামুটিভাবে বলা যায়, উড়িষ্যার উঃ ও উঃ পূর্ব সীমান্তবর্তী পশ্চিমবঙ্গের এই অংশে গোষ্ঠীগত পার্থক্য বজায় রেখে ও ভাষাভাষীদের সকলে ওড়িয়া প্রভাবিত বাংলা ভাষায় কথা বলেন। লোকায়ত ছড়াগুলিতে তাই ওড়িয়া মিশ্রিত বাংলা ভাষার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

উপকূল এলাকার একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে রাঢ়ীকেন্দ্রিক ভাষা। যে এলাকাগুলি রাঢ়ী উপভাষা প্রভাবিত, সেই স্থানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তমলুক, কোলাঘাট এবং হলদিয়া। বলা যায় তমলুক মহকুমার পূর্ব এবং পশ্চিমাংশ জুড়ে কেন্দ্রিয় উপভাষা রাঢ়ীর প্রভাব রয়েছে। তমলুক মহকুমার দক্ষিণাংশ— বাজকুল, চণ্ডীপুর এবং দক্ষিণ পূর্বাংশ নন্দীগ্রাম এই বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে রাঢ়ী মিশ্রিত ঝাড়খণ্ডী উপভাষার বিশেষরূপে সন্ধান পাওয়া যায়। উচ্চারণের বিন্যাস থেকে এলাকার ভাষাগুলির পার্থক্যচিহ্ন অনুভূত হয়। ভাষা বিষয়ে অভিজ্ঞ মানুষেরা সহজেই ভাষার ব্যবহারের পার্থক্যগুলি চিনতে পারেন। শব্দের ব্যবহারে এবং ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে পার্থক্যগুলি সুচিহ্নিত হয়।

এই অধ্যায়ের পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে সংগৃহীত ছড়াগুলির বিজ্ঞানভিত্তিক ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দেখানো হয়েছে যে, বাংলা ভাষাবিজ্ঞানের মূল বৈশিষ্ট্য আঞ্চলিক স্তরে সংগৃহীত ছড়ার ভাষায় কতটা পরিমাণে রক্ষিত আছে এবং প্রয়োগমূল্যে আলোচ্য ছড়াগুলির ভাষার সৃজনশীলতা সমভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই আলোচনা তিনটি উপধারায় এগিয়েছে—

ক। ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিচয়।

খ। রূপতাত্তিক পরিচয়।

গ। বাক্যগঠনগত বৈশিষ্ট্য।

ক। উপকূলীয় এলাকায় প্রচলিত তথা সংগৃহীত ছড়াগুলির ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিচয়ঃ

উপভাষা বিষয়ে যে সব পূর্বগত বিভাজন ছিল, ভৌগোলিক প্রেক্ষিতে তাকে পূর্বী ও দঃ পূর্বীস্তরের ঝাড়খণ্ডী হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। যাকে আমরা সূত্মক বাংলা, মালঝিটা বাংলা এইসব উপনামে চিহ্নিত করেছি। এছাড়া রাঢ়ী উপভাষার পশ্চিম অংশের উপভাষিক চিহ্ন ছড়িয়ে রয়েছে নির্দিষ্ট উপকূলীয় অঞ্চলে। স্বাভাবিক কারণেই স্থানগত উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ রয়েছে ছড়াগুলির ধ্বনিতাত্ত্বিক অবস্থান। বাংলা ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের সাধারণ পরিচয়সহ এই ছড়াগুলির ভাষায় রয়েছে এমন সব ধ্বনিবৈচিত্র্য, যা স্বভাবে স্বতন্ত্র, সেহেতু বিশিষ্টতর।

স্বরভক্তি ঃ বামনদেব চক্রবর্তীর মতে, যুক্তবর্ণের উচ্চারণক্লেশ লাঘব করবার জন্য দুই ব্যঞ্জনের মাঝে স্বরধ্বনি এনে বর্ণ দুটিকে পৃথক করার রীতি স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ। প্রাপ্ত ছড়াগুলিতে কোথাও কোথাও স্বরভক্তির ব্যবহার রয়েছে। যেমন—‘যেদিন যাহা মিলই সানন্দে আহার করই’ (ছড়া সংখ্যা-৪৬) এখানে ‘মিলই’ এবং ‘করই’ শব্দদুটিতে স্বরভক্তির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় ঃ

মিলি>মিলই=(ম্+ই+ল্+ই>ম্+ই+ল+অ+ই)

করি>করই=(ক্+অ+র্+ই>ক্+অ+র্+অ+ই)

চর্যায় ‘মিলি’[৫১] শব্দের ব্যবহার আছে। এর অর্থ হল প্রাপ্তি (নং ৮, কম্বলাম্বর পাদ)। অনুরূপভাবে ‘করই’ শব্দে থাকা স্বরভক্তিটি ঔপভাষিক। দুটিতেই ওড়িয়া প্রভাব রয়েছে। দুটি শব্দই ক্রিয়া নির্ভর, সেই অর্থে ক্রিয়াপদ। প্রাচীন বাংলায় এইরূপ ক্রিয়াপদের ব্যবহার সুলভ। ‘করই’-এর সমধর্মী ক্রিয়াপদ হতে পারে গড়ই (সংগঠতি, ঐ পৃ-৭৪)। প্রাচীন বাংলা গটই অপভ্রংশ প্রভাব।

অনুরূপ শব্দ ‘পড়ধানি’, ‘পরের ধনে পড়ধানি / সুকা বিকিয়া মহাজনি’, (ছড়া সংখ্যা-৩৫৯) শব্দটির মূলে রয়েছে ‘প্রধান’। উচ্চারণ বেগুণে-‘পড়ধান’। প্রধানের কাজ = প্রধান গিরি, ঔপভাষিক প্রয়োগ পর্‌ধানি। ‘র’—এই কম্পনজাত ধ্বনিটি পরিণত হয়েছে তাড়িত ধ্বনিতে। যেমন পরধানি>পড়ধানি।

সূত্র ঃ র>ড়। লক্ষণীয় যে, তরল ও তাড়িতধ্বনি এই উপভাষায় পূর্ণরূপে উচ্চারিত হয়।

স্বরভক্তিজাত শব্দ 'পেতিনী' ভূত আমার পুত / পেতিনী আমার ঝি', (ছড়া সংখ্যা-১১৯) শব্দের ব্যবহার হয়েছে এই ছড়ায়। মূল শব্দ সং-'প্রেত', স্ত্রীলিঙ্গে 'প্রেত্নী' হওয়া উচিৎ। উচ্চারণের সুবিধার জন্য আদি র-ফলা লুপ্ত হয়েছে। ফলে গড়ে উঠেছে পেত্নী শব্দটি। উচ্চারণের অনবধানবশত এবং যুগ্ম ব্যঞ্জনের উচ্চারণের কষ্ট লাঘবের জন্য প্রস্তুত পেত্নী শব্দ ঔপভাষিক স্তরে স্বরভক্তি অনুকূলতা লাভ করেছে।

স্বরসংগতি ঃ বামনদেবের মতে, মৌখিক বাংলায়, কোনো কোনো শব্দে পূর্বস্বরের প্রভাবে পরবর্তী স্বরধ্বনির এবং পরবর্তী স্বরের প্রভাবে পূর্ববর্তী (ছড়া সংখ্যা-৪৯) স্বরধ্বনির যে লক্ষণীয় পরিবর্তন হয়, বাংলার উচ্চারণগত এই বিশিষ্ট রীতিকে স্বরসংগতি বলে। বেশ কয়েকটি ছড়ায় রয়েছে স্বরসংগতির ব্যবহার। যেমন ঃ

'পোর লত্‌রায় পৌতি খায়
বাঞ্জা ম্যায়া চায়া যায়'[৫২]

—'ম্যায়া' শব্দটিতে স্বরসংগতি ঘটেছে। মেয়ে>ম্যায়া, এ>অ্যা। সূত্র ঃ উচ্চমধ্য / অর্ধসংবৃত স্বরধ্বনি নিম্নমধ্য/ অর্ধবিবৃত স্বরধ্বনি হয়েছে। অবশ্য 'ম্যায়া' শব্দে উৎসমূলে 'মহিলা' শব্দ থাকতে পারে। মহিলা > মাইয়্যা > ম্যায়া। এইসূত্রে 'ম্যায়া' শব্দে অভিশ্রুতিগত পরিবর্তন আছে। অনুরূপ শব্দ যেমন, 'বিড়িতে নাই আগুন/হয়্যা গেল বেগুন' (ছড়া সংখ্যা-২৫৫), এখানে হইয়া>হয়্যা। 'আমার শিলেট শুকি যা' (ছড়া সংখ্যা-১১৭) ছড়ায় 'শিলেট' শব্দটি ইংরেজি slate[৫৩] > সেলেট>শিলেট এইভাবে এসেছে। 'শিলেট' ইংরেজি শব্দের প্রচলিত লৌকিক উচ্চারণ। 'শ্লেট' শব্দটির বঙ্গীয় প্রতিশব্দ নেই। একটা সময়ে প্রধানত লেখার উপযোগী উপাদান হিসেবে প্রাথমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীরা এর ব্যবহার করত। কাঠের ফ্রেমে বিশেষভাবে নির্মিত হত শিলেট। অনুরূপে, বিবাহ>ব্যায়া— 'শিয়া কুত্তার ব্যায়া হটে।'

ছড়াগুলিতে স্বরসংগতিজাত শব্দগুলির উচ্চারণগত কিছু পৃথক বৈশিষ্ট্য আছে। বলা যায়, স্বরসংগতিজনিত উচ্চারণগুলি অধিকাংশ স্থলেই অর্ধস্বরান্ত, মনে হয় পূর্ণতা প্রাপ্তির আগেই থেমে যাচ্ছে উচ্চারণের রেস। কেবল শ্রবণ-যান্ত্রিক অভিজ্ঞতা থেকে এই অর্ধ স্বরান্ত উচ্চারণের বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত হতে পারে।

এছাড়াও আরো কয়েকটি ছড়ার শব্দে স্বরসংগতিগত পরিবর্তন হয়েছে। যেমন ঃ

১। ‘ভাতারকে দেখিয়া এককাঁড়ি’ (ছড়া সংখ্যা-৩৭)

ভর্তা>ভাতার-ভ্+অ+র্+ত্+আ>ভ্+আ+ত্+আ+র

২। ‘ও বৌদি সরে দাঁড়াও বর আস্তিছে’ (ছড়া সংখ্যা-৩৫৮)

আসিতেছে > আস্তিছে— আ+স্+ই+ত্+এ+ছ্+এ>আ+স্+ত্+ই+ছ+এ

৩। ‘আদ পইসা লিয়া হাতে’ (ছড়া সংখ্যা-৩৬৫)

পয়সা > পইসা— প্+অ+অ+স্+আ > প্+অ+ই+স্+আ

—এখানে প্রথমটিতে অ>আ স্বরধ্বনিতে, দ্বিতীয়টিতে ‘ই’ স্বরধ্বনি স্থান পরিবর্তিত করেছে, এবং ‘এ’ স্বরধ্বনি লুপ্ত হয়েছে, এবং তৃতীয়টিতে অ>ই অর্থাৎ নিম্ন-মধ্য স্বরধ্বনি > উচ্চ-স্বরধ্বনিতে পরিণত হয়ে পরিবর্তিত হয়েছে।

অভিশ্রুতি ঃ অপিনিহিতি-জাত ই-কার বা উ-কার এক বিশেষ সন্ধির নিয়মে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গো মিলিত হয়ে তার রূপের যে পরিবর্তন ঘটায়, স্বরধ্বনির সেই পরিবর্তনকেই অভিশ্রুতি বলেছেন বামনদেব চক্রবর্তী। প্রাপ্ত ছড়াগুলিতে অভিশ্রুতিজনিত ধ্বনিপরিবর্তনের হদিশ পাওয়া যায়। ধ্বনি রূপান্তরের ক্ষেত্রে যে গতিশীলতা আছে ছড়ার ভাষায় সেই গতিশীলতা স্পষ্ট হয়েছে অভিশ্রুতি প্রয়োগে। প্রধানত অভিশ্রুতি শব্দগুলির শেষে ‘এ’ ধ্বনির প্রাধান্য লক্ষিত হয়েছে। যেমন ঃ শিশুদের ছড়ায়—

১। ‘একটা চুল পোড়ে গেল’, পোড়ে→পড়িয়া>পইড়্যা>পোড়ে। (ছড়া সংখ্যা-২০৬)

অ+ই+আ>অ+ই+অ্যা>ও+এ

২। ‘অজয় বলে ছাড়িয়া দুব’, (ছড়া সংখ্যা-৩০২)

বলে→বলিয়া>বইল্যা>বলে, বোলে

অ+ই+আ>অ+ই+অ্যা>অ+এ, ও+এ।

সমাজমূলক ছড়ায়—

৩। ‘মাউগের বাপের দরে’ (ছড়া সংখ্যা-৩৮৩)

দরে→দুয়ারে>দুইয়ারে>দোরে, দরে

উ+আ+এ>উ+ই+আ+এ>ও+এ, অ+এ

৪। ‘জঁতায় না দেলু তুঁড়ে / মইলে দেলু মুঁড়ে (ছড়া সংখ্যা-৫১)

তুড়ে→তুণ্ড>তুইণ্ড>তুঁড় ঃ উ+অ>উ+ই+অ>উ+অ

মুঁড়ে→মুণ্ড>মুইণ্ড>মুঁড় ঃ উ+অ>উ+ই+অ>উ+অ

৫। ‘গা ধুয়ে আসো গেড়িয়া ঘাটে’ (ছড়া সংখ্যা-৫৫)

ধুয়ে→ধুইয়া>ধুইয়্যা>ধুয়ে ঃ উ+ই+আ>উ+ই+অ্যা>উ+এ

৬। ‘লড়াই করে বাঁচতে চাই’ (ছড়া সংখ্যা-২২৬)

করে→করিয়া>কইর‍্যা>করে, কোরে

অ+ই+আ>অ+ই+অ্যা>অ+এ, ও+এ

৭। ‘দাম লিবে কাঁড়িয়া ঃ লিবে→লইবে>লইব্যে>লিবে (ছড়া সংখ্যা-৩৬২)

অ+ই+এ>অ+ই+অ্যা>ই+এ

বর্ণবিপর্যয় ঃ বামনদেবের মতে, চলিত বাংলায় উচ্চারণদোষে একই শব্দের অন্তর্গত দুটি ব্যঞ্জনবর্ণ পরস্পর স্থান বিনিময় করলে হয় বর্ণ বিপর্যয় বা বিপর্যাস।

ছড়া ঃ ‘কলমি শাকের ফাঁদে’, কম্‌লি<কল্‌মি (ছড়া সংখ্যা-৩৮৭)

‘হারকিন বাস্ক’, বাস্ক<বাক্স (ছড়া সংখ্যা-১৭৭)

‘হয়ে গেল অ্যাস্ক’ আস্ক<একশ (ছড়া সংখ্যা-১৭৭)

— এই শব্দগুলিতে বর্ণবিপর্যয়গত পরিবর্তন হয়েছে। সংখ্যায় এগুলির উদাহরণ অতি অল্প। অনুমিত হয় যে, এলাকার মানুষজনের উচ্চারণ স্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট। বর্ণবিপর্যয়ের মতো শ্লথ গতি তা প্রমাণ করে। এই প্রসঙ্গোক্রমে বলতে পারি ‘কলম’ শব্দের ‘ল’ বর্ণটিতে উচ্চারণ স্থানের পরিবর্তনও ঘটেছে। যথা—

কল্‌মি	কম্‌লি
↓	↓
উচ্চারণ স্থান→দন্ত্য	মূর্ধা
↓	↓
রাঢ়ী	ঝাড়খণ্ডী

বর্ণাগম (ব্যঞ্জনাগম ও স্বরাগম) ঃ উচ্চরণের সুবিধার জন্য শব্দের আদিতে মধ্যে বা শেষে নূতন বর্ণের আবির্ভাব ঘটলে তাকে বর্ণাগম বলে।

ছড়া ঃ ‘চিরকাল গেল ঝোটপাতা খাইয়্যা’, খাইয়া>খাইয়্যা (ছড়া সংখ্যা-৯৫)

'চিৎপিটিয়া শুইয়্যা', শুইয়া > শুইয়্যা (ছড়া সংখ্যা-৯৫)

'সকলের শালা ভাউজ', ভাজ>ভাউজ (ছড়া সংখ্যা-৬২)

—উপরোক্ত শব্দগুলিতে 'য' ফলা এবং 'উ' স্বর ছিল না, এগুলি পরে এসেছে। তাই একে আমরা ব্যঞ্জনাগম ও স্বরাগমগত পরিবর্তন বলতে পারি। এই অঞ্চলের প্রাপ্ত ছড়াগুলিতে ব্যঞ্জনাগম এবং স্বরাগমের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তবে তা খুব কম। উপভাষিক উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যের জন্য এই ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে।

আনুনাসিকগত পরিবর্তন ঃ বামনদেব চক্রবর্তীর মতে, প্রত্যেক বর্গের পঞ্চম বর্ণের উচ্চারণকালে মুখমধ্যস্থ বায়ু মুখবিবর দিয়ে বহির্গত না হয়ে নাসিকা দিয়েও বহির্গত হয় বলে এই পাঁচটি বর্ণকে নাসিক্যবর্ণ বা আনুনাসিক বর্ণ বলে।

ছড়া ; 'দক্ষিঁ বর্ধমান ছুট' (ছড়া সংখ্যা-৬৫) — এই চরণে 'দক্ষিঁ', শব্দটির মূল শব্দ হল দক্ষিণ>দক্ষিঁ। এখানে 'ন' লুপ্ত হয়ে 'ঁ' (চন্দ্রবিন্দু)-র আগম ঘটেছে। আনুনাসিক ধ্বনির হেরফের ঘটেছে। অনুরূপে পাই— ছড়া, 'লয়ায় ল পঁ / পুন্যায় ছ পঁ'-তে পন > পঁ তে পরিণত হয়েছে। (ছড়া সংখ্যা-৩২)।

অপিনিহিত ঃ বামনদেবের মতে, শব্দের মধ্যে বা শেষে ব্যঞ্জনযুক্ত কোনো ই-কার বা উ-কার থাকলে তাকে ব্যঞ্জনটির অব্যবহিত পূর্বে উচ্চারণ করে ফেলার রীতি হল অপিনিহিতি।

সাধারণভাবে অপিনিহিতি পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত। পশ্চিমবঙ্গীয় উপভাষায় অপিনিহিতির ব্যবহার খুবই কম। পশ্চিমবঙ্গে দক্ষিণাংশে উপকূল অঞ্চলে অপিনিহিতির ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে। তবে উচ্চারণগত অবধানতার কারণে কিছু কিছু অপিনিহিতি শব্দ ছড়ার ভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে। যথা ঃ

ছড়া ঃ ১। 'যার নাই জাইতকুল' জাতি > জাইত (ছড়া সংখ্যা-৫)

২। 'মা মরল মাউগ বেইল' মাগ > মাউগ (ছড়া সংখ্যা-৫৯)

৩। 'রাইত পাইনে যাব কাই' রাত্রি > রাতি > রাইত (ছড়া সংখ্যা-৩৫২)

— উপরোক্ত উদাহরণ তিনটির প্রথম চরণে 'জাইত' শব্দটি এসেছে 'জাতি' শব্দের

থেকে। শব্দটিতে 'ই' ধ্বনির আগম আসলে মধ্য-স্বরাগমের উদাহরণ এবং এটি অপিনিহিতির ব্যবহারও বটে। দ্বিতীয় উদাহরণটিতে 'উ' ধ্বনির আগম আসলে মধ্য-স্বরাগমের উদাহরণ এবং অপিনিহিতিগত পরিবর্তন ঘটেছে। এবং তৃতীয় উদাহরণটিতেও প্রথমটির মতো 'ই' ধ্বনির আগমে মধ্য-স্বরাগম এবং অপিনিহিতিও ব্যবহার হয়েছে।

বর্ণলোক (ধ্বনিলোপ) ঃ উচ্চারণ সহজ করার জন্য শব্দ মধ্যস্থ এক বা একাধিক বর্ণের যে বিলোপসাধন করা হয়, বামনদেবের মতে তাই বর্ণলোপ।

উচ্চারণ ত্রুটির ফলে শব্দান্ত ধ্বনির লোপ ঘটে যায়। এরফলে খণ্ডিত শব্দ তৈরী হয়। লোক প্রচলিত ব্যবহারের গুণে এরদ্বারা অর্থ প্রকাশের কোনো অসুবিধা হয় না, অথচ অনুচ্চারিত ধ্বনিগুলির অস্তিত্ব বেশ টের পাওয়া যায়। সংগৃহীত ছড়াগুলির নিম্নোক্ত সংখ্যায় এই দৃষ্টান্তগুলি লক্ষ্যণীয়। ধ্বনিলোপ উপকূলীয় আঞ্চলিক ভাষার এক অন্যতম দৃষ্টান্ত।

ছড়াগুলি হল ঃ

১।'পাট পড়িয়া বা হবে'	বাল > বা (ছড়া সংখ্যা-৩৪৭)
২।ঘসি গুড়িলে জা হবে'	জ্বালানী > জ্বাল > জা (ছড়া সংখ্যা-৩৪৭)
৩।'টি দিয়ে যা'	টিপ > টি (ছড়া সংখ্যা-৩১৩)
৪।'দক্ষিঁ বর্ধমান ছুট'	দক্ষিণ > দক্ষিঁ (ছড়া সংখ্যা-৩৬৫)

— উপরোক্ত উদাহরণগুলির প্রথম চরণে 'বা' শব্দটি 'বাল' শব্দের খণ্ডিত রূপ। 'ল' ধ্বনি লোপ পেয়ে এখানে ধ্বনিলোপ ঘটেছে। দ্বিতীয় চরণে 'জা' শব্দটি জ্বালানীর খণ্ডিত রূপ, তৃতীয় চরণে 'টি' শব্দটি 'টিপের' খণ্ডিত রূপ হয়ে ধ্বনিলোপ হয়েছে। এবং চতুর্থ চরণে 'ণ' ধ্বনি লোপ পেয়ে দক্ষিঁ হয়ে ধ্বনিলোপ সৃষ্টি করেছে।

অনুরূপে আরো বলা যায়—

ছড়াঃ ১।'আভা মাতি আইলো' (ছড়া সংখ্যা-২১৬)

২।'তা গাছ লড়েঠে' (ছড়া সংখ্যা-১০৭)

— এখানে ‘মাইতি’ শব্দের খণ্ডিত ‘মাতি’ শব্দে ‘ই’ ধ্বনি লোপ পেয়েছে এবং দ্বিতীয়টিতে ‘তাল’ শব্দের ‘তা’ তে ‘ল’ ধ্বনি লোপ পেয়ে ধ্বনিলোপের সৃষ্টি করেছে।

স্বরাগম ঃ উচ্চারণের সুবিধার জন্য শব্দের মধ্যে স্বরের আগমকে বলে স্বরাগম।

উপকূলীয় অঞ্চলের লোকায়ত ভাষায় স্বরাগমের দৃষ্টান্ত ও লক্ষিত হয়। যা এই অঞ্চলের অন্যতম ভাষিক বৈশিষ্ট্য। যথা— ‘খেজুর গাছে লাল গামছিয়া’ (ছড়া সংখ্যা-৩৫৩) — এখানে ‘গামছিয়া’ শব্দটিতে ‘ইয়া’ প্রত্যয়জাত ধ্বনির আগম ঘটেছে। যথা— গামোছা > গাম্‌ছা > গাম্‌ছিয়া

অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি (বর্গের প্রথম এবং তৃতীয় ব্যঞ্জন) ঃ রামেশ্বর শ’ এর মতে, অল্পপ্রাণ ধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে নির্গত হয়, বাংলা, হিন্দী, সংস্কৃতি প্রভৃতি ভাষায় বর্ণের প্রথম এবং তৃতীয় ধ্বনি অল্পপ্রাণ ধ্বনি।

সমীক্ষিত এলাকায় অল্পপ্রাণ মহাপ্রাণ, অঘোষ-সঘোষ এবং আনুনাসিক ধ্বনিগুলিতে তাদের যথাযথ উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তাতে দেখা যায়, অনেক ক্ষেত্রে অল্পপ্রাণীভবন এবং ঘোষীভবনের প্রবণতা বেশি। এখানে উচ্চারণ স্পষ্টতার জন্য ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তন সেভাবে কার্যকর নয়। সাধারণত স্পষ্ট ভাষা। যথা ঃ

ছড়াঃ	১। ‘মাচ ধরবু খাবু সুখে’	মাছ > মাচ (ছড়া সংখ্যা-৯৯)
	২।‘পাট পড়িয়া বা হবে’	পাঠ > পাট (ছড়া সংখ্যা-৩৪৭)
	৩।‘ভোক্‌ কি জাঁয়ে কাঁচা অদা’	ভোখ্‌ > ভোক্‌ (ছড়া সংখ্যা-৩৫৪)
	৪।‘ভাতার গ্যেছে রত দেখতে’	রথ > রত (ছড়া সংখ্যা-৩৫৩)

— উপরোক্ত উদাহরণ চারটির প্রথমটিতে ‘ছ’ এর স্থানে ‘চ’, দ্বিতীয় চরণে ‘ঠ’ এর স্থানে ‘ট’, তৃতীয় চরণে ‘খ’ এর স্থানে ‘ক’ এবং চতুর্থ চরণে ‘থ’ এর স্থানে ‘ত’ ধ্বনি ব্যবহৃত হয়েছে, এবং অল্পপ্রাণগত ধ্বনিপরিবর্তন হয়েছে।

ঘোষব্যঞ্জন বর্ণ (বর্গের তৃতীয় এবং চতুর্থ ব্যঞ্জন, ঘোষধ্বনি) ঃ ভাষাতত্ত্ববিদ্‌ রামেশ্বর শ’ এর মতে, স্বরতন্ত্রী দুটি অংশিক যুক্ত হয়ে শ্বাসবায়ুর বাধা সৃষ্টি করলে স্বরতন্ত্রী দুটি কাঁপে এবং কম্পনের ফলে একটি সুর সৃষ্টি হয়, এই সুরকে বলে ঘোষ ধ্বনি। বর্গীয় ধ্বনির তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম ধ্বনি ঘোষ ধ্বনির দৃষ্টান্ত।

সংগৃহীত ছড়ায় কোথাও কোথাও ঘোষীভবনের উচ্চারণ প্রবণতা ও লক্ষ্য করা যায়। বর্গের তৃতীয় এবং চতুর্থ ধ্বনিগুলিকে আমরা ঘোষধ্বনি বলে থাকি। ছড়ায় ঘোষ ধ্বনির কয়েকটি দৃষ্টান্ত হল ঃ

ছড়াঃ ১।'চোখের জয়ে শাগ ভাজে' শাক্ > শাগ্ (ছড়া সংখ্যা-৪৭)

২।'বউর কথা সদ্', সৎ > সত্ > সদ্ (ছড়া সংখ্যা-৫০)

—এখানে প্রথম চরণটিতে 'ক্' ধ্বনির পরিবর্তে 'গ্' ঘোষ ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে এবং দ্বিতীয় চরণটিতেও 'ত' অঘোষ ধ্বনি 'দ' ঘোষ ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

পঙ্গুক্রিয়া ঃ যে ধাতুকে সবকালে সবভাবে ব্যবহার করা যায় না, সেই ধাতুর সঙ্গে নিষ্পন্ন ক্রিয়াকে বলে পঙ্গুক্রিয়া।

লোকায়ত ছড়াগুলিতে পঙ্গুক্রিয়ার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য ও পাওয়া যায়। অন্যান্য ক্রিয়ার মতো এই ক্ষেত্র সমীক্ষিত অঞ্চলের ছড়াগুলিতে পঙ্গুক্রিয়ার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, যথা ঃ

ছড়াঃ ১।মায়ার ভাতার মদ্দ বটে (ছড়া সংখ্যা-৩৮৫)

২।বুকে আছে রামলক্ষণ (ছড়া সংখ্যা-১১৯)

নাসিক্যব্যঞ্জন ধ্বনি ঃ রামেশ্বর শ' এর মতে, শ্বাসবায়ু মুখ গহ্বরের কোনো স্থানে বাধা প্রাপ্ত হয়ে অনুরণন সৃষ্টি করে, তখন যে ধ্বনির সৃষ্টি হয়, তাকে নাসিক্য ব্যঞ্জন ধ্বনি বলে।

ছড়াঃ ১।ভালো পান ভাঙ্তে জাঁয়ি (ছড়া সংখ্যা-১৩৩)

২।যত কর হাঁইপাঁই (ছড়া সংখ্যা-১৬০)

৩।কাঁহির কালে নাইকো দুলি (ছড়া সংখ্যা-১৬২)

উপরোক্ত ছড়ার চরণের 'জাঁয়ি', 'হাঁইপাঁই', এবং 'কাঁহির' শব্দগুলিতে নাসিক্যব্যঞ্জন ধ্বনির আধিক্য দেখা যায়। লৌকিক ভাষায় এই নাসিক্যব্যঞ্জন ধ্বনির প্রয়োগ এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করে।

অনবধানতার কারণে ঃ

অনেক সময় ধ্বনির অনবধানতার জন্য কিংবা জিহ্বার শৈথিল্যতার কারণেও ধ্বনিগত পরিবর্তন হয়। যথা ঃ

ছড়াঃ ১।'ঝায়ে মরে যাই', ঝালে > ঝায়ে (ছড়া সংখ্যা-৩৬০)

২।'তয়ে ভাত উপ্‌রে আমানি' তলে > তয়ে (ছড়া সংখ্যা-৩৮৫)

উপরোক্ত শব্দগুলিতে অনবধানতার কারণে যেমন ধ্বনিগত পরিবর্তন হয়েছে, তেমনি হয়েছে জিহ্বার শৈথিল্যতার কারণে। যে কারণে প্রথম চরণে 'ল' ধ্বনির স্থলে 'য়' ধ্বনির আগম ঘটেছে। আবার দ্বিতীয় চরণে 'ল' ধ্বনির স্থলে 'য়' ধ্বনির আগম ঘটেছে। ফলে ধ্বনিগত পরিবর্তনও হয়েছে।

শব্দদ্বিত্ব ঃ অর্থের গুরুত্ব বোঝার জন্য বাক্য মধ্যস্থ শব্দকে দ্বিত্ব করে উচ্চারণ করার রীতিকে শব্দ দ্বিত্ব বলা হয়।

ভাষার নিজস্ব ধরন বজায় রেখেও বাচনিক সৌন্দর্যের কারণে অনেক সময় লোকমানুষ কথোপকথনকালে লোকভাষায় চমৎকারিত্ব আনে, যা উপকূলীয় অঞ্চলের ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়ে এইখানকার লোকভাষাকে বিশিষ্টতা দান করেছে। বাক্যের মধ্যে একই শব্দ প্রয়োগে বিষয়বস্তুর গুরুত্বও বহুলাংশে বেড়ে যায়। ফলে সমীক্ষিত অঞ্চলের লোকভাষা অনেকাংশে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়েও উঠেছে শব্দের দ্বিত্বপ্রয়োগে। যথা ঃ

ছড়াঃ ১। দিনেদিনে করিয়া খাইলি মাসে (ছড়া সংখ্যা-৫৮)

২।আমার অসুদ কড়াকড়া (ছড়া সংখ্যা-১৩৩)

৩।ছেলে হবে জড়াজড়া (ছড়া সংখ্যা-১৩৩)

৪।নদীর জল কল্‌কল্‌ করে (ছড়া সংখ্যা-১০৮)

—উপরোক্ত চরণগুলিতে 'দিনেদিনে', 'কড়াকড়া', 'জড়াজড়া' এবং 'কল্‌কল' শব্দগুলি শব্দদ্বিত্বের দৃষ্টান্ত।

শব্দত্রিত্ব ঃ

একই শব্দের দুইবার প্রয়োগে শব্দদ্বিত্ব হলে, কখনও কখনও এই অঞ্চলে একই শব্দ তিনবারও ব্যবহৃত হয়েছে, যাকে শব্দত্রিত্বও বলতে পারি। যথা ঃ

ছড়াঃ ১। চড়্ চড়্ চড়্ দক্তা পতর (ছড়া সংখ্যা-৩৫৫)

২।ট্রেন ট্রেন ট্রেন / ট্রেন থেকে নেমে এল / সুচিত্রা সেন (ছড়া সংখ্যা-১৮৬)

৩।ডুব ডুব ডুব নদীতে (ছড়া সংখ্যা-৯২)

উপরোক্ত চরণগুলিতে 'চড়্ চড়্ চড়্', 'ট্রেন ট্রেন ট্রেন', 'ডুব ডুব ডুব' শব্দগুলি তিনবার করে প্রয়োগ ঘটায় শব্দত্রিত্ব হয়েছে।

'ন' বর্ণ 'ল' রূপে ঃ

উচ্চারণ স্পষ্টতা অনেকখানি নির্ভর করে জিহ্বার উপর। সমুদ্র উপকূলবর্তী জনজীবনে নোনা আবহাওয়ার প্রভাব অনস্বীকার্য। এই নোনা আবহাওয়া জড়তাপূর্ণ উচ্চারণের একটি কারণও। তাছাড়া অনবধানতার কারণেও ন > ল রূপে এবং ল > ন রূপে উচ্চারিত হয়। যথা ঃ

ছড়াঃ১। 'ঝি রইনে জামির আদর' রহিলে > রইলে > রইনে, ল > ন (ছড়া সংখ্যা-৫৬)

২। 'মুক ফিরিনে / কথা কইনে', ফিরিলে > ফিরিনে, ল > ন (ছড়া সংখ্যা-৩৬১)

৩। 'ঘর পুড়নে কি হলা', পুড়লে > পুড়নে, ল > ন (ছড়া সংখ্যা-৭৭)

৪। 'লাজির বাজার যাবে যে', নাজির > লাজির, ন > ল (ছড়া সংখ্যা-৩৬৩)

৫। 'লয়ায় ল পঁ', নতুন > লতুন, ন > ল (ছড়া সংখ্যা-৩২)

উপরোক্ত ছড়ার চরণগুলিতে 'রইনে', ফিরিনে', 'পুড়নে' শব্দগুলিতে ল > ন ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়েছে, এবং শেষ দুটি চরণের 'লাজির' এবং 'লয়ায়' শব্দদ্বয়ে ন > ল ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে।

খ। রূপতাত্ত্বিক পরিচয় ঃ

পূর্বগত ও প্রমাণে ভাষালোচনার যে ধারাটি সাধারণভাবে 'ব্যাকরণ' হিসেবে পরিচিত ছিল, আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে তাকেই বলা হয়েছে ভাষার রূপতত্ত্ব। সাধারণভাবে এই রূপতত্ত্ব হল একটি স্থায়ী বিষয়। বলা যেতে পারে, রূপতত্ত্ব হল ভাষার স্থায়ী পরিকাঠামো। তার ভিত্তি যত শক্ত হয়, ততই স্থায়ীত্ব অর্জন করে ভাষা। এই স্থায়ীত্বের কারণে তার ইতিহাসও গড়ে ওঠে সেই ইতিহাস ভিত্তি থেকে ভাষার এককালিক (Synchronic) এবং বহুকালিক (Diachronic) ইতিহাস নির্ণয় সম্ভবপর হয়ে ওঠে।

অনুসন্ধান ক্ষেত্রে প্রচলিত তথা সংগৃহীত ছড়ার ভাষার সংগঠনে ভাষার আঞ্চলিক স্তর চিহ্নিত হতে পারে, এককালিক ও বহুকালিক তথা-ঐতিহাসিক সূত্র। আঞ্চলিক স্তরে বিধৃত ছড়ার ভাষায় পূর্ববর্তী কালের ভাষা ব্যবহারের পার্থক্য থাকলেও সেই পার্থক্য কখনও ঐতিহাসিকতা লঙ্ঘন করেনি। তাতে বোঝা যায় যে, আঞ্চলিক স্তরেও প্রচলিত কথ্য বাংলা অবিচ্ছিন্ন ও সংহত ছিল এবং এখনও আছে। কালগতসূত্রে তৈরী হওয়া বিভাজন, ব্যতিক্রম, ভঙ্গুরতা ইত্যাদি থেকে যে সব রূপান্তর ঘটেছে, সে সব গঠনসূত্রে যেমন প্রমাণিত, তেমনি পরিকাঠামো সূত্রে পরিগৃহীত হয়ে চলেছে। আলোচনায় সেই নির্ণেয়গুলি নির্ণীত হবে।

কারক ঃ

সংগৃহীত ছড়াগুলির রূপতাত্ত্বিক আলোচনার প্রথমেই 'কারক' প্রসঙ্গে আলোচনা করছি। বাক্যে ক্রিয়াপদের সঙ্গে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের সম্পর্ককে বলা হয় কারক। স্বরূপচিহ্নে বাংলা কারক ছয়প্রকার। এবং বাক্যের অন্তর্গত ক্রিয়াপদের সঙ্গে যোগ থাকে না এমন পদকে সম্বন্ধপদ এবং সম্বোধন পদ বলা হয় যাকে আমরা অ-কারক পদ বলে থাকি। বাংলাভাষায় বিভক্তি চিহ্ন মোট পাঁচটি— এ, কে, রে, তে এবং র (এর), তবে 'র' (এর) আবার সম্বন্ধপদের নিজস্ব চিহ্ন। তাই বাংলা ভাষায় বিভক্তি চিহ্ন মোট চারটি (৪) তারসঙ্গে শূন্য বিভক্তি এবং অনুসর্গ যোগেও কারক নিষ্পন্ন হয়। নিম্নে লোকছড়ায় প্রাপ্ত কয়েকটি কারক ও অ-কারকের আলোচনা করা হল। যথা ঃ

১। কর্তৃকারক

২ ।কর্মকারক

৩ ।অধিকরণ কারক

৪ ।সম্বন্ধ পদ

৫ ।সম্বোধন পদ

কর্তৃকারক ঃ বাক্যে যিনি ক্রিয়া সম্পাদন করেন তিনি হলেন কর্তা, আর কর্তার দ্বারা নিষ্পন্ন কারকই কর্তৃকারক। কর্তৃকারকে কর্তাই মূল উদ্দেশ্য। সমীক্ষিত এলাকার ছড়ায় কয়েকটি কর্তৃকারকের দৃষ্টান্ত হলঃ

ছড়া ঃ ১। 'খুকুরাণি ফড়ফড়াণি' (ছড়া সংখ্যা-২৯৪)

২। 'ছোঁড়া যাচ্ছে বাঁধে বাঁধে' (ছড়া সংখ্যা-৩৮৭)

৩। 'বড় বউ বড় ঘরের ঝি' (ছড়া সংখ্যা-২৪০)

—উপরোক্ত ছড়ার চরণের 'খুকুরাণি', 'ছোঁড়া', 'বড় বউ' প্রতিটি শব্দ-ই কর্তৃকারকের দৃষ্টান্ত। এবং শূন্য বিভক্তি যোগে কারক নিষ্পন্ন করেছে।

কর্মকারক ঃ ক্ষেত্র সমীক্ষালব্ধ ছড়াগুলিতে কর্মকারকের কয়েকটি দৃষ্টান্ত হল, যথাঃ

ছড়াঃ ১। 'বড় বউকে ঠেঙ্গা লাঠি' (ছড়া সংখ্যা-৭৯)

২। 'দিদিকে দেব সাজিয়ে' (ছড়া সংখ্যা-১৮৬)

৩। 'দেশকে ভালোবেসে' (ছড়া সংখ্যা-৩২২)

উপরোক্ত শব্দগুলি যথা 'বড় বউকে', 'মেয়েকে', এবং 'দেশকে' 'কে' বিভক্তিযোগে নিষ্পন্ন হওয়া কর্মকারকের দৃষ্টান্ত। অনুরূপে 'বাবুভায়াদের দিলে ধার' ছড়াটিতে 'বাবুভায়াদের' শব্দটিতে 'এর' বিভক্তি যোগেও নিষ্পন্ন হয়েছে কর্মকারক।

অধিকরণকারক ঃ স্থান-কাল-বিষয় বোঝাতে ক্রিয়ার আধারকে অধিকরণ কারক বলা হয়।

ছড়া— 'ছোঁড়া যাচ্ছে বাঁধে বাঁধে', চরণের 'বাঁধে বাঁধে' হল স্থানাধিকরণ। এবং এই শব্দদ্বয়ে 'এ' বিভক্তি যুক্ত হয়েছে। এই রূপ নামপদের সঙ্গে বিভক্তিযোগে হয় অধিকরণ কারক। অনুরূপভাবে বলা যায় ঃ

ছড়াঃ ১। 'সন্ধ্যাবেলায় বাজারে হবে' (ছড়া সংখ্যা-৩৮৮)

২। 'হাড়োরে গড়োরে লাউবাড়ে কুমড়াবাড়ে' (ছড়া সংখ্যা-২৯৫)

৩। 'পাল্‌কিতে উঠ্যিয়া বলে' (ছড়া সংখ্যা-৩৮৯)

—উপরোক্ত ছড়াগুলিতে, প্রথম চরণে 'বাজারে' দ্বিতীয় চরণে 'লাউবাড়ে কুমড়াবাড়ে' শব্দগুলিতে 'এ' বিভক্তিযোগে অধিকরণ কারক হয়েছে। এবং তৃতীয় চরণে 'পাল্‌কিতে' শব্দে 'তে' বিভক্তি যোগে অধিকরণ কারক নিষ্পন্ন হয়েছে।

কারকের দৃষ্টান্ত হিসেবে যেমন কর্তৃকারক, কর্মকারক এবং অধিকরণ কারকের দৃষ্টান্ত বেশি পাওয়া যায়, তেমনি অ-কারকের দৃষ্টান্ত হিসেবে সম্বন্ধপদ ও সম্বোধন পদের ব্যবহার লোকছড়াগুলিতে আরও অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়। যথা ঃ

সম্বন্ধ পদ ঃ

ছড়াঃ ১। 'ভালো বেগুনের চ্যারা' (ছড়া সংখ্যা-২৯৪)

২। 'হাটের হাটানি বলে' (ছড়া সংখ্যা-১৩৮)

এখানে ছড়ার চরণে 'বেগুনের চ্যারা', 'হাটের হাটানি'— এই শব্দদ্বয়ে 'এর' এবং 'র' বিভক্তি যুক্ত হয়েছে এবং দুটি পদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, যাকে আমরা সম্বন্ধ পদ বলছি। অনুরূপ বহু দৃষ্টান্ত এই অঞ্চলের লোকছড়ায় পাওয়া যাবে, যেগুলি সম্বন্ধপদ গঠন করেছে।

যথা ঃ

ছড়া ঃ ১। 'নাঙ্গোর ঘর নয়' (ছড়া সংখ্যা-৩৯০)

২। 'গাঙ্গোর ঘর' (ছড়া সংখ্যা-৩৯০)

৩। 'মাঘের শেষ' (ছড়া সংখ্যা-৩৬৬)

৪। 'শীতের কম্প' (ছড়া সংখ্যা-৩৬৬)

৫। 'ঝিঙ্গার তরকারী' (ছড়া সংখ্যা-৩৬৬)

রেখাঙ্কিত প্রতিটি পদ-ই সম্বন্ধ পদ।

সম্বোধন পদ ঃ যে পদের দ্বারা কোনো ব্যক্তিকে আহ্বান করা হয়, এমন বোঝাতে সম্বোধন পদ ব্যবহৃত হয়। এই পদের সঙ্গে ক্রিয়াপদের সরাসরি কোনো সম্পর্ক

থাকে না, তাই সম্বোধন পদকে অ-কারক পদ বলা হয়। ক্ষেত্র সমীক্ষিত এলাকা থেকে প্রাপ্ত ছড়াগুলিতে সম্বোধন পদের উদাহরণ পাওয়া যায়। যথা—

ছড়াঃ ১। 'চাড়ি রে চাড়ি তোর ঘর যে পুড়ি গেলা' (ছড়া সংখ্যা-৭৭)

২। 'বেলা রে বেলা, আমরা করি খেলা' (ছড়া সংখ্যা-১৭৮)

প্রথম চরণে 'চাড়ি রে চাড়ি', বলে কোনো মেয়েকে সম্বোধন করা হচ্ছে, দ্বিতীয় চরণে 'বেলা রে বেলা' বলে সম্বোধন পদের ব্যবহার করা হয়েছে। যার দ্বারা এই অঞ্চলের ভাষাবৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রয়েছে।

সন্ধি ঃ 'সন্ধি' শব্দের অর্থ 'মিলন'। যাতে পরস্পর সন্নিহিত দুটি ধ্বনির মিলন ঘটে। উপকূলীয় অঞ্চলের লোকছড়ায় সন্ধিযুক্ত শব্দও পরিলক্ষিত হয়। যথা ঃ

ছড়াঃ ১। 'আসতে যাইতে নমস্কার' (ছড়া সংখ্যা-১৫১)

২। 'গড়গড়িয়ে জগন্নাথ মাসি বাড়ী যান' (ছড়া সংখ্যা-৩৮০)

৩। 'নিমাই সন্ন্যাসী হল' (ছড়া সংখ্যা-৩৫)

—উপরোক্ত ছড়াগুলির প্রথমটিতে 'নমস্কার', দ্বিতীয়টিতে 'জগন্নাথ', এবং তৃতীয়টিতে 'সন্ন্যাসী' শব্দগুলির সন্ধিবিচ্ছেদ করলে হবে,

নমঃ + কার = নমস্কার

জগৎ + নাথ = জগন্নাথ

সম্ + নাসী = সন্ন্যাসী

—এখানে প্রথমটিতে বিসর্গসন্ধি এবং বাকি গুলোতে ব্যঞ্জনসন্ধির দৃষ্টান্ত রয়েছে। এখানকার লোকছড়ার শব্দে ব্যঞ্জনসন্ধির দৃষ্টান্ত বেশি মেলে।

সমাস ঃ সমাসে বক্তব্যবিষয়কে সংক্ষিপ্তভাবে বলতে পারি। তাই 'সমাস' শব্দটির অর্থ 'সংক্ষিপ্ত'। সমাস সংঘটিত হয় সমস্যমান পদের সঙ্গো পদের মিলনে। উপকূলীয় অঞ্চলের ভাষায় সমাস বহুল পদের ব্যবহার ব্যাপকভাবে রয়েছে। এই অঞ্চলের ছড়ায় ব্যবহৃত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সমাস হল—

কর্মধারায় সমাস ঃ

ছড়া — 'সুভদ্রাবোন বলরামভাই' (ছড়া সংখ্যা-৩৮০)

— এই পদের ব্যাসবাক্যসহ সমাস হল 'সুভদ্রা নামক বোন' এবং 'বলরাম নামক ভাই', মধ্যপদলোপী কর্মধারায় সমাস, যার সমস্ত পদ 'সুভদ্রাবোন', এবং 'বলরামভাই'। একে আবার সাধারণ কর্মধারায় সমাস হিসেবেও বিশ্লেষণ করা যায়, যিনিই সুভদ্রা তিনিই বোন' এবং 'যিনিই বলরাম তিনিই ভাই'। এখানে উভয় পদ-ই বিশেষ্য। এই সংগৃহীত ছড়াগুলিতে বেশির ভাগ-ই সাধারণ এবং মধ্যপদলোপী কর্মধারায় সমাসের দৃষ্টান্ত। অনুরূপে আরো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যথা—

ছড়া ঃ ১। 'তালগাছ লড়েঠে' (ছড়া সংখ্যা-১০৭)

২। 'বারোতে বাঘাবাগ খেলতে যায়' (ছড়া সংখ্যা-১৮২)

৩। 'ফুলবাড়ির তেলি' (ছড়া সংখ্যা-৪)

উপরোক্ত চরণগুলির প্রতিটি সমাসবদ্ধ পদ-ই মধ্যপদলোপী কর্মধারায় সমাসের দৃষ্টান্ত,—

১। তাল নামক গাছ = তালগাছ

২। বাঘা নামক বাগ = বাঘাবাগ

৩। ফুল নামক বাড়ি, তার = ফুলবাড়ির।

তৎপুরুষ সমাস ঃ

তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের কর্ম, করণ, অপাদান ইত্যাদি কারকসমূহের বিভক্তি চিহ্ন কিংবা বিভক্তি স্থানীয় অনুসর্গের লোপ পায় এবং পরপদের অর্থ প্রধানভাবে বজায় থাকে। এই সমাসের আবার ছয়টি উপস্তর ও আছে। কর্ম, করণ, অপাদান, সম্প্রদান, অধিকরণ এবং অ-কারক তৎপুরুষ। এছাড়া উপপদ তৎপুরুষ সমাসও রয়েছে। সংগৃহীত ছড়ায় তৎপুরুষ সমাসগুলি হল ঃ

ড়াঃ ১। 'ঝি

ছড়া ১। 'বিদ্যাসাগরের দেশে' (ছড়া সংখ্যা-৩২২)

২। 'ঘর জ্বালানী / পরভুলানী' (ছড়া সংখ্যা-১৫)

৩। 'সীতাহরণ ছুটবি খালি' (ছড়া সংখ্যা-১৭০)

৪। 'দশেতে তেল চুপচুপ তেলেভাজা' (ছড়া সংখ্যা-১৮২)

— উপরোক্ত ছড়ার চরণগুলিতে যথা 'বিদ্যাসাগরের', 'ঘর জ্বালানী', 'পর-ভুলানী', 'সীতাহরণ', 'তেলেভাজা' শব্দগুলি বিভিন্ন প্রকার তৎপুরুষ সমাসের দৃষ্টান্ত। প্রথমটির ব্যাসবাক্য 'বিদ্যার সাগর, তার = সম্বন্ধ তৎপুরুষ। দ্বিতীয়টিতে কর্ম তৎপুরুষ হয়েছে। 'ঘরকে জ্বালানো' = ঘর জ্বালানী', পরকে ভুলানী = পরভুলানী। তৃতীয়টিও কর্ম তৎপুরুষের দৃষ্টান্ত, সীতাকে হরণ=সীতাহরণ, এবং চতুর্থটি করণ তৎপুরুষের দৃষ্টান্ত, 'তেলেতে ভাজা' = তেলে ভাজা। তবে অন্যান্য সমাসের দৃষ্টান্ত আমার সংগৃহীত ছড়ার তালিকায় বড়-ই অল্প।

অব্যয় ঃ

ভাষার রূপতাত্ত্বিক আলোচনায় অব্যয়ের ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। খাঁটি বাংলা ভাষায় অব্যয়ের অনেক সংখ্যা আছে। উপকূলবর্তী আঞ্চলিক ভাষায়ও বহুল অব্যয় পদের ব্যবহার লক্ষিত হয়। 'অব্যয়' শব্দের অর্থ ব্যয় বা পরিবর্তন নাই যার, আরও স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, লিঙ্গ-বচন-পুরুষ ইত্যাদি ভেদে যে পদের কোনোরূপ পরিবর্তন হয় না, তাই-ই অব্যয়। এই রকম অব্যয়ের বহুল ব্যবহার এই অঞ্চলের লোকভাষায় পরিলক্ষিত হয়। যথা ঃ

ছড়া ঃ ১। 'গর্ব করি দেশের লাগি' (ছড়া সংখ্যা-৩২২)

২। 'মাঘের শেষ তবুও কিন্তু' (ছড়া সংখ্যা-৩৬৬)

৩। 'জল ঢেলে তাই শিবের মাথায়' (ছড়া সংখ্যা-৩৬৬)

৪। 'তার বড় চিড়াচিড়ানী' (ছড়া সংখ্যা-৩৮)

৫। 'নদীর জল কল্‌কল্‌ করে' (ছড়া সংখ্যা-১০৮)

উপরোক্ত রেখাঙ্কিত শব্দগুলি বিভিন্ন অব্যয়ের দৃষ্টান্ত। প্রথম চরণের 'লাগি', হেতুবোধক অব্যর, দ্বিতীয় চরণে 'তবুও', নিত্য সম্বন্ধীয় অব্যয়, 'কিন্তু', সংশয়সূচক অব্যয়। তৃতীয় চরণে 'তাই' সিদ্ধান্তবাচক অব্যয়, চতুর্থ চরণে 'বড়' আলংকারিক অব্যয়, পঞ্চম চরণে 'কল্‌কল্‌' ধন্যাত্মক অব্যয়। অনুরূপভাবে বলা যায় দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঃ

ছড়াঃ ১। আম মিষ্টি / জাম মিষ্টি / আর মিষ্টি মধু (ছড়া সংখ্যা-৩৫৭)

২। যেদিন যাহা মিলই (ছড়া সংখ্যা-৪৬)

৩। যউ তিনকে সউ তিন হইল— (ছড়া সংখ্যা-৫৯)

অনুসর্গ ঃ

এই ক্ষেত্র সমীক্ষিত এলাকার লোকছড়ায় বহুল পরিমাণে অনুসর্গ পরিলক্ষিত হয়। অনুসর্গের প্রয়োগে বাংলা ভাষার গঠন ও অর্থ সুপরিস্ফুট হয়। তাই এর গুরুত্বও রয়েছে। বাক্যে অনুসর্গ বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের পর বসে এবং তা পৃথকভাবে বসে বাক্যের অর্থ পরিস্ফূট করতে সাহায্য করে। ছড়াগুলিতে যে যে অনুসর্গের প্রয়োগ ঘটেছে তা এইরূপ ঃ

ছড়াঃ ১। 'পোর লত্‌রায় পৌতি খায়'

২। 'খুকুর তরে বর আইসবে'

৩। 'জান্‌লা দিয়া দেখব আমি'

উপরের রেখাঙ্কিত শব্দগুলি যথা ঃ 'লত্‌রায়', 'তরে', 'দিয়া', প্রতিটি শব্দই অনুসর্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। 'লত্‌রায়' অর্থাৎ জন্যে অর্থে, 'তরে' ও জন্যে অর্থে, 'দিয়া' অর্থাৎ দিয়ে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

সর্বনাম ঃ

লোকছড়ায় সাধারণ মানুষ নানা ধরনের নামপদ ব্যবহার করে। পূর্বে আলোচিত, উড়িষ্যা সংলগ্ন উপকূলীয় অঞ্চলে রাঢ়ী উপভাষার সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা ওড়িয়া ভাষারও সংমিশ্রণ ঘটেছে। ছড়ায় প্রাপ্ত সর্বনাম পদগুলি হল ঃ

ছড়াঃ ১। 'তুমার বেটাশালা কয়' (তোমার) (ছড়া সংখ্যা-২৫৮)

২। 'সাদ্ ছিল মোর' (আমার) (ছড়া সংখ্যা-৮১)

৩। 'দবা ভয়েরে তুম্ভে যাউছ' (তুমি) (ছড়া সংখ্যা-১৭)

৪। 'তু ননদ কইবু যেতে' (তুই) (ছড়া সংখ্যা-৩৯)

৫। 'তো ননদ কইব তেতে' (তোর) (ছড়া সংখ্যা-৩৯)

বিশেষণ ঃ

বিশেষণ পদের ব্যবহার উপকূলীয় অঞ্চলের ভাষায়ও রয়েছে। রেখাঙ্কিত বিশেষণ পদগুলি হল, যথা ঃ

১। 'বুড়া শিবকে সেলাম করে' (ছড়া সংখ্যা-৯৫)

২। 'লাল লাল গুলা কী' (ছড়া সংখ্যা-৩৮৯)

৩। 'সেই হবে কালিয়া বুড়ি' (ছড়া সংখ্যা-৩৯১)

ক্রিয়ারূপ ঃ

বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হবে তখনই, যখন-ই তাতে একটি সমাপিকা ক্রিয়াপদ বসবে। আমরা জানি, কাল তিন প্রকার, তাই তার তিনকালের ক্রিয়ার রূপ ও তিন ধরনের। উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাপ্ত লোকছড়ায় ক্রিয়ার তিন রূপের ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদেরও তিন ভিন্ন ভিন্ন রূপ আছে। যাতে এই অঞ্চলের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশিত হয়েছে, যথা ঃ

বর্তমানকাল বোঝাতে ক্রিয়াপদের রূপ—

ছড়াঃ ১। 'ছোঁড়া যাচ্ছে বাঁধে বাঁধে' (ছড়া সংখ্যা-৩৮৭)

২। 'গিমা শাগ বলেরে ভাই' (ছড়া সংখ্যা-৯৬)

৩। 'দাদা দেখতে পেয়েছে' (ছড়া সংখ্যা-২৬০)

৪। 'কল্‌কল্ করে' (ছড়া সংখ্যা-১০৮)

অতীত কাল বোঝাতে ক্রিয়াপদের রূপ—

১। 'জঁতায় না দেলু তুঁড়ে' (ছড়া সংখ্যা-৫১)

২। 'সেই ঘৈতা করলু' (ছড়া সংখ্যা-৪০)

ভবিষ্যৎ কাল বোঝাতে ক্রিয়াপদের রূপ—

১। 'তাড়াতাড়ি রাঁদ্ গিন্নি / যাব কাচারি' (ছড়া সংখ্যা-৩৮৬)

২। 'খুকুর তরে বর আইসবে' (ছড়া সংখ্যা-২৯৪)

৩। 'বাঁধব ছোট ঘর' (ছড়া সংখ্যা-৮১)

৪। 'যাকে দেখবুনি হাটেবাটে' (ছড়া সংখ্যা-৫২)

—উপরোক্ত ছড়ার চরণের রেখাঙ্কিত পদগুলিই বিভিন্নকালের ক্রিয়াপদের রূপকে প্রকাশ করেছে।

প্রত্যয় ঃ

'প্রত্যয়' হল নতুন নতুন শব্দ গঠনের কৌশল। শব্দ বা ধাতুর উত্তর যে সমস্ত বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয়ে নতুন নতুন শব্দ তৈরী হয়, তাকেই আমরা প্রত্যয় বলে জানি। লোকছড়ার ভাষায় এরকম বহু শব্দ আছে, যাতে প্রত্যয়ের দৃষ্টান্ত মিলবে। তবে তা কখনও কৃতপ্রত্যয় আবার কখনও বা তদ্ধিত প্রত্যয় হিসেবে ছড়ায় ব্যবহৃত। যথাঃ

১। আয়ে বিয়ে পাশ করা (ছড়া সংখ্যা-২৯৪)

২। আদ্ পইসা লিয়া হাতে (ছড়া সংখ্যা-৩৬৫)

৩। বুড়ো শ্বশুরের নাইকো দেখা (ছড়া সংখ্যা-২০)

৪। সিঁন্দুর নিয়ে খেলা (ছড়া সংখ্যা-৩৪৬)

—উপরোক্ত শব্দগুলি 'করা', 'হাতে', 'দেখা', 'খেলা'-য় কর্, হাত্, দেখ্, খেল্ মূল ধাতুর সঙ্গো আ-প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে।

ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও অনুকার শব্দ ঃ

বাক্যের সৌন্দর্য বর্ধনে ধ্বন্যাত্মক এবং অনুকার শব্দের তুলনা নাই। আমরা প্রতি মূহূর্তে উঠতে বসতে চলতে ফিরতে এইরকম শব্দ ব্যবহার করে থাকি। লোকছড়ার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নেই। এতে সাধারণ মানুষের আটপৌরে জীবন আরও সজীব ও সরস হয়ে উঠেছে। কয়েকটি ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগঃ—

ছড়াঃ ১। 'ব্যাঙ মারে ঠাই ঠাই' (ছড়া সংখ্যা-৩০২)

২। 'নদীর জল কল্‌কল্ করে' (ছড়া সংখ্যা-১০৮)

কয়েকটি অনুকার শব্দের প্রয়োগ ঃ—

১। 'যতকর হাঁইপাঁই' (ছড়া সংখ্যা-১৬০)

২। 'যাকে দেখবুনি হাটেবাটে' (ছড়া সংখ্যা-৫২)

৩। 'অঞ্চল করব ছারখার' (ছড়া সংখ্যা-২৩৪)

বহুবচন ঃ

এই আঞ্চলিক উপভাষায় ভাষার রূপতাত্ত্বিক আলোচনার সর্বশেষ বিষয় হল

বহুবচন। এই আঞ্চলিক উপভাষার বহুবচন বোঝাতে যে নির্দেশকগুলি ব্যবহৃত হয়, সেগুলি হল ঃ

১। ‘আমাহারে সনার চোখে’ (ছড়া সংখ্যা-৩১৩)

২। ‘টকামনে মেইঝিমনে’ (ছড়া সংখ্যা-৩২০)

৩। ‘ব্যাগবেটা যেমন তেমন’ (ছড়া সংখ্যা-৩৫৬)

—এক্ষেত্রে ‘হারে’, ‘মনে’, ‘ব্যাগ’ চিহ্নগুলি বহুবচনের নির্দেশক চিহ্ন। ‘ব্যাগবেটা’ অর্থাৎ সকলবেটা, ব্যাগ+বেটা= ব্যাগবেটা, শব্দটি সাধারণত বিশেষ্য পদের পূর্বে বসে। উপকূলীয় ভাষার লোকছড়ায় এটি এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে বহন করেছে।

অনুরূপে বলা যায় ঃ

১। ‘বাবুভায়াদের দিলে ধার’ (ছড়া সংখ্যা-১৫১)

২। ‘খাঁড়াহারে ঢ্যারাপূজা’ (ছড়া সংখ্যা-৩৯২)

ইংরেজি শব্দের প্রয়োগ লোকছড়ায় ঃ

১। ‘মেয়ের পেটে ক্যানসার/আই অ্যাম এ ডিস্কো ড্যান্সার’ (ছড়া সংখ্যা-৩৯৩)

২। ‘ছেলেরা তিরিশে ফিনিস’ (ছড়া সংখ্যা-৩১৫)

৩। ‘ডিস্কো ডিবানী’ (ছড়া সংখ্যা-১৭৬)

গ। বাক্যগঠনগত বৈশিষ্ট্য ঃ

ছড়া যে সব বাক্যে বিধৃত হয়, সেগুলিও প্রথা মতে কাব্যবাক্য হওয়াই উচিৎ। ‘বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্’।[৫৪] কাব্য হচ্ছে সেই বাক্য, ‘রস’ যার আত্মা।[৫৫] আচার্য বামনের এই উক্তি নন্দনতত্ত্বের প্রাক্‌লগ্নে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কাব্য বাক্যকে রসাত্মক হতে হবে এমন একটি শর্ত আরোপিত হয়েছিল, এই সূত্রে। যে কোনো বাক্য নয়, রসাত্মক বাক্যই কাব্য স্বাদ বহন করে, এটি হল মূল তত্ত্ব। সাধারণভাবে রসাত্মক বাক্য হল প্রথম পর্যায়ের উচ্চারণ, লিখিত সৃজন নয়, বরং বলা যায় ; উচ্চারণ নির্ভর সৃষ্টি লিপিময় বাক্যে যথাযথ রূপ লাভ করে থাকে। তাই কবিতার কাঠামোই হল বাক্য। ছন্দে ও অলংকারে, মাত্রায় ও যতিতে তার প্রাথমিক দেহ নির্মিত হয়, তার মধ্যেই প্রতিষ্ঠা পায় রীতি বা কবির স্টাইল। পরে নির্ণীত ও

লিপিবন্ধ বাক্য কৌশলের গুণে ধ্বনি এবং রসের সৃষ্টি হয়। কাব্য বাক্যের গঠন এবং কাঠামোর দিকে যথাযথ শব্দ সজ্জা থাকে। শব্দ তখন তার অভিধানিক অর্থ ক্রমশ ঘুচিয়ে দিতে দিতে হয়ে ওঠে অনুষঙ্গানির্ভর।

ছড়ার ক্ষেত্রে একই ব্যাপার ঘটতে থাকে। লক্ষনীয় যে, ছড়ার স্রষ্টারা কথনশীল স্বভাবের ভাবুক মানুষ। সকলে ছড়া সৃষ্টি করেছে এমন দাবী কেউ করেনি কোনদিন। কিছু মানুষ ছড়ায় বাক্যানুষঙ্গে যে ভাবসমূহ ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন, তা তাঁদের বিশিষ্ট কথন স্বভাবের পরিণতিমাত্র। "তাহারা মানবমনে আপনিই জন্মিয়াছে"[৫৬] — রবীন্দ্রনাথ কথিত এই সিদ্ধান্তের মূলেও রয়েছে সেইসব অপ্রত্যক্ষ ভাবুক মানুষের মানসিক ক্রিয়াত্মক কথন স্বভাব। ছড়া সংগ্রাহকদের লিপিবন্ধ বাক্যে সম্পূর্ণও সে-সবের হদিস পাওয়া অনেক সময়-ই দুরূহ হয়ে পড়ে, তবুও সংগৃহীত এবং লিপিবন্ধ ছড়া সমূহের বাক্যগত বিন্যাস থেকেই ছড়ার বৈশিষ্ট্যের হদিস করা যেতে পারে।

ছড়ার বাক্যের কথনশীলতা ঃ

ব্যক্তবাক্ হল বাক্য। দশটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে পাঁচটি হল জ্ঞানেন্দ্রিয়। অন্য পাঁচটি হল কর্মেন্দ্রিয়। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রথমেন্দ্রিয়টির নাম-ই হল বাক্। মানুষ যা বলে, অন্তরের সেই আকূতবাণী কণ্ঠস্বরে স্ফুট হয়। তখন তৈরী হয় বাক্য। তাই বাক্যকে বলা হয় স্ফূটবাক্। ভাবসমূহের প্রস্ফূটন থেকে যা রচিত হয়, তাকে বলে কথন। এই কথনসূত্রে ঘটে যায় ব্যক্তকরণের সমূহ চেষ্টা। সংস্কৃতে 'ব্যক্ত্যঃ' কথাটির অর্থ হল, যা প্রকাশিত হয়। ছড়ার বাক্য সম্পর্কে সবচেয়ে কার্যকর তথা বিশ্লেষণী আধার হতে পারে পূর্বকথিত কথন স্বভাব, যা স্বতঃই ব্যক্ত হয়। এই ব্যক্ততা গুণ থেকেই নির্মিত হয় তাদের বাক্-কাঠামো।

ছড়ার বাক্যগঠন অবশ্যই কথন স্বভাবের হুবহু প্রতিফলন হয়ে ওঠে। ছড়ায় যা বলা হচ্ছে, তার বিষয় তাৎক্ষণিক আবেগজাত হলেও তারমধ্যে যে ভাবগুলি ধরা পড়ে, হৃদয়ের আকাঙ্খার সঙ্গে সেই ভাবের সংগতিবিধান হয়ে থাকে। বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে এসে পড়ে তার অনিবার্য প্রভাব। তাই মৌখিক সাহিত্য হওয়া সত্ত্বেও ছড়ার বাক্য নির্মাণ কোথাও তার গতিশক্তি হারিয়ে ফেলেনি। লক্ষণীয় যে, মৌখিকভাবে

নির্মিত বাক্যগুলি হঠাৎ আসা মিল রীতির অনুসারী হয়েছে। আবার বিপরীত ক্ষেত্রে রচিত হয়েছে মিলরীতিহীন বাক্‌বিন্যাস। বাক্যের অন্তর্গত মিল রীতি অনেক সময়ে ক্রিয়ামূলক শব্দের সাহায্যে ঘটেছে। প্রক্রিয়াটি সামান্য দুর্বল হলেও সংগৃহীত ছড়াগুলির পক্ষে বিশেষ বাক্‌বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে, আবার নূতন মিল বা মিলরীতিহীন ছড়া বাক্যও রচিত হয়, এছাড়া ছড়ার বাক্যগুলি নিম্নলিখিতভাবে গঠিত হয়েছে ঃ

ক. মাত্র দুটি বাক্য নিয়ে গঠিত ছড়া

খ. তিনটি বাক্যে রচিত ছড়া

গ. চারটি বাক্যে রচিত ছড়া

ঘ. চারটির অধিক বাক্যে রচিত ছড়া

ঙ. দীর্ঘ বাক্যে রচিত ছড়া

চ. অসম্পূর্ণ বাক্যে রচিত ছড়া।

ক. দুটি বাক্য নিয়ে গঠিত ছড়া ঃ

দুটি পংক্তি নিয়ে গঠিত ছড়াগুলি বিবরণমূলক নয়। এই সব ছড়ায় দীর্ঘ বক্তব্য প্রকাশের অবকাশ থাকে না। এখনও দেখা গেছে যে, মাত্র দুটি পংক্তিতে রচিত হলেও একটি বাক্য নিয়েই একটি ছড়া গঠিত হয়েছে। ছড়াকারের বক্তব্য এমন-ই লক্ষাভিমুখ থাকে যে, বাক্যে অপ্রয়োজনীয় শব্দ থাকে না। অন্ত্যমিলের শাসনে ছড়ার বাক্য হয়ে ওঠে মেদহীন। যেমন—

১। যদি যাউ হাঁড়িয়া
দাম লিবে কাড়িয়া

২। লাজির বাজার যাবে যে
কম দামে মাল পাবে সে

এই দুটি ছড়ায় রয়েছে একটি করে বাক্য। বাক্যগুলি Conditional বা শর্তসাপেক্ষ। বাক্যের মধ্যে আছে লাভ-ক্ষতি জাতীয় অর্থনীতিগত সচেতনতা। কিছুটা বা তেমন বিচক্ষণতা কার্যকর আছে যে, দামে সুবিধা পেতে গেলে দূরে যাওয়ার শ্রম স্বীকার করতে হবে। বাক্যের কাঠামো থেকেই এইসব ঝোঁক স্পষ্ট হয়েছে। শর্ত

সাপেক্ষতা থাকায় জটিল কাব্যবাক্য সহজে নির্মিত হতে পেরেছে।

দুটি বাক্যে গঠিত ছড়ায় অনুরূপ গঠনগত বৈশিষ্ট্য আছে। এই ছড়াগুলির ক্ষেত্রে বাক্যগঠনে ছন্দের শাসন অব্যাহত ঃ

১। লয় কিঁয়া ছয় বিকে
ব্যাটা আমার ব্যাবসা শিকে

২। এটা দিলে ওটা দেয়
নাইলে কুন গুলাম্‌টা দেয়

—উদ্ধৃত ছড়ার বাক্যগুলিতে বিবরণ অপ্রধান, তুলনায় তাৎপর্য প্রাধান্য লাভ করেছে। শব্দগুলির ব্যবহারের গুণেই এসেছে তির্যকতা। শেষের ছড়াটিতে আর্বি 'গুলাম' শব্দটি ব্যবৃহত হয়েছে। এই শব্দটি বাচ্যার্থ অতিক্রম করে ব্যঞ্জনাকে প্রকাশ করেছে। ছড়ার বক্তা বিরক্তিজনিত সমালোচনা থেকেই 'গুলাম' শব্দের অর্থান্তর ঘটেছে। ছড়াগুলির ভাষায় প্রবচন জাতীয় সিদ্ধান্ত কার্যকর রয়েছে।

খ। তিনটি বাক্যে রচিত ছড়া ঃ

১। সাঁরে যাঁহা সে আচ্ছা
ভিম্‌রুর পঁচিশটা বাচ্চা
তাই গোরুর কি লজ্জা[৫৭]

২। আমার নাম নামে নাম্‌
আমি খাই পাকা আম
তুই খাউ গরুর চাম্‌[৫৮]

— তিনটি বাক্যে রচিত ছড়াগুলির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। সেটি হল, বক্তব্যের প্রবহমানতা। উপযুক্ত ছড়াগুলির প্রত্যেকটিতে বক্তব্য বিষয় প্রথম থেকে শেষ পংক্তি পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে এসেছে। এই রীতির ছড়ার সংখ্যা বেশ কম। মনে হয় এই রীতির ছড়াগুলি গঠন বৈশিষ্ট্যে আদিম। ছড়াগুলির বিষয় অবশ্য আদিম নয়, তুলনায় আধুনিক বলা যায়। প্রথম ছড়ার প্রথম পংক্তিটি কবি ইকবালের অনুকৃতি। বাকি দুটি পংক্তিতে রয়েছে কোনো উদ্ভট গানের স্মৃতি। বলবার বিষয় হল এই যে, এইসব ছড়ায় তাৎক্ষণিক কল্পনাশক্তি কার্যকর আছে। ২য় ছড়াটি আক্রমণাত্মক। ছড়ার তৃতীয়

পংক্তিতে রয়েছে চূড়ান্ত আক্রমণ। নিন্দিত ভক্ষ্য 'গরুর চাম' কথাটির মধ্যে রয়েছে আক্রমণের ধারালো অংশ, এবং এ আক্রমন জাতিভেদ সংক্রান্ত নয়; বরং প্রতিপক্ষকে নিশ্চিতভাবে পরাজিত করার লক্ষ্যে নিষিদ্ধ শব্দ বন্ধটি ব্যবহৃত হয়েছে মাত্র। এই ছড়াটিতেও রয়েছে তীব্র প্রবহমানতা। 'খাউ' শব্দের লোকায়ত উচ্চারণ ভঙ্গীটি বেশ স্পষ্ট করেই উচ্চারিত হয়েছে ছড়াটিতে।

গ। চারটি বাক্যে রচিত ছড়া ঃ

১। গঙ্গা যাইতে পঙ্গা ফাটে
সাগর যাইতে দূর
আদ্ পইসা লিয়া হাতে
দক্ষিঁ বর্ধমান ছুট্[৫৯]

২। আমার নাম চিন্তামণি
ভালো পান ভাঙতে জাঁয়ি
আমার অসুদ কড়াকড়া
ছেলে হবে জড়াজড়া[৬০]

৩। ভাতর গ্যাছে কাতারপুর
ছাতা মাথায় দিয়া
আইস্‌বে ভাতার দেখবে মুক্
নূতন টাকা দিয়া[৬১]

— চারটি পংক্তিতে রচিত এই ছড়াগুলিতে মূল ভাবনার প্রবহমানতা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রয়েছে। চারটি পংক্তিতে ভাববস্তু ব্যক্ত হওয়ায় ছন্দের যে সুষ্ঠু পরিসমাপ্তি তা অব্যাহত রয়েছে। তেমনি অন্ত্যমিল যুক্ত ছড়াগুলিতে দৈনন্দিন জীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে। প্রতিটি ছড়ার ভাব ও বিষয় ভাবনার প্রাচীনত্বের ছোঁয়া লক্ষণীয়। 'আদ্ পইসা', 'অসুদ কড়াকড়া', 'ছেলে হবে জড়জড়া', 'নূতন টাকা' সব শব্দগুলি অর্থনৈতিক জীবনের প্রতিচ্ছবি। দ্বিতীয় ছড়ায় জাদুশক্তির প্রকাশ এবং তৃতীয় ছড়ায় গ্রামজীবনের দুরাশা-ধোঁয়াশার অবসান ঘটিয়ে আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার আভাস ফুটে উঠেছে। যাতে টিকে থাকবে সাংসারিক সুখ-ঐশ্বর্য। এছাড়াও আধ > আদ, ঔষধ >

অসুদ, আসবে > আইস্‌বে ধ্বনিগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ছড়ার প্রবহমানতা ও বিদ্যমান।

ঘ। চারটির অধিক বাক্যে রচিত ছড়া ঃ

১। একতলা দুতলা তিনতলা / পুলিশ যাবে নিমতলা / পুলিশের হাতে লম্বা লাঠি / ভয় করবে না কংগ্রেস পাটি / কংগ্রেস পাটি বারটা / ডিম পেড়েছে তেরটা / একটা ডিম নষ্ট / চড়াই পাখির কষ্ট/ [৬২]

২। আয়লারে আয়লা / জেষ্ট মাসের পইলা / জামা দুটা মইলা / গেঞ্জি দুটা ফুটা / প্লাসটিকের জুতা / আলমারিতে গোলাপ ফুল / টেক্সিয়ালার টাকে চুল/ [৬৩]

—এই চারটি পংক্তির অধিক ছড়াগুলি বিবরণমূলক। উপরোক্ত প্রতিটি ছড়াই এখানে শিশুদের ছড়া। এই ছড়াগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য অসংলগ্নতা। ছড়াগুলি বেশ আধুনিক সময়ের। 'পুলিশ', 'কংগ্রেস পার্টি', 'আয়লা', 'আলমারি', 'টেক্সিয়ালা', শব্দগুলিতে আধুনিক যুগ-জীবনের প্রভাব রয়েছে। এই ছড়াগুলি যেহেতু বিবরণমূলক, তাই এতে অপ্রয়োজনীয় শব্দ ও লক্ষ্য করা যায়। শিশুরা যেমন অকপট, প্রগলভ, ছড়ার আকৃতি, গতি প্রকৃতিও সেইরকম ঝরঝরে গতিময় এবং শিশুদের মতো উচ্ছ্বল, স্বতস্ফূর্ত।

ঙ। দীর্ঘ বাক্যে রচিত ছড়া ঃ

১। বাজনা বাজে মাইক বাজে বাজে জগঝম্প
মাঘের শেষ তবুও কিন্তু যায়নি শীতে কম্প
উৎসবে আজ মাত্‌ছে সবে মানছে না কুন ক্লেশ
একে একে উৎসবে সব মেতে উঠেছে বেশ
কালকে ছিল শিবরাত্রি আনন্দ সবার মনে
জল ঢেলে তাই শিবের মাথায় মানস করে সবে
অমঙ্গাল আজ দূর কর সব সবার মনোভাবে
শিবরাত্রির মানত করে যত কুমারী গনে
উপোষ করে পূজা দেয় বাবা শিবের পদে

দিনটি রবে পরিচিত মানব কুলের মাঝে
শিব-দুর্গার বিয়ে হল শিবরাত্রির সাঁঝে[৬৪]

২। বুড়ি তোর হাঁড়ি কুঁড়ি কাই্
হাঁড়ি কুঁড়ি কাই্ পাবু ভাই
গ্যাঁড়ায় রাঁদিয়া খাই
গ্যাঁড়ায় রাঁদিয়া খাউ বুড়ি তোর
চুলার পাঁউস্ কাই
চুলার পাঁউস্ কাই পাবু ভাই
বাড়ে বিছি দেই
বাড়ে বিছি দউ বুড়ি তোর
বাড়ির খন্দ কাই
বাড়ির খন্দ কাই পাবু ভাই
হাটে বিকিয়া দেই
হাটে বিকিয়া দউ যদি তোর
পইসা কড়ি কাই
পইসা কড়ি কাই পাবু ভাই
পান দক্তা খাই
পান দক্তা খাউ বুড়ি তোর
ঠোঁট্ রাঙা কাই
ঠোঁট্ রাঙা কাই পাবু ভাই
ডেলি পান্তা খাই
ডেলি পান্তা খাউ বুড়ি তোর
পেট গাড়ু কাই
পেট গাড়ু কাই পাবু ভাই
ডেলি হাগ্তে যাই
ডেলি হাগ্তে যাউ বুড়ি তোর
পঁদ অদা কাই

পঁদ অদা কাই পাবু ভাই
উনানে সেঁকিয়া লেই
উনানে সেঁকিয়া লউ বুড়ি তোর
উনানে আগুন কাই
উনানে আগুন কাই পাবু ভাই
লোকে দর্‌কে যাই
লোকের ঘর কাই পাব ভাই
দিল্লি কটক যাই[৬৫]

— দীর্ঘ বাক্যে রচিত ছড়ার গঠনগত বাক্য বিন্যাসের ক্ষেত্রে কিছু পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্যকে বহন করে আনে। ছড়ার মূল বক্তব্য প্রথম থেকে শেষ চরণ পর্যন্ত প্রবাহিত। নির্দিষ্ট কোনো ঘটনার সম্পূর্ণ কাহিনীবস্তু এতে লক্ষণীয়। দীর্ঘ বাক্যে রচিত এই ছড়াগুলি যেমন প্রশ্নোত্তরধর্মী হয় তেমনি উৎসব, অনুষ্ঠান, দেবতানির্ভর, এমন কি জীবনের কোনো নির্দিষ্ট পর্যায় কেন্দ্রিক ও হতে পারে। এই জাতীয় ছড়ার অর্থ প্রতিটি চরণে এতই দৃঢ়বন্ধ থাকে যে, শ্রোতার কাছে কোনো চরণ ভুলে গেলে চলবে না। তাই আগাগোড়া এক শৃঙ্খলবদ্ধতা বিষয়বস্তুকে পরিণতির পথে নিয়ে যায়। প্রথম ছড়াটিতে কুমারী নারী কর্তৃক পালিত শিবরাত্রির ব্রত এবং উৎসবমুখর বর্ণনা রয়েছে। দ্বিতীয়টিতে রয়েছে প্রশ্ন-উত্তর মূলক শৃঙ্খলিত বেণীবন্ধন। এক বৃদ্ধার জীবন ইতিহাসের করুণ কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার, আপাতভাবে ঠাট্টা-তামাসা হলেও এখানে আছে বাস্তবের চরম দুর্দশা।

চ। অসম্পূর্ণ বাক্যে গঠিত ছড়া ঃ

বাক্য যখন কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া পদের যোগে সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থান এবং যথাযথ অর্থবোধক হয়ে ওঠে, তখন তাকে আমরা সম্পূর্ণ বাক্য বলি। কিন্তু ছড়ার বাক্যে সর্বদা এমনটা নাও হতে পারে। বেশকিছু ছড়া আছে তাদের বাক্য শর্তগুলি যথাযথ নয়, আমার সংগৃহীত কয়েকটি ছড়ায় এই ধরনের দৃষ্টান্ত সহজেই মিলবে। যথা ঃ

১। শাউড়ীর পালা
কী বউড়ীর পালা

২। ঘর জ্বালানী

পর ভুলানী

৩। নয় ছয় / ভাগ্যে হয়

— উপরোক্ত ছড়াগুলির প্রথম ছড়াটিতে কর্ম নেই, আবার দ্বিতীয়টি কর্তাহীন, তৃতীয়টিতে আসক্তি থেকে যায় যে, কোন্ জিনিস বা বস্তুর কথা বলা হচ্ছে— 'নয় ছয় / ভাগ্যে হয়', তার কোনো পরিষ্কার উল্লেখ নেই। উপরের প্রতিটি ছড়া তাই কোনো না কোনো দিক দিয়ে অসম্পূর্ণ। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, লোকায়ত মানুষ কথায় কথায় ব্যবহৃত এই অসম্পূর্ণ ছড়াগুলির অর্থ সহজেই অনুধাবন করতে পারে ; কেননা সামাজিক অর্থ মূল্য এদের কাছে কোনো অংশে কম নয়। এখানেই এই ছড়াগুলির বিশিষ্টতা এবং বৈচিত্র্যতা।

পরিশেষে বলা যায়, এই অধ্যায়ের আলোচনায় ছড়ার মধ্যে ব্যবহৃত এমন অনেক শব্দ আছে, যেগুলির হয়তো কোনো ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হয়ে ওঠেনি। তবে সমগোত্রীয় একই ধরনের অন্য শব্দের আলোচনা করা হয়েছে। যতদূর সম্ভব কথ্যভাষার অর্থগুলিও আলোচিত হয়েছে। এখানে এমন অনেক ছড়ার উল্লেখ রয়েছে, যাকে দেখে আপাতভাবে প্রবাদধর্মী বলে মনে হতে পারে, তথাপি প্রবাদধর্মী ছড়াগুলি সংগৃহীত এবং আলোচিত — কেননা এরা প্রবাদের মতো শোনালেও দেহকাঠামোতে ছড়ার বৈশিষ্ট্যই ধারণ করেছে। এবং ছড়া হিসেবেই অধিক প্রচলিত। সবশেষে বলি ছড়াগুলি কেবল গবেষণার জন্য সংগৃহীত এবং আলোচিত। এরমধ্যে অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। কোনো কোনো ছড়ায় জাতিগত চিন্তাধারার বিশ্লেষণ আছে, কিন্তু তা কেবল ছড়ায় উঠে এসেছে তাই। এতে আমার অন্য কোনো উদ্দেশ্য গ্রহণ করবেন না। যদি তা অন্য কোনো অর্থ প্রকাশক বা পাঠককে আঘাত করে, তবে তা আমার বোঝানোর অক্ষমতা বলে ক্ষমা করবেন।

প্রসঙ্গ নির্দেশ ও মন্তব্য ঃ

১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রী দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, সংসদ বাংলা অভিধান, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ, ১৯৯৪, কলি-৯, পৃ-৫০০।

২. ছড়া, পরীক্ষাগারে গবেষণা লব্ধ বিজ্ঞান বলে পরিগণিত না হলেও ছড়ায় রয়েছে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণগত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, যা দিয়ে লোকসাধারণ জীবন দর্শন গণিত বিশেষ জ্ঞানের সন্ধান পায়, তাই-ই এখানে বিজ্ঞান মনস্কতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য শেক মকবুল ইসলাম, লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞান ও তত্ত্ব ; পদ্ধতি ও প্রয়োগ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১১, কলি-৯, পৃ-১২৭।

৪. ছড়াটি লাক্ষী গ্রামের নিকুঞ্জ বেরার কাছ থেকে সংগৃহীত। ছড়া বাহকের সাক্ষাৎকার দ্বিতীয় অধ্যায়, ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা—৪, পৃ-৯০তে সংযোজিত হয়েছে।

৫. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-৯০ দ্রষ্টব্য।

৬. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-৯০ দ্রষ্টব্য।

৭. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-৯০ দ্রষ্টব্য।

৮. আলোচ্য ছড়াটি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গাল' কাব্যগ্রন্থের ঈশ্বরী পাটনীর উক্তি।

৯. দ্বিতীয় অধ্যায়ে ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা-২, পৃ-৮৮ দ্রষ্টব্য।

১০. 'ঘসি' শব্দটি ঘুটে এর রূপান্তর। ঘুটে উৎপাদন হয় গোরুর মল গোমাই থেকে। গোমাইকে গোলাকার ভাবে শুকিয়ে জ্বালানীতে পরিণত করার প্রক্রিয়াই গ্রাম্য কথ্য ভাষায় 'ঘসি' বলে পরিচিত। যাকে ছড়ার ভাষায় 'ঘসিতে' বলা হয়েছে। পরিশিষ্ট-১, চিত্রসংখ্যা—৪২, পৃ-৫১৩ দ্রষ্টব্য।

১১. আমড়া এক ধরণের টক ফল। কাঁচা এবং পাকায় দুভাবেই খাওয়া যায়।

১২. গবেষণা অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাক্ষাৎকার সংখ্যা ৩, পৃ-৮৯ দ্রষ্টব্য।

১৩. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোকসাহিত্য, বিশ্বভারতী ২০০৪, কলি-১৭, পৃ-৭ দ্রষ্টব্য।

১৪. 'চাঁটাই' হল তালপাতার তৈরী। এটিকে মাটিতে বসার আসন হিসেবে ব্যবহার হয়। পরিশিষ্ট-১, চিত্রসংখ্যা—৪৩, পৃ-৫১৪ দ্রষ্টব্য।

১৫. পল্লীসমাজ, লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গ্রন্থটির প্রকাশ কাল ২০০৩, প্রকাশক সাহিত্য সংগী।

১৬. গ্রন্থটির লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশিত হয়েছে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে।

১৭. পরিশিষ্ট-১, চিত্রসংখ্যা—৪৪, পৃ-৫১৫ দ্রষ্টব্য।

১৮. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য রামেশ্বর শ, সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলাভাষা, পুস্তক বিপণী, ১৯৯২, কলি-৯, পৃ-৪৪ দ্রষ্টব্য।

১৯. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ-মাধ্যমিক কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত বাংলা ভাষা ও শিল্পসাহিত্য সংস্কৃতির ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা, ২০১৪—১৫, কলি-৫৬, পৃ-১০৮ দ্রষ্টব্য।

২০. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ছড়া বাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৪, পৃ-৯০।

২১. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ছড়া বাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা-১৬, পৃ-১০২।

২২. 'জড়াজড়া' শব্দের অর্থ জোড়াজোড়া অর্থাৎ যমজ সন্তান হওয়ার কথা ব্যক্ত হয়েছে।

২৩. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ছড়া বাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৪, পৃ-৯০।

২৪. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-৯০ দ্রষ্টব্য।

২৫. শাক্ত পদাবলীর অন্যতম দুটি পর্যায় হল আগমনী ও বিজয়া। রামপ্রসাদ সেন এবং কমলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় এই দুই ধারার শ্রেষ্ঠ কবি এবং সাধক বলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয়।

২৬. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা—৪, পৃ-৯০।

২৭. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-৯০ দ্রষ্টব্য।

২৮. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-৯০ দ্রষ্টব্য।

২৯. কুটুম শব্দ 'কুটুম্ব' শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ আত্মীয়।

৩০. অর্থাৎ শুধু আলু ভাতে ভাত খেয়ে থাকবার কথা বলা হয়েছে।

৩১. 'ভাজ' < ভাউজ, অপিনিহিতিগত পরিবর্তন হয়েছে, যার অর্থ ভাই বউ।

৩২. 'মাউগ' শব্দটির ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তন হয়েছে মাগ > মাউগ, অপিনিহিতিগত, যার অর্থ স্ত্রী।

৩৩. স্ত্রীর ভাইবউকে শালা ভাউজ বলে। শালা ভাউজ সম্পর্কটি ঠাট্টা-তামাসার।

৩৪. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা-২, পৃ-৮৮।

৩৫. যে মেয়ের মাথার চুলে একফোঁটা তেল নেই, খস্‌খসে চুল বোঝাতে উখ্‌লা শব্দটির প্রয়োগ হয়েছে।

৩৬. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-১৪০ দ্রষ্টব্য।

৩৭. 'ভুরিভুরি' শব্দটির অর্থ পর্যাপ্ত। শব্দটি ধন্যাত্মক শব্দ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় শব্দটি ব্যবহার করেছেন জমিদার শ্রেণীর চরিত্র বোঝাতে।

৩৮. 'জঁতায়', অর্থাৎ জীবন থাকতে থাকতে দেওয়া।

৩৯. দেলু এসেছে দেওয়া থেকে।

৪০. 'তুঁড়ে', শব্দটির অর্থ তুণ্ডু, মুখে। ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবরর্তন—তুঁড়ে>তুঁণ্ডে>তুণ্ডু।

৪১. 'মুড়ে' শব্দটির অর্থ মাথায়। 'মুড়ি' শব্দটি মুণ্ড থেকে এলেও এখানে স্ত্রীলোকের মাথার কথা বলা হয়েছে।

৪২. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৪, পৃ-৯০।

৪৩. 'চিৎপিটিয়া' চিৎ হয়ে মহাদেবকে প্রণাম করার কথা বলা হয়েছে।

৪৪. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা-২৩, পৃ-১০৯।

৪৫. পরিশিষ্ট-১, চিত্রসংখ্যা—৪৫, পৃ-৫১৬ দ্রষ্টব্য।

৪৬. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যয়, বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৪, কলি-৭৩, পৃ-৩৭।

৪৭. পরিশিষ্ট-১, চিত্রসংখ্যা—৪৬, পৃ-৫১৭ দ্রষ্টব্য।

৪৮. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য সুকুমার সেন, ভাষার ইতিবৃত্ত, ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স, ১৯৭৯, কলিকাতা, পৃ-১৮৬।

৪৯. পরিশিষ্ট-১, চিত্রসংখ্যা—৪৭, পৃ—৫১৯ দ্রষ্টব্য।

৫০. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য প্রেমানন্দ প্রধান, হিজলীনামা, কন্টাই হাউস ওনার্স এ্যাসোসিয়েশন, কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর, ২০০৩, পৃ-৭, ৬২।

৫১. মিলি=প্রাপ্ত হই। 'বাটত মিলিল মহাসুখ সাঙ্গা।।' মেলি=পরিত্যাগ করি। 'খুন্টি উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছি' (মনীন্দ্র মোহন বসু, পৃ-৭৬, ৮১)

৫২. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা-১৭, পৃ-১০৩।

৫৩. 'Slate' D K illustrated Oxford Dictionary, Page-636. Bluesh-Purple rock easily split into smooth, flat plates used as roofing material and formerly for writing on.

৫৪. 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম'। পণ্ডিতগণ মনে করেন বাক্য রসাত্মক হলেই তা কাব্য হয়। ছড়ার ক্ষেত্রেও কথাটি সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

৫৫. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য অতুলচন্দ্র গুপ্ত, কাব্যজিজ্ঞাসা, বিশ্বভারতী, ১৯৯১, কলি-১৭, পৃ-২৩।

৫৬. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোকসাহিত্য, বিশ্বভারতী, ২০০৪, কলি-১৭, পৃ-৭।

৫৭. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা-২৮, পৃ-১১৪।

৫৮. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-১১৪ দ্রষ্টব্য।

৫৯. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা—১৫, পৃ-১০১।

৬০. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-১০১ দ্রষ্টব্য।

৬১. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-১০১ দ্রষ্টব্য।

৬২. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা—২৪, পৃ-১১০।

৬৩. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-১১০ দ্রষ্টব্য।

৬৪. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা—১৪, পৃ-১০০।

৬৫. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহী বাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা—৯, পৃ-৯৫।

—ঃঃ—

চতুর্থ অধ্যায়

একটি তুলনামূলক অনুসন্ধান ঃ লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখা বনাম ছড়া।

লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে বিশ-শতকের মাঝামাঝি থেকে বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতির প্রয়োগ ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়। ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, জাতীয়তাবাদী পদ্ধতির প্রয়োগ বিশ-শতকের প্রথম দিকেই লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তবে পরবর্তীকালে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী, তুলনামূলক পদ্ধতি মনোসমীক্ষণ পদ্ধতিগুলিও লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চায় বলিষ্ঠ পদ্ধতি রূপে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। বর্তমান গবেষণা অভিসন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায় পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ও অধ্যায়টি নির্মাণের ক্ষেত্রে তুলনামূলক পদ্ধতিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই অধ্যায়টিতে পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাপ্ত ছড়াগুলির সঙ্গে লোকসাহিত্যের অন্যান্য সংরূপগুলির মধ্যে বিষয়গত ও গঠনগত তুলনামূলক আলোচনা করা হবে। এই আলোচনার সুবিধার্থে পুরো অধ্যায়টিকে কয়েকটি উপ-অধ্যায়ে বিভক্ত করে নেওয়া হল। যথা—

১। ছড়া ও ধাঁধা
২। ছড়া ও প্রবাদ
৩। ছড়া ও লোকগান
৪। ছড়া ও গীতিকা
৫। ছড়া ও লোককথা
৬। ছড়া ও লোকপুরাণ।

১। ছড়া ও ধাঁধা ঃ

সাধারণত লোকছড়া ও লোকধাঁধার মধ্যে রূপরীতিগত ফারাক থাকলেও এই দুই লোকসাহিত্যের উপধারার মধ্যে লোকজীবনের জীবনাদর্শের একটা সমান্তরাল প্রতিফলন আছে। বলাবাহুল্য পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাপ্তছড়াগুলির সম্পর্কেও একথা একইভাবে প্রযোজ্য। বর্তমান উপ-অধ্যায়ে পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলের ছড়াগুলির সঙ্গে ধাঁধার সম্পর্ক নির্ণয় করার উদ্দেশ্যে কিছু সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য তুলে ধরা হল, অবশ্যই তা প্রাপ্তছড়ার ভিত্তিতে।

ক। ধাঁধার আলোচনায় কমপক্ষে দুজন মানুষকে প্রয়োজন। একজন বক্তা বা প্রশ্নকর্তা, অপরজন শ্রোতা বা উত্তরদাতা। যেহেতু ধাঁধায় রয়েছে প্রশ্নের বার্তা, সেহেতু এখানে উত্তরদাতাকে অনেকবেশি উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন, স্মৃতিধর এবং সক্রিয় হতে হয়। প্রশ্নকর্তার প্রশ্নের উত্তর, উত্তরদাতা দিতে পারেন আবার নাও দিতে পারেন, তবে উত্তরদাতা উত্তর খোঁজেন, শেষে পারলে দেন কিংবা নাও দেন, ধাঁধা তবে দুজনকে নিয়েই। ছড়ার আলোচনায় উভয় পক্ষ থাকলেও শ্রোতার ভূমিকা সেভাবে সক্রিয় নয়, কেননা সেখানে উত্তর খোঁজার কোন প্রশ্ন-ই ওঠে না। তাই উত্তর দানের বাধ্যবাধকতাও নেই।

যথা ঃ ধাঁধা

প্রশ্ন ঃ উপরনু পড়ল (অ)ছুরি
ছুরি বলে ঠায় ঘুরি — উত্তর ঃ বাঁশপাতা।

ছড়া ঃ কে তার কি কথা কয়
গেলি তার মার কথা কয়[১]

খ। ছড়া ও ধাঁধা উভয়-ই স্মৃতি ও শ্রুতিনির্ভর।

গ। উভয় রচনাই প্রথমে ব্যক্তি, পরে তা সমষ্টির। লোকায়ত মানুষ হঠাৎ করে এই রচনাগুলি সৃষ্টি করলে ও পরে পরে তা সমাজের আর পাঁচজনের হাতে পড়ে সমষ্টির রচনায় পরিণত হয়। তাই এদের কোনো নির্দিষ্ট রচয়িতা নাই, এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য— "কোনোটির কোনো কালে কোনো রচয়িতা ছিল বলিয়া পরিচয় মাত্র নাই এবং কোন্ শখের কোন্ তারিখে কোন্টা রচিত হইয়াছিল কাহারো মনে উদয় হয় না।"[২] কোথায় কবে, কীভাবে রচিত তা নিয়ে ও কেউ প্রশ্ন করে না। এগুলি সমাজের সামগ্রিক চেতনার প্রকাশ।

ঘ। রচনাগুলি যেহেতু স্মৃতি ও শ্রুতিনির্ভর, তাই এদের পাঠান্তর লক্ষ্য করা যায়। তবে ধাঁধার তুলনায় ছড়ার পাঠান্তর অনেকবেশি। ধাঁধায় তত Variation নেই। নিচে পাঠান্তরযুক্ত ছড়া ও ধাঁধা হল,—

ছড়াঃ ১। পান্তা খাইতে নু নাই
কম্‌লি শাগে জিরা

২। গরম্‌ভাতে নু নাই

কম্‌লি শাগে জিরা

ধাঁধাঃ ১। অতটুকু গাছে

রাঙা বউটি লাচে

২। অতটুকু গাছে

টুকটুকে বউ লাচে (পাকা লংকা)

ঙ। ছড়া ছন্দবন্ধ পদ্যে রচিত। ছড়ার জগৎ পদ্যধর্মী এবং তা বেশিরভাগই অন্ত্যানুপ্রাসছন্দযুক্ত। কিন্তু ধাঁধার বেলায় সেকথা সর্বদা খাটে না। অধিকাংশ ধাঁধা পদ্যধর্মী হলেও ছন্দহীন গদ্যধর্মী ধাঁধাও লক্ষ্য করা যায়। যেমন ঃ

গদ্যধর্মী ধাঁধা ঃ

১। কোন্‌ বাচ্চা কাঁদে না? (চৌবাচ্চা)

২। কোন্‌ দেশে মাটি নাই? (সন্দেশে)

৩। কোন্‌ কলে জল নাই? (গ্যাঁড়াকলে)

ছন্দধর্মী ছড়া ঃ

খুকুরাণী ফড়্‌ফড়ানি

ভালো বেগুনের চ্যারা

খুকুর তরে বর আইস্‌বে

আয়ে বিয়ে পাস করা[৩]

চ। ছড়ার মতো ধাঁধা ও বিভিন্ন চরণের হয়। কোনোটা এক চরণের, কোনোটা দুই চরণের আবার তিন বা তার অধিক চরণেরও লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

ছড়া ঃ

১। নয় ছয় ভাগ্যে হয়। (এক চরণযুক্ত)

২। ঘরে নাই চিনি

মেয়ে আমার মন্দাকিনী (দুই চরণযুক্ত)

৩। বাম ঠাকুর বাম ঠাকুর

ঘোয়ে শাদ্দ হয় ?

কুনশালা কয় ?

তুমার বেটা শালা কয়

ও তিথি অনুসারে হয়।[৪] (অধিক চরণযুক্ত)

ধাঁধা ঃ

১। কোন দেশে মাটি নাই ? (সন্দেশে, এক চরণযুক্ত)

২। এখান থেকে মারলাম তাড়া

তাড়া গেল বামুন পাড়া (শাঁখ, দুই চরণযুক্ত)

৩। নিশিযোগে গোপনেতে

জন্মে যার ঘরে

তার ঘরের লোক সব

কান্নাকাটি করে

জন্মদাতা জন্ম দিয়া

সত্তর পালায়

মুর্খের নাহিকো শক্তি

পন্ডিতের বুঝা দায়[৫] (চোর, অধিক চরণযুক্ত)

ছড়া এবং ধাঁধা উভয় রচনাই শিশু উপভোগ্য হলেও ধাঁধা মূলত জ্ঞানচর্চা এবং বুদ্ধির অনুশীলন, যাতে আছে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা, যা শিশুর দ্বারা সম্ভব নয়। সুতরাং ধাঁধা বয়স্ক মানুষের অবসর বিনোদনের জন্য। মিলের মতো ছড়া এবং ধাঁধার মধ্যে বেশকিছু অমিলও চোখে পড়ে। নিম্নে ছড়া ও ধাঁধার মধ্যে বেশকিছু অমিল তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

ক। ছড়ার ছন্দনির্মিতি কৌশল বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ছড়ার ছন্দ মানেই শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দ। যাকে দলবৃত্ত বা স্বরবৃত্তও বলা হয়। এই ছন্দে প্রতিটি শব্দের প্রথমেই বিশেষ

ঝোঁক দিয়ে উচ্চারণ করা হয়, যার প্রতিটি পূর্ণ পর্ব ৪-মাত্রার এবং অপূর্ণ পর্ব ১, ২, ৩ মাত্রারও হতে পারে। যথা—

১। পড়াসুয়াঁ / করে যে / ৪+৩

গাড়ি চাপা / খায় সে / ৪+৩

ছড়াটির প্রতিটি চরণে দুটি করে পর্ব রয়েছে, তারমধ্যে একটি পূর্ণ পর্বের এবং শেষেরটি অপূর্ণ পর্বের, মাত্রা সংখ্যা ৪+৩।

ধাঁধায় শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দের ব্যবহার খুবই কম। এর ছন্দ মাত্রাবৃত্ত বা পয়ার ছন্দের হয়ে থাকে। যথাঃ—

১। রক্তে ডুবু ডুবু / কাজলের ফঁটা ৭+৬

অতিপর্ব— (যে) নাই কইতে পারে / সে মজুমদারের / বেটা (১)+৭+৭+২

খ। ধাঁধায় ছন্দ মেলানোর জন্য বেশ কিছু শব্দ বা বাক্য থাকে, যা এককথায় নিরর্থক এবং অপ্রাসঙ্গিক। কেবলমাত্র শ্রোতাকে জব্দ করার জন্য ব্যবহার করা হয়। যেমন—

১। থাকের উপর থাক্

যে নাই কইতে পারে তার্ চোদ্দটা বাপ্ (কলাকাঁদি)

২। কাঁচায় তল্তল পাকায় সিঁদুর

যে নাই কইতে পারে তার বাপবেটা ইঁদুর (কলসী)

উপরোক্ত ছড়ার 'চোদ্দটা বাপ', 'বাপবেটা ইঁদুর' শব্দগুচ্ছগুলি কেবল ছন্দের প্রয়োজনে এবং শ্রোতাকে জব্দ করার জন্যে বলা হয়েছে।

গ। ছড়ার বিষয়বস্তুতে এমনকিছু শব্দ এই উপকূলীয় অঞ্চলে পাওয়া যায়, যা ধাঁধায় নেই। যেমন—

১। হাড়োরে গড়োরে লাউ বাড়ে কুমড়া বাড়ে

আমাহারে কচির চোখে ঘুম দিয়া যা

২। আয়রে ঘুম যায়রে ঘুম
পাখার বাতাসে
ডিমালু ঝিমালু পাতা
আমাহারে কচির ঘুম দিয়া যা[৬]

'হাড়োরে গড়োরে', 'ডমালু ঝিমালু' এই শব্দগুলির অর্থ কী তা ঠিক পরিষ্কার নয়, যেমন স্পষ্ট নয় 'হাট্টিমা টিম টিম' শব্দটি। এটি একটি বহুল প্রচলিত ছড়া—

হাট্টিমা টিম্ টিম্
তারা মাঠে পাড়ে ডিম
তাদের খাড়া দুটা শিং
তারা হাট্টিমা টিম্ টিম্[৭]

ঘ। ধাঁধায় থাকে নির্মল আনন্দ। শ্রোতাকে আনন্দদানের জন্য এর ভাষা অনেক বেশি রসগ্রাহী, মনোগ্রাহী। তাই এই ভাষায় থাকে ব্যঞ্জনা, এবং কবিত্বের ছোঁয়া যেমন—

১। এক থালা সুপারী
গুঁইতে পারে কোন ব্যাপারী (নক্ষত্রমণ্ডলী)

২। লালবাবু হাটে যায়
বিনা দোষে মার খায় (কলসী)

ছড়ার বিষয় বৈচিত্র্য বহুবিধ— প্রকৃতি, পশুপাখি, সমাজ, শিশু, নারী, জাতি, দেবতা, শাক-সব্জি, ভূত-প্রেত, ফলফুল প্রকৃতি প্রভৃতি। তেমনি ধাঁধায় আছে—কীটপতঙ্গ, গাছগাছালি, নক্ষত্র, মানুষ, তৈজসপত্র প্রভৃতি বিষয়। সেকারণেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছড়ার চিরত্বের[৮] গুণেই লোকসাহিত্যের অন্যতম ধারা ছড়া সাহিত্যে গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন আর এই বিষয়গুলিও পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাপ্ত ছড়ায় প্রচুর রয়েছে। তাই ছড়াগুলি এককথায় অতুলনীয় এবং অনবদ্য।

ছড়া ও প্রবাদ ঃ

ছড়া ও ধাঁধার মতই ছড়া ও প্রবাদের মধ্যে এক নৈকট্য আছে, পৃথক সংরূপ হয়েও এমন অনেক প্রবাদ আছে যার মধ্যে ছড়ার আদল ধরা পড়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরের

উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাপ্ত ছড়াগুলিতে এমন অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সংগত কারণেই বর্তমান গবেষণায় আলোচ্য অধ্যায়ের তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে প্রাপ্ত ছড়াগুলির সঙ্গে প্রবাদের একটি সামগ্রিক তুলনামূলক মূল্যায়নকে প্রাধান্য দেওয়া হল। যা গবেষণাটির পূর্ণতায় সহায়ক হবে।

ছড়া সাহিত্য এবং প্রবাদ দুটিই লোকসাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ছড়ার মতো প্রবাদ শ্রুতি ও স্মৃতিবাহিত, সমষ্টির রচিত মৌখিক সাহিত্য, তাই এরও কোনো লেখক নাই। কিন্তু ছড়া ও প্রবাদের এই তুলনামূলক আলোচনায় উভয়ের মধ্যে যে অমিলগুলি রয়েছে, তা তুলে ধরার মধ্য দিয়ে এই আলোচনাটি এগিয়ে যাবে। তবে তার পূর্বে এই অঞ্চলের কয়েকটি প্রবাদধর্মী ছড়াগুলিকে তুলে ধরা হল। যেমন—

১। কাছের কুটুম ছুঁচের লাতা
দূরের কুটুম ফুলের ছাতা

২। ভাত খাইয়্যা গা ধুয়ে জ্বরের তরে
বুড়া বইস্যে ব্যায়া হয় পরের তরে

৩। খালা দেখ্বু যেঠি
মাচ ধরবু সেঠি

ক। প্রবাদের মূল উদ্দেশ্য মানুষের চরিত্রের সংশোধন করা। প্রবাদ জীবনের ত্রুটিপূর্ণ দিকগুলিকে ঝাঁঝালো শাণিত বাক্যে সমালোচনা ও শ্লেষের দ্বারা সংশোধন করে। কিন্তু ছড়া তা করে না। বেশিরভাগ ছড়ায় প্রকাশিত হয় কল্পনামিশ্রিত মনের আবেগ, কিছু অসংলগ্ন ভাবনা। প্রবাদের মতো অনেক ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের ছড়াগুলি ধারালো, বৈদগ্ধপূর্ণ বা তীক্ষ্ণ নয়, বরং অনেকটাই জীবনের উপরিতলের সহজ সরল ভাবনামাত্র। যেমন—

১। পেট করেছি ভারি
কুনশালার ধারি

২। যদি খেতে চাও বোঁদে
বাটি লিয়ে চলে যাও
ছাগলের পঁদে

খ। ছড়ায় থাকে অস্পষ্ট অর্থবোধক কিছু শব্দ। প্রবাদে যা থাকে না। প্রবাদে বক্তব্য বিষয়ই স্পষ্ট এবং প্রধান। যা বলতে চায় তা বলা শেষ হলে প্রবাদের দায়িত্ব শেষ। যেমন—

ছড়াঃ ১। বাম ঠাকুর বাম ঠাকুর
ঘোয়ে শাদ্দ হয় ?
কুনশালা কয় ?
তুমার বেটা শালা কয়
ও তিথি অনুসারে হয়

২। মা মরল মাউগ বেইল
যউ তিনকে সউ তিন হইল

প্রবাদ ঃ ১। নাই মামুর চেয়ে কাঁয়া মামু ভালো
২। ঢেকি সর্গে গেলেও ধান ভাঙ্গো

গ। ছড়া হঠাৎ করে রচিত হয়। জীবনের হঠাৎ কোনো মুহূর্ত ছড়ায় ব্যক্ত হয়। তেমন কোনো দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ছড়ায় নাও থাকতে পারে। প্রবাদ কিন্তু জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি।

ছড়া ঃ বানের জ এসে
সব গেল ভেসে

প্রবাদ ঃ পিরিতে মজিলে মন
কিবা হাড়ি কিবা ডম

ঘ। ছড়া মূলত শিশু ভোলানাথ[৯]-এর জন্য রচিত। ছোট্ট খোকনকে নিয়ে শত ব্যস্ত মা তাড়াতাড়ি ঘুম পাড়িয়ে, বা অন্য কোনো খেলনাবাটি দিয়ে কিংবা দোলনায় দোল দোল করিয়ে ছড়া কাটে, তাই ছড়া শিশু মনোরঞ্জনের জন্য রচিত। যদিও বর্তমানে ছড়ার বিষয় ব্যাপক। কিন্তু প্রবাদে শিশুর কোনো স্থান নেই। প্রবাদ যেহেতু দীর্ঘ অভিজ্ঞতার, তাই সেখানে বয়স্ক মানুষের চিন্তা-ভাবনার প্রকাশ ঘটে। যেমন এই উপকূলীয় অঞ্চলে পাই—

ছড়া ঃ ধেইতা ধিনা
তাধিন ধিনা
খোকন নাচে

দেখে যানা

আহা কেমন

হাত্‌টি তুলে

নাচে আমার

সোনার ছেলে [১০]

প্রবাদ ঃ কুঁড়া খাওবা পো বয়ে

চিনি খাওবা পো গয়ে [১১]

ঙ। ছড়া চিত্রধর্মী। এখানকার বহুছড়া আছে, চোখের সামনে তার চিত্র যেন আঁকা। ছড়া আমাদের মাটির প্রকৃতির সুন্দর সুন্দর চিত্র এঁকে দেয়, কিন্তু প্রবাদে এই চিত্রের সুযোগ বড়-ই কম। যেমন—

দাদু দ্যাখে সিরিয়াল

কাকু দ্যাখে খবর

দিদা দ্যাখে বাংলা ছবি

কাঁদে সঁপর সঁপর [১২]

চ। প্রবাদের সত্য গাণিতিক সত্য যা ছড়ায় নির্দিষ্ট নয়। প্রবাদ বলে— 'কষ্ট না করলে কেষ্ট মিলে না'

আবার কখনো প্রবাদে পাই—

দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো

ছ। ছড়ার মতো প্রবাদ পদ্যধর্মী হলেও কখনো কখনো তা গদ্যধর্মী হয়ে থাকে—

পিরীতের পেত্নীও ভালো

জ। ছড়ায় সেভাবে কোনো ব্যাঞ্জার্থ নেই বললেই হয়, প্রবাদে কিন্তু থাকে—

ঢামে ঢোল ভিতরে পোল

ঝ। ছড়া যেহেতু প্রবাদের মত দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফল নয়, জীবনের সহজ, সরল, চিত্রগুলি এখানে ছায়া ফেলে, তবুও এর সমাজ মূল্য পরিলক্ষিত হয় যা প্রবাদে নেই। বিবাহবাসরে, ভূত-প্রেত জীবজন্তুকে বস করানোর জন্য ছড়ার জুড়িমেলা ভার। উপকূলীয় অঞ্চলে এরকম বহু ছড়ার দৃষ্টান্ত মেলে। যেমন বিখ্যাত একটি প্রচলিত ছড়া—

১। ভূত আমার পুত

পেত্নী আমার ঝি

বুকে আছে রামলক্ষ্মণ

ভয়টা আমার কি

২। আসতে যাইতে করে হিত

তার নাম পুরোহিত

ঞ। ছড়া যত ক্ষুদ্র হোক্ না কেন, প্রবাদের মতো ক্ষুদ্র নয় এবং প্রবাদের মতো বাস্তব নয়। ছড়ায় আছে অবাস্তব আর অসম্ভবের গল্প। তাই ছড়া প্রবাদের তুলনায় শিল্পসৌন্দর্যে অনেক বেশি আকর্ষণীয়। এই অঞ্চলের এরকম একটি ছড়া হলো—

একতলা দুতলা তিনতলা

পুলিশ যাবে নিমতলা

পুলিশের হাতে লম্বালাঠি

ভয় করবে না কংগ্রেস পার্টি

কংগ্রেস পার্টি বারোটা

ডিম পেড়েছে তেরটা

একটা ডিম নষ্ট

চড়াই পাখির কষ্ট[১৩]

ট। ছড়া মূলত নারীদের দ্বারা রচিত। যদিও ছড়া সমাজের সকলের। তবুও প্রবাদের মতো তা পুরুষ প্রভাবিত নয়।

ঠ। প্রবাদে পাঠান্তর সেভাবে নেই, ছড়ায় আছে। এ কারণে সহজেই অনুমান করা যায়, ছড়ার জনপ্রিয়তা প্রবাদের তুলনায় অনেক বেশি। তাই তার পাঠান্তরও বেশি। এই রকম এই অঞ্চলের একটি ছড়ার পাঠান্তর হল—

১। পাড়া ধড়্কি ধকড়্ ধাঁই

তোর কপালে পাল্কি নাই

২। উঁচ কপালি চিরুণ দাঁতি

তোর কপালে নাইকো পতি

৩। উঁচ্ কপালী চিরা দাঁতি

তোর কপায়ে নাইকো পতি

ঢ। ছড়া বলে দেয় কি ভালো আর কি মন্দ—

১। আশা দিল ভরসা দিল / জমি দিবে বুইয়া

আষাঢ় মাস হইতে / ঘরে রইল শুইয়া

২। ঘরে নাই নুন / ছেলে হইছে মিঠুন

ড। প্রবাদের সত্য চিরকালীন সত্য নয়। কিন্তু ছড়ায় যা সত্যি তাই সত্যি-ই হয়। যেমন—

প্রবাদঃ ভায়ের তুল্য মিত্র নাই

ভায়ের তুল্য শত্রু নাই

ছড়া ঃ ঝি রইনে জামি আদর

নাইনে জামি গাছের বাঁদর

ছড়া ও লোকগান ঃ লোকগানের অনেক ধারা। ছড়ার সঙ্গে লোকগানের নিবিড় সম্পর্ক। ছড়াতেও একটা সুর থাকে, তাল থাকে, লয় থাকে। আর একারণেই ছড়া কোনো কোনো সময় গাওয়া হয়। প্রাপ্তছড়াগুলির মধ্যে এমন কিছু ছড়া পাওয়া যায়, যার মধ্যে লোকগানের যোগ সাযুজ্য মেলে। এমন কয়েকটি ছড়ার দৃষ্টান্তে এই উপ-অধ্যায়ে, প্রাপ্ত ছড়াগুলির সঙ্গে লোকগানের তুলনামূলক আলোচনা করা হল। লোকগানের প্রধান প্রধান ধারা অনুসারে কয়েকটি সূত্রে আলোচনাকে প্রাধান্য দেওয়া হল। যথা—

১। ঝুমুর গান

২। মেছেনি গান

৩। চোরচুন্নী গান

৪। আঞ্চলিক গান প্রভৃতি।

সাঁওতালি ঝুমুর গানগুলি সহজ সরল সরস লৌকিক ভাবনার। যেমন একটি সাঁওতালি ঝুমুর গানে—

“ছোট মোট বাগুন বেটি

ডাঁড়ায় পড়ে চুল

মোচড়ে বান্ধিবে কেশ
কদম ফুলের পারা।।" [১৪]

—উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাপ্ত একটি ছড়ায় যেন এই ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে—

দোল দোল দুলুনি
রাঙা মাথায় চিরুণী
বর আইসবে যখুনি
লিয়ে যাবে তখুনি
বরের মাথায় ল্যাট্কাচুল
কনের মাথায় গেঁদা ফুল [১৫]

আরো একটি সাঁওতালি ঝুমুর গানে পাই—

"ঘরেতে শাসিনী (শাশুড়ী) বাদী
বাহিরেতে ননদিনী বাদী।
অন্তরে বা দেখা হয়—
আমার পুরুষ ও বাদী।" [১৬]

গৃহে শাশুড়ী ও বাহিরে ননদিনী উভয়েই বিরুদ্ধাচারণ করে, তাই স্বামীর সঙ্গে দেখা হয় না বললেই চলে। ঠিক এই রকম-ই আক্ষেপোক্তি উচ্চারণ হয়েছে এই উপকূলীয় অঞ্চলের একটি ছড়ায়—

জা ভাগারি ঠকর্ মকর্
ননদ রাঁড়ি পর
শাউড়ি রাঁড়ি মরবে যবে
করব তবে ঘর। [১৭]

সাঁওতালি ঝুমুর গানের নর-নারীর রোমান্টিক প্রেমকথাই বেশি করে ব্যক্ত হয়েছে। ঠিক তেমন-ই ক্ষেত্রসমীক্ষা অঞ্চলে প্রাপ্ত ছড়াগুলি ঝুমুর গানের তুলনায় কোনো অংশে কম নয়।

'মেছেনি' [১৮] গান প্রান্ত উত্তর বাংলার একটি জনপ্রিয় গান। জলপাইগুড়ি জেলার মেয়েদের সবচেয়ে বড় ব্রত 'মেছেনি' ব্রত। [১৯] 'মেছেনি' ব্রত একা হয় না। দল বেঁধে এই ব্রত হয়। 'মেছেনি' হল দেবী তিস্তা। তিস্তারা পাঁচবোন। তবে এই 'মেছেনি' গানে দেবী তিস্তার নামই সবচেয়ে বেশি উল্লিখিত। একটি মেছেনি গানে পাই—

১। "সাঞ্জা হলে সাঞ্জো বাতি
জুড়িমো রে
সাকালে উঠিয়া ছান ছড়ামো রে।"[২০]

ভাব বা বিষয়বস্তুতে নয়, লোকসংগীতের ছন্দে মিলে যায় এই অঞ্চলের ছড়াগুলি। ছন্দগত এইরকম একটি ছড়া হলো—

আল্‌তা বাটি পায়ের পাটি
পা ধুয়ে দে
জল নিবি না ডাঞ্জা নিবি
তা বলে দে।[২১]

এ যেন ঠিক উপরের ছড়ার অনুকরণে রচিত। লোকসংগীতে আছে সুরের মূর্চ্ছনা। কথার চেয়ে সুরের সঙ্গো সমাজ অনেক বেশি পরিচিত। কথা বলাতেই তার আবেদন ফুরিয়ে যায়। কিন্তু সুর দীর্ঘস্থায়ী হয়। মানুষের মনে তা একবার গেঁথে গেলে সদা সর্বদাই জাগরুক হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গো আশুতোষ ভট্টাচার্যের উক্তি স্মরণযোগ্য—

"সুর ব্যতীত গীতির প্রকৃত রসোপলব্ধি সম্ভব হইতে পারে না। প্রত্যেক লোকগীতিরই একটি নির্দিষ্ট সুর আছে, এই নির্দিষ্ট সুরের ব্যতিক্রম করিয়া কোন গীতিই গাহিতে পারা যায় না... সেইজন্য সুর ব্যতীত কেবলমাত্র কথা দ্বারা গীতি প্রকাশ করা যায় না।"[২২]

আমাদের আলোচ্য চতুর্থ অধ্যায়ের একটি তুলনামূলক অনুসন্ধান, 'অন্যান্য শাখা বনাম ছড়া' এই অধ্যায়ে লোকসংগীতের উক্ত বৈশিষ্ট্য এই অঞ্চলের কোনো কোনো ছড়ার বেলায় ও প্রযোজ্য। ছড়া মানেই শুধু কতকগুলি শব্দ মুখস্ত করে বলা নয়, যে যেখানেই তা বলুক না কেন, তার মধ্যে বিশেষ এক বাচন ভঙ্গীমা থাকে, যার মধ্যে সুরের ছোঁয়া থাকে। সে সুর লোকগানের উদাত্ত কণ্ঠের নাও হতে পারে, তবে মনকে দোলা দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

শিশু ভোলানো ছড়াগুলিতে শিশু কি বোঝে মায়ের মুখনিঃসৃত বাণীর মর্মকথা? শিশু বোঝে না। সে শুধু মায়ের মুখচ্ছবি দেখে আর এক চিরমধুর মর্মধ্বনি শ্রবণ করে, এক আবেশ মাখানো সুরমূর্চ্ছনা, মিষ্টি মধুর সন্ধ্যার ছায়া মাখা আধো আলো আধো অন্ধকার ভরা দোলনার দোদুল মুখরতা তাকে নিবিড়তায় আচ্ছন্ন করে নিয়ে যায় কল্পলোকের সুদূর

পারে। যেখানে মায়ের ছড়ার ভাষা নয়, সুর, কথা নয় মধুরতা, পংক্তি নয় আবিলতাই তাকে নিয়ে যায় আনন্দলোকে। তাই যেদিন কথা ছিল না, ভাষা ছিল না, মানুষ সেদিন সুরের ভেলাকে বহু মানুষের মধ্যে পাঠিয়ে দিয়েছিল। আমাদের এই উপকূলীয় অঞ্চলের বহু ছড়াতে রয়েছে এমন আবেশ, যা ঠিক লোকগানের-ই মতো—

১। আয়রে ঘুম যায়রে ঘুম
পাখার বাতাসে
ডিমালু ঝিমালু পাতা
আমাহারে কচির ঘুম দিয়া যা [২৩]

২। হাড়োরে গড়োরে
লাউ বাড়ে কুমড়া বাড়ে
আমাহারে কচির চোখে ঘুম দিয়া যায় [২৪]

এরকম বহু ছড়া আছে এই উপকূলের মাটিতে যা লোকগানের সুরের চেয়ে কোনো কম লহরী তুলে না। এই প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য উদ্ধার করতে পারি আমরা—

"... ভাষা হইতে ও সুর প্রাচীন। যেদিন ভাষা ছিল না সেদিন সুর ছিল ; যেদিন ভাষা থাকিবে না, সেদিন ও সুর বাঁচিয়া থাকিয়া তাহার অমরত্ব প্রচার করিবে।" [২৫]

লোকগানগুলি ক্ষুদ্রাকৃতির হয়ে থাকে। লোকগানগুলি কুন্দফুলের ন্যায় সুন্দর ও সৌরভময়। লোকমানুষ পথের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে যখনই যে দৃশ্য দেখে তাই নিয়ে রচনা করে গান। তাই একটি দৃশ্য শেষ হতে না হতে পুনরায় অন্য দৃশ্য ভেসে ওঠে, মন চলে যায় সেখানে, আর ক্ষণিক চিত্রপটগুলি গান হয়ে প্রকাশ পায়, ফলে এই লোকগানগুলি সংক্ষিপ্ত এবং ক্ষুদ্র হয়। ঠিক ছড়ার মতোই। ছড়াগুলি বেশির ভাগ-ই ক্ষুদ্রাকৃতির। যেমন—

১। আয়রে পাখি ল্যাজ ঝোলা
খেতে দুব চাল ছোলা
খাবি দাবি কল্‌কলাবি
ছেলেকে নিয়ে খেলা করবি [২৬]

২। কর্তা গেছে কাচারি
চিগ্‌নি শাগের হাপারি
জিনি পকার পঁদে আলো
বড়্‌ভাই একটি গল্প বলো
জয়ের পানি জকে যা
আমার সিলেট শুকি যা[২৭]

এইরকম কতকগুলি টুসুগান[২৮] আছে, যা এই অঞ্চলের ছড়াগুলির মতো ক্ষুদ্রাকৃতির। যেখানে টুসু গৃহস্থ পরিবারের মেয়ে, সে তেলের বাটি নিয়ে স্নান করে, মাথার চুল ঝাড়ে এবং গলায় সোনার হারও পরে—

"টুসু সিন্যাছেন গা হিল্যাছেন
হাতে তেলের বাটি।
নুয়ে নুয়ে চুল ঝাড়ছেন
গলায় সোনার কাটি।।"[২৯]

টুসু মুড়িও ভাজে,—

"আমার টুসু মুড়্হি ভাজে
কি বা খইড়কা লড়ে গ।"

টুসু চৌদলে বেড়াতে যান—

"আমার টুসু বেড়াতে যায়
চন্দন কাঠের চৌদলে।"

জলের ভিতর তাহার শ্বশুর বাড়ি—

"জলে হেল জলে খেল,
জলে তুমার কে আছে।
আপন মনে ভাবে দেখ
জলে শ্বশুর ঘর আছে।"[৩০]

এই অধ্যায়ে তুলনামূলক আলোচনায় একথা বলা যায় যে, প্রাপ্ত ছড়াগুলির সঙ্গে লোকগানগুলির এক নৈকট্য ও সাযুজ্য রয়েছে, যা অস্বীকারের উপায় নাই।

লোকগানের একটি উল্লেখযোগ্য গান হল চোরচুন্নী[৩১] গান। প্রান্ত উত্তরবাংলার দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার একটি জনপ্রিয় গান এই চোরচুন্নী গান। প্রতি বছর কালিপূজার সময় পুরুষরা এই গান গেয়ে থাকে ও নেচে থাকে। একজন চোর, অপরজন চোরণী সেজে সারাবছরের দুঃখ সুখের নানা কথা অভিনয় করে গেয়ে যায়। আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাবো ক্ষেত্রসমীক্ষায় প্রাপ্ত ছড়াগুলির সঙ্গোও এই গানগুলিরও অপূর্ব এক মেলবন্ধন আছে—

১। চোরচুন্নী—"ও গো, যে জন চরা করে চুরি—
তার মাইয়া পরে চুড়ি
নীল পাড়িয়া বোম্বাই শাড়ী।।"[৩২]

ঠিক উপরোক্ত গানের ছন্দে যেন লেখা এই ছড়া—

প্রাপ্তছড়া— লয়া নাঙ্গোর কড়ি
দিন পাঁচছয় লবর্ চবর্
ভাত বিহনে মরি[৩৩]

বিষয়বস্তুগত দিক দিয়ে লোকগান এবং লোকছড়া একাকার হয়ে গেছে—

২। চোরচুন্নী— চরা রে,
"আসিছে পূজার বাজার ঃ
নাগে মোক্ এই সন চন্দ্রহার ;
দিনে দিনে দিন যাছে মোর
করেক্ তুই বিচার—
নারীর উজানি বাহার।।"[৩৪]

প্রাপ্ত ছড়ায় পাই— ভাতার গ্যাছে কাতারপুর
ছাতা মাথায় দিয়া
আসবে ভাতার দ্যাখবে মুখ
নতুন টাকা দিয়া[৩৫]

— নারী জীবনে যৌবনের নানারকম শখ্ আহ্লাদ থাকে। উপরোক্ত চোরচুন্নী গানে পূজার আগমনে চোরণীর মনোকথা ব্যক্ত হয়েছে। যেখানে সে একটি চন্দ্রহার দাবী করেছে স্বামীর কাছে। ঠিক তেমনি প্রাপ্ত এই অঞ্চলের ছড়াটিতে ও নারীর চাওয়া-পাওয়ার অন্যতম

প্রতিচ্ছবি রয়েছে। স্বামী দীর্ঘদিন গেছে স্ত্রীকে ছেড়ে, কিন্তু একটি আশা তার রয়েছে বুকে, যেখানে 'নতুন টাকা' উপার্জনের মধ্যদিয়ে তার ভাবীকালের সুখ-সাহচর্য পরিপূর্ণ হবে। সেই আশায় অপেক্ষমান বিরহিনী নারী। দুটিতেই প্রাপ্তির আকাঙ্খা, যা কেবল তার স্বামীর কাছে। এখানেই মিশে গেছে ছড়া এবং লোকগান। এখানেই এই আলোচনার সার্থকতা।

এইরকম আরও একটি আঞ্চলিক গানে পাই—

আঞ্চলিক গানে—

"ঘরেতে শাসিনী (শাশুড়ী) বাদী,
বাহিরেত ননদিনী বাদী।
অন্তরে বা দেখা হয়—
আমার পুরুষ ও বাদী।" [৩৬]

প্রাপ্ত ছড়ায় আছে—

ননদিনী রায়বাঘিনী
দাঁড়িয়ে আছে কালসাপিনী
ননদিনী যদি মরে,
সুখের বাতাস বইবে ঘরে [৩৭]

—গার্হস্থ্য জীবন মানে স্বামী-শাশুড়ী-ননদ-ভাই-বোন-আত্মীয় স্বজন নিয়ে আমাদের পরিবার। আর এই পরিবারের সকলের মন ভোলানো খুব কষ্ট। এই চিত্র আমাদের বাঙালি জীবনের অচ্ছেদ্য চিত্র। আলোচ্য ভাবনা শুধু সাঁওতাল সমাজে কেন, যেকোনো পরিবারের নারীর একান্ত উক্তি। তা যেমেন লোকগানে সত্য, তেমন লোকছড়ার ক্ষেত্রেও সর্বতোভাবে সত্য। আরও একটি বিষয়ের উপস্থাপনা করে এই উপ-অধ্যায়ের আলোচনা শেষ করব। 'বারোমাসিয়া' [৩৮] একটি গানের সঙ্গো প্রাপ্ত ছড়ার মিল চোখে পড়ার মতো। 'বারোমাসিয়া' গান গোটা মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য সম্পদ। এই গান সাধারণত নারীর গান। বিরহকাতরা নারীর এই গান উদ্ভবকালে কৃষি জীবনের সঙ্গো সম্পৃক্ত ছিল, পরে তা প্রেমসংগীতে পরিণত হলেও মূলত পরবর্তীকালে তা নারী-পুরুষ উভয়েরই দুঃখ গীতিমূলক গানে পরিণত হয়েছে। নির্মলেন্দু ভৌমিকের সংকলনের [৩৯] ১৩৮ সংখ্যক গানটি [৪০] এবিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই গানে প্রকৃতি জগতের বিশেষ দিককে তুলে ধরা হয়েছে। বারোমাসের ক্রম-কথা গানটিতে ব্যক্ত—

বারোমাসিয়া গান—

“জ্যৈষ্ঠ মাসে মিষ্টি ফল, আষাঢ়ে বরিষা কাল ;
শ’ন মাস যাবে নারীটার ভাবিতে চিন্তিতে।
ভাদরে আউলিবে কেশ, আশ্বিনে বাইষ্যার শেষ—
কাত্তিক মাসোতে যাবে পুরুষটা বিদেশ॥
অগনে কাটিবে ধান, পুষ মাসে পুন্নিমার চাদ—
মাঘ মাসে যাবে নারীটা শহরে-বন্দরে।
ফাগুন মাসোতে তেগুণ জ্বালা, চৈত্ মাসে মন কালা
বৈশাখো মাসোতে যাবে পুরুষটা বৈদেশে॥” [৪১]

প্রাপ্ত ছড়া—

মাঘেতে মকর [৪২] মিঠা কটুতলে [৪৩] শিম্
ফাগুনেতে দ্বিগুণ মিঠা বাড়্তিকেতে [৪৪] নিম্
চৈত্রেতে শ্রীফল মিঠা খেয়েছিলেন রাম
বৈশাখেতে শসা মিঠা শোলমাছেতে আম
জ্যৈষ্ঠেতে পাকা আম আষাঢ়ে কাঁঠাল
শ্রাবণেতে খই দই ভাদ্রে পাকা আম
আশ্বিনেতে ঝুনা [৪৫] নারকেল কার্ত্তিকেতে ওল
মক্সিরেতে [৪৬] নবাঅন্ন চিংড়িমাছে ঝোল
পৌষেতে পিঠাপুলি খেতে লাগে মজা
ঘন আউটা [৪৭] তপ্তা দুধে বাসি পড়াপিঠা [৪৮] ॥ [৪৯]

উপরোক্ত বারোমাসিয়া গানটিতে বারোমাসের যে বর্ণনা রয়েছে তা আমাদের প্রাপ্ত ছড়াটির সঙ্গে হুবহু এক। বারোমাসের বর্ণনায় উপরোক্ত ছড়াটি যেন ‘বারোমাসিয়া’ গানের-ই প্রতিচ্ছবি। এমন দৃষ্টান্ত বিরল। এই অঞ্চলের এমন বহু ছড়া রয়েছে, যা আমাদের ‘অন্যান্য শাখা বনাম ছড়া’— এই আলোচনাকে পরিপূর্ণতা দেবে, এবং তুলনামূলক অনুসন্ধানকে সার্থক করে তুলবে।

৪। ছড়া ও গীতিকা ঃ

লোকসাহিত্যের ধারাগুলির মধ্যে আখ্যানধর্মী গীতিকার স্থান বাংলা লোকসাহিত্যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে, ময়মনসিংহ গীতিকাগুলি সংগ্রহ[৫০] ও প্রকাশের পর।[৫১] গীতিকাতে সাধারণত আখ্যান প্রাধান্য পেলেও কোথাও কোথাও ছড়া ধর্মী বর্ণনা অনুপ্রবেশ করেছে। 'মৈমনসিংহ গীতিকার'[৫২] 'মহুয়া' পালার একটি অংশে দেখা যায় সেই ছড়ার ছাঁদ—

"নয়া বাড়ী লইয়া রে বাইদ্যা লাগাইল বাইঙ্গান॥
সেই বাইঙ্গান তুলতে কইন্যা জুড়িল কান্দন॥[৫৩]

এমনই একটি ছাঁদের ছড়া প্রাপ্ত ছড়াগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। যদিও অর্থগত মিল নেই—

হাট গেলাম বাজার গেলাম
    কিনে আনলাম লাউ
হারার মা লাউ খইয়া
    করে হাউহাউ।[৫৪]

এমনই বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে 'মহুয়া' পালায় নদ্যার ঠাকুরের সঙ্গে মহুয়ার জলের ঘাটে দেখা—

"শুন শুন কইন্যা ওরে আমার কথা রাখ
মনের কথা কইবাম আমি একটু কাছে থাক।।"[৫৫]

ঠিক এই একই রকম মনের ভাবনা প্রাপ্ত ছড়াতেও পাওয়া যায়—

ভাতার বাপা তেলের কপা
সুরু ধানের খই
শুনরে ভাতার কানে কানে
মনের কথা কই[৫৬]

গীতিকা রোমান্টিক প্রেমের কথা বলে। নায়ক-নায়িকার দুঃসাহসিক রোমান্টিক প্রেমের অভিযান-ই গীতিকার মূল বিষয়। গীতিকার গীতি প্রাণতা অনেক বেশি প্রাণোজ্জ্বল হলেও ছড়াগুলি প্রাণরসে কম পরিপুষ্ট নয়। তাই গীতিকার মতো ছড়াগুলিও অনেক বেশি জনপ্রিয় এবং সমাদরপূর্ণ।

ময়মনসিংহ গীতিকার 'মহুয়া' [৫৭], 'মলুয়া' [৫৮], 'চন্দ্রাবতী পালা' [৫৯], 'কাজলরেখা' [৬০], 'ভেলুয়া সুন্দরী' [৬১], 'কঙ্ক ও লীলা' [৬২] প্রভৃতি পালাগুলি নাটকীয়তায় [৬৩] পরিপূর্ণ। এই পালাগুলিতে নাটকীয় রসের সঙ্গে সঙ্গে সংলাপধর্মীতার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন 'চন্দ্রাবতী' পালায় ঘটকের বিবাহ প্রস্তাব প্রদান—

"কেবা বর কিবা ঘর কহ বিবরণ।
পছন্দ হইলে দিব মনের মতন॥"
ঘটক কহিল কথা "সুন্ধা গ্রামে ঘর।
চক্রবর্তী বংশে খ্যাতি কুলিনের ঘর॥
জয়ানন্দ নাম তার কার্ত্তিক কুমার [৬৪]

এই ধরনের সংলাপ ধর্মীতা উপকূলীয় অঞ্চলের প্রাপ্ত ছড়াতেও পাওয়া যায়—

ধান ঘাটুঘাটু কন্যাগো হস্তে পাকা পান
বুকের মাঝে বিফল দুটি ব্রাহ্মণকে কর দান
ভাল বলেছ ব্রাহ্মণ ঠাকুর ভাল বলেছ তুমি
চোদ্দ বছর না জানি স্বামী
হাটের হাটানি বলে ওটি তোমার কে
লজ্জার খাতিরে পড়িয়া ওটি আমার ঠাকুরদা হে

—এই রকম নাটকীয় সংলাপ এই অঞ্চলের ছড়ায় বহুল লক্ষণীয়। [৬৫]

গীতিকার মতো ছড়ার ভাষা ছন্দধর্মী ও কাব্যগন্ধী

'মলুয়া পালায়— "ডুবুক ডুবুক ডুবুক নাও আর বা কত দূর।
ডুইব্যা দেখি কতদূরে আছে পাতালপুর॥"
পূবেতে গর্জিল দেওয়া ছুটল বিষম বাও।
কইবা গেল সুন্দর কন্যা মন-পবনের নাও॥ [৬৬]

প্রাপ্তছড়ায় পাই—

ঘরের ধারে লংকা গাচ
লংকা তুলে খাই
বন্ধুর কথা মনে পড়নে
ঝায়ে মরে যাই [৬৭]

বিষয়গত দিক থেকে গীতিকাগুলির সঙ্গে উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাপ্ত ছড়াগুলির তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। যেমন—'কঙ্ক ও লালা' গীতিকায় কঙ্ককে না দেখতে পেয়ে গর্গের উক্তি বিচিত্র মাধবকে—

"চারিদিক শূন্য হেরি তাহার কারণ
দেশে দেশে ঘুরি তোমরা কর বিচরণ।।"[৬৮] (মৈমনসিংহ গীতিকা)

এই একই আক্ষেপোক্তি লক্ষ্য করা যায়, প্রাপ্ত একটি ছড়ায়—

নিমাই সন্নাসী হইল
কাঁদে শচীর হিয়া
চারিদিকে শূন্য দ্যাখে
ওগো বিষ্ণুপ্রিয়া[৬৯]

আলোচ্য অংশে গীতিকার পিতৃহৃদয় এবং প্রাপ্ত ছড়ার মাতৃহৃদয় বাৎসল্যরসে একাকার হয়ে গেছে।

৫। ছড়া ও লোককথা ঃ

লোককথার একটি বিশেষ আঙ্গিক হল সূত্রছড়া। এই সূত্রছড়া ছাড়াও লোককথায় ছড়ার ব্যবহার থাকে। সুতরাং ছড়ার সাথে লোককথার একটা নিবিড় যোগ আছে। এই উপ-অধ্যায়টিতে প্রাপ্ত ছড়াগুলির সাথে লোককথায় ব্যবহৃত ছড়ার তুলনামূলক আলোচনা করা হল।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুমার ঝুলি ঃ বাংলার রূপকথা'[৭০]-র 'দুধের সাগর' গল্পে ছড়ার আদল তথা আঙ্গিক ও ছন্দগত মিল লক্ষণীয়। রাণীদের প্রশ্নে নৌকা থেকে যখন কুঁচবরণ কন্যা বললেন—

"মোতির ফুল মোতির ফুল সে বড় দূর,
তোমার পুত্র পাঠাইও কলাবতীর পুর।
হাটের সওদা ঢোল-ডগরে, গাছের পাতে ফল।
তিন বুড়ির রাজ্য ছেড়ে রাঙ্গা নদীর জল।"

রাণীরা বলিলেন—

"কোন্ দেশের রাজকন্যা কোন্ দেশে ঘর ?
সোনার চাঁদ ছেলে আমার তো-মার বর।"

কন্যা উত্তর দিল—

"কলাবতী রাজকন্যা মেঘ-বরণ কেশ,
তোমার পুত্র পাঠাইও কলাবর্তীর দেশ।
আনতে পারে মোতির ফুল ঢো-ল-ডগর
সেই পুত্রের বাঁদী হয়ে আসব তোমার ঘর।"[৭১] (ঠাকুমার ঝুলি)

'কিংবা কাঁকনমালা, কাঞ্চনমালা' গল্পে পাই—

"দাসী লো দাসী পান্ কৌ
ঘাটের উপর রাঙ্গা বৌ!
রাজার রাণী কাঁকনমালা ;
ডুব দিবি আর কত বেলা ?[৭২] (ঐ, পৃ-৬৩)

প্রাপ্ত ছড়ায় পাই—

দামোদরে হাঁড়ি কুড়ি
দুয়ারে বুসে চাল কাঁড়ি
চাল কুটতে হল বেলা
ভাতি খাব কতবেলা ?[৭৩]

'কাঁকনমালা, কাঞ্চনমালা' গল্পে মানুষ বলছে—

সূঁচ পেতাম পাঁচ হাজার,
তবে যেতাম হাট-বাজার!
যদি পাই লাখ—
তবে দেই রাজ্যপাট!!"[৭৪] (ঐ, পৃ-৬৫)

প্রাপ্ত একটি ছড়ায় আছে—

আয়ুভাতে ভাত
কুটুম থাকবু কত থাক্[৭৫]

'পাতালকন্যা মণিমালা' [৭৬] গল্পে আছে—

মাথা খুঁড়িয়া বুড়ী মরিল,
রাজ্য ভরিয়া কান্না উঠিল। [৭৭] (ঐ, পৃ-১৫৮)

প্রাপ্ত একটি ছড়ায় এইরকম ছাঁদ আছে—

মা মরল মাউগ বেইল
যউ তিনকে সউ তিন হইল। [৭৮]

প্রতিটি লোককথা, বিশেষ একটি ছড়া দিয়েই শেষ হয়, যথা—

"আমার কথাটি ফুরোলো
নটে গাছটি মুড়োলো" [৭৯]

লোককথার শেষে এই ছড়াটি না বললেই যেন লোককথা শেষ হয় না। প্রাপ্ত ছড়াতে এই ধরনের বহু ছড়া পাওয়া যাবে। যেহেতু ছড়ায় কোনো গল্প নেই, তাই তার শেষও নেই। কিন্তু বহু ছড়া আছে আমরা উঠতে বসতে বলে থাকি। প্রায়-ই বলতে বলতে সেই ছড়াগুলিও যেন কোথায় অতি ঘনিষ্ঠ হয়ে গেছে। যেকোনো লোক কথার শেষের ঐ দুটি চরণের মতো প্রতিদিন এইভাবে অনেক ছড়াই বলা হয়—

১। পেট করেছি ভারি
কুনশালার ধারি।
২। যত কর হাঁইপাঁই
পাঁচ শিকার বেশি নাই

লোকসাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ের থেকে লোককথার প্রাণশক্তি ব্যাপক। কেননা, কোনো কোনো লোককথা প্রায় পৃথিবীর সব দেশেই আছে। এ প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলার লোকসাহিত্য' [৮০] ১ম খণ্ড গ্রন্থের মন্তব্যটি স্মরণযোগ্য—

"... দূর প্রাচ্যের সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ সূত্রে ভারতবর্ষ হইতে এই প্রকার বহু লোককথা বৃহত্তর ভারতীয় দীপপুঞ্জ, চীন ও সেখান হইতে জাপান পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছে। জাপান হইতে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দীপমালার পথে ইহারা পশ্চিম উপকূল দিয়া আমেরিকায় প্রবেশ করিয়াছে। লোকসাহিত্যের আর কোনও বিষয় এই অপূর্ব প্রাণশক্তির অধিকারী হইয়া এমন বিস্তৃত দিগ্‌বিজয় করিয়া বিশ্ব ভ্রমণ করিতে

পারে নাই। এই বৈশিষ্ট্যই লোক-কথাকে লোক-সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় একটি অপরূপ গৌরব দান করিয়াছে।"[৮১] (বাংলার লোকসাহিত্য)

ঠিক তেমনি করে ছড়া সাহিত্য সম্পর্কে ও এই কথা সমভাবে বলা যায়, কেননা ছড়ার এরকম বিশ্বজনীনতা দেখেই তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছড়াগুলিকে 'কামচারিতা'[৮২] ও 'কামরূপধারিতা'[৮৩] নাম দিয়েছিলেন। বহু ছড়া আছে, তাদের বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন পাঠান্তর আছে। একই ছড়ার ভিন্ন পাঠান্তর ছড়ার জনপ্রিয়তাকেই নির্দেশ করে। তাই লোককথার মতো একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, ছড়া-সাহিত্যের জনপ্রিয়তা কোনো অংশেই কম। একই ছড়ার ভিন্ন পাঠান্তর হল—

১। "বড় বউ বড় মানুষের ঝি,
তাকে বলতে পারি কি,
মেজ বউটি বেগুন কুটি
কথা বল্লে ঠিক্‌রে উঠি"[৮৪] (২৪ পরগনা)

২। বড় বউ বড়ালের ঝি,
রান্নাঘরে বসে কর কি?
পটল ভেজে পালায় ঝি,
মেঝ বৌ মেঝের মাটি।
সব কথাতেই ঝন্‌কে উঠি।"[৮৫] (মেদিনীপুর)

৩। "বড় বৌ বড়ুয়ার ঝি,
তান্ কথা কেয়ম কি?
মধ্যম বউঅর্ হাতত হরা
সকল গুষ্টি ভাতে মরা।"[৮৬] (চট্টোগ্রাম)

উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাপ্ত—

১। বড় বৌ বড় ঘরের ঝি
তারে আর বলব কি
মাজিয়া বউ মজা কাটে
কথা কইনে ঝম্‌কি উঠে

সাজিয়া বউর মুখে পান
গুমরি ভিতর কুটে ধান
ছোট বউ দুদের লাউ
তার দিয়া মোর জীবন যাউ।[৮৭] (উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাপ্ত)

তবুও সব শেষে বলতে পারি লোককথার ধর্মের মতো ছড়ার কোনো ধর্ম নেই। লোককথার nationality-র মতো ছড়া জাতীয় পরিচ্ছদ কখনো কখনো ধারণ করলেও অন্তর অর্থে তা একই থাকে। যে ধর্মের বা যে জাতিরই হোক না কেন, সার্বজনীন মানবিকতার ছায়াপাত ঘটে ছড়ায়। আর এখানেই ছড়ার সঙ্গে লোককথার নৈকট্য।

৬। ছড়া ও লোকপুরাণ ঃ

লোকপুরাণের সঙ্গে ছড়ার তুলনামূলক আলোচনা প্রাসঙ্গিক। কেননা, ছড়ায় পুরা চেতনা যেমন পাওয়া যায়, তেমনি বিভিন্ন পুরাণে ছড়ার আঙ্গিকও লক্ষ্য করা যায়। প্রাপ্ত ছড়াগুলিতে কীভাবে পুরাণ প্রসঙ্গ প্রাধান্য লাভ করেছে, তার একটি সুসংবদ্ধ বিশ্লেষণ এই উপ-অধ্যায়ে তুলে ধরছি।

আমার সংগৃহীত ছড়াগুলিতে কীভাবে পুরাণ প্রসঙ্গ এসেছে, তা বিভিন্ন ছড়াগুলি থেকে বেশ কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরলে বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে। প্রাচীনকালে যার অস্তিত্ব ছিল, তাই বর্তমানে পুরাণ, পাণিনির মতে, প্রাচীনকালে যার অস্তিত্ব ছিল তাই পুরাণ নামে খ্যাত।[৮৮] পুরাণ কাহিনী মানে সেখানে দেব-দেবীদের প্রাধান্য। রামায়ণ, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, কৃষ্ণ, ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে পুরাণের কথা পাওয়া যায়। সাধারণ লোকসমাজ বিভিন্ন পালাগানে বিভিন্ন পুরাণ গ্রন্থ থেকে মুখে মুখে, যা যা শুনেছে সেই ধারণারই প্রকাশ ঘটিয়েছে ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা প্রভৃতি সাহিত্যে। এখন লোকছড়ায় কীভাবে পুরাণ চেতনার প্রকাশ ঘটেছে, তা কয়েকটি দৃষ্টান্ত সহযোগে জেনে নেব—

১। রথে চড়ে মাসী বাড়ি যাবে জগন্নাথ
সুভদ্রা বোন বলরাম ভাই যাবে এক সাথ
ভক্তেরা মিলে রথে দিল টান
গড়গড়িয়ে জগন্নাথ মাসিবাড়ি যান
রথ টানে সবাই দেখ হাসিখুশি মনে

মেলায় ঘুরে খুশিমত জিনিসপত্র কিনে
মেলায় দেখ দোকানগুলা আমকাঠালে ভরা
বাড়ি যাবে তাইতো সবাই করছে তাড়াহুড়া
খাওয়ার যত দোকান সব ভীড়ে ঠাসা লোকে
খুশিমত কিনছে জিনিস কেবা কাকে দ্যাখে
চল্‌ল সবে আপন ঘরে রথের মেলা থেকে।[৮৯]

জগন্নাথ, বলরাম আর বোন সুভদ্রাকে নিয়ে বাঙালির ঈশ্বর প্রীতির কথা সর্বজনবিদিত এবং তা সাহিত্যের অনন্য সম্পদ। সেই সম্পদকে উপজীব্য করে ছড়াসাহিত্যও পুষ্ট হয়েছে। বৎসরান্তে একবার মাসিবাড়ি যাওয়া, ভক্তের আকুতি, জমজমাট মেলার বর্ণনা আলোচ্য ছড়ায় ব্যক্ত হয়েছে।

পুরাণের আদি দেবতা হল দেবাদিদেব মহেশ্বর। শিব মাহাত্ম্যের কথা আপামর বাঙালি জানে। তাই শিবরাত্রির ব্রত করে, শিবের মাথায় জল ঢেলে পূজো করে ব্রতীগণ। তখন শুধু কৈলাস নয়, যেন আমাদের মাটির আঙিনা ও শিব মহিমায় জীবন্ত হয়ে ওঠে। প্রাপ্ত একটি ছড়ায় শিবরাত্রির মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে—

বাজনা বাজে মাইক বাজে বাজে জগঝম্প
মাঘের শেষ তবুও কিন্তু যায়নি শীতের কম্প
উৎসবে আজ মাত্‌ছে সবাই মানছে না কুন ক্লেশ
একে একে উৎসবে সবাই মেতে উঠেছে বেশ
কালকে ছিল শিবরাত্রি আনন্দ সবার মনে
জল ঢেলে তাই শিবের মাথায় মানস করেন সবে
অমঙ্গল আজ দূর কর সব সবার মনোভাবে
শিবরাত্রির মানত করে যত কুমারী গণে
উপোষ করে পূজা দেয় বাবা শিবের পদে
দিনটি রবে পরিচিত মানব কুলের মাঝে
শিব দুর্গার বিয়ে হল শিবরাত্রির সাঁঝে[৯০]

অন্য আরেকটি ছড়ায় শিব প্রসঙ্গ এসেছে—

চিরকাল গেল ঝোটপাতা খাইয়া
বুড়া শিবকে সেলাম করে
চিৎপিটিয়া শুইয়া [৯১]

জগন্নাথ দেবের জন্মরহস্যের গল্প সবারই জানা। যেকারণে তাঁর হাত ভাঙ্গা। সেই ভাঙ্গা ঠাকুরকে নিয়েও একটি ছড়া পাওয়া গেছে এই উপকূলীয় অঞ্চলে—

হারার মারে হারার মা
রত্ দ্যাকতে যাবু
পথে আছে ভাঙ্গা ঠাকুর
তাই দ্যাক্‌তে পাবু [৯২]

লোকসাধারণ মনে করে যে, সন্তান-সন্ততি ভগবানের দান। আর এই ভগবান হলেন আমাদের ষষ্ঠী দেবী। তাই শিশু জন্মগ্রহণের পর কঁ ষষ্ঠী দেবীর [৯৩] পূজা করতে হয়, এবং এই ষষ্ঠীদেবীর পূজোর মূল নৈবেদ্য হল খই। তাই প্রাপ্ত ছড়ায় উচ্চারিত হয়েছে—

যেমন ঠাকুরের তেমন পূজা
কঁ ষষ্ঠীর খই ভূজা

রাম সীতাকে নিয়ে বহু ছড়া রচিত। এরকম একটি ছড়া হল—

সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়িয়া
সীতা হইল রামের মা [৯৪]

আলোচ্য অংশে 'রামায়ণ' পাঁচালী কাব্যের চরিত্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের ত্রুটি বর্ণিত হলেও রামের মতো পতি এবং সীতার মতো পত্নী সকলেই চায়, রামায়ণের এ কাহিনী বাঙালির অত্যন্ত পরিচিত। তথাপি কেউ যদি ভুল করে বলে রাম কে? সীতা কে? তখন তার উত্তরে আলোচ্য ছড়াই লোকসাধারণের যথাযথ উত্তর।

রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা মধ্যযুগের বৈষ্ণব সাহিত্যের এক অতুল সম্পদ। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা শুধু বৃন্দাবনবাসীকে নয়, আপামর জনগণকে মথিত করে তুলেছিল। আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলায় আন্দোলিত। যে কারণে শুধু ছড়ায় নয়, শিশুদের ছড়াকেও এই কাহিনী প্রভাবিত করেছিল। তার একটি নমুনা তুলে ধরা হল—

১। রাধাকৃষ্ণ বাজায় বাঁশি

এ্যাক নিশাসে একস আশি [৯৫]

মনসাদেবীর কথাও প্রাপ্ত ছড়ায় পাওয়া যায়—

মা মনসা বিষ ঝাড়ে

বিষ যা তুই গোবর বাড়ে [৯৬]

সাপের বিষ তোলার সময় ওঝা মনসাদেবীর আরাধনা করে। মনসা সাপের দেবী। এখানে পৌরাণিক এই ভাবনাটি ব্যক্ত হয়েছে। এইভাবে প্রাপ্ত বহু ছড়া আছে যেখানে পুরাণ চেতনার প্রকাশ ঘটেছে।

হিন্দু ধর্মের আঠারোটি [৯৭] পুরাণের অন্যতম হল পদ্মপুরাণ, ভাগবতপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, গরুড় পুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ, ব্রহ্মকৈবর্ত পুরাণ প্রভৃতি। এই সমস্ত পুরাণের আঙ্গিকেও ছড়ার আঙ্গিক লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত' [৯৮] গ্রন্থের 'পদ্মপুরাণে' এর সরস্বতী স্তোত্রটি উল্লেখ করা যেতে পারে—

"শ্বেত পদ্মাসনা দেবী শ্বেত পুষ্প শোভিতা।

শ্বেতাম্বর ধরা নিত্যা শ্বেত গন্ধা লেপনা॥

শ্বেতাক্ষ সূত্র হস্তা চ শ্বেত চন্দন চর্চিতা।

শ্বেত বীণা ধরা শুভ্রা শ্বেতলংকারা ভূষিতা॥" [৯৯]

ভাগবতের অনুবাদ—

"আর না যাইব সখি চিন্তামণি ঘরে।

আলিঙ্গান না করিব দেব গদাধরে॥

আর না দেখিব সখি সে চাঁদ বদন।

আর না করিব সখি সে মুখ চুম্বন॥" [১০০]

পরিশেষে বলা যায়, প্রাপ্ত ছড়ার বেশ কয়েকটি পাঠ এখানে উদ্ধৃত হয়েছে, যা থেকে সহজেই বোঝা যায়, ছড়া এবং লোকপুরাণের মধ্যে বহুলাংশে মিল রয়েছে। এবং যা এই আলোচনাকে একটা সমাগ্রিক রূপ প্রদানে সহায়তাও করেছে।

প্রসঙ্গ নির্দেশ ও মন্তব্য ঃ

১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা-২, পৃ-৮৮।

২. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোকসাহিত্য, বিশ্বভারতী, ২০০৪, কলি-১৭, পৃ-৭।

৩. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৭, পৃ-৯৩।

৪. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা-২৩, পৃ-১০৯।

৫. এটি একটি ধাঁধা, এই ধাঁধামূলক ছড়াটির দিয়েছেন বিভাষ মাইতি, দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৩, পৃ-৮৯।

৬. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৯, পৃ-৯৫।

৭. ছড়াটি বহুল প্রচলিত একটি ছড়া। প্রায় প্রত্যেকটি শিশু শৈশবে এই ছড়াটি কোনো না কোনোভাবে বলেছে।

৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর লোকসাহিত্য গ্রন্থে (পৃ-৭) ছড়ার চিরত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন "এই স্বাভাবিক চিরত্বগুণে ইহারা আজ রচিত হইলেও পুরাতন এবং সহস্র বৎসর পূর্বে রচিত হইলেও নতুন।"

৯. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য শিশু ভোলানাথ কাব্যগ্রন্থটি রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রকাশ গীতাঞ্জলী, প্রকাশ-২০০২, এই কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতার নামও শিশু ভোলানাথ।

১০. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৯, পৃ-৯৫।

১১. 'ছড়াগুলি যেন চিত্রের সাম্রাজ্য'। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য বরুণকুমার চক্রবর্তী, পুস্তক বিপণি, ২০০৮, পৃ-৯৪।

১২. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা-১৫, পৃ-১০১।

১৩. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা-১৯, পৃ-১০৫।

১৪. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য, ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৬২, কলি-১২, পৃ-২৫৮, ২৫৯।

১৫. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-২৫৯ দ্রষ্টব্য।

১৬. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-২৫৯ দ্রষ্টব্য।

১৭. ছড়াবাহকের ছবি সহ সাক্ষাৎ আমরা গবেষণা অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায় সাক্ষাৎকার সংখ্যা-১০, পৃ-৯৬ শিরোনামে সংযুক্ত করেছে।

১৮. 'মেছেনি' গান হল প্রান্ত উত্তরবঙ্গের জনপ্রিয় একটি লোকসংগীত। এটি হল একধরণের ব্রতমূলক অনুষ্ঠান।

১৯. 'ব্রত' সাধারণত মেয়েদের দ্বারা পালিত ও অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে আচার, উপাচার ও মান্য করা হয়।

২০. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নির্মলেন্দু ভৌমিক, প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসংগীত, ২য় খণ্ড, ৪৮ হাজরা রোড, ১৯৭৬, কলি-৯, পৃ-৩১।

২১. ছড়াবাহকের ছবি সহ সাক্ষাৎ আমরা গবেষণা অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায় সাক্ষাৎকার সংখ্যা-১০, পৃ-৯৬ শিরোনামে সংযুক্ত করেছি।

২২. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য, ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৬২, কলি-১২, পৃ-২১৫।

২৩. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৯, পৃ-৯৫।

২৪. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-৯৫ দ্রষ্টব্য।

২৫. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য, ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৬২, কলি-১২, পৃ-২১৬।

২৬. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা-১১, পৃ-৯৭।

২৭. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-৯৭ দ্রষ্টব্য।

২৮. 'টুসুগান' হল পুরুলিয়ার একটি জনপ্রিয় লোকসংগীত। পৌষমাসে এই অনুষ্ঠান হয়। টুসুর উৎপত্তি নিয়ে নানা মতান্তর থাকলেও টুসুকে ছোটো মেয়ে হিসেবে ভেবে নানা গান রচিত আছে।

২৯. গানটি টুসুগান, এই গানে টুসুর স্নান ও সজ্জার বর্ণনা রয়েছে।

৩০. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য, ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৬২, কলি-১২, পৃ-২৫০।

৩১. ‘চোরচুন্নী’ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের একটি জনপ্রিয় লোকসংগীত। এখানে চোর-চোরনী দুজনে মিলে সারাবছরের ঘটে যাওয়া নানারকম সংবাদ পরিবেশন করে। একে বলে লোকসাংবাদিকতা। তখন তারা চোর-চোরনী না থেকে সাধারণ মানব-মানবীতে পরিণত হয়।

৩২. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নির্মলেন্দু ভৌমিক, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসংগীত, ৪৮ হাজরা রোড, ১৯৭৬, কলি-৯, পৃ-৭৮।

৩৩. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৪, পৃ-৯০।

৩৪. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নির্মলেন্দু ভৌমিক, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসংগীত, ৪৮ হাজরা রোড, ১৯৭৬, কলি-৯, পৃ-৭০।

৩৫. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা-১৫, পৃ-১০১।

৩৬. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য, ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৬২, কলি-১২, পৃ-২৫৯।

৩৭. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা-১০, পৃ-৯৬।

৩৮. ‘বারোমাসিয়া’ একধরণের লোকসংগীত। যাতে নারী-পুরুষের বারোমাসের দুঃখের বর্ণনা বর্ণিত হয়।

৩৯. সংকলনটির নাম প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসংগীত, ৪৮ হাজরা রোড, ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত।

৪০. গানটিতে বারমাসের চাষবাস, ফসল ফলানোর সঙ্গে সঙ্গে মনের দুঃখও প্রকাশ পেয়েছে।

৪১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নির্মলেন্দু ভৌমিক, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসংগীত, ৪৮ হাজরা রোড, ১৯৭৬, কলি-৯, পৃ-১৬৩।

৪২. ‘মকর’ হল দেবতার উদ্দেশ্যে সমর্পিত অর্ঘ্য। ফলমূলের উপাচার, একসঙ্গে একে বলে মকর। ‘মকর’ এটি কথ্য শব্দ, এতে বাতাসা সন্দেশ থাকে বলে খেতে ‘মিঠা’ হয় অর্থাৎ মিষ্টি লাগে।

৪৩. কটুতলে—উঁচুতে পাটাতন দিয়ে বেড়া,

৪৪. বাড়তিকেতে— বেগুন,

৪৫. ঝুনা— খুব পাকা,

৪৬. মক্সিরেতে—অগ্রাণ মাস,

৪৭. আউটা— খুব ফোটানো দুধ,

৪৮. পড়াপিঠা—চাল এবং পাকা তাল দিয়ে পোড়ানো পিঠা।

৪৯. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্য-৬, পৃ—৯২।

৫০. দীনেশচন্দ্র সেন এই গীতিকাগুলি সাহিত্য সন্ধিৎসু চন্দ্রনাথ দে মহাশয়কে দিয়ে সংগ্রহ করেছিলেন।

৫১. ১৯২৩ খ্রীঃ এগুলি ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন ড. দীনেশচন্দ্র সেন।

৫২. 'গীতিকা' ইংরেজী 'Ballad' সাহিত্যের অন্তর্গত। যাতে আছে কাহিনীমূলক রোমান্টিক গীত।

৫৩. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য অধ্যাপক ঘোষ ও মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত মৈমনসিংহ গীতিকা, ইষ্ট ইণ্ডিয়া পাবলিশার্স, ২০০৯, কলি-১২, পৃ-৬।

৫৪. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৪, পৃ-৯০।

৫৫. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য অধ্যাপক ঘোষ ও মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত মৈমনসিংহ গীতিকা, ইষ্ট ইণ্ডিয়া পাবলিশার্স, ২০০৯, কলি-১২, পৃ-৭।

৫৬. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা-১৫, পৃ-১০১।

৫৭. 'মহুয়া' হল মৈমনসিংহ গীতিকার অন্যতম একটি পালা, দ্বিজকানাই রচিত রোমান্টিক প্রণয়মূলক আখ্যান কাব্য।

৫৮. 'মলুয়া' মৈমনসিংহ গীতিকার একটি অন্যতম পালা, সম্ভবত কবি চন্দ্রাবতীর রচনা।

৫৯. নয়নচাঁদ ঘোষ রচিত জয়চন্দ্র চন্দ্রাবতীর পালাটিতে নারী চরিত্রের প্রাধান্য লক্ষণীয়।

৬০. 'কাজলরেখা' পালাটি মূল উপজীব্য লৌকিক প্রণয় গাথা। নারী শক্তির উৎস যে প্রেম, তা কাজলরেখায় প্রকাশিত।

৬১. মৈমনসিংহ গীতিকার অন্যতম রোমান্টিক পালা 'ভেলুয়া সুন্দরী'।

৬২. 'কঙ্ক ও লীলা' পালাটি চারজন কবির যৌথ রচনা বলে সম্পাদক ও সংগ্রাহক মহাশয় মনে করেন। এতে একনিষ্ঠ প্রেমের স্বরূপ প্রকাশিত।

৬৩. মৈমনসিংহ গীতিকার প্রত্যেকটি পালা নাটকীয়তায় মোড়া। ঘটনাবলী, ঘটনার ঊর্ধ্বারোহণ এবং পরিণতি নাটকীয় চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করেছে।

৬৪. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য অধ্যাপক ঘোষ ও মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত মৈমনসিংহ গীতিকা, ইষ্ট ইণ্ডিয়া পাবলিশার্স, ২০০৯, কলি-১২, পৃ-৬৩।

৬৫. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৬, পৃ-৯২।

৬৬. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য অধ্যাপক ঘোষ ও মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত মৈমনসিংহ গীতিকা, ইষ্ট ইণ্ডিয়া পাবলিশার্স, ২০০৯, কলি-১২, পৃ-১৯০।

৬৭. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা-২৪, পৃ-১১০।

৬৮. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য অধ্যাপক ঘোষ ও মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত মৈমনসিংহ গীতিকা, ইষ্ট ইণ্ডিয়া পাবলিশার্স, ২০০৯, কলি-১২, পৃ-১১২।

৬৯. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা-২৭, পৃ-১১৩।

৭০. পরিশিষ্ট-১, চিত্রসংখ্যা—৪৮, পৃ-৫২০ দ্রষ্টব্য।

৭১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য শ্রী দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, ঠাকুমার ঝুলি বাঙালার রূপকথা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ২০১০, কলি-৭৩, পৃ-৩৬, ৬৫, ১৫৮।

৭২. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৬৩ দ্রষ্টব্য।

৭৩. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৬৩ দ্রষ্টব্য।

৭৪. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৬৫ দ্রষ্টব্য।

৭৫. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৬৫ দ্রষ্টব্য।

৭৬. পরিশিষ্ট-১, চিত্রসংখ্যা—৪৯, পৃ-৫২১ দ্রষ্টব্য।

৭৭. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য শ্রী দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, ঠাকুমার ঝুলি বাঙালার রূপকথা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ২০১০, কলি-৭৩, পৃ-১৫৮।

৭৮. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১৫৮ দ্রষ্টব্য।

৭৯. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১৫৮ দ্রষ্টব্য।

৮০. বাংলার লোকসাহিত্য ১মখণ্ড পরিশিষ্ট-১, চিত্রসংখ্যা—৫০, পৃ-৫২২ দ্রষ্টব্য।

৮১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য ১মখণ্ড, ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৬২, কলি-১২, পৃ-৪৪৮।

৮২. 'কামচারিতা' অর্থ কামনা মতো আচরণের ইচ্ছা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'লোকসাহিত্য' প্রবন্ধে ছড়ার আলোচনা প্রসঙ্গো শব্দটি ব্যবহার করেন।

৮৩. 'কামরূপধারিতা' অর্থ কামনা মতো রূপ ধারণের ইচ্ছা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'লোকসাহিত্য' প্রবন্ধে শব্দটি ব্যবহার করেন।

৮৪. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য সৌগত চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত বাংলার ছড়া ছড়ার বাংলা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৮, কলি-৬, পৃ-২০৫-২০৬।

৮৫. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—২০৫-২০৬ দ্রষ্টব্য।

৮৬. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—২০৫ দ্রষ্টব্য।

৮৭. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা-১০, পৃ-৯৬।

৮৮. 'খ্যাত' অর্থাৎ বিখ্যাত, উল্লেখ্য।

৮৯. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা-১৪, পৃ-১০০।

৯০. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-১০০ দ্রষ্টব্য।

৯১. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৪, পৃ-৯০।

৯২. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা-১৫, পৃ-১০১।

৯৩. কঁ-ষষ্ঠী দেবী ঃ শিশু জন্মানোর পর যে ঘরে শিশু এবং তার মা থাকে, তাকে বলে আতুর ঘর। ঐ ঘরের কোণে ষষ্ঠীদেবীর পূজা করলে শিশুর মঙ্গাল হয়। একেই কঁ-ষষ্ঠী দেবী বলে। ধ্বনিতাত্ত্বিক রূপ— কোন্>কন্>কঁ।

৯৪. নিজস্ব সংগ্রহ, পৃ-২০৩ দ্রষ্টব্য।

৯৫. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা-২৮, পৃ-১১৪।

৯৬. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা-১৩, পৃ-৯৯।

৯৭. হিন্দুধর্মের মোট পুরাণ সংখ্যা আঠারো। ছড়ায় ও এইসব পুরাণের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

৯৮. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত প্রবন্ধটির জন্য পরিশিষ্ট-১, চিত্রসংখ্যা—৫১, পৃ—৫২৩ দ্রষ্টব্য।

৯৯. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, প্রকাশ-১৯৯০, কলি-৬, পৃ-৪৮।

১০০. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৪৮ দ্রষ্টব্য।

—ঃঃ—

পঞ্চম অধ্যায়

পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাপ্ত ছড়ায় নান্দনিক রূপের অনুসন্ধান এবং কাব্য, নাটক, কথা-সাহিত্যে তাদের প্রয়োগের উপযোগিতা বিচার।

সৌন্দর্য-তত্ত্বের প্রতিশব্দগুলি হল 'নন্দনতত্ত্ব', 'শিল্পতত্ত্ব', কান্তিবিদ্যা ইংরেজিতে যাকে বলে 'Aesthetics'। এখন প্রশ্ন হল, 'সৌন্দর্য' কাকে বলে? 'সৌন্দর্য' বলতে কী বুঝি? জগতের সকল কিছুর মধ্যে যে আনন্দ অনুভূত হয়, এই আনন্দই হল সৌন্দর্য। 'Aesthetics' শব্দটি প্রথম প্রচলন করেন অষ্টাদশ শতাব্দীর বার্লিন নিবাসী জার্মান দার্শনিক Alexander Banmgarten তাঁর "Reflections on Poetry" [১] (1735) গ্রন্থে। আনন্দ-ই হল কাব্য-সাহিত্য-শিল্পকলার সৌন্দর্যবোধ তথা নান্দনিকতা। তবে এই সৌন্দর্যবোধ সম্পূর্ণরূপে পরিশীলিত, মার্জিত সমাজের সৌন্দর্যবোধ। এই পরিমার্জিত সমাজের বাইরে যে ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা, গীতি প্রভৃতি লোকসাহিত্যের ব্যাপক পরিসর, তারমধ্যে কি সৌন্দর্যবোধ বা নন্দনতত্ত্ব একেবারেই নেই? নাকি তার নন্দনতত্ত্ব পৃথক কোনো পদার্থ? সুতরাং সাহিত্য, সাহিত্য-ই, তা সে লোকসাহিত্য হোক্ বা পরিশীলিত সাহিত্য হোক্, সকল সাহিত্যের মধ্যে রয়েছে সৌন্দর্যবোধ। কেবল অনুভূতিটাকে বর্ধিত করলেই হয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্য' [২] গ্রন্থের 'সৌন্দর্য ও সাহিত্য' [৩] অধ্যায়ে বলেছেন,

> "জগতের আনন্দলীলাকেও আমরা যতই পূর্ণতর রূপে দেখি ততই জানিতে পারি, ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, জীবন-মৃত্যু সমস্তই উঠিয়া ও পড়িয়া বিশ্ব-সংগীতের ছন্দ রচনা করিতেছে, সমগ্রভাবে দেখিলে এই ছন্দের কোথাও বিভেদ নাই, সৌন্দর্যের কোথাও লাঘব নাই। জগতের মধ্যে সৌন্দর্যকে এইরূপ সমগ্রভাবে দেখিতে শেখাই সৌন্দর্যবোধের শেষ লক্ষ্য।" [৪]

প্রাকৃত সৌন্দর্যকে ছাড়িয়েও সাহিত্য, সংগীতকলা প্রভৃতি অবলম্বন করে মানুষ যে সৃষ্টিশীলতার পরিচয় রাখে, তাই হল প্রকৃত সৌন্দর্য। মানুষের নূন্যতম চাহিদা মিটে গেলে, সে আরও অতিরিক্ত কিছুর মধ্যদিয়ে নিজের অস্তিত্বকে অর্থপূর্ণ করে তুলতে চায়। অস্তিত্বের এই অতিরিক্ত কিছু-ই হল সৌন্দর্য।

সাহিত্যসৃজন এবং সাহিত্যপাঠ উভয়ক্ষেত্রেই নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থাকে। এখানকার বিচারে সাহিত্যসৃজন এবং সাহিত্যপাঠ উভয়পক্ষে যে সব ব্যক্তিরা থাকেন, তাঁরা সকলেই সৃজনধর্মের শরিক হয়ে ওঠেন। ফলতঃ লোকায়ত ক্ষেত্রেও সাহিত্য স্রষ্টা এবং সেই সাহিত্যের ধারকগোষ্ঠী মিলে মিশে একটি মান্যরূপের প্রতি আস্থা পোষণ করেন।

লোকসাহিত্যের অন্যতম বিভাগ ছড়া। সৃষ্টির একটি পর্যায়ক্রমিক ধারা আছে। অজ্ঞাতপূর্বকালে যখন গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে বিরোধের অবসান ও মীমাংসার পর সংহত সমাজ গড়ে উঠেছিল, নবোদ্ভূত সেই সমাজে ছড়া সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। ফলে সকল মানুষের স্মরণসীমায় চিরকালের সম্পদ হয়ে উঠেছে এই লোকায়ত ছড়াসাহিত্য। সর্বজনের অনুভব থেকে তিল তিল রসদ সংগ্রহ করে, প্রাণের উচ্ছ্বাসে লোকায়ত ছড়াসাহিত্য আজ অবয়ব বৃদ্ধি করে, কাণ্ড থেকে ডালপালায় ছড়িয়ে পড়েছে।

ছড়া সকলের প্রাণের সম্পদ। তাই তার গ্রহণযোগ্যতা ও বেশী। মানবমনে কত ভাব, কত অনুষঙ্গ বাতাসে ধূলিকণার মতো ঘোরে, এবং ভাষিক চেহারা পায়। উদ্ভবসূত্রে ছড়া ও তা আত্তিকরণ করে সৌন্দর্যসত্তা লাভ করেছে। ফলে ছড়ার বহিরঙ্গে এবং অন্তরঙ্গে সৌন্দর্য ছড়িয়ে আছে।

সৌন্দর্যবোধ বা নান্দনিকতা, তা সে পরিশীলিত সাহিত্য হোক্ বা লোকসাহিত্য হোক্ উভয় সাহিত্যে বিদ্যমান। অনেকের মনে হতে পারে, পরিশীলিত সাহিত্যের মানদণ্ড যেহেতু পৃথক তাই তার সৌন্দর্যবোধ সংক্রান্ত ধারণা লোকসাহিত্যের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু এমন মনে করার মনে হয় কোনো কারণ নেই। কেননা সাহিত্যের সবধারার মধ্যে সৌন্দর্যবোধ রয়েছে, তাঁকে খুঁজে নিতে হয়। যেমন প্রতিটি বস্তু বা প্রাণী তার স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে বিদ্যমান। সেই স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে যদি বিচার করা যায়, তবে প্রতিটি বস্তু বা প্রাণী সেই সেই কারণে সৌন্দর্যের অধিকারী হবে, অপর বস্তু বা প্রাণীর থেকে। মৌখিক সাহিত্যকে তার মৌখিক ঐতিহ্যের মাপকাঠিতে বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে। সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে, বিচার করলে মাটির কাছে থাকা লোকজীবন থেকে চয়ণ করা এই সব ছড়াগুলি কোনো অংশেই পরিশীলিত সাহিত্যের চেয়ে কম সৌন্দর্যপূর্ণ নয়। কেবল দৃষ্টিভঙ্গির বিচারগত পার্থক্যমাত্র।

ছড়ার সৌন্দর্যের কথা বলতে গিয়ে কবিগুরু আরও বলেছেন ঃ

"সেই অপরিবর্তনীয় পুরাতন বারংবার মানবের ঘরে শিশুমূর্তি ধরিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে, অথচ সর্বপ্রথম দিন সে যেমন নবীন, যেমন সুকুমার, যেমন মূঢ়, যেমন মধুর ছিল আজও ঠিক তেমনি আছে।" [৫]

এই প্রসঙ্গে Dr. Bosanquet এর 'A History of Aesthetics' গ্রন্থের মন্তব্যটি স্মরণযোগ্য ঃ

"There is no difinition of Beauty which can be said to have met with universal acceptance." [৬]

ছড়ার নান্দনিক রূপ ঃ

পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাপ্ত ছড়ায় নান্দনিকতা কতখানি ফুটে উঠেছে, এখন সে বিষয়ে আলোচনায় প্রবিষ্ট হতে আগ্রহী। বাংলা লোকসাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ ছড়া। ছড়ার কোনো আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতা নেই। এগুলি একপ্রান্তে রচিত হলেও বাংলার অন্যপ্রান্তে অনায়াসে ছড়িয়ে পড়ে, ছড়াগুলির বৈশিষ্ট্য তাই। অজ্ঞাতপূর্বকালে রচিত এই ছড়াগুলির মধ্যে এমন এক সার্বজনীন আবেদন আছে যে, এগুলি যে স্থানের নয়, সেই স্থানের হয়ে উঠতেও সময় লাগে না। তাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'লোকসাহিত্য' [৭] গ্রন্থে বলেছেন,

ছড়াগুলি "আজ রচিত হইলেও পুরাতন এবং সহস্র বৎসর পূর্বে রচিত হইলেও নতুন।" [৮]

ছড়া বয়স্ক মানুষ তথা সমাজ কর্তৃক রচিত হলেও ছড়ার বিষয়ের মূল উপজীব্য শিশু। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিশু বিষয়ক ছড়াগুলিকে 'ছেলে ভুলানো ছড়া' [৯] নাম দিয়েছেন। মা ও শিশুর যে চিরন্তন বাৎসল্য সম্পর্ক, এই বাৎসল্যরসের মধ্যে লুকিয়ে আছে অপূর্ব এক সৌন্দর্যময়তা। পৃথিবীর কোনো দৃশ্যই এমন সুন্দর, নির্মল, পবিত্র নয়, যখন কোনো মা তার শিশুকে কোলে তুলে আদর করে। প্রকৃতির এই অপরূপ সৌন্দর্যময়তা, বর্ণনাতীত। মা সংসারের সমস্ত কাজে ব্যস্ত থাকে। এদিকে শিশু তার মায়ের কোলে ঘুমাতে চায়, কিন্তু শতকাজে থাকা মা তাই ব্যস্ততায় শিশু যাতে সহজে ঘুমিয়ে যায়, দোলনায় ঘুম পাড়ানোর

ব্যবস্থা করে। সুরের মূর্চ্ছনায়, ছন্দের দোলায় শিশুমন ঘুমিয়ে পড়ে, কেননা, তখন মা কাটে ছড়া। মৌখিকভাবে রচিত হয় নানা ছড়া, বিশেষ করে ঘুম পাড়ানি ছড়া। ঘুম পাড়ানি ছড়া অতি জনপ্রিয় এবং বহুল ব্যবহৃত ছড়া। তাই নানা পাঠান্তরও পাওয়া যায়। উপকূলীয় অঞ্চলে প্রচলিত পাঠান্তরটি তুলে ধরা হল, যারমধ্য দিয়ে প্রাচুর্যের পরিবর্তে গ্রামজীবনের সহজ সরল অনাড়ম্বর ছবি ধরা পড়েছে। আর তারমধ্য দিয়ে ধরা পড়েছে এক নান্দনিক অনুভূতিও।

ঘুম পাড়ানি মাসি-পিসি ঘুম দিয়া যাও
বাটা ভরা পান দুব গাল ভরিয়া খাও [১০]

চির পরিচিত এই ঘুম পাড়ানি ছড়া আমরা আমাদের শিশুকাল থেকে শুনে আসছি। যা আজও হৃদয়কে দোলায়িত করে, মনের মধ্যে এনে দেয় ঘুমের আবেশ। এই ছড়াগুলিতে ঘুম পাড়ানি মাসি-পিসিকে আহ্বান করা হয়েছে। সেই সঙ্গে বাটা ভরা পান এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য বহন করছে। শিশুর জন্য মায়ের আয়োজনের কোনো ত্রুটি থাকে না। মা সারাদিন সংসারের কাজকর্মের মধ্যে তার শিশুটির চুল বেঁধে দেওয়া, ভালো জামা-কাপড় পরানো, কপালে বড় করে নজর কাড়া টিপ দেওয়া, এমন কি পাখার হাওয়াও করে দেয়। এ সবকিছু কেবল খোকার চোখে ঘুম এনে দেওয়ার জন্য। সন্ধ্যা আসন্ন, সাঁজবাতি চেয়ে আছে, মা তুলসী মঞ্চে প্রদীপ সাজানোর পূর্বে খোকাকে ঘুম পাড়ানোর ছড়া বলে। সকল গাছের পাতা ঝিমায়, শিশুর চোখে তবু ঘুম নেই, মা কাটে ছড়া। এই সবকিছুর সঙ্গে সঙ্গে উপকূলীয় অঞ্চলের মাতৃজননীর সুরেলা ছড়ায় ফুটে ওঠে ছড়ার সৌন্দর্য, যাতে আছে মাটির ঘ্রাণ—

১। আয়রে ঘুম যায়রে ঘুম
পাখার বাতাসে
ডিমালু ঝিমালু পাতা
আমাহারে কচির [১১] ঘুম দিয়া যা [১২]

২। হাড়োরে গড়োরে লাউবারে কুমড়া বাড়ে
আমাহারে সনার চোখে ঘুম দিয়া যায়। [১৩]

শিশুর ঘুমের সময় চাই তার আরামের শয্যা। তাই মা শিশুকে গরম থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য পাখার বাতাস করছে। সেই সঙ্গে নিদ্রাদেবীকে আহ্বান জানাচ্ছে যাতে করে

ডিমালু ঝিমালু পাতার মতো করে 'কচির' চোখে যেন ঘুম আসে। শিশুর ঘুম কোনো কিছু মানে না। কথায় আছে—

ভোক্ কি জাঁয়ে কাঁচা অদা
ঘুম কি জাঁয়ে বঁ বুদা [১৪]

—এটি এই অঞ্চলের প্রচলিত প্রবাদধর্মী ছড়া। খিদে পেলে যেমন 'কাঁচা' আর 'অদা' অর্থাৎ না ফোটা চাল—এর মধ্যে যেমন পার্থক্য থাকে না, তেমনি ঘুম এলে কোথায় বন-জঙ্গাল সে বিভেদবোধও আসে না। তেমনি আলোচ্য ছড়ায় 'হাড়ো' [১৫] এখানে নাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, আর 'গড়ো' [১৬] মানে লুটোপুটি খাওয়া, শুয়ে পড়া, ঘুম এলে শিশু লাউ কুমড়ার মতো যেখানে সেখানে লুটিয়ে পড়ে। তাই মা তার সকল সম্পদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ 'সনার' চোখে ঘুম দিয়ে যেতে বলেছে। আর তার মধ্যদিয়ে সৌন্দর্যবোধ ফুটে উঠেছে। সৌন্দর্য হল ব্যক্তিগত অনুভূতি। তাই এই অনুভূতির মাত্রা যত বাড়িয়ে দেওয়া যায়, ততই এই সৌন্দর্যের সীমারেখা বিস্তৃত হয়। বহুল প্রচলিত এই ছড়াটি এই অঞ্চলের কথ্যভাষায় যেভাবে পাওয়া গেছে—

আয় আয় চাঁদ মামা
টি দিয়ে যা
আমাহারে কচির কপালে চাঁদ
টি দিয়ে যা। [১৭]

মায়ের স্নেহ কোনো সম্ভব অসম্ভবের সীমারেখা মানে না। তাই আকাশের চাঁদকে মামা পাতিয়ে আহ্বান করা হয়। যাতে করে চাঁদ মামা এসে মায়ের 'কচির' কপালে টিপ দিয়ে যায়। এই অঞ্চলে শিশু বা বাচ্চাদের 'কচি' সম্বোধন করা হয়। অপর একটি ছড়ায় পাই—

দোল দোল দুলুনি
রাঙা মাথায় চিরুণী
বর আইস্‌বে যুখুনি
লিয়ে যাবে তুখুনি [১৮]

— মেয়েরা বড় হলেই বিবাহ দিতে হয়, তারা পরের ঘরে চলে যায়। এই প্রথা আমাদের সমাজের চিরাচরিত প্রথা। কিন্তু এখানে যে প্রথাটির কথা সুপ্তভাবে নিহিত তা

আমাদের পূর্ব ইতিহাসকে স্মরণ করায়, তা হল গৌরীদান প্রথা। সেই বিবাহিতা কন্যা যখন বাবার বাড়িতে আসে তখন তাকে তার মা দোলায় দোলাতে দোলাতে বলে উপরোক্ত ছড়াটি। তারমধ্যে ফুটে উঠেছে অপরূপ সৌন্দর্যময়তা। এখানে তৎকালীন সমাজের সেই গৌরীদান [১৯] প্রথাটির কথা বলা হয়েছে। ছড়াটিতে পাই 'রাঙা মাথা' অর্থাৎ বিবাহিতা কন্যার মাথায় সিন্দুরের রেখাটি 'রাঙা মাথার' রূপকে মোড়া। এমন ছোটো কন্যা যাকে এখনও দোলায় দোলাতে হয়। মা তার চুল বেঁধে দেয়, সাজিয়ে দেয় মেয়েকে, যাতে যখন খুশি তার বর এসে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু তারমধ্য দিয়ে যা প্রকাশ পেয়েছে, তা হল এই ছড়াটির সৌন্দর্যময়তা। বহুপূর্বকালের স্নেহ সুশীতল পল্লীবাংলার মাতৃমূর্তি যেন আজকেও আমাদের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। নিয়ে যায় নিকানো উঠোনে, পাশে যার তুলসীতলা, গত সন্ধ্যার প্রদীপের শেষ স্মৃতিটুকু এবং ধূপের ক্ষীণ সৌরভের সুবাস আজকের এই জীবনের মাঝে যেন এখনও দিয়ে যাচ্ছে প্রস্ফূটিত শিউলী-শোভা। এই রসাবেদনের মধ্যে সৌন্দর্য বা Aesthetics যেন কোথায় মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। একটি ছড়ায় পাই—

খুকুরাণী ফড়ফড়ানি
ভালো বেগুনের চ্যারা
খুকুর তরে বর আইস্‌বে
আয়ে বিয়ে পাশ করা।[২০]

—নতুন সভ্যতার আলোকের স্পর্শে গ্রামবাংলার প্রান্তে-অন্তে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে শিক্ষার চেতনা আসে। তখন সমাজ মানুষ স্বপ্ন দেখে তার মেয়ের জন্যে আয়ে, বি.এ. পাশ করা ছেলের সাথে বিয়ে হবে। এটাই তাদের একমাত্র আশা। শিক্ষিত পাত্রে মেয়ের বিবাহ হলে, মেয়েটি সুখী হবে। কারণ খুকুও এখানে একটি ভালো মেয়ে, তাই তার বরটিও হোক্ ভালো। এই সামান্য আবেদন মাতৃস্থানীয়া বা খেলার সাথী যারই হোক্ না কেন, তারমধ্যে যে কামনামূলক আশা-আকাঙ্খা আছে তা অস্বীকারের জায়গা নেই। আর তাতেই সৌন্দর্যের স্বপ্ন পাল তুলে যায় হাল ছেড়ে। 'খুকুরাণী', 'ফড়ফড়ানী', 'বেগুনের চারা' এই অনুষঙ্গগুলির মধ্যে একটি ডাগর ডগর পল্লীকন্যার সুশ্রী রূপটি উদ্ভাসিত।

অনুভবের স্পন্দনে ছড়াগুলি সৌন্দর্যময়ী। পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাপ্ত এরকম বহু ছড়া আছে, যাতে লোককবিদের ছড়ায় এক অনীর্বচনীয় আনন্দ ফুটে উঠেছে।

আমরা জানি, এই অনীর্বচনীয় আনন্দ-ই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যসত্তা। ক্ষেত্র-সমীক্ষায় প্রাপ্ত আরো একটি ছড়া হল—

আম মিষ্টি জাম মিষ্টি
আর মিষ্টি মধু
তা হইতে অধিক মিষ্টি
বাসর ঘরে বধূ[২১]

—ছড়াটিতে উৎকৃষ্ট প্রতিবস্তু জাতীয় উপমা প্রস্তুত করা হয়েছে। আম-জামের মিষ্টত্ব আস্বাদনে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অন্যতম জিহ্বা ক্রিয়াশীল থাকে। এটি নিতান্তই স্বাদ-গ্রহণের ব্যাপার, তাতে ক্ষুধা নিবারণ হয়। কিন্তু বাসরঘরে বধূর মিষ্টত্ব, না স্বাদগ্রহণ কিংবা না ক্ষুধা নিবারণ, কোনোটিই সম্পাদন করে না, অথচ তার মিষ্টত্বের কথা বলা হয়েছে। তবে তা কী? উত্তরে বলা যায়—বাসরঘরে নববধূর সান্নিধ্য-প্রেমের রোমান্টিক আস্বাদন। ছড়াকার এইরূপ আস্বাদনের উপমা এনে এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন যে, নববধূর হৃদয় ধর্মের আকাঙ্খিত ঔজ্জ্বল্য সকল মিষ্টত্বকে ছাপিয়ে যায়।

গোলাপ ফুল তুলতে গ্যালে
হাতে লাগে কাঁটা
বন্ধুর কথা মনে পড়্‌নে
প্রাণে লাগে ব্যথা[২২]

উদ্ধৃত ছড়াটি উৎকৃষ্ট স্মরণোপমা। স্বকন্টক গোলাপ ফুল চয়ন করতে গেলে কখনও কখনও রক্তাক্ত হতে হয়। তবুও পুষ্প চয়ণের সুখ থেকে মানুষ কি কখনও বিরত থাকেন? ঠিক তেমনি প্রিয়জনের বিচ্ছেদ মানুষের হৃদয়কে ব্যথাতুর করলেও সে ব্যথার প্রতি আমাদের হৃদয়ের সর্বাধিক আকর্ষণ ও সমর্থন ব্যক্ত হয় না কি? উত্তরে বলি হয়। এবং তা শুধু রক্ত ঝরায় না, তা বন্ধুর স্মৃতি জাগিয়ে অন্তরে রক্তক্ষরণ ঘটায়। এবং এখানেই এর সার্থকতা। ছড়ার সৌন্দর্য রূপায়ণে লোকসাহিত্যের ছড়া শাখাটি তাই সহজেই মনকে দোলা দেয়, হৃদয়কে আকৃষ্ট করে। আরো একটি ছড়ায় পাই—

দাদাভাই চালভূজা খাই
নয়না মাছের মুড়া

হাজার টাকার বউ কিন্‌ছি
খাঁদা নাকের চূড়া
খাঁদা হোক্ বোঁচা হোক্
তা সইতে পারি
মুক ফিরিনে কথা কইনে
তাতেই জ্বলে মরি[২৩]

—ছড়াটিতে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ছবি প্রদর্শিত। মাতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর স্থান ছিল উচ্চে। তাই তখনকার দিনে পাত্রকে যৌতুক দেওয়ার পরিবর্তে কন্যাকে যৌতুক দিয়ে বিবাহ করতে হত। তাই 'হাজার টাকার বউ কিনেছি' পংক্তিটি ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এই রোমান্টিক জীবনেও তিক্ততার কথা ব্যক্ত হয়েছে। যেখানে চালভাজা এবং নয়নামাছের মুড়োর কথা, অবস্থাপন্ন বাড়ির আভাস দেয়, সেখানে স্ত্রীর আর একটু সাহচর্যে বিবাহিত জীবন পরিণত হত স্বর্গসুখে, কিন্তু তা না হয়ে, হয়ে উঠেছে অসহনীয়। যে বধূটি ঘরে এসেছে, তার নাকটি খ্যাঁদা, রূপহীনতার সেই ক্ষেত্রটি চাপা পড়ে যেতে পার্‌ত বধূটির সুমধুর ব্যবহারে ; কিন্তু সুমধুর ব্যবহারের পরিবর্তে বধূটির তার্কিক স্বভাব প্রণয়ের পক্ষে তিক্ত পরিণাম সৃজন করছে। ছড়াটিতে বিবাহিত জীবনের সামান্য চাওয়া অসামান্যতার সৌন্দর্যকে স্পর্শ করেছে।

শুধু তিক্ত অভিজ্ঞতা নয়, ছড়া আমাদের সরস মধুর খুনসুটির চিত্রকেও প্রকটিত করে, যার মধ্যে স্বাভাবিক সৌন্দর্য লক্ষণীয়—

বৌদি ঘাটে নেমেছে
দাদা দেখতে পেয়েছে
দাদা দেখ্‌তে পেয়ে
ঢিল ছুঁড়েছে
বৌদি কাঁদতে বসেছে
দাদা মিষ্টি এনেছে
বৌদি খুশি হয়েছে[২৪]

— দাদা-বৌদির ঢিল ছুঁড়ে লুকোচুরি খেলা, এ আমাদের চিরন্তন শৈশবকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এই দ্বন্দ্ব-মধুর সম্পর্কের মধ্যে অনুরাগ বিরাগ মিশ্রিত। যার শুভ সমাপ্তি মিষ্টি খুশির হাসি দিয়ে ঘটেছে। আরো একটি ছড়ায় পাই—

স্বাদ ছিল মোর্ বাঁধব ছোট(অ) ঘর
জান্লা দিয়া দেখ্ব আমি
বার নদীর চর্

উদ্ধৃত ছড়াটি কল্পনার স্বর্গরাজ্য। যে কল্পিত ঘর বাঁধার ইচ্ছে জেগেছে, তার জান্লা দিয়ে যেন দেখা যাবে গোটা বিশ্বজগতকে। 'বার নদীর চর' যেন রূপকথার সৌন্দর্য। ক্ষুদ্র গৃহস্বামীর বাইরে আমাদের মন নিত্য ছড়িয়ে পড়তে চায়। ক্ষুদ্র পরিসর থেকে বৃহৎ পরিসরে মন তার প্রতিষ্ঠা খোঁজে। সেই অপার সৌন্দর্যের দেশে পাড়ি জমাতে চেয়েছে লোকায়ত মানুষ।

ছড়ায় শুধু মর্ত-মানবীর চাওয়া-পাওয়া, সুখ-দুঃখ, কামনা-বাসনার কথা নেই। এখানে যেন বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রীরাধিকার মুখচ্ছবি প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

এরকম একটি ছড়া হল—

নদীর জল কল্‌কল্ করে
সোয়ামীরে মনে পড়ে

এ যেন শ্রীরাধিকার যমুনার ঘাটের কথা মনে করিয়ে দেয় ঃ—

"সখির সহিতে জলেতে যাইতে
সে কথা কহিবার নয়।
যমুনার জল করে ঝলমল
তাহে কি পরাণ রয়।।" [২৫]

বিরহ কাতরা শ্রীরাধিকার এই হৃদয়ার্তির চেয়ে কোনো অংশে কম নয় উপকূলীয় অঞ্চলের উপরোক্ত ছড়াটি। কেননা, যৌবনের দ্রাক্ষাবনে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল ফুটেছে, অথচ সেই ফুলকে আহরণে সার্থক করে তুলবে এমন জনা কোথায়? নায়িকার এই হৃদয়ার্তির ব্যাকুলতাই ছড়াটিকে অনুভূতির শ্রেষ্ঠত্বে পৌঁছে দিয়েছে। এইরূপ আশার বাণী ব্যক্ত হয়েছে আরও একটি ছড়ায় —

ভাতার গেছে কাতারপুর
ছাতা মাথায় দিয়া

আস্‌বে ভাতার দ্যাখবে মুক

নুতন টাকা দিয়া[২৬]

ছড়ার রাজ্যে কি-না সম্ভব ? সম্ভব অসম্ভবের কোনো মানদণ্ড ছড়ায় নেই। ছড়ার রাজ্যে তাই সবই হতে পারে। যথা—

ভবানী কাপড় কাচে

দু-ঠ্যাং তার বাব্‌লা গাছে

কখনও কোনো মানুষ কাপড় কাচলে তার দুই পা, কি গাছে থাকতে পারে ? উত্তর, ছড়ায় তা পারে। গ্রাম্য পরিবেশে পুকুরঘাটে গ্রামের মেয়েরা কাপড় কাচতে বসলে পা দুটি প্রসারিত করে বসে, এবং পায়ের মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটিতে কাপড় কাচে। এখানে লৌকিক ছড়াকারগণ কল্পনা করেছেন যে, ঐ প্রসারিত পা দু-খানি যেন বাব্‌লা গাছে তোলা রয়েছে। ছড়াটিতে লোকজীবনের সহজ সরল রসিকতার দিকটি ফুটে উঠেছে। যাতে অনাবিল আনন্দে ও কাল্পনিক চিত্রময়তায় নান্দনিকতার ছবিটিও প্রকাশিত।

বাঙালির বারো মাসে তের পার্বনের একটি হল রথ উৎসব। এই রথকে আশ্রয় করে ছড়াটির মধ্যেও সৌন্দর্যের চিত্র ফুটে উঠেছে—

রথে চড়ে মাসিরবাড়ি যাবে জগন্নাথ।
সুভদ্রা বোন বলরাম ভাই যাবে একসাথ॥
ভক্তেরা মিলে রথে দিল টান।
গড়গড়িয়ে জগন্নাথ মাসিবাড়ি যান॥
রথ টানে সবাই দেখ(অ) হাসিখুশি মনে।
মেলায় ঘুরে খুশিমত জিনিসপত্র কিনে॥
মেলায় দ্যাখো দোকানগুলো আমকাঁঠালে ভরা।
বাড়ি যাবে তাইতো সবাই করছে তাড়াহুড়া॥
খাওয়ার যত দোকান সব ভিড়ে ঠাসা লোকে।
খুশিমতন কিনছে জিনিস কেবা কাকে দেখে।
চললো সবে আপন মনে রথের মেলা থেকে॥[২৭]

উপরোক্ত ছড়াটিতে জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রার রথে চড়ে মাসিবাড়ি যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে রথকে কেন্দ্র করে মেলায় মানুষের মিলন অনুষ্ঠানের দিকটিও প্রকাশিত। বাড়ি যাওয়ার তাড়াহুড়ো, খাওয়ার দোকান ভিড়ে ঠাসা, সকলেই খুশি মনে জিনিস কিনছে খুশির প্রশান্তি নিয়ে বাড়িও ফিরে যাচ্ছে— আর সব মিলিয়ে রথের মেলার এই উৎসব খুশির আনন্দে ভরে উঠেছে।

কাঁহির কালে নাইকো দুলি
আজ দেইছন দু ঠ্যাং তুলি

উপরোক্ত ছড়ায় হঠাৎ বড়লোকী চাল্‌টি প্রকাশিত। এর মধ্যে দিয়ে সমাজ সত্যের দিকটি যেমন ফুটেছে, তেমনি অদ্ভূত এক সৌন্দর্যও ধরা পড়েছে ছড়াটির বর্ণনার গুণে।

পূর্বে আলোচিত যে, ছড়াগুলি রবীন্দ্রনাথের কাছে ছেলেবেলার মোহমন্ত্র ও স্মৃতিসুখকর ছিল। তিনি লিখেছেন,—

"'বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর নদী এল বান' ছড়াটি তাঁর নিকট বাল্যকালে মোহমন্ত্রের মত ছিল এবং সেই মোহ এখনো তিনি ভুলতে পারেন নি।"[২৮]

তাছাড়া ছড়ায় আছে এক সম্মোহন ক্ষমতা। সহজ সরল ভাষায় রচিত ছড়াগুলি নিবিড়ভাবে আকর্ষণ করে। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে বলেছেন—

"ইহার সহিত যে স্নেহটি, সংগীতটি, যে সন্ধ্যা প্রদীপালোকিত সৌন্দর্যচ্ছবিটি চিরদিন একাত্মভাবে মিশ্রিত হইয়া আছে সে আমি কোন্ মোহমন্ত্রে পাঠকদের সামনে আনিয়া উপস্থিত করিব। ভরসা করি এই ছড়াগুলির মধ্যেই সেই মোহমন্ত্রটি আছে।"[২৯]

ছড়ার নান্দনিকতা তথা সৌন্দর্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপরোক্ত মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

লোকায়ত এই ছড়াগুলি কুন্দফুলের ন্যায় ক্ষুদ্র হলেও যেমন তার ঔজ্জ্বলতা তেমনই তার সৌরভ। মানব জীবনের হাসি-অশ্রুময় বিরহ-মিলনের ছোট্ট ছোট্ট কথা দিয়ে গাঁথা এই হার। সেই হারগুলিকে কুড়িয়ে অন্তরের মণি-মাণিক্যে পরিণত করে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে গচ্ছিত রাখাই শ্রেয়। এই ঋকথ্‌গুলি বিভিন্ন স্থানে আনাচে-কানাচে লোকালয়ের ভিড়ে পল্লীজনের প্রাণে প্রাণে অনুরণিত হচ্ছে, সভ্যতার ভয়ংকর গতিশীলতায় তাদের নিরব

নিশ্চল ঢেকে যাওয়া হৃদয়গুলিকে যদি আহরণে সার্থক করা যায়, তাতে গৌরব বর্ধিত হবে-বই এতটুকু কম্‌তি হওয়ার কথা নয়। তাই আজকের সময় এসেছে হৃদয়ের এত কাছে থাকা, 'জাতীয় ঐতিহ্য'গুলিকে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা। যাতে পরবর্তী প্রজন্মের হাতে আরো বৃহৎ ও ব্যাপকভাবে গবেষণার সুযোগ এনে দিতে পারা যায়। আর এই ভাবনার বাণীমূর্তি রূপ দেওয়ার জন্য আমিও আমার অতি পরিচিত বাল্য-কৈশোরের 'মোহমন্ত্র'গুলিকে "পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাপ্ত ছড়ায় লোকজীবন ও সমাজচিত্রের পরিচয় অন্বেষণ ও তার পর্যালোচনা" শীর্ষক—এই গবেষণাপত্রে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি মাত্র। প্রাপ্ত ছড়াগুলিতে লৌকিক মানুষের জীবনকথার সাতকাহনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ব্যক্ত। হয়তো সেখানে পরিশীলিত সাহিত্যের নানা মানদণ্ড নেই, সৌন্দর্যের যথাযথ সংজ্ঞাও নেই, তথাপি জীবিত মানুষের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি রূপ ছড়া এবং এই ছড়াগুলির সৌন্দর্য তথা নান্দনিকতা কোথাও কি ব্যাহত হয়েছে? বরং বলা যায়, এককথায় চমৎকার। স্ব স্ব ঔজ্জ্বলতায় নিকানো উঠোনে ভোরের প্রভাতীগান, যার সুর লহরীতে আঙিনার চির চঞ্চলতা, প্রাণোন্মাদনা এখনও মাটির সোঁদা গন্ধ এনে দেয়। হয়তো ছড়াগুলি কোথাও কোথাও পরিশীলিত বা মার্জিতের মাপকাঠি খণ্ডন করেছে, কিন্তু তাতেই তার যথার্থতা, তাতেই তার সার্থক পরিণতি। পূর্বউল্লিখিত 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্যটি স্মরণযোগ্য—

"... ছত্রটি একেবারেই বাদ দিতে পারিতেছি না, কারণ তাহার মধ্যে কতকটা ইতর ভাষা আছে বটে, কিন্তু তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে বিশুদ্ধ করুণ রস আছে।" [৩০]

ছত্র দুটিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে 'অনতিরূঢ় ভাষার পরিবর্তন' করে অন্যভাবে ছন্দপূরণ করেন তা হল নিম্নরূপ—

"বোন কাঁদেন বোন কাঁদেন খাটের খুরো ধরে
সেই যে বোন গাল দিয়েছেন স্বামীখাকী বলে।" [৩১]

অর্থাৎ কলহকালে রোরুদ্যমানা বালিকাটি তার সহোদরাকে 'ভর্তৃখাদিকা' বলে যে গাল দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাকে স্বামীখাকী' বলে ছন্দ পূরণ করে দেন। সুতরাং ইতর ভাষা অমার্জিত হলেও তার মধ্যে যে 'গভীর স্নেহ-উৎসের নির্মল জলধারা' আছে, সে বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই।

পরিশেষে বলি পরিশীলতাই সকল সৌন্দর্যের শেষ কথা নয়। অত্যন্ত গ্রাম, রুচিহীন অমার্জিত ভাষার মধ্যেও স্বতস্ফূর্ত সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। কোনো বস্তুর প্রতি ভালোলাগা, আগ্রহ, আকর্ষণ, বস্তুটির আভ্যন্তরীণ উপাদান বা গুণের কারণেই হয়ে থাকে। এটাই স্বাভাবিক। আর যা-কিছু সুন্দর, হৃদয়কে নাড়া দেয়, তাই-ই চমৎকারজনক। চমৎকার বস্তুর ধর্মই হৃদয় আকৃষ্ট করা। ছড়াও হৃদয় আকৃষ্ট করে, তাই ছড়া চমৎকার, সৌন্দর্যময়, তথা নান্দনিক। যে কোনো সাহিত্যই হোক্ না কেন সৌন্দর্য তার মননে, সৃজনে, আঙ্গিকে। ছড়া তাই সকলের কাছেই আনন্দজনক এবং সৌন্দর্যদায়ক।

কাব্য, নাটক, কথা-সাহিত্যে ছড়ার উপযোগিতা বিচার ঃ

"পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাপ্ত ছড়ায় লোকজীবন এবং সমাজচিত্রের পরিচয় অন্বেষণ ও তার পর্যালোচনা" বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত একটি গবেষণা। গবেষণার পঞ্চম অধ্যায় 'পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাপ্ত ছড়ায় নান্দনিক রূপের অনুসন্ধান এবং কাব্য, নাটক, কথা-সাহিত্যে তাদের প্রয়োগের উপযোগিতা বিচার।' এই অধ্যায়ের প্রথমে আমরা ছড়ার নান্দনিক রূপের আলোচনা করেছি। এখন এই কাব্য, নাটক, কথা-সাহিত্যে ছড়ার প্রয়োগের উপযোগিতা নিয়ে আলোচনা করব। এবং এই আলোচনা আমার গবেষণাকে এক অখণ্ড রূপদান করবে বলে আমার বিশ্বাস। সেই অখণ্ডতার উদ্দেশ্যেই সাহিত্যের উপরোক্ত ধারায় তাদের প্রায়োগিক দিকটি তুলে ধরার চেষ্টা করছি মাত্র।

ভারতবর্ষ বিশালদেশ। বিশ্ব-মানচিত্রে তার অস্তিত্ব শুধু রাজনীতি, সমাজনীতি বা অর্থনৈতিক দিক থেকে নয়, আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের ইতিহাসও কম সাফল্যের দাবীদার নয়। বহির্বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রের কাছে তার একক পরিচয়—ভারতীয় ঐতিহ্যও সংস্কৃতিতে, আর তার-ই অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর—আমাদের লোকসংস্কৃতি তথা লোকসাহিত্য। যার ধারাগুলিতে স্বতোৎসারিত হয় সৌন্দর্য, ছড়া তার অন্যতম আদি সৌন্দর্য। উল্লেখ্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মানসী' [৩২] কাব্যে 'মেঘদূত' কবিতার অংশ—

"এইমতো মেঘরূপে ফিরি দেশে দেশে
হৃদয় ভাসিয়া চলে উত্তরিতে শেষে
কামনার মোক্ষধাম অলকার মাঝে,
বিরহিনী প্রিয়তমা যেথায় বিরাজে
সৌন্দর্যের আদিসৃষ্টি।"[৩৩]

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ-ই এই কথা প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন যে, উচ্চতর বা শিষ্ট সাহিত্যের সঙ্গো লোকসাহিত্যের এক অন্তর্গূঢ় সম্পর্ক রয়েছে। তাই তিনি তাঁর 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে লিখেছেন—

> "গাছের শিকড় যেমন মাটির সঙ্গো জড়িত এবং তাহার অগ্রভাগ আকাশের দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে তেমনই সর্বত্রই সাহিত্যের নিম্ন অংশ স্বদেশের মাটির মধ্যেই অনেক পরিমাণে জড়িত হইয়া ঢাকা থাকে। ... সাহিত্যের যে অংশ সার্বভৌমিক তাহা এই প্রাদেশিক নিম্নস্তরের থাকটার উপর দাঁড়াইয়া আছে।" [৩৪]

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ থেকে শুরু করে বিভিন্ন মঙ্গালকাব্য, জীবনীসাহিত্য, আরাকান রাজসভার সাহিত্য, কবিওয়ালা, নবাবী আমলের সাহিত্য এবং মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী, সুকুমার সেন, মহাশ্বেতা দেবী বহু বিদগ্ধজনের কাব্য, নাটক, সাহিত্যে ছড়ার খণ্ড খণ্ড চিত্র পেয়ে থাকি।

বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ছাত্রীরূপে লোকসাহিত্যের বিশেষ বর্গ ছড়া নিয়ে কাজ করছি এবং কাব্য, নাটক, কথা-সাহিত্যে তাদের প্রয়োগের উপযোগিতা বর্তমান গবেষণার বিষয়কে অখণ্ড রূপদান করবে। এই আলোচনার মধ্য দিয়ে বর্তমান গবেষণার কাজটি লোকছড়ার গবেষণার সীমারেখাকে অতিক্রম করে কাব্য, নাটক, কথা-সাহিত্যের সীমা স্পর্শ করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

'কাব্য, নাটক, কথাসাহিত্যে ছড়ার প্রয়োগের উপযোগিতা বিচার' এই আলোচনা প্রসঙ্গো একটি কথা বলে নেওয়া ভালো যে, উপরোক্ত সহিত্যগুলিতে যে সকল ছড়ার প্রয়োগ হয়েছে, তাতে আমার ক্ষেত্রসমীক্ষায় প্রাপ্ত ছড়াগুলির সাদৃশ্য থাকলেও থাকতে পারে। তবে এই সাদৃশ্য নিঃসন্দেহে ছড়াগুলির পাঠভেদের সঙ্গো। তার আদিরূপের ক্ষেত্রে নয়। আমরা সকলে জানি, প্রতিটি ভৌগোলিক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতে একই ছড়ার ভিন্ন ভিন্ন পাঠান্তর পরিলক্ষিত হয়। ক্ষেত্রসমীক্ষায় প্রাপ্ত ছড়াগুলি সেই ভিন্ন ভিন্ন পাঠান্তর। তাই কাব্য, নাটক, কথা-সাহিত্যে প্রয়োগ হয়েছে এমন কোনো ছড়ার সঙ্গো পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাপ্ত ছড়াগুলির মিল থাকলেও সে মিল তার ভিন্ন ভিন্ন পাঠভেদের মিল।

লোক সংস্কৃতির পরিভাষায় এই আদিরূপ, মৌলপাঠ বা মূলকে বলে Archetype[৩৫] (আর্কেটাইপ)। এবং এই ভিন্ন পাঠভেদ, রূপান্তর, পরিবর্তিত রূপকে বলে 'Oikotype[৩৬] (অয়কোটাইপ)।

কাব্য ঃ লোকছড়ার প্রয়োগ হয়েছে, এমন কয়েকটি কাব্যের পংক্তি এখানে তুলে ধরা হল। কাব্য সাহিত্যে এই মানদণ্ড কখনও ছড়ার আঙ্গিকে, কখনও ছন্দে, কখনও ভাবে-ভাষায়, শব্দচয়ণে, আবার কখনও তা ছড়াধর্মের মধ্যে ব্যক্ত। নিম্নে এরকম কয়েকটি কবিতার পংক্তি তুলে ধরলাম, যেখানে কবিরা তাদের কাব্যে লোকছড়ার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রতিফলন ঘটিয়েছেন।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর জীবনস্মৃতি[৩৭]-র গোড়াতেই বলেছেন ;

"সেই কৈলাস মুখুজ্যে আমার শিশুকালে অতি দ্রুতবেগে মস্ত একটা ছড়ার মত বলিয়া আমার মনোরঞ্জন করিত। ... ছড়া শুনিতে শুনিতে তাহার চিত্রটিতে মন ভারি উৎসুক হইয়া উঠিত। ... বালকের মন যে মাতিয়া উঠিত এবং চোখের সামনে নানাবর্ণে বিচিত্র আশ্চর্য মুখচ্ছবি দেখিতে পাইত, তাহার মূল কারণ ছিল সেই দ্রুত-উচ্চারিত অনর্গল শব্দচ্ছটা এবং ছন্দের দোলা। শিশুকালের সাহিত্যরস ভোগের এই দুটো স্মৃতি এখনো জাগিয়া আছে ; আর মনে পড়ে 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান।' ওই ছড়াটা যেন শৈশবের মেঘদূত।"[৩৮] পরবর্তীকালে ঐ ছড়া তাঁর 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হয়—

"কবে বিষ্টি পড়েছিল, বাণ এল সে কোথা—
শিব ঠাকুরের বিয়ে হল কবে কার সে কথা।
....
তিনকন্যে বিয়ে করে কী হল তার শেষে।
না জানি কোন নদীর ধারে, না জানি কোন দেশে,
কোন ছেলেরে ঘুম পাড়াতে কে গাহিল গান—
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান।"[৩৯]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনস্মৃতির এই ছড়ার আদলে, আত্মজীবনীর পিঠোপিঠি ছেলেবেলায় লিখলেন—

"কিশোরী চাটুজ্জে হঠাৎ জুটত সন্ধ্যা হলে—
বাঁ হাতে তার থেলো হুঁকো, চাদর কাঁধে ঝোলে।

দ্রুত লয়ে আউড়ে যেত লবকুশের ছড়া—

থাক্‌ত আমার খাতা লেখা, পড়ে থাকত পড়া।"[৪০]

কবি ছড়ার ছন্দেই এই কবিতা লিখেছেন। 'সোনারতরী' কাব্যগ্রন্থে 'সুপ্তোত্থিতা' কবিতাটিতে পাই—

"ঘুমের দেশে ভাঙিল ঘুম,
উঠিল কলস্বর।
গাছের শাখে জাগিল পাখি
কুসুমে মধুকর।"[৪১]

এখানেও ছড়ার ছন্দ অব্যাহত। এরকম আরো কয়েকটি কবিতা যথা —'বুড়ি', 'রাজা ও রাণী', 'দামোদর শেঠ' এবং 'বর এসেছে বীরের ছাঁদে' কবিতাতে ছড়া ধর্মীতা রয়েছে—

১। "এক যে ছিল চাঁদের কোণায়
চরকা কাটা বুড়ি
পুরাণে তার বয়স লেখে
সাতশো হাজার কুড়ি"[৪২] ('বুড়ি')

২। "এক যে ছিল রাজা
সেদিন আমায় দিল সাজা
ভোরের রাতে উঠে
আমি গিয়ে ছিলুম ছুটে"[৪৩] ('রাজা ও রাণী')

৩। 'খাপছাড়া' [৪৪] কাব্য গ্রন্থের—
"অল্পেতে খুশি হবে দামোদর শেঠ কি ?
মুড়কির মোয়া চাই, চাই ভাজা ভেটকি।"[৪৫] ('খাপছাড়া')

৪। "বর এসেছে বীরের ছাঁদে, বিয়ের লগ্ন আটটা—
পিতল-আঁটা লাঠি কাঁধে, গালেতে গালপাট্টা।"[৪৬] ('বর এসেছে বীরের ছাঁদে')

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরবর্তী কবি বুদ্ধদেব বসুর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' [৪৭] বেশ কিছু কবিতায় লোকজ ছড়ার আদলটি ধরা পড়েছে। যেমন, তাঁর 'একশব' কবিতায় পাই—

"কী আমরা দেখেছিলুম হঠাৎ পথের মোড়ে
গ্রীষ্মমধুর দিনে,

শিলার শয়নে গলিত জন্তু রয়েছে পড়ে—

প্রেয়সী, পড়ে কি মনে ?"[৪৮]

তাঁর 'একটা রূপকথা' কবিতাটি লোকছড়ার ছন্দে লেখা—

"একদা রূপকুমার দেশে

ঘোড়সওয়ার

টগবগিয়ে মাড়িয়ে চলে

স্টেপির পাড়"[৪৯]

ছড়াকার, শিশু সাহিত্যিক হিসেবে সুকুমার রায়ের নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। ছড়াধর্মী কবিতা লেখার জন্যই বাংলা কবিতার ইতিহাসে তিনি স্মরণীয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য 'আবোল তাবোল'[৫০] কাব্যের প্রতিটি ছড়াই-ছড়ার আঙ্গিকে রচিত। যেমন 'বাবুরাম সাপুড়ে' কবিতাটি এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য—

১। "বাবুরাম সাপুড়ে,

কোথা যাস্ বাপুরে ?

আয় বাবা দেখে যা,

দুটো সাপ রেখে যা !

যে সাপের চোখ্ নেই,

শিং নেই নোখ্ নেই...."[৫১]

কবিতাটি এই অঞ্চলের ছোটো শিশুদের মুখে মুখে ছড়া হিসেবে আজও শোনা যায়। কবির অন্য একটি কবিতা 'গোঁফ চুরি' ও বিশেষভাবে উল্লেখ্য—

"গোঁফকে বলে তোমার আমার

গোঁফ কি কারো কেনা ?

গোঁফের আমি গোঁফের তুমি

তাই দিয়ে যায় চেনা।"[৫২]

কাব্যে ছড়ার প্রয়োগ এ আলোচনায় আমরা ছড়াকার ভবানীপ্রসাদ মজুমদারের 'দেশাত্মবোধক ছড়া ও কবিতা'[৫৩] গ্রন্থের নামোল্লেখ করতে পারি। তাঁর লেখা ছড়াগুলিতে ছড়ার আদল সম্পূর্ণরূপে রয়েছে। তাঁর 'নমস্য কার নাম, শহীদ ক্ষুদিরাম' কবিতাটি একটি উল্লেখযোগ্য ছড়াধর্মী কবিতা—

"সকাল-সাঁঝে মনের মাঝে

দোলায় অবিরাম ?

সবার চেনা সূর্যসেনা

কিশোর ক্ষুদিরাম।"[৫৪] (দেশাত্মবোধক ছড়া ও কবিতা)

কবিতাংশ—

আমরা কেমন স্বাধীন দাদা ? আমরা কেমন স্বাধীন ?

তোমার মতন হাত-পা তুলেই নাচছি তাধিন তাধিন !"[৫৫] (ঐ)

পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাপ্ত ছড়াগুলি শুধু যে লোক মুখে মুখে চর্চিত ও আলোচিত তা নয়, বর্তমানে এদের নিয়েও বহু লেখালেখি হচ্ছে, বই লেখাও হচ্ছে। রচিত হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের সাহিত্য। এই অঞ্চলে প্রকাশিত অন্যতম একটি কাব্যগ্রন্থ 'কবিতানগর'[৫৬] এতে অনেকগুলি কবিতা ছড়ার কবিতা। তার দুটি হল—

১। 'কি খাদ্য খাবো' কবিতায় পাই—

"মিষ্টি আনতে ভুলে গেছি

তাই এনেছি মৌ

আমার খাবার ছিরি দেখে

গাল দিচ্ছে বৌ"[৫৭]

২। 'বাবুমশায়' কবিতায় পাই—

"হাজার টাকার নোট দেখিয়ে

ধারে কিনেন আম

সেই আমের পায়নি দাম

বেজায় চটে রাম।"[৫৮]

এছাড়া কবি নজরুল ইসলামের 'কাঠবেড়ালী'[৫৯], 'লিচুচোর'[৬০], এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তাছাড়া সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'দূরের পাল্লা'[৬১], কবি জসীমউদ্দিনের 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ'[৬২], 'সোজনবাদিয়ার ঘাট'[৬৩], এমন কি আধুনিক শিষ্ট সাহিত্যের কবিদের লেখা কবিতায় ছড়ার প্রয়োগ ও তার আঙ্গিক, আদল, ছন্দ, শব্দচয়ন আমাদের গ্রাম্য লোকছড়া তথা উপকূলীয় অঞ্চলের লোকছড়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ছড়ায় থাকে অন্ত্যমিল, শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দ,

যাকে আমরা ছড়ার ছন্দ বলে থাকি, শব্দের আদিতে ঝোঁক প্রকাশ, ছড়ার আদল, অঙ্গগত বৈশিষ্ট্য এবং সহজ সরল ঘরোয়া কথ্য শব্দের প্রয়োগ —এইসব গুলি উপরোক্ত কবিদের কবিতায়ও লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। যা এই অঞ্চলের ছড়াগুলিকে আঞ্চলিকতার সীমা অতিক্রম করিয়ে শিষ্ট সাহিত্যে নবজন্ম ঘটিয়েছে। এখানেই ছড়াগুলির প্রয়োগগত উপযোগিতা ও সার্থকতা।

নাটক ঃ কাব্যসাহিত্যের মতো নাট্যসাহিত্যেও ছড়ার প্রয়োগগত দিকটি ফুটে উঠেছে। লোকসাহিত্যের বিষয় লেখকদের কেবল প্রেরণা দেয় তাই নয়, বহুক্ষেত্রে সেই বিষয়বস্তু আধুনিক লেখকদের হাতে পড়ে অনেক বেশি নতুন সৃষ্টিও হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে আশরাফ সিদ্দিকীর মন্তব্য বিশেষভাবে স্মরণীয় ঃ

> " 'মহুয়া' ও অন্যান্য কাহিনী নিয়ে যেমন নাটক লেখা হয়, তেমনি ফরাসী দেশের বিখ্যাত কাহিনী 'Tristan and Iseult' এবং 'Aucassin and Nicolette' পরবর্তী যুগের খ্যাতিমান কাহিনী পরবর্তী যুগের খ্যাতিমান লেখক দ্যান্তে, পেট্রার্ক, চসার স্পেনসার, শেক্সপিয়র, বাইরণ ও গ্যেটেকে যে কিভাবে প্রভাবান্বিত করেছে তা সর্বজনবিদিত। যে প্রেম কোনো দৈব-দুর্বিপাকের মধ্যেই দীপ্তি হারায় না সে কি অমর সাহিত্যের বিষয়বস্তু নয় ?"[৬৪]

'মৈমনসিংহ গীতিকা'র 'মহুয়া' পালার কথা বলা যায়, যেখানে লোকছড়ার ভাষা, ছন্দরীতি, ও অন্ত্যমিলের সঙ্গে গীতিকাটির বহু অংশের সাদৃশ রয়েছে। তার একটি হল—

"যখন নাকি বাইদ্যার ছেরি বাশে মাইলো লাড়া।
বইস্যা আছিল নদ্যার ঠাকুর উঠ্যা ঐল খাড়া॥
দড়ি বাইয়া উঠ্যা যখন বাশে বাজী করে।
নইদ্যার ঠাকুর উঠ্যা কয় পইর‍্যা নাকি মরে।।"[৬৫] (মৈমনসিংহ গীতিকা)

দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' [৬৬] নাটকে ব্যবহৃত ছড়া হল—

"সাপের ফেনা বাঘের নাক।
ধুনোর আগুন চরোক পাক॥
সাত সতীনের সাদা চুল।
ভাঁটির পাতা ধুতরো ফুল।।"[৬৭] (নীলদর্পণ)

ছড়ার প্রয়োগ হয়েছে মন্মথ রায়ের 'কারাগার' [৬৮] নাটকেও। সেখানে কঙ্কার ছড়াগানে আছে—

"আয় উড়ে আয় মৌমাছি বৌ।

মৌচাকেতে ঝরছে যে মৌ॥

ফুল পরীরা চুল দুলিয়ে।

যা নেচে ঐ মন ভুলিয়ে॥"[৬৯] (কঙ্কার ছড়া গান)।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ব্যঙ্গাকৌতুক' [৭০] নাটকে 'বিনি পয়সার ভোজে' গানটিতে ছড়ার আদল পাওয়া যায়—

"যদি জোটে রোজ

এমনি বিনি পয়সায় ভোজ!

ডিশের পরে ডিশ

শুধু মটন কারি ফিশ।"[৭১] (ব্যঙ্গাকৌতক)

নাট্যকার মনমোহন বসুর 'প্রণয় পরীক্ষা' [৭২] নাটকেও ছড়ার প্রয়োগ রয়েছে—

"আয়রে আয় গলায় দড়ে।

কাজলা নদীর ঘাড়ে চড়ে॥

ফাঁস লাগিয়ে লাগা টান।

হুস করে তোর বেরুক প্রাণ॥"[৭৩] (প্রণয় পরীক্ষা)

সুতরাং ছড়াগুলি যে শুধু গ্রাম-বাংলার পথে প্রান্তরে অনাদরে পড়ে থাকা বিষয়, আজ আর তা মনে হয় না। সাহিত্যের দরবারে তথা আধুনিক সাহিত্যের আকাশে তাদের প্রয়োগ এবং উপযোগিতা দুই-ই অসাধারণ।

নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের 'দেবীগর্জন' [৭৪] নাটকেও ছড়ার প্রয়োগ ঘটেছে। তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে তৃতীয় চাষীর মুখে—

"ই বড় মজার কথা

ই বড় মজার কথা লক্ষ্মণিয়া

বচন তুমার চমৎকার

আমরা কিন্তু তোমাক জানি

ভুঁখা পেটের গণৎকার

ই বড় মজার কথা,

ই বড় মজার কথা..."[৭৫] (দেবীগর্জন)

এই নাটকে দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে মেয়েরা ধান ঝাড়াচ্ছে, ধান ওড়াচ্ছে, সেই সঙ্গে সঙ্গেও গান গাইছে, যে গান ছড়ার গানের সুরে হলেও, মূলত তা ছড়াধর্মী—

"গুণের ননদ ময়না

গুণের ননদ ময়না

নিশাকালে শিয়াল ডাকে

ঘরেতে মন রয় না।

গুণের ননদ ময়না

গুণের ননদ ময়না

ধান ঝাড়িতে দোসর পাইলাম না"[৭৬] (দেবীগর্জন)

উপরোক্ত ছড়াধর্মী গানে ছড়ার আদল-ই প্রকাশ পেয়েছে, শব্দ প্রয়োগ, এবং পংক্তি নির্মাণে ছড়ার বৈশিষ্ট্যই প্রকাশিত ; যার জন্যে ছড়াগুলি সাহিত্যিক পদমর্যাদায় উন্নীত হয়েছে।

নাট্যকার শম্ভু মিত্রের 'চাঁদবণিকের পালা' [৭৭] এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, এই নাটকেও ছড়ার আঙ্গিক নিম্নলিখিত রূপে পাওয়া যায়।

চাঁদ ও সনকার ছয় পুত্র যখন সর্পবিষে ঢল্যে যায় তখন চাঁদ সনকাকে বলে—

"তুই তো সনকা কতোদিন ধর্যে মনস্যার পূজা কর্যে এলি,

তুবু তোরই পুত্র খায় কেন চ্যাংমুড়ি কানী ?" [৭৮]

সূত্রধরের বর্ণনাতে ছড়ার আদল ঃ

" 'বেয়ে চলো, বেয়ে চলো' এই কথা শোনে।

উত্তর করিতে নারে ফোঁসে মনে-মনে॥

কতক নাবিক ক্রমে তিক্ত হয়্যা ওঠে।

লক্ষ্যেতে হারায় আস্থা, রুদ্ধ রোষ ফোটে।।" [৭৯] (ঐ, পৃ-৩১)

লহনার সংলাপে ছড়া ঃ

"যে সংসারে যতো বেশী দীর্ঘশ্বাস পড়ে,
সেইখেনে লক্ষ্মী ততো যাই-যাই করে।"[৮০] (ঐ, পৃ-৫২)

সনকার সংলাপে পাই, হাতের পল্লবে জল ছিটোতে-ছিটোতে প্রার্থনা করে,—

"এ গৃহে কল্যাণ হোক, পাপ দূর হোক।
সর্ববিধ অমঙ্গাল দূরীভূত হোক॥
স্বামীর মঙ্গাল হোক, পুত্রের মঙ্গাল।
লক্ষ্মীর প্রসাদে যাক সর্ব অমঙ্গাল॥"[৮১] (ঐ, পৃ-৭৩)

তৃতীয় পর্বের প্রথমাংশে সূত্রধারের সংলাপে ঃ

"সনকা কাঁদিয়া বলে, তুমি সর্বনাশা।
মোদের জীবন নিয়্যা খেলিতেছ পাশা॥
স্বামী কেড়্যে নেছ তুমি, কেড়্যে নেছ ঘর।
আমার জীবন তুমি করেছ ধূসর॥
একমাত্র আশা ছিল পুত্র লখিন্দরে।
তারেও ফুসলায়্যা তুমি পাঠাও সাগরে॥"[৮২] (ঐ, পৃ-৯৮)

তৃতীয় পর্বের প্রথমাংশে সূত্রধর ও জুড়ি মিলে ছড়ায় ও গানে ঃ

" ঃ এইবার কিবা করে চাঁদ সদাগর॥
ঃ একে-একে সব আশা সমূল নির্মূল হোল।
এইবার কিবা করে চাঁদ সদাগর॥
ঃ শিব তারে বাঁচালো না।
সদুদ্দেশ্য বাঁচালো না।"[৮৩] (ঐ, পৃ-১৪১)

কথা-সাহিত্য ঃ শিষ্ট সাহিত্যের সবচেয়ে আধুনিক শিল্পরূপ হল কথা-সাহিত্য। বাংলা কথাসাহিত্যগুলি বাঙালির জীবন-চর্চার দর্পণ। বাঙালির লোকসংস্কৃতিকে উপেক্ষা করতে পারেনি অনেক আধুনিক কথাসাহিত্যিক। লোকসাহিত্যের উপাদানের উপর ভর করেই গড়ে উঠেছে নানা আঞ্চলিক কথাসাহিত্য। যথা ঃ তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা'[৮৪], 'কবি'[৮৫], অদ্বৈত্য মল্লবর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম'[৮৬],

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'আমার বাংলা' [৮৭] গল্পগ্রন্থ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' [৮৮] এবং গিরিবালা দেবীর 'রায়বাড়ি' [৮৯] প্রভৃতির নাম বলা যায়।

এছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বিষবৃক্ষ' [৯০] উপন্যাসে ছড়ার ব্যবহার করেছেন—

"হীরার অয়ি বুড়ী। গোবরের ঝুড়ি॥
হাঁটে গুঁড়ি গুঁড়ি। কাঁঠাল খায় দেড়কুড়ি।"[৯১] (বৃষবৃক্ষ)

ছড়ার ব্যবহার পাই বনফুলের 'ডানা' [৯২] উপন্যাসে। বনফুল তাঁর 'ডানা' উপন্যাসে অনেক ছড়াই ব্যবহার করেছেন, তার দু-একটি হল—

১। "মুনিয়া রে মুনিয়া,
কথা যাবে শুনিয়া
গাঁয় কাঁটা ফোঁটা আছে
আয় দেখি গুনিয়া"[৯৩] (ডানা)

২। "ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো
বর্গী এল দেশে
সোনাপাখিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেব কিসে।"[৯৪] (ডানা)

উপরোক্ত দুটি ছড়াই অত্যন্ত পরিচিত দুটি ছড়া। লেখক খুব সুকৌশলে তাঁর 'ডানা' উপন্যাসে প্রয়োগ করেছেন, যেখানে লোকছড়াগুলি শিষ্ট সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে।

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য এবং জনপ্রিয় একটি উপন্যাস 'কবি'। 'কবি' উপন্যাসেও ঔপন্যাসিক ছড়ার প্রয়োগ করেছেন —

"সেই মেলাতে কবে যাব
ঠিকানা কি হায়রে,
যে মেলাতে গান থামেনা
রাতের আঁধার নাই রে।" [৯৫] (কবি)

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইছামতি' [৯৬] উপন্যাস এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য—

"আজ বলেছে যেতে
পান সুপারি খেতে

পানের ভিতর মৌরিবাটা

ইস্কে বিস্তে ছবি আঁকা"[৯৭] (ইছামতি, পৃ-১৪)

এছাড়াও শ্রীপান্থ ছদ্মনামে নিখিল সরকার তার 'হারিয়ে যাওয়া কালিকলম ও মন' [৯৮] প্রবন্ধে কয়েকটি ছড়া ব্যবহার করেছেন। লেখক প্রবন্ধে বলেছেন, প্রাচীনেরা বলত—

১। "তিল ত্রিফলা শিমূল ছালা

ছাগ দুগ্ধে করি মেলা

লৌহ পাত্রে লোহায় ঘসি

ছিঁড়ে পত্র না ছাড়ে মসি।" [৯৯]

২। "কালির অক্ষর নাইকো পেটে

চণ্ডী পড়েন কালীঘাটে।"[১০০] (সাহিত্য সঞ্চয়ন)

বেশ কিছু পত্র-পত্রিকাও এই অঞ্চলে নিয়মিত প্রকাশিত হয় যেখানে লৌকিক ছড়ার প্রয়োগ হয়েছে। বিদগ্ধ, জ্ঞানী, অধ্যাপক, শিক্ষক-শিক্ষিকা এঁরা এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত, এবং নিয়মিত সাহিত্য চর্চাও করে থাকেন। পূর্ব মেদিনীপুরের এরকম একটি উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয় পত্রিকা ছিল 'চর্যা'।[১০১] ঐ পত্রিকা থেকে প্রাপ্ত, অধ্যাপক অমলেন্দু বিকাশ জানার ব্যবহৃত কয়েকটি ছড়া হল—

১। "হাতি ঝুল্ ঝুল (অ) পাকা পান (অ)।

সঁপড়ির শাশু-মা মুসলমান" (অ)॥ [১০২]

২। "ঝালু মালু কর্কটা ব্যাঙ্।

ঝালুর মুয়ে বাছুর ঠ্যাং॥"[১০৩] (চর্যা)

পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলের অন্য একটি পত্রিকা 'দিগন্তের খোঁজে'।[১০৪] ঐ পত্রিকায় প্রাপ্ত ইভা মাইতির ছড়াটি হল—

"বনমালী জ্যান্ত কালী

ভূতের ব্যাটা ভূত

গলায় কাঁটা আটকে ব্যাটার

ঘুঁচলো খাওয়ার জুত"[১০৫]

এইভাবে পত্র-পত্রিকায় এই অঞ্চলের প্রাপ্ত লোকছড়াগুলি পূর্বে যেমন আলোচিত হয়েছে, আজও তেমনি আলোচিত হচ্ছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে শিষ্ট সাহিত্যেও এদের প্রয়োগ হয়েছে।

সবশেষে বলা যায়, লোকছড়া কেবল আর ছড়া নেই। পল্লী বাংলার গোষ্ঠীজীবন থেকে উঠে আসা এই মাটির ফসলগুলি অনাদরে, অবহেলায় শ্রুতিও স্মৃতি সর্বস্ব না হয়ে আজ আধুনিক সাহিত্যের আসরে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করে তুলেছে। তাই লেখক সাহিত্যিকগণ এই প্রাচীন ঐতিহ্যগুলির সোনার কাঠির জাদু স্পর্শে সাহিত্যের নবজীবনে নব জোয়ার এনেছে। আগামীদিনেও তা প্রবাহিত হবে। এ প্রসঙ্গে তাই সবশেষে আশ্‌রাফ সিদ্দিকীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য ঃ

"... বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন পর্যায়ে, আমাদের প্রবহমান ঐতিহ্যে বিভিন্ন লোক-সংস্কৃতির ধারা এসে মিশেছে। জীবনের নানা পর্যায়ে তা আজও মলিন হয়ে যায়নি। আমাদের প্রাচীন সাহিত্য, পুঁথি-সাহিত্য, মৈমনসিংহ বা পূর্ববঙ্গ গীতিকার মতো অন্যান্য আরও বহু সাহিত্য-সংস্কৃতির ধারাও নানা রূপকল্পে আমাদের আধুনিক সাহিত্যে প্রতিফলিত হতে বাধ্য। লোকসাহিত্য হলো সেই সীমাহীন ভাণ্ডার যা থেকে বিচিত্র রসদ সংগ্রহ সম্ভব- যার জ্ঞান দিতে পারে সহস্র চক্ষু। আমাদের ভুললে চলবে না, কালচার হলো Commonly accepted and expected ideas, attitudes, values, and habits which individuals learn in connection with the social living." এবং "All the elements of culture... must be at work. Functioning active, efficient... ।"[১০৬]

প্রসঙ্গ নির্দেশ ও মন্তব্য ঃ

১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য সৌগত চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত বাংলার ছড়া ঃ ছড়ার বাংলা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৮, কলি-৯, পৃ-২২১।

২. 'সাহিত্য' গ্রন্থটির রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রকাশক বিশ্বভারতী, ২০১০, কলি-৬। পরিশিষ্ট-১, চিত্রসংখ্যা—৫২, পৃ-৫২৪ দ্রষ্টব্য।

৩. 'সৌন্দর্য ও সাহিত্য' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যের সৌন্দর্য বিষয়ে অসাধারণ আলোচনা করেছেন।

৪. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্য, বিশ্বভারতী ২০১০, কলি-৬, পৃ-৭৬, ৭৭।

৫. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোকসাহিত্য, বিশ্বভারতী ২০০৪, কলি-১৭, পৃ-৭।

৬. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য সৌগত চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত বাংলার ছড়া ঃ ছড়ার বাংলা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৮, কলি-৯, পৃ-২২১।

৭. 'লোকসাহিত্য' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত এক অমূল্য গ্রন্থ। যার মধ্যে রয়েছে—১) ছেলে ভুলানো ছড়া, ২) ছেলে ভুলানো ছড়া-২, ৩) কবি-সংগীত, এবং ৪) গ্রাম্যসাহিত্য নিয়ে চারখানি প্রবন্ধ। পরিশিষ্ট-১, চিত্রসংখ্যা—৫৩, পৃ-৫২৫ দ্রষ্টব্য।

৮. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোকসাহিত্য, বিশ্বভারতী, ২০০৪, কলি-১৭, পৃ-৭।

৯. এই প্রবন্ধের প্রথমেই লেখক বলেছেন, ছেলে ভুলাইবার জন্য যে সকল মেয়েলি ছড়া প্রচলিত আছে, কিছু কাল হইতে আমি তাহা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম।

১০. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা-২৫, পৃ-১১১।

১১. 'কচি'—এই অঞ্চলে ছোটো শিশুকে আদরার্থে বলে 'কচি'। 'কচি' শব্দটি বিশেষ্য এবং বিশেষণ উভয় পদ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। ১। কচি বাজার যাইছে। ২। গাছে কচি কচি প্যাহারা হইচে। তবে বড়দের ও 'কচি' বলে সম্বোধন করা হয়।

১২. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৯, পৃ-৯৫।

১৩. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-৯৫ দ্রষ্টব্য।

১৪. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা-২, পৃ-৮৮।

১৫. 'হাড়ো' হড় > হাড়ো অর্থ মানুষ (সাঁওতালী ভাষায়)।

১৬. 'গড়ো' শিশুর গড়িয়ে গড়িয়ে ঘুমানোকে গড়ো বলা হয়েছে।

১৭. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা-২৬, পৃ-১১২।

১৮. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-১১২ দ্রষ্টব্য।

১৯. 'গৌরীদান' হল মেয়েকে পরিণত বয়সের পূর্বে ৭-৯ বছরের মধ্যে বিবাহ দেওয়া। পূর্বে এই প্রথা প্রচলিত ছিল।

২০. নিজস্ব সংগ্রহ, পৃ-২১৭ দ্রষ্টব্য।

২১. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা-২, পৃ-৮৮।

২২. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা-২৪, পৃ-১১০।

২৩. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা-১৬, পৃ-১০২।

২৪. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা-২৯, পৃ-১১৫।

২৫. আলোচ্য পদটি বৈষ্ণব পদাবলীর অন্যতম পদকর্তা চণ্ডীদাসের রচিত।

২৬. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা-১৫, পৃ-১০১।

২৭. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা-১৪, পৃ-১০০।

২৮. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোকসাহিত্য, বিশ্বভারতী, ২০০৪, কলি-১৭, পৃ-৬।

২৯. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯, ১০ দ্রষ্টব্য।

৩০. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৬ দ্রষ্টব্য।

৩১. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৩৬ দ্রষ্টব্য।

৩২. 'সঞ্চয়িতা' কাব্যগ্রন্থটির রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রকাশক বিশ্বভারতী, ১৯৯৫, কলি-১৭, পরিশিষ্ট-১, চিত্রসংখ্যা—৫৪, পৃ-৫২৬ দ্রষ্টব্য।

৩৩. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঞ্চয়িতা, বিশ্বভারতী, ১৯৯৫, কলি-১৭, পৃ-১০৩।

৩৪. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-৯১ দ্রষ্টব্য।

৩৫. Archetype, (আর্কেটাইপ) ঃ মৌলপাঠ, আদিরূপ, মূল। লোকসংস্কৃতিচর্চায় আরকেটাইপের বিশেষ গুরুত্ব আছে যেহেতু এটি মূলত মৌখিক শিল্প, সহজেই পরিভ্রমণের কারণে তৈরী হয় অসংখ্য পাঠান্তর। তখন বিভিন্ন পাঠগুলি নিপুণভাবে পর্যালোচনা করে আদিরূপ বা মূলপাঠ নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

৩৬. Oikotype (অয়কোটাইপ) ঃ পাঠভেদ। সুইডিশ লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানী কার্ল ভন সিডোর এই শব্দটি চয়নের কৃতিত্ব। শব্দটি গৃহীত হয়েছে উদ্ভিদ বিজ্ঞান থেকে। বিশেষ ভৌগোলিক পরিবেশে জাত বিশেষ উদ্ভিদ প্রজাতিকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয় 'Oikos'

এই গ্রীক শব্দটি। সিডো মনে করেন প্রতিটি ভৌগোলিক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতে লোককথার বিশেষ পাঠ ঐতিহাসিক বিবর্তনহেতু আত্মপ্রকাশ করে। এটিই হল অয়কোটাইপ। তথ্যসূত্র ঃ চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায়, লোকসংস্কৃতি ও নৃ-বিদ্যার অভিধান, প্রথম প্রকাশ-২০০৯, প্রকাশক-অপর্ণা বুক ডিসট্রিবিউটার্স, কলি-৯, পৃ-৩৭, ৩৩৫।

৩৭. 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থটির রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩৮. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য সৌগত চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত বাংলার ছড়া ঃ ছড়ার বাংলা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৮, কলি-৯, পৃ-৪৬৭।

৩৯. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য সৌগত চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত বাংলার ছড়া ঃ ছড়ার বাংলা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৮, কলি-৯, পৃ-৪৬৭।

৪০. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঞ্চয়িতা, বিশ্বভারতী ১৯৯৫, কলি-১৭, পৃ-৪৬, ৪৭।

৪১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঞ্চয়িতা, বিশ্বভারতী ১৯৯৫, কলি-১৭, পৃ-১১২।

৪২. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিশু ভোলানাথ, ৩/১৬১ শেঠ বাগান রোড, ২০০২, কলি-৩০, পৃ-১৩।

৪৩. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৩৪ দ্রষ্টব্য।

৪৪. 'খাপছাড়া' কাব্যটির রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রকাশ ১৩৪৩ মাঘ।

৪৫. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঞ্চয়িতা, বিশ্বভারতী ১৯৯৫, কলি-১৭, পৃ-৭৬২।

৪৬. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৭৬৩ দ্রষ্টব্য।

৪৭. বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলনটির প্রকাশক দে'জ পাবলিশিং, প্রকাশ ২০১০, কলি-৭৩।

৪৮. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নরেশ গুহ সম্পাদিত বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং ২০১০, কলি-৭৩, পৃ-১৯৩।

৪৯. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-১৮৩ দ্রষ্টব্য।

৫০. 'আবোল তাবোল' কাব্যগ্রন্থটির রচয়িতা সুকুমার রায়, প্রকাশক ইয়ু রায় এণ্ড সন্স, প্রকাশ-১৯২৩।

৫১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য সুকুমার রায়, আবোল তাবোল, ইয়ু রায় এণ্ড সন্স, ১৯২৩, পৃ-৬।

৫২. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১৫ দ্রষ্টব্য।

৫৩. 'দেশাত্মবোধক ছড়া ও কবিতা'র সম্পাদক স্বপন পাত্র, প্রকাশক-লালমাটি, প্রকাশ-২০১৫, পরিশিষ্ট-১, চিত্রসংখ্যা—৫৫, পৃ-৫২৭ দ্রষ্টব্য।

৫৪. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য স্বপন পাত্র সম্পাদিত দেশাত্মবোধক ছড়া ও কবিতা, লালমাটি, ২০১৫, কলি-৭৩, পৃ-১০৩।

৫৫. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-১০৭ দ্রষ্টব্য।

৫৬. 'কবিতানগর' কাব্যগ্রন্থটির সম্পাদক মনোরঞ্জন খাঁড়া, প্রকাশক-বেণুকা, ২০১৭ দ্রষ্টব্য।

৫৭. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-১৭১ দ্রষ্টব্য।

৫৮. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-১৭৯ দ্রষ্টব্য।

৫৯. 'কাঠবেড়ালী' কবিতাটির রচয়িতা কাজী নজরুল ইসলাম।

৬০. 'লিচুচোর' কাজী নজরুল ইসলামের একটি বিখ্যাত কবিতা।

৬১. 'দূরের পাল্লা' ছন্দের জাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা।

৬২. 'নকসী কাঁথার মাঠ' আখ্যান কাব্যটি পল্লী কবি জসীম উদ্দিনের লেখা, প্রকাশ ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে।

৬৩. 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা জসীম উদ্দিন, প্রকাশ-১৯৩৪।

৬৪. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য আশ্‌রাফ সিদ্দিকী, লোক-সাহিত্য, ২য় খণ্ড, নয়া উদ্যোগ, ২০১৩, কলি-৬, পৃ-২৫৬।

৬৫. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ঘোষ ও মুখোপাধ্যায় মৈমনসিংহ গীতিকা, ইষ্ট ইণ্ডিয়া পাবলিশার্স, ২০০৯, কলি-১২, পৃ-৫।

৬৬. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য মনাঞ্জলী বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত লোকসংস্কৃতি নূতনের ভাবনায়, ডাভ পাবলিশিং হাউস, ২০১৩, কলি-৯, পৃ-১৩।

৬৭. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১৩ দ্রষ্টব্য।

৬৮. 'কারাগার' নাটকের রচয়িতা মন্মথ রায়, প্রকাশক বামা পুস্তকালয়, প্রকাশ-২০০৬, পরিশিষ্ট-১, চিত্রসংখ্যা—৫৬, পৃ-৫২৮ দ্রষ্টব্য।

৬৯. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১৯, ২০ দ্রষ্টব্য।

৭০. ব্যঙ্গাকৌতুক নাটকের রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এটি রবীন্দ্র নাট্য সংগ্রহতে সংকলিত।

৭১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র নাট্য সংগ্রহ ১ম খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৯৯৯, কলি-৯, পৃ-৬০৬।

৭২. 'প্রণয় পরীক্ষা' নাটকটির রচয়িতা মনমোহন বসু, প্রকাশ ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে।

৭৩. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য মনাঞ্জলী বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত লোকসংস্কৃতি নূতনের ভাবনায়, ডাভ্ পাবলিশিং হাউস, ২০১৩, কলি-৯, পৃ-১৩ দ্রষ্টব্য।

৭৪. 'দেবীগর্জন' নাটকটির রচয়িতা বিজন ভট্টাচার্য, প্রকাশক দে'জ পাবলিশিং, প্রকাশ-১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে, পরিশিষ্ট-১, চিত্রসংখ্যা—৫৭, পৃ-৫২৯ দ্রষ্টব্য।

৭৫. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য বিজন ভট্টাচার্য দেবীগর্জন, দে'জ পাবলিশিং-১৯৬৯, কলি-৭৩, পৃ-৯৭।

৭৬. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৭৬ দ্রষ্টব্য।

৭৭. 'চাঁদবণিকের পালা' নাটকটির রচয়িতা শম্ভু মিত্র, প্রকাশক-এম.সি.সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রকাশ-২০১৮। পরিশিষ্ট-১, চিত্রসংখ্যা—৫৮, পৃ-৫৩০ দ্রষ্টব্য।

৭৮. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য শম্ভু মিত্র, চাঁদবণিকের পালা, এম.সি.সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৮, কলি-৭৩, পৃ-২৭।

৭৯. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৩১ দ্রষ্টব্য।

৮০. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৫২ দ্রষ্টব্য।

৮১. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৭৩ দ্রষ্টব্য।

৮২. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯৮ দ্রষ্টব্য।

৮৩. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১৪১ দ্রষ্টব্য।

৮৪. 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' উপন্যাসের লেখক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশ-১৯৪৬ খ্রীঃ।

৮৫. 'কবি' তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশ-১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে।

৮৬. 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটির রচয়িতা অদ্বৈত্য মল্লবর্মন, প্রকাশ-১৯৫৬ খ্রীঃ।

৮৭. 'আমার বাংলা' গ্রন্থের লেখক কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রকাশ-

৮৮. 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের রচয়িতা মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশ-১৯৩৬ খ্রীঃ।

৮৯. 'রায়বাড়ি' উপন্যাসের লেখিকা গিরিবালা দেবী।

৯০. 'বৃষবৃক্ষ' উপন্যাসের লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অক্ষর বিন্যাস, ২০০৯। পরিশিষ্ট-১, চিত্রসংখ্যা—৫৯, পৃ-৫৩১ দ্রষ্টব্য।

৯১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বৃষবৃক্ষ, অক্ষর বিন্যাস, ২০০৯, কলি-৯, পৃ-২৯১।

৯২. পরিশিষ্ট-১, চিত্রসংখ্যা—৬০, পৃ-৫৩২ দ্রষ্টব্য।

৯৩. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য বনফুল, ডানা, দে'জ পাবলিশার্স, ২০০৭, কলি-৭৩, পৃ-৪৯।

৯৪. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১৪ দ্রষ্টব্য।

৯৫. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য মনাঞ্জলী বন্দ্যোপাধ্যায়, লোকসংস্কৃতি নূতনের ভাবনায়, ডাভ পাবলিশিং হাউস, ২০১৩, কলি-৯, পৃ-১৪।

৯৬. 'ইছামতি' উপন্যাসটির লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৯৭. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য মনাঞ্জলী বন্দ্যোপাধ্যায়, লোকসংস্কৃতি নূতনের ভাবনায়, ডাভ পাবলিশিং হাউস, ২০১৩, কলি-৯, পৃ-১৪।

৯৮. 'হারিয়ে যাওয়া কালি কলম ও মন' লেখক নিখিল সরকার।

৯৯. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য সাহিত্য সঞ্চয়ন, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, ২০১৭, কলি-১৬, পৃ-৫১।

১০০. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৫২ দ্রষ্টব্য।

১০১. ‘চর্যা’ পত্রিকাটির সম্পাদক বৃহস্পতি মণ্ডল, এটি একটি ষান্মাসিক পত্রিকা, খেজুরী থেকে প্রকাশিত।

১০২. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা-১, পৃ-৮৭।

১০৩. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য বৃহস্পতি মণ্ডল সম্পাদিত চর্যা, ১৮ বর্ষ, ৩১৩তম প্রকাশ, ২০০৯, পূর্ব মেদিনীপুর, পৃ-৫০।

১০৪. ‘দিগন্তের খোঁজে’ সম্পাদক বেলালউদ্দিন, উৎসব সংখ্যা, ২০১৫, পূর্ব মেদিনীপুর, পৃ-৯ দ্রষ্টব্য।

১০৫. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯ দ্রষ্টব্য।

১০৬. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য আশ্‌রাফ সিদ্দিকী, লোক-সাহিত্য, ২য় খণ্ড, নয়া উদ্যোগ, ২০১৩, কলি-৬, পৃ-২৬১ দ্রষ্টব্য।

—ঃঃ—

ষষ্ঠ অধ্যায়

পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাপ্ত ছড়ার বিষয়বৈচিত্র্য ও গঠনশৈলী বিচার।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় 'পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাপ্ত ছড়ার বিষয়বৈচিত্র্য ও গঠনশৈলী বিচার।' এই আলোচনার দুটি দিক, এক বিষয়বৈচিত্র্য এবং দুই গঠনশৈলী বিচার। এই অধ্যায়ের মূল বিষয়টিকে একটি রেখাচিত্রের মাধ্যমে নিম্নরূপভাবে দেখানো যেতে পারে। যথা ঃ

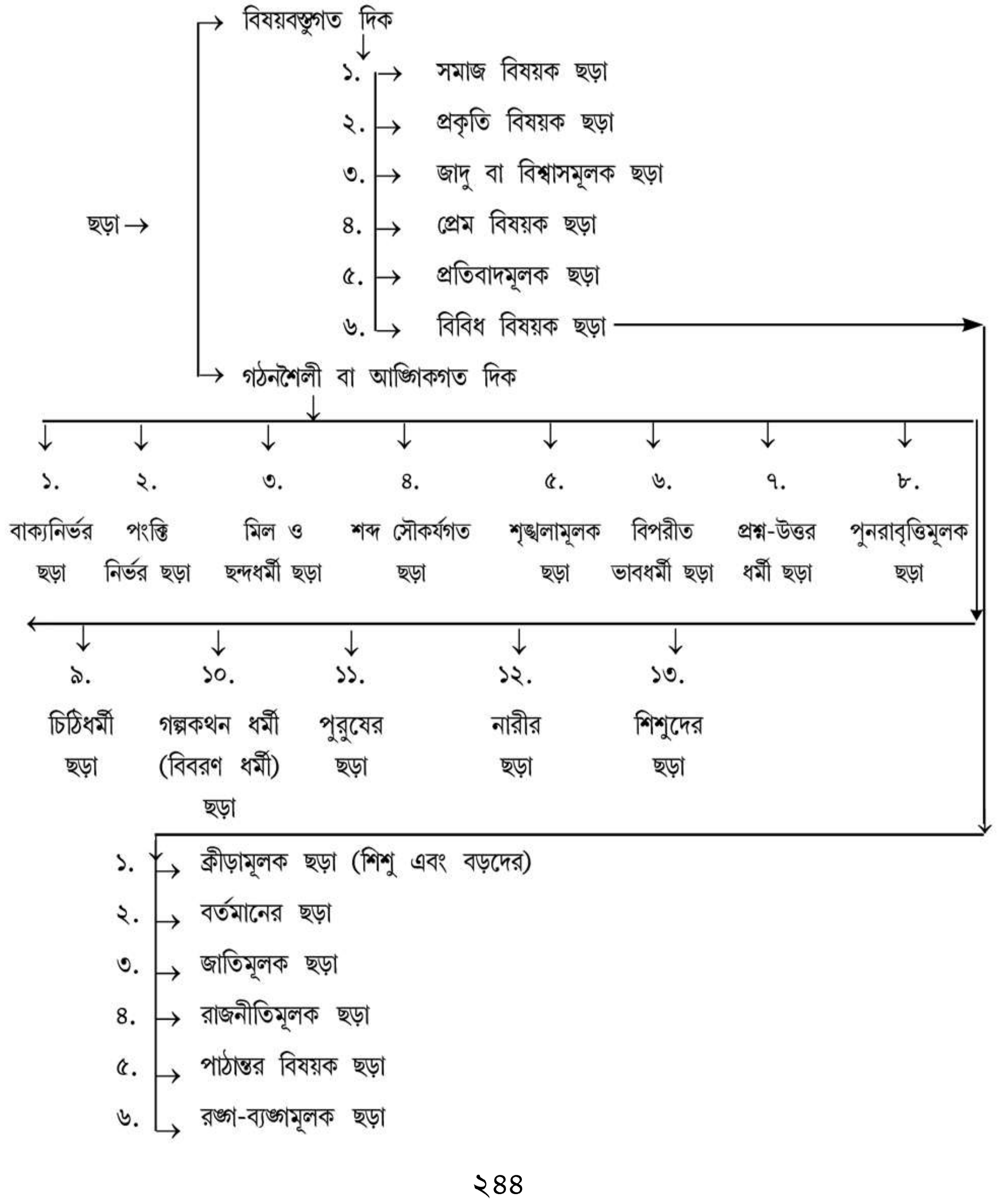

ছড়ার উপরোক্ত বিষয়ভিত্তিক আলোচনার পূর্বে যাঁর কথা না বললেই নয়, তিনি আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলা ছড়াকে তিনি-ই প্রথম মাতৃজঠর থেকে উন্মোচন করে লোকচক্ষুর সম্মুখবর্তী করেন। কয়েকজন পাশ্চাত্য মিশনারীদের [১] কথা স্মরণে রেখেও বলি, ছড়া আলোচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ-ই প্রথম [২] পথ প্রদর্শক। শুধু পথ প্রদর্শক নন, ছড়ার মধ্যে যে হৃদয়গ্রাহী বিষয়টি আছে, তিনি তাকে রসানুভূতির দৃষ্টি দিয়ে ব্যাখ্যা করে অত্যন্ত মনোগ্রাহী করে তুলেছেন। যেহেতু তাঁর পূর্বে এই বিষয় নিয়ে তেমন কোনো দৃষ্টান্ত ছিল না, তাই তিনি কোনোরূপ দৃষ্টান্ত ছাড়াই ছড়াগুলির যে কাব্যরস সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, তাই ছিল তাঁর কাছে বেশি আদরের বিষয়। ছড়াগুলি সংগ্রহের উদ্দেশ্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'ছেলে ভুলানো ছড়া [৩] ঃ ২' -এর ভূমিকায় বলেছেন —

"শুধুমাত্র এই রসের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই আমি বাংলাদেশের ছড়া সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। রুচিভেদবশত সে রস সকলের প্রীতকর না হইতে পারে, কিন্তু এই ছড়াগুলি স্থায়ীভাবে সংগ্রহ করিয়া রাখা কর্তব্য সে বিষয়ে বোধ করি কাহারো মতান্তর হইতে পারে না। ... এই ছড়ার মধ্যে আমাদের মাতৃমাতামহীগণের স্নেহসংগীতস্বর জড়িত হইয়া আছে, এই ছড়ার ছন্দে আমাদের পিতৃপিতামহগণের শৈশব নৃত্যের নূপুরনিক্কন ঝংকৃত হইতেছে। অথচ, আজকাল এই ছড়াগুলি লোকে ক্রমশই বিস্মৃত হইয়া যাইতেছে। ... অতএব জাতীয় পুরাতন সম্পত্তি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে।" [৪]

এই উপকূলীয় অঞ্চলের ছড়াগুলি সংগ্রহের উদ্দেশ্যও তাই। আমি আমার এই উপকূলীয় অঞ্চলের ছড়াগুলি বিগত ২০০৯ সাল থেকে সংগ্রহ করে আসছি। এ বিষয়ে গ্রামের বয়স্ক মানুষজন, পরিচিত-অপরিচিত ব্যক্তিগণ, মাষ্টারমশাই - অধ্যাপক, আমার প্রিয় ছাত্রীবৃন্দ, আত্মীয় পরিজন সকলেই বহুল পরিমানে সহায়তা করেছেন, আজও করছেন। এমনও অনেক সময় হয়েছে, বহু পরিস্থিতিতে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু যখন গ্রামের ভোলেভালা, সহজ সরল মানুষদেরকে বোঝাতে পেরেছি আমার গবেষণার বিষয়টি সম্পর্কে, তখন-ই তাঁরা স্বতস্ফূর্তভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। দীর্ঘদিনের প্রয়াসের ফলশ্রুতি আমার এই গবেষণার ছড়াগুলি। তাই আশা রাখি এই সংগৃহীত 'জাতীয় সম্পত্তি' [৫] গুলি আমার গবেষণাকে এক অখণ্ড রূপদান করবে।

ক্ষেত্র-সমীক্ষায় প্রাপ্ত ছড়াগুলির বিষয়ভিত্তিক আলোচনা এই গবেষণার মুখ্যদিক। নিম্নে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা নিম্নরূপভাবে করা হল ঃ

১। সমাজবিষয়ক ছড়া ঃ

সাহিত্য সমাজের দর্পণ। সমাজের নানা বিষয় নানা ঘটনা চিত্রিত হয় সাহিত্যে। ছড়া-সাহিত্য তার অন্যতম। লোকসাহিত্যের অন্যতম বিভাগ এই ছড়াসাহিত্যে, সমাজের প্রায় প্রতিটি চরিত্র কোনো না কোনোভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সমাজ মানুষের ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, জটিলতা-কুটিলতা, স্বপ্ন ও জীবনের নানা সমস্যা, আশা-নিরাশা ব্যক্ত হয়েছে সমাজের এইসব ছড়ায়। তাই ছড়াগুলিকে জানার সঙ্গে সঙ্গে অতীত ও বর্তমানের নানাচিত্র আমরা খুঁজে পাবো। খুঁজে পাবো বাঙালির নানান উৎসব-অনুষ্ঠান, সংস্কার-বিশ্বাস ও অভাব-অভিযোগের জীবন্ত দলিল।

সমাজে এখন একান্নবর্তী পরিবারের খুব অভাব। জীবিকার সন্ধানে মানুষ ঘরের কোন্ ছেড়ে কার্যক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে যৌথ পরিবারগুলি টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। এই নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিতে দাদা-দিদিমা, ঠাকুরদা-ঠাকুরমা নেই বললে চলে। পূর্বে এঁরাই তো শিশুকে কোলে নিয়ে ঘুম পাড়াতো, চান করাতো, ভাত খাওয়াতো, দোলায় দোলাতো, কিন্তু আজ দাদু-ঠাকুমাগণ হয় নিঃসঙ্গ জীবন কাটাচ্ছে, নয়তো বৃদ্ধাশ্রমে ঠাঁই নিয়েছে। অথচ একদিন এই দাদু-ঠাকুমার সাহচর্য-ই শিশুদের কল্পনাকাঠিকে নিয়ে যেতো সাত-সমুদ্দুর তেরো নদীর পারে, যেখানে সোনার পালঙ্কে রূপকথার রাজকন্যার অধিষ্ঠান। তাই ঠাকুরমা-দিদিমার আদর-শিশুর শৈশবের মনিমুক্তা, যা খুব কম শিশুদের কপালে এখন জোটে। এই ঠাকুমা যিনি শুধু ঠাকুমা নন, সংসারের কর্তী, অভিভাবকও, যার নিয়ন্ত্রণে সংসার, কিন্তু আজ সেই ঠাকুমা নেই বলে সংসারের শিশুরা নিয়ম-শৃঙ্খলহীন জীবন কাটাছে, শিবের গাজন গাইছে, ডুগডুগিও বাজাচ্ছে। এই শাসনহীন শৈশবের 'মোহমন্ত্র' একটি ছড়ায় পাই —

আমরা দুটি ভাই শিবের গাজন গাই
ঠকুমা গেছে গয়াকাশী ডুগডুগি বাজাই [৬]

একান্নবর্তী পরিবার জীবনের চিত্র উপরোক্ত ছড়াটিতে ব্যক্ত হয়েছে। পরিবারেরর চেয়ে আরো বৃহত্তর ক্ষেত্র সমাজ। এই সমাজ কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষ থেকে শুরু করে শিল্প সংস্কৃতি মনস্ক মানুষদের সহায়তায়। এই সকল মানুষের সার্বিক ক্রিয়াকলাপে আমাদের ছড়ার সমাজচিত্রের কায়া গঠিত।

সবচেয়ে আগে আমরা নারীদের কথা বলতে পারি। কেননা, নারীকে কেন্দ্র করে পরিবার গড়ে ওঠে। নারীরাই কখনও জননী, কখনও জায়া, কখনও কন্যা হিসেবে আমাদের জীবনকে পরিচালিত করছে।

মেয়েদের বিবাহিত জীবনের অনেকটা অংশ জুড়ে থাকে শাশুড়ীমাতা। শাশুড়ী-বধূর তিক্ত সম্পর্ক আমাদের ঘরোয়া জীবনের চিত্র মনে করিয়ে দেয়। যেখানে কোথাও কোথাও শাশুড়ী হয় অত্যাচারিত, আবার কোথাও বা বধূ-ই হয় শাশুড়ীর চিরশত্রু। ছড়ায় তার ব্যতিক্রম ঘটেনি—

শাউড়ীর পালা
কি বউড়ীর পালা [৭] (সংগ্রাহক আরতি মান্না মাইতি, স্থান-মধুসূদনচক)

আসলে যখন যার সুযোগ আসে, সেই হয় অত্যাচারী। তাই একে অপরকে বলে —

ঘর জ্বালালি,
পর ভুলানি। [৮] (সংগ্রাহক ঐ)

ছড়ায় আবার কখনও শুনি —

থিলে ঘুটে কুড়ানি
হইচেন্ রাজরানী। [৯] (সংগ্রাহক ঐ)

কথায় বলে হঠাৎ 'হাতে স্বর্গ পাওয়া' অর্থাৎ অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে 'ধরাকে সরা জ্ঞান' করে; তেমনি যে ছিল ঘুটে কুড়ানি, হঠাৎ সে যদি রাজরাণী হয়, তাহলে সে হয়ে ওঠে দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য অহম্ সর্বস্ব এক নারী। আলোচ্য ছড়াটিতে সেই কথাই ব্যক্ত হয়েছে।

ছড়া যে শুধু শাশুড়ী-বউমার সম্পর্কের কথা বলে তা নয়, ছড়া ননদ-বৌদির ও কথা ব্যক্ত করে। তবে ননদ- বৌদির সম্পর্কে তিক্ততা থাকলেও মধুরতা কম নেই। ছড়ায় বলতে শুনি —

দব কহথিল এ ঢাকশাড়ী
দবা ভয়রে তুম্ভে যাউছ
ছাড়িগো ননদী মোর
খরা বেলে তুম্ভব দিশুচি মুহ
পান খাই পিক পকাই
অছ গো ননদী মোর। [১০] (সংগ্রাহক মিংকু সৎপতি, স্থান-রামনগর)

ননদ-বৌদির এমন মধুর সম্পর্ক সমাজজীবনের এক মূল্যবান দৃষ্টান্ত। ঢাকাই শাড়ী খুবই বিখ্যাত ও জনপ্রিয় ঘরানার এক শাড়ী। এই ঢাকাই শাড়ী দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ননদী তার ভ্রাতৃবধূকে। পান খেয়ে ননদী 'পিক' ফেলে যে চিহ্ন রেখে গেছে, তার স্মৃতি আজও ভ্রাতৃবধূটিকে বিমর্ষ করে তোলে, কিন্তু ননদী আর ফিরে আসেনি। আসলে বাস্তবিক-ই আমরা ননদ-বৌদির মত-ই তিক্ত সম্পর্ক সমাজে যতই খুঁজে বেড়াই না কেন, এই অনাত্মীয় দু'টি মেয়ের সম্পর্ক যে কতখানি অন্তরের তা পরম ঈশ্বর-ই জানেন। সাধারণত উভয়ের বয়স সমান হয়ে থাকে, ফলে এদের মধ্যে এক টক-ঝাল সম্পর্ক গড়ে উঠলেও, বাস্তবিক সবক্ষেত্রে তা যে সঠিক নয়, আলোচ্য ছড়াটিতে তার-ই প্রতিচ্ছবি সুস্পষ্ট।

বউ করবু ঝাঁপড়ি
ঘর করবে হাঁপড়ি [১১]

ছড়াটিতে সমাজ শিক্ষা ব্যক্ত হয়েছে। কি ধরনের বউ সংসারের জন্য ভালো। বউ যদি বিলাসবতী না হয়ে গৃহনিপুণা, সাদামাটা হয়, তাহলে সে বউ ভালো। আর ঘর ও করবে বেশ মনোযোগ দিয়ে। অন্য একটি ছড়ায় ব্যক্ত —

কাজ করবু কসি
ভাগ লুবু বেসি [১২]

সংসারে তো দেনাপাওনা থাকে। তবে সেই দেনা-পাওনা পাওয়ার বেশি বেশি প্রত্যাশা যদি থেকেও থাকে তবে তাকে কাজও করতে হবে বেশি করে। এই দেনা-পাওনার হিসেব বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকদের অন্দরেই সীমাবদ্ধ থাকে, তা বাড়ির কর্তার কান পর্যন্ত আসে না, ছড়ায় সেকথাও ব্যক্ত হয়েছে এভাবে—

শাশু বউর লাগছে ঠেকা
বুড়ো শশুরের নাইকো দেখা [১৩]

সংসারে ঝগড়া-ঝাটি অমঙ্গালের লক্ষণ সূচিত করে। এই ক্ষণিক অমঙ্গাল চিন্তা থাকলেও মঙ্গাল চিন্তায় সবকিছু মানিয়ে আবার মিষ্টি-মধুর সম্পর্কে জড়িয়ে যায় মন। একটি ছড়ায় সেকথাই ব্যক্ত হয়েছে দেখা যায়—

বুড়ি কয় বুড়া শুঁয়ে
ধান কুটে বউ আপন মনে [১৪]

পূর্বোক্ত ছড়ার তিনজনের মধ্যে যে দুইজন সম্পত্তির আশায় তর্কে যেভাবে লিপ্ত ছিল, এখানে সেই তিনজন-ই সুখী সংসারের স্বপ্ন বুনছে। ব্যাপারটি সত্যিই চমৎকার। এই ছড়াটি আমাদের অতীত স্মৃতিকে জাগরিত করে। এবং সুখী দাম্পত্যের চিত্ররূপ এখানে ফুটে উঠেছে। ছড়া বলছে, সুখী পরিবারের সুনাম সর্বদা ধরে রাখা খুব কঠিন ব্যাপার। তাই পিতার সময়ে যা যা হয় তার পরবর্তী প্রজন্মের সঙ্গে তা তা নাও হতে পারে। অনেকেই ছেলের কুকীর্তির কথা জেনে শুনে চুপ করে থাকে পারিবারিক সম্মানের কথা ভেবে। সমাজের লোকের এইরকম একটি মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে নিম্নোক্ত ছড়ায় —

সাত রাজার ধন মানিক তোর
তুই মরলে কইবে চোর। [১৫]

ছড়ায় সমাজের কোনোকিছু আটকায় না। লৌকিক মন যা যা দেখে তাই-ই ছড়ার ভাষায় ব্যক্ত করে।

তাছাড়া নারীজীবনের অজস্র চিত্রপট পাবো ছড়ায়। মেয়েরা সাধারণত অন্দরে থাকে। পুরুষের মতো বহির্জগতে তারা যাতায়াত করে না। অজ্ঞাতপূর্বকালে এই ছড়াগুলি যে সময়ে রচিত তখন সমাজ ছিল পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে। শিক্ষা-দীক্ষা, কথা বলার অধিকার, সমাজ পরিবেশে সমস্ত দিক দিয়ে নারী ছিল কোনঠাসা। কেবল রান্নাঘর থেকে শয়নকক্ষ এই ছিল নারীর জগৎ। ঘরোয়া জীবনে কোনঠাসা হতে হতে তাদের মুখের ভাষাও হয়ে উঠেছিল রুক্ষ, শুষ্ক, কঠিন, অমার্জিত, অশ্লীল। কখনও কখনও নিজেদের মধ্যে রঙ্গ-রসিকতা, ঠাট্টা-মজলিসে তারা তাদের মত এক পৃথক জগৎ খুঁজে নিয়েছিল, যে জগতে পুরুষের কোনো প্রবেশাধিকার ছিল না। নারীদের এই 'Dialect' গুলির তারাই ছিল ধারক এবং বাহক। আর সেই ভাষা গুলির মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে, তাদের চাওয়া-পাওয়া-না পাওয়ার গল্প, তাদের কামনা-বাসনা-সুখ-দুঃখের অনুভূতি, তাদের ভালো লাগা, মন্দ লাগার ইতিকথা, সমাজের এ এক অনালোচিত অধ্যায় —

কাঞ্চন্ কাঞ্চন্ দুদের সর্
কাঞ্চন্ গেল(অ) পরের্ ঘর্
পরের্ বেটা মারল(অ) চড়্
কাঞ্চন্ আইল(অ) বাপের্ দর্ [১৬]

যৌবনাবতী মেয়েরা চায় স্বামী-শ্বশুর ভরা সুখের এক সাজানো সংসার। এই সুখ-স্বপ্ন নিয়ে তারা বসে বিয়ের পিড়িতে, ভাবী জীবনের নানা রঙীন আশা বুকে নিয়ে। তারপর জীবন নিরাশার অন্ধকারে ডুবে যায়, যখন তার জীবনে আসে চরম সেই দিন যেদিন 'পরের বেটা মারল চড়', — জীবনের সব স্বপ্ন সেদিন তাসের ঘরের মতো টুকরো টুকরো হয়ে এক নিমেষে ভেঙে যায়। ফিরে আসে নিরাপদ আশ্রয়ে, কেননা মেয়েদের শেষ আশা-ভরসার স্থল 'বাপের দর' [১৭] তাই কাঞ্চন সেখানেই ফিরে আসে। ছড়া আমাদের সমাজের এরকম বহু নির্যাতিতা, বিতাড়িতা কাঞ্চনদের কথা এভাবেই ব্যক্ত করে। কেননা, ছড়া সমাজের এই নির্মম পরিনতির প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

ছড়া সমাজের বন্ধুত্বের কথা বলে। এই সমাজে যথার্থ বন্ধু পাওয়া খুব মুশকিল। বন্ধুত্বের হাত অনেকেই বাড়ায়, কিন্তু দাম দেয় ক'জন? বন্ধুত্বের নামে শত্রুতাই করে —

বন্ধু বন্ধু কইলাড়ি
উল্‌টিয়া ধার দিয়া পঁন্দ্‌ মারি [১৮] (সংগ্রাহক, নিকুঞ্জ বেরা, লাক্ষী)

চাণক্য শ্লোকে আছে 'মধু তিষ্ঠতি জিহ্বাগ্রে অন্তরে তু হলাহলম্‌'। অর্থাৎ মুখে মধু অন্তরে বিষ। তাই এমন বন্ধুর প্রয়োজন নেই। ছড়া আমাদের সমাজ-শিক্ষকের ভূমিকায় সেইকথাই ব্যক্ত করেছে।

ছড়ায় বলছে যে, অধিক বন্ধুত্ব ভালো নয়। বন্ধু হোক্‌ বা কুটুম্ব যাইহোক্‌ না কেন, তার জন্য সংসারের অপব্যয় হয়, সেজন্যে আত্মীয় আসে আসুক্‌ তবে থাকলে বড় বিপদ। অভাবের সংসারে আত্মীয় যত দূরে থাকে ততই মঙ্গল। ছড়ায় তাই শুনি —

আইস(অ) বন্ধু বুসঅ খাটে
পা ধুই আইস(অ) পুকুর ঘাটে
ভাত খাবত(অ) ধান শুকেটে
ঘর যাবত(অ) টুই দিসেটে [১৯] (সংগ্রাহক, ঐ)

বন্ধু এলে তাকে অভ্যর্থনাস্বরূপ বসতে বলতে হয়। তাই বলা হয়েছে, এসো বন্ধু বসো খাটে, পা ধুয়ে এসো পুকুরের ঘাটে। আর যদি ঘর যাবে তো যেতে পারো, কেননা বাড়ির 'টুই' [২০] অর্থাৎ চাল দেখা যাচ্ছে, ভাত খাবে তো ধান শুকানো চলছে। অর্থাৎ রান্নার জন্য চাল এখনো প্রস্তুত হয়নি। তাই কোনোরূপ ভনিতা না করে পক্ষান্তরে সরাসরি বাড়ি চলে যাওয়ার কথাই বলা হয়েছে ছড়াটির শেষ পংক্তিতে।

বাস্তব বড় কঠিন, 'Give and take Policy'-র যুগে কিছু দিলে তবে না মানুষ কিছু দেয়। ছড়ার লোকমানস তা লক্ষ্য করেছে। এবং ছড়াতে সে কথা বর্ণনা করেছে, —

এটা দিনে ওটা দেয়
নাইলে কুন গুলাম্টা দেয়।[২১] (সংগ্রাহক, ঐ)

আজকের মানুষ, মানুষের জন্য এমনি এমনি কিছু করে না। যদি তুমি দাও তো বিনিময়ে কিছু পাবে। তাই মানসিক বন্ধন দিন দিন যেভাবে আল্গা হচ্ছে, শিথিল হচ্ছে সমাজ থেকে, সমাজ বিষয়ক ছড়াগুলি যেন; আমাদের সেইদিকটির প্রতি ইংগিত করছে—

কাই করিয়ার কে
দুটা আমড়া ভাতে দে[২২] (সংগ্রাহক, ঐ)

অর্থাৎ সম্পর্কের মধ্যে যদি সুদৃঢ় বন্ধন থাকে তবে তা, রক্ষার জন্য অনেক বেশি আন্তরিক হতে হয়, আর তা যদি কোনরকমের নামমাত্র সম্পর্ক হয়, তবে তার জন্য ব্যবস্থাও সেরূপ হয়, শুধু 'আমড়া ভাতে'ই যথেষ্ট।

সমাজমূলক ছড়ার আলোচনায় এই অঞ্চলে প্রাপ্ত ছড়াগুলি আমাদের এই অঞ্চলের লোকজীবন, তাদের মনন, চিন্তনকে বুঝতে সহায়তা করে। তাই লৌকিক আচার - ব্যবহার ও রুচি-নীতির কথা প্রাপ্ত ছড়ায় ব্যক্ত হয়েছে —

আশা দিল ভরসা দিল
জমি দিবে রুইয়া
আষাঢ় মাস হইতে
ঘরে রইল শুইয়া[২৩] (সংগ্রাহক, ঐ)

এই উপকূলীয় অঞ্চলের প্রায় সব মানুষ-ই কৃষিজীবি। আমার ক্ষেত্রসমীক্ষার অধ্যায়ে তা আলোচিত হয়েছে। প্রত্যেক মানুষ যে, যে উপায়েই আয় উপার্জন করুক না কেন মূল জীবিকা তাদের কৃষিকাজ করা। ধান হল অন্যতম একটি কৃষিজ ফসল, যার উপর প্রত্যেকেই নির্ভরশীল। এই ধান চাষে বহুলোক প্রয়োজন হয়। চাষিরা আগে থেকেই চাষবাসের লোকজন ঠিক করে রাখে। যাতে সময়মতো চাষের ক্ষেত্রে কোনোরূপ না ত্রুটি হয়। এইরূপ আশা-ভরসায় চাষী নিশ্চিন্তে থাকে। কিন্তু আষাঢ় মাস হতে দেখা গেল যে, চাষের সময় (আমন চাষ) কাজের লোকটি ঘরে শুয়ে পড়ে আছে। এখানে 'রোয়া' শব্দ থেকে ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তন হয়ে রুয়া

এসেছে, তার থেকে লৌকিক কথ্য ভাষায় আবার 'রুইয়া' শব্দটি এসেছে। যাতে 'ই' স্বরধ্বনির আগম ঘটেছে। যাইহোক্ এই 'রুইয়া' অর্থাৎ রোপন করার কথা বলা হয়েছে। আর এই ছড়াটিতে সমাজের উক্ত লোকমানসিকতার দিকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

ছড়া আবার একথাও জানায়, মানুষজন ততক্ষণ-ই তোমার পাশে থাকবে, যতক্ষণ তার তোমাকে প্রয়োজন হবে। যথা —

পেট করেছি ভারি
কুন শালার ধারি। [২৪]

অর্থাৎ 'কাজের বেলায় কাজি, কাজ ফুরালে পাজি' -এই প্রবাদ বাক্যটি স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে আর কারও দেখা মিলে না।

ছড়া আরো বলছে —

মেয়েরা কুড়িতেই বুড়ি

আবার কখনো বলছে —

ছেলেরা তিরিশে ফিনিস

মেয়েদের সকল সৌন্দর্য নাকি বয়স কুড়ি পেরোলেই নষ্ট হয়ে যায়। তেমনি ছেলেদেরও তিরিশ পেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু 'ফিনিস' হয়ে যায়, ছড়া অন্তত তাই বলে।

উপকূলীয় অঞ্চলের লোকেদের মুখে মুখে চর্চিত কিছু ছড়া শোনা যায়, যথা —

ঘরে নাই নুন / ব্যাটা আমার মিঠুন
ঘরে নাই চিনি / মেয়ে হইচে মন্দাকিনি [২৫]

এই ছড়াগুলি খুবই আধুনিক সময়ের। তবে ছড়াগুলিতে যে সমাজ দার্শনিকতার ছায়াপাত ঘটেছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। বর্তমানের ছেলে-মেয়েদের যে Life Style তাই দেখে বয়স্ক পাড়া-প্রতিবেশী এই ধরনের ছড়ার জন্ম দিয়েছে। সমাজ মানুষ আরো বলে —

লয় কিঁয়া ছয় বিকে
ব্যাটা আমার ব্যাবসা শিকে [২৬] (সংগ্রাহক, সুভাষ মাইতি, এগরা)

ছড়া আমাদের গাণিতিক, লাভ-ক্ষতির হিসাব দেয়। কিসে কত আয় আর কিসে কত ব্যয় তা ছড়া জানায়। উপরের ছড়াটিতে অভিভাবকের কটুক্তি প্রকাশ পেয়েছে। 'লয়' অর্থাৎ

নয় টাকায় (৯/-) কিনে 'ছয়' অর্থাৎ ছয় (৬/-) টাকায় বিক্রি করলে, তাতে ব্যবসা টিকে না, এই মর্মকথাটি ছড়ায় ব্যক্ত হয়েছে। তাই শ্লেষাত্মক ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে 'ব্যাটা আমার ব্যবসা শিখে'। এখানে ধ্বনিতাত্বিকগত কিছু পরিবর্তনও লক্ষ্য করা যায়, নয় > লয়, কেনা হয়েছে কিনা > কিয়া > কিঁয়া। এই রকম আরোও ছড়া হল —

নয় ছয় ভাগ্যে হয় (সংগ্রাহক, ঐ)

কিংবা —

লয়ায় ল পঁ
পুন্যায় ছ পঁ (সংগ্রাহক, ঐ)

প্রথম ছড়ায় বলা হয়েছে ভাগ্য তখনই খোলে যদি নয় বা ছয়ের কোনো একটি সংখ্যা জোটে। আবার দ্বিতীয় ছড়ায় বলা হয়েছে যে, কোনো জিনিস ক্রয় করলে তার প্রথম প্রথম গুরুত্ব বা মর্যাদা অনেক বেশি দেওয়া হয়, যা পুরোনোর বেলায় দেওয়া হয় না। 'ল' অর্থাৎ নয় (৯) 'পঁ', (এক পন = ৮০)। অর্থাৎ নতুন জিনিসের মূল্য হল ৯ x ৮০ = ৭২০ সংখ্যার সমতুল্য। সেখানে পুরোনো ঐ একই জিনিসের দাম ৬ x ৮০ = ৪৮০ -এর সমতুল্য। যাইহোক্ এই ছড়ার মধ্য দিয়ে সমাজ শিক্ষকরা ছেলেমেয়েদের সংখ্যাবাচক জ্ঞান বৃদ্ধি করতেও শেখায়।

ছড়া শুধু উপরোক্ত বিভিন্ন সামাজিক শিক্ষা দেয় না, সেই সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার নানা অনুষঙ্গের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটায়। উপকূলীয় দক্ষিণবঙ্গে বৎসরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সময়ে বিশেষ করে শীতকালে অনেক যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হয়। এই সমস্ত যাত্রাপালা যেমন খোলা প্যান্ডেলে হয়, তেমনি টিকিট কেটে পেশাদারী রঙ্গামঞ্চেও অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামীণ মানুষ সারাদিনের কাজের শেষে ক্লান্তি দূর করতে বহু দূর দূরান্ত থেকে যাত্রাপালা কিংবা সিনেমা জগতের ব্যক্তিত্ব যুক্ত এমন যাত্রাপালা দেখতে ছুটে যায়। এই যে যাত্রা দেখতে যাওয়ার আয়োজন তা বড়-ই বিচিত্র সুখের এবং আনন্দপূর্ণ। আমি নিজে বহুবার ছোটবেলায় গিয়েছি। এই আয়োজন প্রায় ১০ দিন পূর্বে টিকিট কেনা দিয়ে শুরু হয়। তারপর আসে যাত্রাপালা হওয়ার দিন। সন্ধ্যায় যাত্রার আসরে বসে যাত্রা শুরু হওয়ার পূর্বের প্রায় দু-ঘন্টা কীভাবে কাটবে, তার প্রস্তুতি পর্ব চলে দুপুর থেকে। ঘুগনি, ছোলাসিদ্ধ, আলু ভাজা, মটর সিদ্ধ, বিভিন্ন ধরনের তেলেভাজা, মুড়ি, যারা পানাসক্ত তারা নেবে গোটা কুড়ি পান, বিড়ি, সিগারেট, দেশলাই, টর্চলাইট, তাস, লুডো, চাদর, শোয়েটার, এমনকি কীভাবে যাওয়া হবে তার জন্য চাই রিক্সা, যার ছোট শিশু আছে, তার প্রয়োজনীয় সামগ্রী এই প্রকার বিবিধ

বন্দোবস্তের সমভিব্যাহারে শুরু হয় প্রায় ৩টে থেকে যাত্রাপালার উদ্দেশ্যে রওনা। আর অনুষ্ঠান রঙ্গমঞ্চের চতুর্পার্শ্বে শুরু হয় মাইকে ক্যানভাসিং নানা ছন্দ, ছড়ার সমাহার। যে যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হবে তার নামকরণের সঙ্গে মিলিয়ে নানা ধরনের ছড়া হঠাৎ হঠাৎ রচিত হয়। যাত্রার টিকিট মূল্য মাত্র ২৫ টাকা। তাতে আছে নানা লটারি। হয়তো আপনার ভাগ্যে জুটে যেতে পারে মারুতি, মটর সাইকেল, ঘড়ি, টিভি, টর্চ ইত্যাদি ইত্যাদি। এখানে সেই রকম কতগুলি যাত্রাপালার বিজ্ঞাপনের ছড়া উল্লেখ করা হল। যথা —

মনটা করে কুরুকুরু
চওড়া কপাল শুরু ভুরু
কার ভাগ্যে কি আছে গুরু
পঁচিশ টাকায় জীবন শুরু [২৭] (সংগ্রাহক, শশধর সামন্ত, স্থান-খেজুরী)

ঘোষকগণ যাত্রার বিজ্ঞাপন এইভাবে দেয়, যাতে করে যাত্রাপালা অনেকবেশী আকর্ষণীয় এবং জনমনোরঞ্জনপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। যাত্রাপালার নাম 'স্বামী হল আসামী'। এই যাত্রার বিজ্ঞাপনে যে ছড়াটি বলা হল —

সুখের সংসার ভেঙে গেল
বিলাসিতা হল দামী
স্ত্রীকে সুখে রাক্‌তে গিয়ে
স্বামী হল আসামী [২৮] (সংগ্রাহক, ঐ) (যাত্রা-স্বামী হল আসামী)

এইরকম বহু ছড়া সমাজের যাত্রাপ্রেমী মানুষজন শুনছে এবং রচিতও হচ্ছে। নিম্নে আরো কয়েকটি যাত্রার এই রকম ছড়া উল্লেখ করা গেল —

নিমাই সন্ন্যাসী হল
কাঁদে শচীর হিয়া
চারিদিকে শূন্য দ্যাখে
ওগো বিষ্ণু প্রিয়া। [২৯] (সংগ্রাহক, ঐ)
(যাত্রা - ওগো বিষ্ণুপ্রিয়া)

তোমার ঠিকানা যাইহোক্ না

আমার দক্ষিণবঙ্গা

বাঁশগড়ার বাজারে হবে

ঠিকানা পশ্চিমবঙ্গা।[৩০] (সংগ্রাহক, ঐ)

(যাত্রা - ঠিকানা পশ্চিমবঙ্গা)

যাত্রাপালার সাথে সাথে ছড়া সমাজ সংসারের অন্দরমহলের খবর এনে দেয়। স্ত্রীকে শুধু শ্বশুর, শাশুড়ীর কথা শুনতে হয় না, স্বামীর ভয়েও থাকতে হয়। অভাবের সংসারে স্ত্রী যদি বেশি খায় তো, গুরুজনেরা নানা কথা বলে, বিশেষ করে স্বামী, তাই খাওয়ার ব্যাপারে গোপনীয়তা অবলম্বন করে চলতে হয় —

তিনবার তিনকাঁড়ি

ভাতারকে দেখিয়া এ্যককাঁড়ি।[৩১]

'ভাতার' [৩২] অর্থাৎ স্বামীকে ফাঁকি দিয়ে তিনবার খেলেও স্বামীর দর্শনে একবার খায়। ছড়ায় পাই —

জয়ের পরে খরা হয়

তার বড়(অ) চিড়্‌চিড়ানি

বউড়ী হইয়া সাউড়ী হয়

তার বড় ফড়্‌ফড়ানি [৩৩]

বৃষ্টির পর রৌদ্রের যেমন খুব তেজ, তীব্রতা, তেমন বউ হয়ে যদি নিজেকে শাশুড়ী বলে মনে করে, তবে তারও খুব কর্তৃত্ব হয়, ছড়ায় এমনটাই ব্যক্ত হয়েছে।

সমাজে বিসদৃশ কিছু হলে ছড়ায় তার প্রকাশ ঘটে। সমাজ হল সবচেয়ে বড় সমালোচক। তাই নিয়মের বাইরে কিছু ঘটলে সমাজ পর্যবেক্ষক ছড়ার মাধ্যমে আমাদের জানায়। যথা —

তু ননদ কইবু যেতে

তো ননদ কইব তেতে [৩৪]

অর্থাৎ 'তুমি ননদ হয়ে যদি কিছু বল তো তোমারও ননদ তোমাকে সেভাবেই বলবে।' কিংবা —

সেই ঘৈতা করলু

বইস গড়িগড়ি [৩৫]

অর্থাৎ সেই বিবাহ হল, কিন্তু যথাসময়ে হল না। যদি বা হল তাতে ও শান্তি নেই। শ্বশুর বাড়ির সকলে নানা গালমন্দ, অপবাদ দেয়, ছড়া আমাদের সেকথাও জানায় —

ঢামে ঢোল ভিত্‌রে পোল
বাপের ঘরে শাঁখা শাড়ী
স্বামীর ঘরে বোল [৩৬]

মেয়েদের বিবাহের পরে কিংবা পূর্বে একমাত্র নির্ভরযোগ্য স্থান হল তার বাপের বাড়ি। স্বামীর ঘর হল কেবল লাঞ্ছনা গঞ্জনার জায়গা। উপরের ছড়াটি সমাজের এই মর্মান্তিক চিত্রের দৃষ্টান্ত।

শিশুরা সমাজের এক বড় অংশ অধিকার করে আছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সংসার অনেক বেশি সুন্দর, প্রাণবন্ত, ঝর্‌ঝরে হয়ে ওঠে শিশুর কোমল মূর্তির আবির্ভাবে। তাই সমাজ জীবনের আলোচনায় তাদের কথা একেবারে বাদ দিতে পারি না। তারা ছাড়া আমাদের জীবনের সব আলোচনাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সেই শিশুদের মুখেও ছড়া শোনা যায় —

এ্যকপায়ে জুতা
খাঁড়া হারে কুত্তা
খাঁড়া দরকে যাবনি
কুত্তা ভাজা খাবনি

তাই তাই তাই
মামাবাড়ি যাই
মামাদরে ভারি মজা
কিল্‌চড়্ নাই [৩৭]

উপকূলীয় অঞ্চলের বহুমানুষ এখনও দরিদ্রসীমার নীচে বসবাস করে। দুবেলার আহার কখনও জোটে আবার কখনও নাও জুটতে পারে। গ্রামীণ মানুষ সেভাবেই তাদের জীবনকে ভাবতে ভালোবাসে। কেননা দুঃখ-সুখ নিয়েই তাদের বাস্তব জীবন। যেদিন যা জোটে তাতেই তারা সন্তুষ্ট। এ নিয়ে বিলাসিতা বা ভাগ্যকে দোষও দেয় না। ছড়ায় তার চিত্র প্রতিফলিত —

আহারে ভালোমন্দ নাই
যেদিন যাহা মিলই
সানন্দে আহার্ করই [৩৮]

অপর একটি ছড়ায় পাই —

> বেলা হল(অ) তা গাছে
> চোখের জয়ে শাগ্ভাজে [৩৯]

বেলা 'তা গাছে' অর্থাৎ মাথার উপর সূর্য। বেলা তাই দুপুর। এখানে গ্রাম্য লোকজীবনে বৈজ্ঞানিক সুলভ দৃষ্টিভংগীরও প্রকাশ ঘটেছে। অথচ শাকভাজা আর ভাত খাওয়ার জন্য একফোঁটা তেলও জোটেনি। তাই চোখের জলে শাক্ভাজার কথা বলা হয়েছে।

ছড়ায় বলে —

> আছে গরু না বয় হাল
> তার দুক্খ চিরকাল [৪০]

উপকূলীয় এই অঞ্চল যে কৃষিপ্রধান একথা পূর্বেও বলেছি। চাষযোগ্য জমি লাঙ্গল করে বীজরোপন হয়। এই আবাদ সম্ভব হয় গরুর দ্বারা হাল করে, কিন্তু গরু থেকে ও যদি হাল না বয়, এমন ঘটনা সত্যিই চাষীর জীবনে দুঃখজনক ছাড়া আর কিছু নয়, ছড়ায় সেই কথাই ব্যক্ত হয়েছে।

ছড়া গার্হস্থ জীবনের দলিল। সমাজের খুঁটিনাটি তত্ত্ব ছড়ার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়। এই রকম উপকূলীয় অঞ্চলের একটি ছড়া হল —

> পোর লত্রায় পৌতি খায়
> বাঞ্জা ম্যায়া চায়া যায় [৪১]

ছড়াটিতে নারীজীবনের অন্ধকারময় দিকটির প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে। নারী জীবনের সার্থকতা তার মাতৃত্বে। 'পৌতি' শব্দটি এসেছে — 'পোয়াতি' থেকে যার অর্থ গর্ভধারিনী, আর 'বাঞ্জা' অর্থাৎ যার সন্তান জন্মায়নি। সমাজে তাই যিনি পোয়াতি তার খুব সমাদর, কেননা তিনি সন্তান সম্ভবা, আর যিনি 'বাঞ্জা' তাঁকে কেউ সম্মান করে না। অন্য ব্যাপারে তো পরের কথা, কেবল খাওয়াদাওয়ার ক্ষেত্রেই এই বৈষম্য, যা ছড়া আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। ছড়া আরো আমাদের চোখে দেখিয়ে দেয় বর্তমানের বৃদ্ধ পিতামাতার কি করুন অবস্থা। ছড়ায় বলছে —

> মার কথা চেঁদিয়া কথা
> বউর কথা সদ্ [৪২]

ব্যাতিক্রমকে বাদ দিয়ে বলতে পারি যে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পুরুষরা বিশ্বাস করে মা যা বলে ভিত্তিহীন, অবিশ্বাস্য কথা, স্ত্রী যা বলে সব কথাই ঠিক বলে, একথা ছড়া বলছে। সমাজের এইটাই রীতি, যার খেয়ে দেয়ে বড় হয়, একদিন তাকেই মানুষ বেমালুম ভুলে যায়—

কিংবা —

জঁতায় ন দেলু তুঁড়ে
মইনে দেলু মুঁড়ে [৪৩]

ছড়াটিতে বর্তমানের সমাজচিত্র প্রতিফলিত। বেঁচে থাকতে থাকতে কেউ কারোর মূল্য দেয় না। কিন্তু মৃত্যুর পর মহা সমারোহে নানা আয়োজন করে। রবীন্দ্রনাথের 'দেনাপাওনা' [৪৪] গল্পের নিরুপমার মৃত্যুর কথা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। জীবনে বেঁচে থাকতে থাকতে প্রাপ্য মর্যাদাটুকু আমরা মানুষকে দিই না কেবল লোক দেখানোর জন্য আয়োজন করি, এখানে ঠিক সেকথাই লোক-মানসের গোচর হয়েছে, এবং তাই ছড়ায়ও তা ব্যক্ত হয়েছে।

ছড়া আরও জানায়—

যাকে দেখ্‌বুনি হাটেবাটে
তাকে দেখ্‌বু গেড়িয়াঘাটে [৪৫]

'গেড়িয়াঘাট' [৪৬] অর্থাৎ পুকুরঘাট। ছড়া বলছে যে, কোনো বাড়ির বউকে যদি এমনিতে না দেখা যায়, তবে তাকে অবশ্যই গেড়িয়াঘাটে দেখা যাবে। কেননা, মেয়েরা পুকুরের ঘাটে তাদের সারাদিনের কাজকর্ম সব করে। তাই একথা বলা হয়েছে।

ছড়া যেন সবজান্তা। ছড়ায় আশ্চর্য বিষয়বস্তু সব উঠে আসে। এমন কোন বিষয় নেই, যা ছড়ায় আলোচিত হয় না। ছড়া বলছে —

জানার কুন(অ) শেষ নাই
মার খাবার কুন(অ) বয়স্‌ নাই [৪৭]

বাস্তবে যা ঘটে ছড়া তাই বলে।

গ্রীষ্মকালে নিদারুণ তাপ প্রবাহে চারিদিক যখন বিষন্ন, ঘর্মাক্ত কলেবর, তখন লোকায়ত মানুষ আবিষ্কার করল তালপাতার শীতল-হাওয়া মধুরতা। সে এসে জুড়িয়ে দিলে মন প্রাণ, ভরিয়ে দিলে খুশি —

তালপাতার তৈরী তুমি
নামটি তোমার পাখা
শীতকালে শত্রুতুমি
গ্রীষ্মকালে সখা। [৪৮]

লোকমানুষ সত্যিই অতি ক্ষুদ্র একটি বস্তুকে নিয়ে কি সুন্দর না ছড়া বলে। যাতে সমাজের নানা ছন্দ ছড়িয়ে পড়ে। বাঙালির ঘরে মেয়ে-জামাই অতি আদরের ধন। তারা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক—

যা না খাবে ঝিয়
তাকে জামির পাতে দিয়। [৪৯]

সমাজের এ যেন অলিখিত নিয়ম। মেয়ে-জামাই-এর বন্ধন অবিচ্ছেদ্য বন্ধন। তাই ছড়ায় ও প্রকাশিত, মেয়ে না খেলে, সেই খাদ্য খাওয়ার দায়িত্ব পড়ে যেন জামাই -এর। কিন্তু বিপরীত চিত্রটি ও ছড়ায় প্রতিফলিত—

এসো জামাই বসো খাটে
গা ধুয়ে আসো গেড়িয়াঘাটে
পিট্ ভাঙ্ব(অ) চ্যালা কাঠে
কাঁদবে শুদু মাঠে ঘাটে [৫০]

জামাই যেমন ভালো হয়, তেমন মন্দ ও হয়। বর্তমানে বধূহত্যা, নারী নির্যাতন, মেয়েদের আত্মহত্যার মতো নানা ঘটনা নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটে চলেছে। মানুষ ভুক্তভোগী। লৌকিক মানুষ কিছু না জানুক মেয়েদের মান-ইজ্জত নিয়ে অসম্মান আচরণের প্রাপ্য আঘাত তারা ফিরিয়ে দিতে জানে। ছড়া আমাদের সেই সংবাদ দেয়। উপরের ছড়ায় হয়তো সেই কথাই ব্যক্ত হয়েছে। ছড়া আরও জানায় যে —

ঝি রইনে জামির আদর
নাইনে জামি গাছের বাঁন্দর [৫১]

আমার এই গবেষণায় এই সব ছড়া পূর্বেও আলোচিত হয়েছে। আসলে এমন কিছু ছড়া আছে যেগুলি হয়তো বারে বারে আলোচিত হয়েছে এই কারণে যে, ঐ ছড়াগুলির বাস্তবিক মূল্য

বহুমাত্রিক। তাদের বিভিন্নভাবে সামাজিক মূল্য রয়েছে। তাই প্রসঙ্গক্রমে বারে বারে উল্লিখিত হয়েছে। এটি সেই রকম একটি ছড়া।

ছড়া শুধু সমাজের নানা কথা, বাড়ির কথা, ভালোমন্দের কথা জানায়, তা নয়, সে আমাদের আত্মীয় স্বজন সম্পর্কিত নানা তথ্য দেয়। যথা —

কাছের কুটুম ছঁচের্ লাতা
দূরের কুটুম ফুলের্ ছাতা [৫২]

অর্থাৎ কাছের যে আত্মীয় তার সেরকম কোনো মর্যাদা নেই অথচ দূরের আত্মীয় ফুলের ছাতার মতোই অতি আদরের। ছড়া জানায়—

দিনে দিনে করিয়া খাইলি মাসে
এক্কা দিনা পৌঁছি গেল জঁ তিরিশে [৫৩]

অভাবের সংসারে প্রত্যেকেই ভাবে কি করে দিন কাটানো যায়। তাই আত্মীয় বাড়িতে থেকে কষ্টের দিনগুলো অতিবাহিত করে প্রায় মাসখানিক ধরে। এদিকে নিজের বাড়িতে একদিনেই প্রায় তিরিশ জন আত্মীয়র আগমন ঘটে। ছড়া আমাদের আটপৌরে জীবনের অন্তপুরের দুঃখ-যন্ত্রণার কথাও অবলীলায় জানিয়ে দেয়। ছড়া আরো জানায় যে —

মা মরল মাউগ বেইল

যউ তিনকে সউ তিন হইল। [৫৪]

অভাবের সংসারে যদি একজন কমে যায়, দুঃখের হলেও বাস্তবিক স্বস্তির কথা। কিন্তু সেই স্বস্তি দীর্ঘস্থায়ী হয় না, কেননা ছড়া আবার খবর দেয় গৃহস্থ নতুন অতিথি (অথাৎ সন্তান জন্ম) লাভ করেছে। ফলে যেই তিনজন ছিল সেই তিন জনই থাকল, অভাবের সংসারে এর চেয়ে দুঃখজনক আর কি-বা হতে পারে। তাই ছড়া বলে —

আয়ু ভাতে ভাত

কুটুম থাকবু কত(অ) থাক্ [৫৫]

আত্মীয়ের জন্য তাই রকমারী ব্যাঞ্জনের পসরা নেই। কেবল আলু সেদ্ধ এবং ভাত রয়েছে। সমাজ-সাতকাহনের সংবাদ এই ছড়ায় ব্যক্ত হয়েছে—

দূরে যত রইবু

আদর তত পাইবু [৫৬]

ছড়ায় জানতে পারি, সমাজের গরীব মানুষের কোনো মান-সম্মান নেই, পাড়া প্রতিবেশী সমাজ তাদের মর্যাদা সেভাবেও দেয় না, তাই ছড়ায় শুনি —

গরীবের মাউগ

সকলের শালা-ভাউজ [৫৭]

অর্থাৎ প্রত্যেকের হাসি-ঠাট্টার পাত্রী।

উপরোক্ত ছড়াগুলিতে আত্মীয়-স্বজন সংক্রান্ত সমাজ জীবনের নানা অনুষঙ্গ ব্যক্ত হয়েছে। সমাজ জীবনমূলক এই উপকূলীয় অঞ্চলের ছড়াগুলি এক কথায় অপূর্ব এবং চমৎকার। যেন জ্যান্ত মানুষের কঠিন বক্তব্য, এখনো কানে বাজে। লোকমুখে বহু ছড়া এখনও এখানে চর্চিত ও আলোচিত হয়। সেই ছড়াগুলির কিছু এখানে আহরণ করে লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি মাত্র। প্রতিটি সমাজজীবনমূলক ছড়া তাদের স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল, জীবন্ত, প্রানবন্ত। সমাজের ভালো-মন্দ, খুঁটিনাটি চিত্র লোকায়ত মানুষের চোখে পড়েছে, আর সেগুলিই ছড়ার আকাশে আমাদের মনপ্রাণ, ভিতর-বাইর, উজাড় করে সকলের চোখের সামনে তুলে ধরেছে। ছড়া যেন নিছক ছড়া নয়, তা যেন জীবন্ত প্রাণের তীব্র কণ্ঠস্বর। যার দ্বারা ব্যক্ত হয়েছে উপকূলীয় অঞ্চলের সমাজ জীবন, সমাজ প্রতিচ্ছবি।

২. প্রকৃতি বিষয়ক ছড়া ঃ

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক অতি নিবিড়। মানুষ পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত হওয়ার পূর্বেই প্রকৃতি তার নানাপ্রকার জীব ও জড়ের সম্ভার সাজিয়ে ছিল। মানুষ এল প্রকৃতির সান্নিধ্যে। প্রকৃতি মানুষকে দিয়েছে বাঁচার আস্তানা, ক্ষুনিবৃত্তির পর্যাপ্ত খাদ্য, পরিধানের বল্কল, সভ্যতার প্রথম সোপান আগুন জ্বালাবার উপকরণ। প্রকৃতির স্নেহশীতল আচ্ছাদনে আদিম মানুষ যে অচ্ছেদ্য বন্ধন রূপলাভ করেছিল, তা হাজার হাজার বছর অতিক্রম করেও আজ সমানভাবে অটুট। এই প্রকৃতির চোখে দেখা আর না দেখা বহুবিচিত্র বিষয় নিয়ে রচিত হচ্ছে বহু চর্চিত ছড়া। প্রকৃতির গাছ-গাছালি, নদী-পাহাড়, পশুপাখি, আকাশ-বাতাস, ইত্যাদি আজ

ছড়ার বিষয়বস্তু রূপে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। উপকূলীয় অঞ্চল তার ব্যতিক্রম নয়। এই সব বিচিত্র পশু-পাখি কখনও কখনও মানুষের মত কথাও বলে। যথা —

খোকা যাবে শ্বশুর বাড়ি
সঙ্গে যাবে কে?
ঘরে আছে হুলো বিড়াল
কোমর বেঁধেছে [৫৮]

চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে
কদম তলায় কে?
হাতি নাচ্‌ছে ঘড়া নাচ্‌ছে
সোনামনির বে। [৫৯]

আয়রে টিয়া আয়
সবুজ জামা গায়
আসতে যাইতে লোলক বাজে
সনার নুপুর পায় [৬০]

আরো একটি পরিচিত ছড়া —

আয়রে আয় টিয়ে
নয়া ভরা দিয়ে
না নিয়ে গেল বোয়াল মাছে
তা দেখে দেখে ভোঁদর নাচে
ওরে ভোঁদর ফিরে চা
খোকার নাচন দেখে যা [৬১]

এই ছড়াগুলি আমরা ছোট থেকে শুনে আসছি। ভাষার একটু রকম ফের হলেও প্রত্যেকের কাছে এগুলি অতি পরিচিত। খোকা, বেড়াল, নদী, মাছ, ছিপ, কোলাব্যাঙ, চিল,

ইত্যাদি বিষয়গুলি ছড়ার রাজ্যে নিজেদের স্থান করে নিয়েছে। উপকূলীয় অঞ্চলে সংগৃহীত একটি ছড়া হল —

ডুব ডুব ডুব নদীতে
বিড়াল কাঁদে গাদিতে
ও বিড়াল তোর ভাগ্য ভালো
পৃথিবীটা উল্টে গেল
আপেল শক্ত
বেদানা রক্ত
মিষ্টির রস
খায় ঢক্‌ঢক্‌। [৬২]

এখানেও প্রকৃতি জগতের বিচিত্র সমন্বয়। উপকূলীয় অঞ্চলের ছেলে-মেয়েরা খেলার সময় এই ছড়াটি বলে, এরকম আরো একটি ছড়া পাই —

একতলা দুতলা তিনতলা
পুলিশ যাবে নিমতলা
পুলিশের হাতে লম্বালাঠি
ভয় করবে না কংগ্রেস পাটি
কংগ্রেস পাটি বারটা
ডিম পেড়েছে তেরটা
একটা ডিম নষ্ট
চড়াই পাখির কষ্ট। [৬৩]

এই অঞ্চলের মানুষ অন্য পেশায় নিযুক্ত থাকলেও মূলতঃ কৃষিজীবি। চাষ-আবাদ করে দিন কাটায়। তারপরেও বহুমানুষ আছে যারা মাঠে-ঘাটে, বিলে-পুকুরে প্রান্তরের শাক্‌সব্জি তুলে তাদের নিত্যদিনের ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। বিশেষ করে গ্রামীণ জীবনে পুকুরপাড়ে নানা ধরনের শাক হয় যথা — শুষনি, গিমা, হিংচা, কল্‌মী, থাল্‌কুনি ইত্যাদি ইত্যাদি। শুধু শুষনি শাক্‌ খেয়েই বেঁচে থাকে অনেকে। যাইহোক্‌ ছড়ার দৃষ্টিতে তা বাদ পড়েনি। তাই ছড়ায় পাই —

শুষনি শাগ্‌ বলেরে ভাই
আমার চারমাথা

ঘুম ঘুম পায়রে ভাই
খাইলে আমার পাতা [৬৪]

বৎসরের অন্যান্য সময়ে দেখা গেলেও গ্রীষ্মকালে এই শাক প্রচুর হয়। ভিজে, স্যাঁতস্যাঁতে জলা জায়গায় এই শাক তুলতে দলে দলে মেয়েরা চলে যায়। এই শাকের চারটি পাতা, সাধারণত ভাজা করে খেতে হয়, এবং খেলে শরীরে প্রচুর ঘুম আসে। অনেক সময় নিদ্রাহীন ব্যক্তিকে এই শাকটি খেতে বলে। এই অঞ্চলে জুন-জুলাই মাসে বর্ষার প্রারম্ভে পাট চাষ হয়। পাট পাতা ও লোকে শাক হিসেবে খায়। ছড়ায় তাই বলা হয়েছে —

চিরকাল গেল ঝোটপাতা খাইয়া
বুড়া শিবকে সেলাম করে চিৎপিটিয়া শুইয়া [৬৫]

এই অঞ্চলে গিমাশাক্ [৬৬] বলে একধরনের শাক প্রচুর হয়। এই শাক চাষ করতে হয় না, আপনা-আপনি মাটিতে হয়। দেখতে পাতাগুলি ছোট ছোট, স্বাদে তেতো। সাধারনত মরা মাছের সাথে এই শাক্ যুক্ত হলে খেতে বেশ উপাদেয় লাগে। তাই ছড়ার জগতে এই শাক্ ও জায়গা করে নিয়েছে —

গিমা শাগ্ বলেরে ভাই
আমি বড় তিতা
আমাকে যে ভাঙ্‌তে আইস্‌বে
মরা মাছের গুতা [৬৭]

মরা মাছের সঙ্গে একমাত্র গিমাশাক্ সুস্বাদু হয়ে ওঠে বলে ছড়া আমাদের জানায়। আরো একধরনের শাক্ এই অঞ্চলে পাওয়া যায়, ছড়ায় শুনি —

কাজ নাই মোর গিরিয়া [৬৮] শাগে
নু দিনে মোর কেমন লাগে [৬৯]

গিরিয়া শাক্ নিজেই লবণযুক্ত। তাই তাতে লবন দিয়ে রান্না করলে আর খাওয়া যায় না। আসলে উপকূলীয় অঞ্চল হওয়ার দরুণ নোনা আবহাওয়া এবং সমুদ্র, নদী এলাকা বলে হয়তো এমনটাই হয়েছে।

আরও একটি ছড়া হল —

লাতুন [৭০] লাতুন লাতু লো
শাগ্ তুইতে যাই লো
শাগে আছে বাওয়া পকা
তোর দাদু খাই লো [৭১]

বাঙালি মাছ ভাতের পিয়াসী। মাছের জোগাড়টুকু করতে পারলেই তাদের জীবনে আর কোনো সমস্যাই থাকে না, মনে ভাবে এটাই সুখের জীবন। তাই ছড়ায় পাই —

মাচ্ ধরবু খাবু সুখে
পাট্ পড়বু মরবু দুখে [৭২]

মাছ তো খেতে ভালো লাগে, তার আগে মাছ ধরতে গেলে জানতে হবে মাছ কোথায় থাকে, ছড়ায় পাই —

খালা দেখ্‌বু যেঠি
মাচ ধর্‌বু সেঠি [৭৩]

অর্থাৎ যেখানে 'খালা', (গর্ত) গভীর সেখানেই জল থাকে, তাই সেখানে বেশি মাছও থাকে।

মাছের মতো গাছ গাছালিও ছড়ার বিষয় হয়ে উঠেছে —

বাঁশ ভাবছে ঝাড়ে
কত্‌বা উঠ্‌ব ঘাড়ে [৭৪]

বাঁশের এই কল্পনা ছড়া ব্যক্ত করেছে, তাতে বাঁশের উপর সজীব সত্তা আরোপিত হয়েছে।

মাছের মত আমাদের প্রকৃতি জগতে আছে নানা প্রকারের পাখি। তাই লৌকিক জন পাখি দিয়ে ও নানা ছড়া রচনা করেছে। এমনিতে কথায় কথায় মেয়েরা বলে, —

জোড়া শালিক ভালো
বিজোড় শালিক দেখ(অ) যদি
দিনটা হবে কালো [৭৫]

জোড়া শালিক দেখা দিনটি ভালো যাওয়ার লক্ষণ সূচিত করে। কিন্তু যদি বিজোড় হয় তখন-ই মনে সন্দেহ কাজ করে, কোনো না কোনোভাবে দিনটাতে বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। ছড়া আরো বলে —

তেতু গাছে বাঁসা
বউ ভাঙ্‌ল কাঁসা
সে বউ কাই
জ আঁইতে যাইছে
সে জ কাই
সাপ ছুঁয়া দিছে
সে সাপ কাই
বঁয়ে ঢুকিছে
সে বঁ কাই
ধবা কাটিয়া লিছে
সে ধবা কাই
কাপড় কাচ্‌তে যাইছে
সে কাপড় কাই
রাজা পরিলিছে
সে রাজা কাই
পাখি মারতে যাইছে
সে পাখি কাই
গগনে ফুরুত্ [৭৬]

পাখি নিয়ে আরো একটি ছড়া সংগৃহীত হয়েছে —

টুনটুনি পাখি
নাচত(অ) দেখি
না বাবা নাচ্‌ব(অ) না
পড়ে গেলে বাঁচব(অ) না

পড়েছি বেশ করেছি
তোর কি ক্ষতি করেছি [৭৭]

পাখিদের নিশ্চিন্ত বাসা কেমন হওয়া উচিৎ, তা ছড়ায় দেখা যায় —

বড়(অ) বড়(অ) গাচ্ দেখিয়া পাখি করে বাসা
বড় বড় ঘর্ দেখিয়া দুঃখী করে আশা

বড় বড় ঘর দেখে দুঃখীরা আশা করে, তেমনি বড় বড় গাছ দেখে পাখিরা ও ভরসা পায় নিশ্চিন্ত নীড়ের। তারা সেই সব গাছে বাসা বাঁধে। পাখিরা নিরাপদ বাসা বাঁধলে কি হবে বর্ষাকালে বর্ষা এসে সব একাকার করে দেয় —

বানের জ এসে
সব গেল ভেসে

চারিদিক জলমগ্ন। শুধু জল হয় না। বর্ষাকালে জলের সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের ও দাপট থাকে। তাই ছড়ায় শুনি —

ঝড় হটে
তা গাচ্ লড়েঠে
তা গাছের গড়া কাটিয়া দেই
তা গুড়ি লিয়া যাই [৭৮]

এমন জল-ঝড় যে তালগাছ পর্যন্ত ঝড়ে দুলছে। আর তাতে নদী ও অশান্ত হয়ে উঠেছে। যাতে বর্ষা প্রকৃতির চিত্র সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। যা দেখে বিরহী হিয়া মনে করছে তার স্বামীর কথা —

নদীর জ কল্ কল্ করে
সোয়ামীরে মনে পড়ে

মানুষ প্রকৃতির দাস। তাই প্রকৃতির পথ নির্দেশে আমাদের চলতে হয়। ঝড়-বৃষ্টি-রৌদ্রে আমাদের পরিত্রাণ নেই। মানুষ সচেতন থাকে নিরাপদে থাকার জন্য। ভাঙা ঘরকে আগে থেকেই মজবুত করে। কিন্তু ছড়ায় দেখছি তার উল্টোটাই ঘটেছে—

ঝড়ুয়া ব্যায়া ঘর্ছায়
খরা ব্যায়া ঘুমি যায়

অর্থাৎ রৌদ্রের সময়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থেকে ঝড়ের সময় ঘর ছাইতে এসেছে, তা কি হয়? উত্তরে - হয় না। আমরা জানি, অনেক সময় অপ্রিয় সত্য কথা অনেকের পছন্দ হয় না। তাই ছড়া বলে —

পরের মেড়া পর্ খাবে
আমার কইনে কি হবে

অর্থাৎ পরের ব্যাপারে নাক না গলানোই ভালো। তাতে অনেক সময় অসম্মানিতও হতে হয়।

উপরোক্ত ছড়াগুলি ছাড়াও কিছু ছড়া এই অঞ্চলে প্রচলিত আছে সেগুলিকে আপাতভাবে মনে হতে পারে প্রবাদ, কিন্তু এইখানকার মানুষজন তাকে ছড়া বলে চর্চা করে। যথা —

সাত্ গাইর রস
এ্যাক বুড়া হালিয়ার চাষ

ছড়াটিতে আপাতভাবে প্রবাদের লক্ষণ থাকলেও এদের গঠনে ছড়ার আদল রয়েছে। তাই ছড়াটি আমার সংগ্রহে স্থান পেয়েছে। এই রকম আরো ছড়া হল —

চোর্ পড়্শি বব্রা ভাই
ছাঁদা ঘটি দুষ্ট গাই
ঘরে উড়স্ ছেলে মূর্খ
এই ছয়টি বড়ই দুঃখ। [৭৯]

প্রবাদের মতো ছড়াও কখনও কখনও আমাদের শিক্ষা দেয়, কি ভালো আর কি মন্দ। সমাজে বাঁচতে গেলে চাই ব্যবহারিক জীবনের জ্ঞান। মানুষ যেহেতু সামাজিক, তাই সমাজ শিক্ষার জ্ঞানগুলিকে ছড়ায় ব্যক্ত করেছে, ছড়া আমাদের জানায় —

কানা বক্ শুক্না গেড়িয়া
থাউ্ নাই থাউ্ আছে পড়িয়া [৮০]

উপরোক্ত এই আলোচনায় প্রকৃতিক হাতি, ঘোড়া, শিয়াল, বক, পায়রা, কুমীর, ভেড়া, ব্যাঙ, পাখি, মাছ, ইত্যাদি বিষয়গুলি ছড়ায় স্থান করে নিয়েছে। আমাদের চারপাশের চোখে দেখা জগতের প্রায় সবরকম বিষয় নিয়ে ছড়ার ভাণ্ডার। যেহেতু ছড়া সমাজজীবন ও প্রকৃতির বিষয়কে অন্তর্ভূক্ত করেছে, তাই ছড়ার বিষয় বৈচিত্র্যেরও ব্যপ্তি ঘটেছে।

এইভাবে একাধিক ছড়া প্রকৃতির বিষয়কে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে, আজও এই অঞ্চলের মানুষের মুখে মুখে তা শোনা যায়। প্রকৃতি ও জগৎ জীবন ছড়ার বিষয়কে প্রসারতা দান করেছে। আমাদের চারপাশে চেনা জগতের ছবি ছড়ায় ব্যক্ত হয়েছে, আর যা উপকূলীয় অঞ্চলে আজও সমানভাবে রয়েছে।

৩। জাদুমূলক ছড়া বা অতিপ্রাকৃত বিষয়ক ছড়া ঃ

মানুষ হয়ে ওঠার ইতিহাস বিস্তৃত। এই বিস্তৃত ইতিহাস জুড়ে আছে সংস্কৃতির নিরবচ্ছিন্ন ধারা। এই সংস্কৃতি হলো লোকসংস্কৃতি। লোকসংস্কৃতির এই ধারায় অন্যান্য উপধারায় মতো ছড়াও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য একটি ধারা। ছড়া যেহেতু আদিতম ধারা তাই এতে প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত উপাদান পর্যাপ্ত রয়েছে। তারমধ্যে জাদুবিদ্যা অন্যতম।

“ইংরাজি 'Magic' শব্দটি ফার্সী 'Magi' শব্দ থেকে উদ্ভূত। মাজিদের বিভিন্ন গোপন ক্রিয়াকর্ম গ্রীকদের নিকট ম্যাজিক বলে পরিচিত ছিল। বাংলায় 'Magic' কথাটির প্রতিশব্দ হিসেবে জাদুবিদ্যাকে গ্রহণ করা হয়েছে।” [৮১] আদিম মানুষ কতকগুলি পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে প্রকৃতির মধ্যে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা বা অলৌকিক ঘটনাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে গেছে এবং মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এটুকু বুঝতে পেরেছিল যে, পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনাবলীর মধ্যে এক অদৃশ শক্তির প্রভাব আছে। এই অদৃশ্যশক্তিকেই আমরা বলি জাদুশক্তি। জাদুশক্তির দ্বারা প্রাকৃত জগতে অনেক অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হয়ে ওঠে।

নৃতাত্ত্বিকদের মতে, জাদু বিশ্বাস সমগ্র বিশ্বের লোকায়ত মানুষের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ই.বি. টাইলর (E. B. Tylor) - এর মতে “আদিম মানুষের মনে বিভিন্নভাবে আত্মা বিষয়ক উপলব্ধি জন্মে। আত্মায় বিশ্বাস বা অ্যানিমিজমই হল আদিম ধর্মবিশ্বাসের প্রথম কথা।” [৮২] (Animism) অ্যানিমিজমকে পরিভাষায় বলে জীববাদ বা আত্মাবাদ, আবার কেউ কেউ সর্বাত্মাবাদ বা জীবাত্মাবাদ ও বলেন। লেখকের মতে জানতে পারি, —

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দু’ধরণের আত্মা রয়েছে, — ১। মুক্ত আত্মা (Free Soul) এবং ২। দেহগত আত্মা (Body Soul)। মুক্ত আত্মা যখন তখন দেহ থেকে বের হয় এবং পুনরায় দেহে ফিরে আসে, অর্থাৎ মানুষের ঘুম; ঘুমালে আত্মা বের হয়ে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেরায়, যাকে আমরা স্বপ্ন দেখা বলি। আবার ফিরে এলে ঘুম ভেঙে যায়। আর দেহগত আত্মা একবার ত্যাগ করলে মানুষ মারা যায়। যেহেতু আত্মা অবিনশ্বর তাই মানুষের মৃত্যুর পর আত্মা ভূত

প্রেতে পরিণত হয়। এই বিশ্বাস মানুষের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মৃত্যুর পর আত্মা তার আবাসভূমির পাশাপাশি ঘোরে এবং নানা অসামাজিক কাজ-কর্ম ঘটায়।

এই Animism -এর সঙ্গে জাদুর সম্পর্ক সুদৃঢ়। বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী এবং দার্শনিক স্যার জেমস্ জর্জ ফ্রেজার (Sir James Gorge Frazer) জাদু বিদ্যাকে দুটি নীতির উপর দাঁড় করিয়েছেন। "প্রথমটির নাম সদৃশ বিধান (Law of Similarity) এবং দ্বিতীয়টি সংক্রমণ বিধান (Law of Contact or Contagion)। যার উপর ভিত্তি করে জাদুবিদ্যাকে দুটি প্রধানভাগে ভাগ করা যায় —

১। সদৃশ জাদুবিদ্যা (Imitative অথবা Homeopathic Magic)

২। সংক্রামক জাদুবিদ্যা (Contagious Magic)।"[৮৩]

১. সদৃশ জাদুবিদ্যার উদাহরণ আমরা স্ত্রী-সমাজের নানারকম কাজকর্মে লক্ষ্য করতে পারি, যথা — বসুধারা ব্রত, শিশুদের নকল মেঘ সাজিয়ে বৃষ্টি আনার খেলা, কৃষিক্ষেত্রে নকল মানুষের দেহ রচনা করা, কুশপুত্তলিকা দাহ করা ইত্যাদি।

২. সংক্রামক জাদুবিদ্যা — স্ত্রী সমাজের নানা কাজকর্ম, যথা — মাথার চুল ফেলতে গিয়ে থু থু দিয়ে ফেলা, ভাবী নববধূর গায়ে হলুদ দেওয়া শাড়ী, আফ্রিকার কোনো কোনো মানুষের বিশ্বাস যে তাদের চুল বা নখ থেকে তাদের ক্ষতি হতে পারে, তাই তারা মাটিতে চাপা দিয়ে দেয়। নববধূর শাড়ীর প্রান্তে গিঁট দেওয়া, রাত্রে চুল না খোলা, শিশু সন্তান-সন্ততীর মায়ের রাত্রে জামাকাপড় বাইরে না থাকা ইত্যাদি ইত্যাদি। বর্তমানে এই ধরনের বিশ্বাস মূলক বিভিন্ন ছড়া ও পাওয়া যায়।

উপরোক্ত দুই প্রকার ছাড়া আরো দুই প্রকার জাদু আছে যথা —

১। হিতকারী জাদুবিদ্যা (White Magic)

২। অহিতকারী জাদুবিদ্যা (Black Magic)

১। হিতকারী বলতে বোঝায় যা আমাদের উপকার করে। যথা — পরিধেয় বস্ত্রকে কুপ্রভাব থেকে মুক্ত রাখা, মাদুলী, কবজ, নানারকম গাছ-গাছালি কিংবা প্রাণীদের হাড় দিয়ে অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করা। শিশুরা জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মা শিশুর কপালে, পায়ের নীচে, মাথায় কালো রঙের বড় টিপ পরিয়ে দেয়। যাতে কোনো প্রকার অশুভ দৃষ্টি শিশুটির উপর

পড়ে শিশুর না ক্ষতি করে। সদ্য বিবাহিতা কন্যার শাড়ীতে হলুদ বা সিঁন্দুর লাগিয়ে দেওয়া হয়, যাতে অশুভ শক্তির কুপ্রভাব না পড়ে। কিংবা সদ্যবিবাহিতা নারীর শাড়ি যদি বাইরে থাকে তাতে একটি কাপড়ের প্রান্তে গিঁট দেওয়া হয়, যাতে সব কুপ্রভাব এড়িয়ে যাওয়া যায়। মেয়েরা মাথার চুল ফেলতে গিয়ে থুথু দিয়ে ফেলে দেয়। যাতে করে জাদুর প্রভাবে চুলে না কুদৃষ্টি পড়ে। ২। অহিতকারী জাদু হল যা আমাদের অনিষ্ট করে, যথা — পানকে মন্ত্রপুত করে খাওয়ানো, গরুর দুধ বন্ধ করা, বাঁ মেরে কলাগাছের ফল না হতে দেওয়া, পিঠে তৈরী করলে দরকাঁচা করে দেওয়া ইত্যাদি করে মানুষের ও প্রাণীদের অনিষ্ট করা।

যাইহোক্ এইভাবে জাদুমন্ত্র প্রয়োগ করে বিভিন্ন শক্তি ও কাজকে প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রিত করা যায়। ফলে এগুলির সমবায়ে তৈরী হয়েছে নানা জাদুমূলক ছড়া। এই অঞ্চলের বহুমানুষ আজও এই সংস্কারে বিশ্বাস করে এবং বহু জাদুমূলক ছড়াও রচনা করছে, তারাই এর উদ্ভাবনকারী। এখন উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাপ্ত জাদুমূলক ছড়াগুলিকে কয়েকটি শ্রেণিতে বিভাজন করে নিম্নে আলোচনা করা হল।

১। প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণের ছড়া।
২। অতি-প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণের ছড়া।
৩। মনুষ্যেতর প্রাণীকে নিয়ন্ত্রণের ছড়া।
৪। মানুষের মন্দপ্রয়াসকে নিয়ন্ত্রণের ছড়া।
৫। বাত-বেদনা নিয়ন্ত্রণের ছড়া।
৬। অভিশাপ মূলক ছড়া।
৭। আশীর্বাদমূলক ছড়া।

১। প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রনের ছড়া ঃ

গ্রীষ্মকালে অসহ্য দাবদাহে যখন থাকা যায় না, তখন বৃষ্টি আনার জন্য এখনও এই অঞ্চলের শিশুরা পুকুরে নেমে এক নকল বৃষ্টি বৃষ্টি খেলে। যার দ্বারা বৃষ্টিকে আহ্বান করে। প্রথমে শিশু দুই হাতে কাদা মেখে মাথার উপরে হাত তুলে কালো মেঘের আভাস দেয়, যেন আকাশে মেঘ করেছে, তারপর হাতগুলি ক্রমশ নিচের দিকে নেমে এসে জল স্পর্শ করবে, অর্থাৎ বৃষ্টি হওয়ার পূর্ব লক্ষণ সূচিত করবে, তারপর প্রত্যেকে একফোঁটা, দুই ফোঁটা করে জল তুলে

ছুঁড়তে ছুঁড়তে হঠাৎ প্রচুর বেগে বৃষ্টি পড়বে এবং সকলের মুখে তখন একটি ছড়া আবৃত হবে—

আয় বিষ্টি ঝেঁপে
ধান দুব মেপে
ধান হবে কাঁড়ি কাঁড়ি
আয় বিষ্টি আমার বাড়ি [৮৪]

প্রবল বেগে এইভাবে নকল নকল বৃষ্টির খেলা খেলা হয়। একে বলে বৃষ্টি আনার ছড়া। বৃষ্টির সঙ্গো ফসলের যোগ ঘনিষ্ঠ। বৃষ্টি বেশি হলে ধানও বেশি বেশি হবে। একথা লোকায়ত সমাজ বিশ্বাস করে। এই রকম ছড়া পাই আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলার লোকসাহিত্য' [৮৫] গ্রন্থের ৬৪৪ পাতায় —

"আয় বিষ্টি ঝেঁপে
ধান দেব মেপে" [৮৬]

বৃষ্টি নিবারণ মূলক ভট্টাচার্য মহাশয়ের সংগ্রহ করা ছড়াটি হল —

"লেবুর পাতা করমচা
ওরে বৃষ্টি থেমে যা
কচুর পাতে হলদী
এই মেঘটা জলদী।" [৮৭]

উপকূলীয় অঞ্চলের লোকেরা বলে —

লেবুর পাতায় করম্‌চা
যা বিষ্টি থামিয়া যা। [৮৮]

অর্থাৎ অধিক বৃষ্টি আবার ফসলের পক্ষে ক্ষতিকর। তাই জাদুবিশ্বাস যে, এই ছড়ার দ্বারা বৃষ্টিকে নিবারণ ও করা যাবে। বৃষ্টি যেমন পড়ে, আবার বন্ধ হয়, তেমনি অনেক সময় এমন বৃষ্টি পড়ে যে রৌদ্রও হয় তার সঙ্গো। অর্থাৎ জলের সঙ্গো রৌদ্রও হয়। তাই এই ঘটনাকে নিয়ে এই অঞ্চলে একটি ছড়া প্রচলিত রয়েছে, ছড়াটি হল—

রোদ হটে জ হটে
শিয়াকুত্তার ব্যায়া হটে। [৮৯]

যা প্রায় অসম্ভব ঘটনা, তাও প্রকৃতিতে দর্শন করে লোকায়ত মানুষ ছড়া রচনা করেছে।

অনেক সময় ছোট্ট ছোট্ট শিশুরা পড়তে বসে ও জাদু শক্তিকে কাজে লাগায়। স্লেট পরিষ্কার করে জলে ধুয়ে ফেলে যাতে লেখাটা পরিষ্কার দেখায়। কিন্তু জল তো তাড়াতাড়ি শুষ্ক হয় না, তখন তাড়াতাড়ি শুষ্ক করার জন্য তারা একটি জাদুমূলক ছড়া বলে —

জয়ের পকা জকে যা
আমার সিলেট শুকি যা [৯০]

শিশুদের মধ্যে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল যে, যে এই ছড়াটি বলবে, তার স্লেট আগে শুকিয়ে যাবে।

নদীমাতৃক উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষ অন্য কিছু খাক্, আর নাই খাক্, মাছ ভাত রোজকার তালিকায় রেখেছে। খাল, বিল, পুকুর, নদী সর্বত্রই মাছের ছড়াছড়ি কিন্তু সবসময় জলে নেমে মাছ ধরা হয়ে ওঠে না। তাই ছিপ [৯১] দিয়ে ও মাছ ধরা হয়, যাকে এই অঞ্চলের লোকজন 'বঁড়শি' [৯২] বলে। এই 'বঁড়শি' দিয়ে দিন দু'বেলা মাছের জোগাড় গ্রামের মানুষ মোটামুটি করে নেয়; তবে মাছ তো ধরা চাই, তার জন্য একটি জাদুমূলক ছড়া ঐ সময় বলা হয় —

থু থু থু
আমার বঁড়্শির মাচ্
অক্ষুনি পড়বু [৯৩]

'বঁড়শি' তে মাছের যে খাদ্য কাঁটায় গেঁথে দেওয়া হয়, তাকে বলে 'আধার'। [৯৪] ঐ আধারের লোভে মাছ ছুটে আসে, আর ঐ আধারেই থুথু দিয়ে জাদু করে দেওয়া হয়, যাতে মাছ অবশ্যই পড়ে। সিদ্দিকী মহাশয় ও মাছ ধরবার একটি জাদুমূলক ছড়া উল্লেখ করেছেন তাঁর 'লোকসাহিত্য' [৯৫] গ্রন্থের ১ম খণ্ডে—

'থুর্ থুর্ বিন্দাবুড়ী,
মাছ্ ধর্ব কুড়ি কুড়ি।
যেখানে মাছের ঘর।
সেখানে গিয়া বন্শী পড়।
আমার নাম বান্যা।
মাচ তুলবো ট্যান্যা।'[৯৬]

২। অতিপ্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণের ছড়া ঃ

ভূতকে ভয় কার না হয়। বিশেষ করে দিন দেবের ঢলে পড়ার সঙ্গো সঙ্গো সকল অশরীরী শক্তি যেন নিঃশব্দ পদচারণা করে যায়। এই অশরীরী ছায়া আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকেই যেন শিহরিত করে। বাঁশজঙ্গল এই এলাকায় যথেষ্ট রয়েছে। কথায় আছে, 'যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়' - এই প্রবাদ বাক্যের মতো বাঁশবাড়ির কাছে যেন রাতের পেত্নীর সহাবস্থান। তাই সন্ধ্যাবেলায় বাঁশবাড়ির পথে যেতে যেতে খোকাখুকি ভূত তাড়ানোর ছড়া কাটে—

ভূত আমার পুত
পেত্নী আমার ঝি
বুকে আছে রামলক্ষন
ভয়টা আমার কি? [৯৭]

এই ছড়াটির একটি পাঠান্তর নির্মলেন্দু ভৌমিক মহাশয়ের 'বাঙলা ছড়ার ভূমিকা' [৯৮] গ্রন্থে রয়েছে—

'ভূত আমার পুত, শাকনী আমার ঝি
মাছ পোড়া দিয়ে ভাত খেয়েছি, করবি আমার কি?'[৯৯]

ভূত তাড়ানোর আরো একটি ছড়া হল —

আমি হই ব্যায়া ম্যানা
মন্ত্র তন্ত্র আছে জানা
ভূত পেত শাকচুন্নী
বাক্স ভিত্‌রে কর্‌ব বন্দী [১০০]

৩. মনুষ্যেতর প্রাণীকে নিয়ন্ত্রণের ছড়া ঃ

শুধু প্রাকৃত বা অতিপ্রাকৃত শক্তি নয়, মনুষ্যেতর প্রাণীকেও জাদুমূলক ছড়া বলে লোকায়ত মানুষ নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন সাপে কাটাকে নিয়ন্ত্রণের ছড়া, বাঘ-হাতীকে নিয়ন্ত্রণের ছড়া ইত্যাদি। গ্রাম বাংলায় সবচেয়ে বড় বিপদ বাড়ে সাপে কামড়ালে। গ্রামাঞ্চলের মানুষ বেশির ভাগ কৃষিজীবী ও মৎসজীবী। এই সব ক্ষেতখামারের মানুষ এবং মাঝি মাল্লারকে বেশির ভাগ

সময়ই জলে, ঝোপে জঙ্গালে, মাঠে-ঘাটে, পানা পুকুরে, বর্ষাবাদলে দিন কাটাতে হয়। আমরা জানি যেখানেই মাছ, যেখানেই সাপ। তাই জল-মাছ-সাপ এরা যেন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কিন্তু এই ভয়ে তো বসে থাকলে চলবে না। বিপদ নিত্যসঙ্গী জেনেও যেতে হয় এবং বিপত্তি ঘটে, তখন লোকায়ত মানুষ গুনীনের কাছে যায়। গুনীন রোগীর দেহের বিষ নামানোর জন্য ছড়া কাটে —

মা মনসা বিষ ঝাড়ে
বিষ যা তুই গোবর বাড়ে।

এইভাবে ওঝা, গুনীনরা জাদুমূলক ছড়া বলে রোগীর দেহ থেকে বিষ তোলার চেষ্টা করে। আরো একটি ছড়া পাই —

বিষ নামিবু ঝট্‌পট্
ব্যায়াকে ডাক্ পট্‌পট্

ছড়াটিতে স্পষ্ট যে, ব্যায়া নামক লোকটি দক্ষ একজন ওঝা এবং ঐ অঞ্চলে বিশেষ সুনামের ও অধিকারী। সাপ কামড়েছে বলে বিষ তোলার জন্য পার্শ্ববর্তী ওঝা (ব্যায়া) কে তাড়াতাড়ি ডাকার কথা বলা হয়েছে, তাহলে মুক্ত হয়ে যাবে। এই প্রসঙ্গো উল্লেখ্য নির্মলেন্দু ভৌমিকের ছড়াটি —

'সাপকাটী রোগীর দেহে কাঁসার থালা বন্ধন;
কংস কংস কংস পড়ি
কংসা চাপড় বিষ মারি।
আছে বিষ তাপে জুড়ে, নাই বিষ আয় বুড়ে
কার আইজ্ঞায়? কংসাসুর বাজার আইজ্ঞায়।'[১০১]

শুধু সাপ নয়। শিয়ালকে দেখলে ও ভয় পায় সবাই। কেননা, শিয়াল ছোট ছোট শিশুদের ধরে খেয়ে নেয়। তাই শিয়ালকে নিয়েও ছড়া পাই —

বেগুন বাড়ির পাশে
ভুঁড় শিয়ালী নাচে
ন্যাংটা টকা দ্যাখতে পাইনে
মুখে লিয়া ছুটে [১০২]

এই ধরনের আশ্‌রাফ সিদ্দিকী মহাশয়ের সংগ্রহ করা ছড়াটি হল —

'আলোয় মায় বাড়া ভানে আলো খায় খুদ
গাছের আগায় মোরগ ডাকে কুক-কুরো-কুক।'[১০৩]

জাদু এখানকার জীবনযাত্রার সঙ্গে গ্রথিত হয়ে গেছে। জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সঙ্গে জাদুবোধ ও সবার অলক্ষ্যে এক স্থান করে নিয়েছে। তাই যেদিকে তাকানো যায়, সেদিকেই যেন জাদু কাজ করছে। এই উপকূলীয় অঞ্চলে কালীপূজোর দিন সন্ধ্যায় প্রতিঘরে, রাস্তার মোড়ে, এবং রাস্তাজুড়ে পাটকাঠির আগুন জ্বালা হয়। কেননা, ঐ সময়ে প্রচুর মশার অত্যাচার হয়। তাই মশাকে তাড়ানোর জন্য এক জাদুমূলক ছড়া বলতেও শোনা যায় —

ধা রে মশা ধা
ল বঁ কে যা
লয়ের চঙ্গা ফুক্কিয়া দিনে
সর্গে উঠিয়া যা [১০৪]

সমস্ত মশার বংশকে নির্মূল করার জন্য এই ছড়া বলা হয়। জাদুবোধ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। মানুষ বহুকিছুর রহস্য উন্মোচন করতে পারে আবার কখনও তা পরে না, তখন তাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য জাদুবিশ্বাস মূলক ছড়া বলে।

৪। মানুষের মন্দ প্রয়াসকে নিয়ন্ত্রণের ছড়া ঃ

বাঙালির 'বারো মাসে তেরো পার্বণ'। উপকূলীয় অঞ্চল এর ব্যতিক্রম নয়। নানা অনুষ্ঠানে মেতে ওঠে লোকহিয়া। কিন্তু বাধা হয় কু-দৃষ্টি। তাই ভালোমন্দ অনুষ্ঠানে যাতে কু-দৃষ্টি না পড়ে, সেজন্য ও জাদুমূলক ছড়া বলে তা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে —

দৃষ্টি দৃষ্টি কু দৃষ্টি এক্ষুনি যা
নাইলে তোর্ পিট্ ভাঙবে চাপড়্ চাপড়্ ঘা [১০৫]

আলোচ্য অংশে যতসব কু-দৃষ্টিকে পালাতে বলা হয়েছে,, নাহলে থাপ্পড়ের (চাপড়) আঘাত দিয়ে তার পিঠ ভেঙ্গে দিবে বলে ছড়ায় ব্যক্ত হয়েছে।

বিভিন্ন ঘরোয়া অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মেয়েরা নানারকমের পিঠে-পুলি তৈরী করে, তাতে দেখা যায় কোনো একজন মানুষের কু-দৃষ্টি হঠাৎ করে সমস্ত পিঠেকে নষ্ট করে দেয়।

সবাই বুঝতে পারে, যে ঐ মানুষটি কে? বা কার কু-দৃষ্টি পড়েছে? তাই পিঠে বানানো অনেক সাবধানে করতে হয়। ছড়ায় সেই রকমের আশঙ্কার কথা বলা হয়েছে—

যত কর সুরু পিঠা
পচা চাইনে কাদো পিঠা

আমরা লক্ষ্য করি বিবাহকালীন অনুষ্ঠানে নাপিত এবং বয়স্ক বৃদ্ধরা নানা ছড়া বলে, যাতে অশুভ শক্তি দূরে চলে যায়। এ প্রসঙ্গে নির্মলেন্দু ভৌমিক মহাশয়ের সংগ্রহ করা একটি ছড়া স্মরণযোগ্য —

'এ সময়ে শুভ কর্ম মন্দ করিবে যে
চৌরাশি নরক কুন্ডে পড়িবে সে' [১০৬]

এই ছড়াটি শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহকালীন ছড়া। বরকনের যাতে কোন অমঙ্গল না হয়, সে জন্য ছড়াটি বলা হয়েছে।

৫. বাত-বেদনা নিয়ন্ত্রণের ছড়া ঃ

সুস্থ জীবন সকলের কাম্য। কিন্তু মাঝে-মধ্যে জীবনে আসে আগন্তুক ব্যথা-বেদনা। মধ্য বয়সীদের প্রায়জনকেই বলতে শুনি বাত-বেদনায় যন্ত্রণা পেতে। মানুষ বাধ্য হয়ে বাত-বেদনার যন্ত্রণা থেকে উপশম পাওয়ার জন্য ঝাড় ফুঁক, গুনীনের কাছে যায়। কেউ আবার জলকে মন্ত্র দিয়ে নিয়ে আসে। একে বলে জলমন্ত্রানো, কেউ আবার তেলকে মন্ত্র দিয়ে নিয়ে আসে একে বলে তেল মন্ত্রানো। এইভাবে ঘাড়ের ব্যথা, পিঠের ব্যথা, হাতের ব্যথা, হাঁটুর ব্যথা মন্ত্র দ্বারা জাদু করে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। সেই সম্বন্ধীয় ছড়াও এই অঞ্চলে প্রাপ্ত হয়েছে —

১। আমার নাম বিন্দাবনী
ভালো ফুঁ দিতে জাঁয়ি
২। ঘাড়ে ব্যাথা পিঠে ব্যাথা
শিঘ্র ছাড়ি পালিবে হোতা [১০৭]

অনেকে মন্ত্র দেওয়া তেল এই এলাকায় বিক্রি করে এই বলে —

বাত ভালো পিত ভালো
তেল আছে মালিস্ করো

বাত বেদনার ঝাড় ফুঁক দেওয়ার একটি ছড়া হল —

ময়নামতী ফুঁক্ ঝাড়ে
বাত বেদ্না কাটিয়া পড়ে

এগুলি সবই জাদুমূলক বিশ্বাস। এই জাদুবোধ এই এলাকায় বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

৬. অভিশাপমূলক ছড়া ঃ

অভিশাপমূলক ছড়া যাতে Black Magic বা অহিতকারী জাদুশক্তি কাজ করছে। এই ধরনের ছড়ায় অভিশাপ বর্ষণ করা হয়। যথা —

এ বিলর লো গিমা সে বিলর লো গিমা
খসি পড়ু পাগ্লার শাশুর চখুর ডিমা [১০৮]

মানুষ যাকে সহ্য করতে পারে না, তার কোন কিছুই ভালো দেখতে পারে না। তখন অভিশাপ দেয়। উপরের ছড়ায় তাই পাগলার শাশুড়ী ভালো নয় বলে ‘চোখের ডিমা’ অর্থাৎ দৃষ্টি চলে যাওয়ার অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে। এরকম আরো একটি ছড়া হল —

এ বিলর লো ফুল সে বিলর লো ফুল
খসিপড়ু পাগ্লীর শাশুর কানের দুল [১০৯]

এই রকম উদাহরণ আমরা নির্মলেন্দু ভৌমিকের গ্রন্থেও পেয়ে থাকি—

“নড়ি ঘড়ি বাইস —
একসের চাইল তুই ছয়মাসে খাইস” [১১০]

এই রকম আরো একটি ছড়া পাবো ‘আশ্রাফ সিদ্দিকী’র ‘লোকসাহিত্য’ গ্রন্থে —

“তোর উপর চড়া। কিরা থাকল কড়া। ঢেঁকির উপর
রক্ত। আমার কিরা শক্ত। কাঁচা কণ্চি পাকা বাঁশ।
কিরা থাকল বারমাস।” [১১১]

৭. আশীর্বাদমূলক ছড়া ঃ

আশীর্বাদমূলক ছড়াকে আমরা White Magic বা হিতকারী জাদু বলতে পারি। সমাজে অনেক দম্পতি আছে যারা নিঃসন্তান। পৃথিবীর সমস্ত সুখ সম্পদ থেকেও তারা ‘মা-বাবা’ এই

ডাক থেকে বঞ্চিত। শিশু তার অতিমনোমুগ্ধকর রূপ নিয়ে আদুরে গলায় বাবা-মা বলে যখন সম্বোধন করে, তখন কার না বাৎসল্য রস উপচে পড়ে? কিন্তু যদি সেই সৌভাগ্য না হয়, এমন অমৃতমধুর স্বাদ চিরকাল থাকে ফল্‌গু ধারার মতো চাপা। কিন্তু জাদুশক্তির দ্বারা এমন অসম্ভব ব্যাপারও আলাদিনের ভেলকীর মতো সম্ভব হয়ে উঠতে পারে। এটাই তো জাদুশক্তি। একমাত্র চিন্তামনি বদ্যি পারে এমন খেল দেখাতে। একটি ছড়ায় পাই —

আমার নাম চিন্তামনি
ভালো পান ভাঙতে জাঁয়ি
আমার অসুদ কড়াকড়া
ছেলে হবে জড়াজড়া [১১২]

শুধু সন্তান জন্মাবে তা নয়, চিন্তামনি বাবুর ঔষধে 'জোড়া জোড়া' অর্থাৎ যমজ সন্তান জন্মাবে। এমন জাদুশক্তির প্রশংসা না করে থাকাই যায় না।

মানব সংস্কৃতির ইতিহাসে অতিপ্রাকৃতবাদ বা Supernatural বিষয়টি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। এই অতিপ্রাকৃত শক্তি মানব জীবনকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে আজও করে আসছে। এই কারণে আজও লেখা হচ্ছে নানা সাহিত্য, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাট্য, চিত্রনাট্য, সিনেমা, গল্প ইত্যাদি। এদের নিয়ন্ত্রণের জন্য মানুষ যে ধরনের প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল তা জাদুবিদ্যা (Magic) নামে পরিচিত। এই জাদুবিদ্যা আজও মানুষের কর্মপদ্ধতিকে সমানভাবে প্রভাবিত করে। আমার গবেষণার ক্ষেত্রটিও সমানভাবে প্রভাবিত। সংগৃহীত জাদুমূলক ছড়াগুলি এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হল। যা দিয়ে এই অঞ্চলের মানুষের বিশ্বাস, চিন্তাধারা, কর্মপ্রণালী জীবনধারার এক সার্বিক রূপ পরিগ্রহ করা যায়।

৪. প্রেম বিষয়ক ছড়া ঃ

"তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি
শতরূপে শতবার
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার।
চিরকাল ধরে মুগ্ধ হৃদয়
গাঁথিয়াছে গীতহার,
কত রূপ ধরে পরেছ গলায়,

নিয়েছ সে উপহার

জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার।”[১১৩]   (মানসী)

পাশ্চাত্য শিক্ষার হাত ধরে আধুনিকতার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনে প্রেম প্রবেশ করেছে। প্রেম-ভালবাসার অনুভূতি সকলের জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। নীরদচন্দ্র চৌধুরীর ভাষায়, ‘বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালী জীবনে নূতন রোমান্টিক প্রেমের প্রবর্তক।’ বৈষ্ণব পদাবলীর পর বাঙালি প্রেমকে খুঁজে পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের রচনায়। পদাবলী সাহিত্যে চৈতন্যদেবের প্রেমরসে আপামর জনগণ নিজেদের সিক্ত করেছিল, আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে বাংলা কবিতায় গড়ে উঠল প্রেমের জগৎ। তিনি, নারীর শারীরিক উপস্থিতিকে কাঙ্খিত প্রেম বলে মনে করেননি, প্রেমের অন্তরায় মনে করেছেন, তাই তাঁর লেখায় পাই —

“এখন হয়েছে বহুকাজ;

সতত রয়েছ অন্যমনে।

হৃদয়ের প্রান্তদেশে, ক্ষুদ্র গৃহকোণে।”[১১৪]   (নারীব উক্তি, মানসী)

সর্বত্র ছিলাম আমি,   এখন এসেছি নামি —

প্রেম অনন্ত। প্রেমানুভূতির কোনো সীমা পরিসীমা নাই। তেমনি নাই কালসীমাও। যুগে যুগে কালে কালে প্রেম চির শাশ্বত। লিখিত সাহিত্যের এই প্রেমের সঙ্গে সঙ্গে অলিখিত সাহিত্যেও প্রেমের উদ্ধত পদচারণ লক্ষ্য করা যায়। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ক্ষেত্রসমীক্ষায় প্রাপ্ত ছড়ায় অন্যান্য বিষয় বৈচিত্র্যের মত প্রেম এক অনন্য মহিমায় হাজির। প্রেমের কথা বললেই বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রীরাধিকার কথা মনে পড়ে যায়, যেখানে শ্রীরাধিকার কণ্ঠে শুনি —

“কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো

অকুল করিল মোর প্রাণ।”[১১৫]

কিন্তু নাম শ্রবণে তো প্রেমের পূর্ণতা নাই, যেমন নাই পত্র প্রেমেও, প্রেমের পূর্ণতা আছে একমাত্র দরশনে। ছড়ায় শুনি —

শিশিরে কি ফুটে ফুল

বিনা বরিষণে

চিঠিতে কি ভরে মন

বিনা দরশনে [১১৬]

বরিষণ ছাড়া যেমন ফুল ফোটে না, তেমনি দরশন ছাড়া শুধু চিঠিতে মনও ভরে না। কিন্তু প্রেমে তো আছে সহস্র বাধা। এ বাধা যেমন পারিপার্শ্বিক, তেমনি ব্যক্তিগতও। সবাই প্রেমের কথা মুখ ফুটে বলতে পারে না। ছড়া আমাদের সে কথাও জানায় —

আম গাছে আম নাই
ঢিল মারি কেন
তুমায় আমি ভালোবাসি
কইতে পারি না কেন? [১১৭]

'বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না' এতো প্রেমের-ই ধর্ম। এই না পারা অব্যক্ত কথা বলে দিলেই সহজ সমাধান হয়ে যায়, কিন্তু বলা হয়ে ওঠে না। মন তাই খোঁজে নানা অবলম্বন, ছড়ায় সেকথাও ব্যক্ত —

সাইকেলে যেতে যেতে
ফেটে গেল টিউব
টিউবে লেখা আছে
আই লাব্ ইউ [১১৮]

শুধু ভালোবাসলে হয় না, ভালবাসার সাথে সাথে প্রেমে রয়েছে নানান দায়িত্ববোধও। সে কথাও ছড়ার চোখে এড়িয়ে যায়নি—

পিউ পিউ পিউটি
দেখতে তোমায় বিউটি
তুমার সাথে দেখা করা
সেটাই আমার ডিউটি [১১৯]

কিন্তু পরিবার-পরিজনের চোখে ফাঁকি দিয়ে প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করার রয়েছে নানান প্রতিবন্ধকতা। রয়েছে সম্পর্কের টানা-পোড়েনও—

ধান ঘাটু ঘাটু কন্যাগো হস্তে পাকা পান
বুকের মাঝে বিফল দুটি ব্রাহ্মণকে কর দান
ভাল বলেছ ব্রাহ্মণ ঠাকুর ভাল বলেছ তুমি
চোদ্দ বছর না জানি স্বামী

হাটের হাটানি বলে ওটি তোমার কে?
লজ্জার খাতিরে পড়িয়া ওটি আমার ঠাকুর্‌দা হে [১২০]

প্রেম কখন আসে তা কেউ বলতে পারে না। যে কারণে প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে বয়সের যোজন পার্থক্য থাকলেও প্রেম দুর্বার, প্রেম তার দুর্জয় নিশান রাখে অব্যাহত। আলোচ্য ছড়াটিতে সেকথাই ব্যক্ত হয়েছে।

প্রবাদে আছে 'পীরিতের পেত্নী ভালো'। প্রেমের রাজ্যে প্রেমিক-প্রেমিকা উভয়কেই সুন্দর দেখে। তাই মন বার বার ছুটে যায় পরস্পরের কাছে। যেখানে প্রেমিক বটবৃক্ষের মত ছায়াদান করে, আর সেই ছায়াতে বসে প্রেমিকা কয় নানা সুখ-দুঃখের কথা। আসলে প্রেমের রাজ্যে প্রেমিক-প্রেমিকা পৃথক দুই দেহ হলে কি হবে, তাদের আত্মা হয় এক ও অভিন্ন। ছড়া আমাদের সেকথাও জানায়—

তুমি হও বটবৃক্ষ
আমি হই পাতা
তোমার বুকে শুইয়্যা আমি
কইব মনের কথা [১২১]

যাইহোক, মন দেওয়া-নেওয়ার এই প্রেমের রাজ্যে মনের কথা তো তার-ই সঙ্গে বলা যায়, যার সঙ্গে মনের মিলন ঘটে। আর এই সম্পর্কের স্বপ্ন শুরু হয় ঘর বাঁধবার আশায়। যে উচাটন এই মনের হদিশ পায় না মেয়েটির মা-ও, ছড়ায় তার-ই প্রকাশ। কারণ যৌবনের দ্রাক্ষাবনে যে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল ধরেছে, আহরণে সার্থক করে তোলার প্রিয় মানুষ আজ তার চাই। তাই ছড়ায় ব্যক্ত —

মা মরে ঝিঅর(অ) লাগি
ঝিঅ মরে তার লাগর লাগি [১২২]

মা তাই যৌবনাবতী মেয়ের চিন্তায় মরমে মরমে কষ্ট পায়, কখন না জানি সমাজ-পড়শীরা কু-কথা শোনায়। এদিকে মেয়ে কিন্তু কলঙ্কের কথা না ভেবে, ভালোবাসার মানুষের স্বপ্নে বিভোর। ছড়ায় তাই আরও শুনি —

যারে যারে ভাব্‌
তার মু চাইনে লাব্‌

তাই চোখের ভাষায় ব্যক্ত হয় প্রেম নিবেদন। বলার চেয়ে না বলা বাণী-ই বেশি মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠে। এ চোখের ভাষা বোঝার ক্ষমতা তাই সকলের সম্ভব নয়। কেবল প্রেমিক

হৃদয়-ই জানে এই অব্যক্ত চাওয়ার পরিণাম। শেষ পর্যন্ত দুটি প্রাণের সেতুবন্ধন হয়, বিবাহ নামক বন্ধনের দ্বারা, কেননা দুটি মন একসূত্রে বলে ওঠে —

জলে যখন নেমেছি মাচ্ তো ধরবই
ভালো যখন বেসেছি বিয়ে তো করবই

শেষ পর্যন্ত বহুদিনের আকাঙ্খিত দুটি প্রাণ পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়। ভালোবাসার শেষ পরিণাম তাই বিবাহ। উপকূলীয় অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য একটি ছড়া, যা বিবাহকালে বলতে শোনা যায় —

উড়ে গেল পজাপতি
পড়ে গেল ফাঁদে
দিদির পা দু-খানি
দাদাবাবুর কাঁদে।[১২৩]

'বিবাহ' শব্দের অর্থ বলতে পূর্বে বোঝত, বিশেষ রূপে বহন, আর বর্তমানে 'বিবাহ' শব্দের অর্থ বলতে বুঝি, বিশেষ রূপে দুটি মনের মিলন। তাই শ্যালক-শ্যালিকা ঠাট্টা করে বিবাহ কালে উপরোক্ত ছড়াটি বলে। বিয়ের পর পরিবারের দায়িত্ব বর্তায় ছেলেটির ওপর। তবে একথাও আবার ঠিক যে, বাস্তবিক মেয়েদেরকেও সংসারের দায়িত্ব কম গ্রহণ করতে হয় না তা নয়, সবাইকে সুখে রাখার দায়িত্ব তার, কেননা কথায় আছে— 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে', তাই সবাইকে সুখী দেখতে মেয়েটিকে সবার বিশেষ করে পতির মন জুগিয়ে চলতে হয়, ছড়ায় পাই—

যতই সাধিবু
ততই মনের কথা পাইবু

অর্থাৎ ভালোলাগার মানুষকে যতই ভালোবাসা যাবে, ততই তার মনের কাছাকাছি থাকা যাবে। সেইজন্য প্রেমিক পুরুষ যখন কার্যোপলক্ষ্যে দয়িতকে ছেড়ে চলে যায় দূর দেশে, তখন প্রেমিকা নারী ঘরে বসে দিন গোনে কবে ফিরবে প্রিয় মানুষটি। মনে মনে নানা জল্পনা-কল্পনা করে। আসলে খেটে খাওয়া জীবনে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ এদের খুব কম-ই জোটে। সারাদিনের কষ্টের পর স্বামীদেবতার আশায় বসে থাকে এই জন্য যে, কিছু রোজগার করে আনবে, সংসারে

বইবে সুখের হাওয়া। আর প্রিয় বধূর মুখটিও দেখবে হয়তো নূতন রোজগার করা টাকা দিয়ে, এই রকম-ই এক ভাবনার প্রকাশ নিম্নোক্ত উপকূলীয় ছড়ায় প্রকাশিত হয়েছে—

ভাতার্ গেছে কাতার্পুর
ছাতা মাথায় দিয়া
আসবে ভাতার্ দ্যাখবে মুক্
নূতন টাকা দিয়া [১২৪]

প্রেমে আছে দায়িত্ববোধের কথা, প্রেমে আছে প্রতিশ্রুতির কথা, উপরোক্ত ছড়াটি তার-ই এক জলন্ত দৃষ্টান্ত।

প্রেমের কোনো বয়স নেই, তাই প্রেম শুধু যুবক-যুবতীর মধ্যে হয় অথচ বয়স্ক বৃদ্ধ-বৃদ্ধার মধ্যে হয় না তা কিন্তু নয়। উপকূলীয় ছড়া আমাদের সে কথা বলে না। বলে বয়স্কদের মধ্যেও চলে প্রেমের অবাধ লীলা খেলা। গরীবের কুঁড়ে ঘর থেকে রাজার রাজপুরী সবের মধ্যে-ই প্রেম অব্যাহত, প্রেম চিরন্তন। ছড়ায় পাই —

ভাঙা ঘরে পাখির বাসা
বুড়াবুড়ির ভালবাসা

প্রেমে গরীব বা ধনী বলে পৃথক কিছু নেই। প্রেম সকলের, তা সে গরীবের ভাঙা ঘর হোক্ বা রাজার রাজপ্রাসাদ হোক্। ছড়ায় তাই 'বুড়াবুড়ির' ভালবাসা অক্ষত, শাশ্বত। সকল প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে প্রেম তাই দুর্বার, অপ্রতিরোধ্য অবাধ ব্যাটিং চালিয়ে যায়। যেখানে সতীন এসেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে না। ছড়া জানায় —

ঘরেতে বর আমি
রইব(অ) সুখে দুজনে
সতীন মাগি আসে যদি
থাপ্পড় দুব(অ) কানে [১২৫]

মেয়েরা সব পারে, কিন্তু স্বামীর ভাগ দিতে পারে না। তাই সতীনকে 'থাপ্পড়' মেরে বরের সঙ্গে সুখে ঘর করার ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে আলোচ্য ছড়াটিতে।

প্রেমে যত আনন্দ আছে, তার চেয়ে বেশি আছে দুঃখ। বিরহ ছাড়া প্রেম পূর্ণতা পায়

না। বৈষ্ণব সাহিত্যে দেখি শ্রীরাধিকা কৃষ্ণকে কাছে পেয়েও হারিয়ে ফেলেছেন। সেই না পাওয়ার বিরহ যন্ত্রণায় রাধিকাকে বলতে শুনি —

“চির চন্দন উরে হার ন দেলা
সো অব নদী গিরি আঁতর ভেলা”[১২৬]

শ্রীরাধিকার এই হৃদয়ার্তি যেমন আমাদের হৃদয়ের দুকূল প্লাবিত করে বিরহ সায়রে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তেমনি উপকূলীয় ছড়ায় একই হৃদয়ার্তির, ব্যাকুলতা আমাদের মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। পদাবলীর শ্রীরাধিকার বিরহ আর এই লোকছড়ার নারীমনের বিরহ কোথায় যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে —

যার লাগি মোর ছিঁড়া কাঁথা
তার সাথে মোর নাইকো দেখা [১২৭]

অর্থাৎ যার জন্য তার জীবনে ‘ছিড়া কাঁথা’ রূপ দুঃখ-যন্ত্রণা, তার সঙ্গে আজ তার আর কোনো দেখা সাক্ষাত নেই। তবে দীর্ঘ অদর্শনে প্রেম শুধু যন্ত্রণা দেয় তা নয়, নিত্য-নতুন সাজে প্রেমের অনুভূতিকে আরো গভীর, গাঢ়তর করে তোলে। কারণ পাওয়ার চেয়ে না পাওয়ার বেদনা প্রেমকে করে আরো আকর্ষণীয় আরো গভীরতর, তাই ছড়া সেকথা ও আমাদের জানায় নিম্নোক্ত ছত্রে—

দূরে যত থাকবু
আদর তত পাইবু

প্রেমে থাকে রাগ-অভিমান। তাই অভিমানে প্রেমিকা বলে, যখন কেউ ছিল না, তখন সেই-ই তার কাছে ছিল, আজ সব কিছু পাওয়ায় সে পর হয়ে গেছে। শুধু পর নয়, ভুলে গেছে, তাই ছেড়ে চলেও গেছে। হৃদয়ের নিভৃতে যে ফুল ফুটেছিল, তা আজ অকালে ঝরে গেছে, ছড়া তাই বলে —

ফুল কেন ফুটেছিল
যাবে যদি ঝরে
ভাল কেন বেসে ছিলে
যাবে যদি চলে [১২৮]

তাই আজ সকল প্রেমের অভিসার বিফলে পরিণত। প্রকৃতির মতো প্রেম, ভালোবাসা, অনুভূতিও যেন পরিবর্তনশীল। একসময় আসে আবার চলে যায়। এ যাওয়া জীবনকে বিষাদে পরিণত করে যাওয়া, যার পরিমাপ করা বড়-ই কঠিন। যাইহোক্ প্রেম-ভালোবাসা, আশা-নিরাশার, এই ছোট্ট ছোট্ট ছড়াগুলি উপকূলীয় অঞ্চলের জনজীবনকে যেমন প্রভাবিত করেছে, তেমনি রোমান্টিক প্রেমের সৌরভে ছড়াগুলি সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিতও হয়েছে, যা এককথায় সত্যই অনবদ্য।

৪. প্রতিবাদ বিষয়ক ছড়া ঃ

ষষ্ঠ অধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য একটি বিষয় প্রতিবাদ বিষয়ক ছড়া। পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাপ্ত অন্যান্য বিষয়ক ছড়ার মতো প্রতিবাদ বিষয়ক ছড়াও ক্ষেত্রসমীক্ষায় লব্ধ হয়েছে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আছে প্রতিবাদী মন। মানুষ যখন তার জীবনের প্রতি পলে পলে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত, অন্তর্দ্বন্দ্ব - কোলাহল, পাওয়া - না পাওয়া, আশা-নিরাশার বিষয়গুলিকে নিয়ে হিসেবের মিল খুঁজে পায় না, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকভাবে অন্যের দ্বারা প্রতারিত হয়, বিপর্যস্ত মন তখন আঘাতে-আঘাতে হয়ে ওঠে প্রতিবাদী। আর ছড়ার মধ্যে খুব সহজে এই প্রতিবাদী মননের হয় প্রতিফলন। এতে কেউ কাউকে দোষ দিতে পারে না, কেননা, ব্যক্তি মানুষকে যত সহজে দোষারোপ করা যায়, ছড়াকে তা বলা যায় না। প্রতিবাদী মন তাই মুক্তি পায় ছড়ায় নিজের মনের কথা বলে। ছড়া তাই সকলের জন্য রাখে অবারিত দ্বার। এইরকম বহু প্রতিবাদী ছড়া ক্ষেত্রসমীক্ষায় উঠে এসেছে, যেগুলি এই উপ-অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

সমাজ-সংসারে বহু মানুষ থাকে যারা অকৃতজ্ঞ। যার দ্বারা বেঁচে থাকে, সাহায্য পায়, তার-ই ক্ষতি করে, ছড়া তাই মুক্ত কণ্ঠে প্রতিবাদ জানায় এই বলে —

যারুর্ খাবু যারুর্ পরবু
তারুর্ বুকের চু ছিড়ঁ্বু [১২৯]

অর্থাৎ 'যার খায়, যার পরে, তার বুকের চুল ছিঁড়ে' এই গদ্যরূপে বোঝা যায় মানুষ বড় স্বার্থপর। শুধু সমাজে নয়, পরিবারের মধ্যেও এমন অনেক মানসিকতার লোক আছে, যাদের জন্য উপরোক্ত ছড়াটি তাদের প্রতি সোচ্চার ও প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, ছড়ায় ব্যক্ত হয়েছে —

বাবুভায়াদের দিলে ধার
আস্তে যাইতে নমস্কার

শুধু গরীবরা যে ঋণ করে তাই নয়, প্রয়োজনে অনেক সময় হয়, বড়লোকেদেরও অর্থনৈতিক দিক অপেক্ষায় ছোট, এমন মানুষদের কাছে ঋণ পরিগ্রহ করতে হয়। কিন্তু সেই ঋণ আজ-কাল-পরশু দেই দেই করেও কথামত সময়ে পরিশোধ করে না। অথচ সমাজে তাদের পরিচয় বাবুভায়া, বাবুমশায় বলে, ছড়ায় তাই ব্যক্ত হয়েছে উপরোক্ত মন্তব্যটি।

কথ্যভাষায় রচিত উপকূলীয় অঞ্চলের ছড়াগুলি যেন প্রতিবাদের বারুদ —

নাই দুয়ার ভাতার্ যে
নানা গীত গায় সে
বুদ্ধি রইনে আবার
মাউগের বাপের দরে খাটতে হয়।

বিবাহিতা নারীর জীবনে স্বামী-ই সব, ভরণ-পোষণের দায়িত্বও তার। কেননা, স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধন। কিন্তু বিবাহের কিছুদিন যেতে না যেতে সেই সম্পর্কে ধরে চিড়। বিভিন্নভাবে বোঝাতে থাকে, স্ত্রীর দায়-দায়িত্ব স্বামীটি আর নিতে পারবে না, তখন অবহেলিত সেই নারীকণ্ঠে ধ্বনিত হয় উপরোক্ত ঝাঁঝালো উচ্চারণ। ধীরে ধীরে সম্পর্ক হয় নষ্ট, দেখা দেয় তিক্ততা, তেমনি প্রতিবাদী দ্বিতীয় ছড়াটিও আবার কখনও কখনও শোনা যায়, নিম্নোক্ত ছড়াটি —

পরের বউ ভালো
নিজের বউ কালো

আসলে, কালো আর ভালো এই শব্দগুলি-ই আপেক্ষিক। মানুষ সহজে যা পায়, তা চায় না। আর যা চায় তা কখনোই পায় না। অসীমের প্রতি আকাঙ্খা, অধরাকে ধরা, অচেনাকে চেনা, এ মানব জীবনের অন্যতম এক বৈশিষ্ট্য। তাই নিজের বউ খুব সহজেই কালো, আর পরের বউ খুব সহজেই ভালো হয়ে যায়। এরকম একই ভাবনার প্রকাশ —

পরের পিঠা বড্ড মিঠা
নিজের পিঠা বড্ড তিতা [১৩০]

ছড়ায় শুধু হৃদয়ের কথা প্রতিবিম্বিত হয় তা নয়, ছড়ায় আমাদের গার্হস্থ্য- জীবনের হাঁড়ির কথা ও প্রতিবিম্বিত হয়—

ভাতকে টান টান
পিঠাকে খান খান

অর্থাৎ যেখানে নিতেন পক্ষে শুধু ভাত-ই জোটে না, সেখানে পিঠা খান খান (গোটা গোটা) খাওয়ার আহ্লাদ যে স্বভাবের আতিশয্য, তা বলাই বাহুল্য। ছড়ার মধ্যে এই প্রতিবাদের ভাষা ব্যক্ত হয়েছে।

সমাজে বেশকিছু মানুষ আছে, তারা কেবল আত্মপর, আত্মসুখ নিয়ে ব্যস্ত। পরের কোনো কিছু-ই তাদের ভালো লাগে না, পরের ভালো দেখতেও পারে না। এইরূপ স্বার্থপর মানুষদের প্রতি ধ্বনিত হয়েছে প্রতিবাদ-মুখর ভাষা —

১। যে করে পরের মন্দ
তার মন্দ করে গোবিন্দ

২। পরের ছেলে পরমানন্দ
নাই পড়নে খুব আনন্দ

৩। আমার ছেলে ছেলেটা
খায় যেন এতটা
নাচে যেন ঠাকুরটা
পরের ছেলে ছেলেটা
খায় যেন এত্তটা
নাচে যেন বাঁদরটা [১৩১]

প্রথম ছড়াটিতে সমাজ-মনস্কতার ছবি থাকলেও প্রতিবাদের আগুন স্ফূরিত হয়েছে। কোনো মানুষ চায় না পরের মন্দ হোক্। কেননা, যখনি কেউ অপরের মন্দ চায়, তৎক্ষণাৎ তার নিজের মন্দ যেন বেশি করে ঘটে। এ যেন প্রতিবাদের মাইল ফলক। দ্বিতীয় ছড়ায় বাস্তব ভাবনার প্রতিচ্ছবি। পারিপার্শ্বিক অনেক জনের ভাবনা এই ধরনেরও হতে পারে। যেখানে পরের ছেলে পরমানন্দ, সে না পড়ায় আলোচ্য বক্তার খুব আনন্দ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে লুকিয়ে থাকতে পারে নিজের ছেলের নষ্ট হওয়ার প্রতিহিংসা, কিংবা বর্তমান প্রতিযোগিতার বাজারে একজন প্রতিযোগী কম হওয়ার আনন্দ। এতেও পরোক্ষে প্রতিবাদের ভাষা শ্লেষের মধ্যে প্রকাশিত। তৃতীয় ছড়াটি আরো অদ্ভুত। প্রত্যেক মায়ের কাছে তার সন্তান শত মণি-মাণিক্যতুল্য এক রত্ন বিশেষ। তাই তার সবকিছুতেই মাতৃজননী পায় মহাসুখ। ছড়ানুযায়ী, তার খাওয়া অতি সামান্য, তার নাচা দেবতা-তুল্য, এককথায় অতুলনীয় চমৎকারজনক এক ছেলে। এই পর্যন্ত

মাতৃজননীর হৃদয় মথিত চির বাৎসল্য রসের অপার স্নেহ-কোমল মূর্তি, আমাদের আর একবার শৈশবে নিয়ে যায়। কিন্তু এরপর যে-কথা জানা যায়, তাতে মাতৃত্বের সহজ, সরল, মমতাময়ীর রূপ খানিকটা হলেও মালিন্যে ঢেকে যায়। এখানেই ছড়াটির অন্তরকথা প্রকটিত হয়ে উঠেছে। যা উপরোক্ত শব্দযোজনায় অদ্ভূতভাবে প্রকাশিত। পরের ছেলে অতি সামান্য এক ছেলে মাত্র, তার খাওয়া 'এত্তটা' (এত বেশি যে 'ত' ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব প্রয়োগ ঘটেছে খাওয়ার আতিশয্য বোঝাতে) আর নাচে ঠিক যেন 'বাঁদরটা'র মতো। যার মধ্যে কোনো সৌন্দর্য তো দূরঅস্ত, গাছের বাঁদর-ই তুলনীয়। আলোচ্য প্রতিটি ছড়ায় পরোক্ষে প্রকাশিত হয়েছে প্রতিবাদী সুর।

সমাজ দর্পণ সবচেয়ে বড় দর্পণ। এই দর্পণে সমাজের সবচিত্র-ই প্রতিফলিত হয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের স্থান-ই পরিবারে প্রধান। তাই বিয়ে করে ছেলেরা বউ নিয়ে বাড়ি আসে। এই নিয়ে আসার একটা দায়ও নিতে হয় তাদের, স্ত্রীর সারাজীবনের দায়িত্ব। খেটে-খাওয়া গরিব জীবনে নানা-রকম অশান্তি লেগে থাকে, যার কারণে কখনও কখনও স্ত্রীরা হয় নির্যাতিত, অত্যাচারিত। ছড়ার শানিত জিহ্বা সেখানে কিন্তু থেমে থাকেনি। তীব্র কর্কশ কণ্ঠে শোনায় —

ভাত্ দুয়ার মুরত্ নাই
কিল মারবার গোঁসাই [১৩২]

নারীদের এমন প্রতিবাদমুখর ভাষা সত্যি চোখের জল এনে দেয়। কেবল দু-মুঠো অন্নের পরিবর্তে জোটে শাসন। এর চেয়ে মর্ম-বিদারক যন্ত্রণা আর কী-বা হতে পারে? 'গোঁসাই' ঠাকুরকে সমাজে সবাই মান্যতা দেয়। তিনি প্রভু, ঈশ্বর তুল্য। সকলের মঙ্গল কামনা করে আশীর্বাদ করেন, তিনি সবাইকে ভালো রাখবার পরামর্শদাতা। এই অর্থে 'গোঁসাই' শব্দটি অর্থবহ। তেমনি সংসারে স্বামীরাই গৃহকর্তা এবং তারা পালক পিতা। সংসারের সার্বিক মঙ্গল সাধনের দায়িত্ব গ্রহণ করে গৃহকর্তা কিন্তু যদি তা না করে, কেবল অত্যাচারী হয়ে ওঠেন তখন প্রতিবাদীমন শ্রদ্ধার 'গোঁসাই' শব্দটিকে আর মান্যতা দেয় না, শব্দটিকে প্রয়োগ করে চরম শ্লেষাত্মক হিসেবে। যা ছড়ার ভাষাকে করে তুলেছে জীবন্ত ও কশাঘাতে জর্জরিত।

পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলের শ্রমনির্ভর জীবনে মানুষ সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে। রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে দু-পয়সা রোজগারের জন্যে। তবু কর্মশেষে অনেকেই যথাযথ প্রাপ্যটুকু দেয় না, ছড়ায় সেকথা ব্যক্ত হয়ে ওঠে —

যত কর হাঁইপাঁই
পাঁচশিকার বেশি নাই [১৩৩]

অর্থাৎ এক শিকা সমান পঁচিশ (২৫) পয়সা, পাঁচশিকা সমান একশ পঁচিশ (১২৫) পয়সা। ছড়ায় ব্যক্ত হয়েছে মানুষ যত কষ্ট করে কাজ করুক না কেন পাঁচশিকার বেশী পয়সা কেউ কিছুতে-ই দেয় না। এই 'পাঁচশিকা' কেবল পাঁচশিকা অর্থে নয়, বাস্তবিক নিঃস্বার্থ কাজের যথার্থ মূল্য দেওয়া যায় না, অথচ তার যথার্থ মূল্য নির্ধারণ হয় ঐ পাঁচশিকা মূল্যের সমসমানে। এর বেশি কিন্তু নয় —সমাজের এমন চিন্তা-ভাবনার বিরুদ্ধে ছড়াটির তীব্র ঘোষণা।

ছড়ায় জানতে পারি, তুমি কিছু দিলে, তবে তুমি কিছু পাবে। আর তা না হলে অন্যথায় হবে। এমনি এমনি যে কেউ কাউকে কিছু দেয় না, তা আমাদের ছড়া জানায় —

এটা দিনে ওটা দেয়
নাইলে কুন গুলামটা দেয় [১৩৪]

ছড়া বলে দেয় জীবনে সবকিছুই সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিৎ। না হলে ঔচিত্য দোষে দুষ্ট হতে হয়। লোকে বলে যেমন মেয়ের তেমন জামাই, যেমন লোকের তেমন বাড়ি, যেমন দেখতে তেমন শাড়ী। এগুলির যথাযথ না হওয়াটাই যেন অপরাধের মতো। ছড়ায়ও সেই প্রতিবাদের ভাষা ব্যক্ত —

ঢেকুয়া পঁদে তসর
খ্যাদা নাকে বেসর [১৩৫]

আলোচ্য ছড়াটিতে জানা যায়, মেয়েটির দেহগঠন সু-সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ার দরুণ 'তসর' শাড়ীখানি যেমন বেমানান, তেমনি বেমানান তাঁর 'খ্যাদা নাকে বেসর' খানি। বেসর শব্দটি 'বেশর' এর রূপ। যার অর্থ স্ত্রীলোকের নাসিকার অলংকার বিশেষ। 'নাসার বেসর পরশ করিয়া ঈষৎ মধুর হাসে'। [১৩৬] কিন্তু খ্যাঁদা নাকের বিড়ম্বনার দরুণ এমন কটুক্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে।

সমাজের মানুষ এরকম-ই প্রতিবাদের তীর নিক্ষেপ করেছে, এমন আরও কয়েকটি ছড়া হল —

১। কাঁহির কালে নাইকো দুলি
আজ দেইছন দুঠ্যাং তুলি

২। পেটে নাই দানা
পঁদে বেনারসী কানা

৩। পড়শি নাই যেঠি
ঢাম দেখিবু সেঠি

একথা প্রায়শই শোনা যায়, যদি সমাজে কোনো বড় সমালোচক থাকে, তবে প্রতিবেশির মতো বড় সমালোচক আর কেউ হয় না। প্রথম ছড়াটিতে হঠাৎ করে হওয়া প্রতিবেশির দুলি এবং তাতে দু-ঠ্যাং তুলে অপর প্রতিবেশির কাছে প্রতিবাদের উদ্রেক করেছে। কেননা, তার কিছুতেই পছন্দ নয় দু-ঠ্যাং মেলে বসার ভংগীমাটুকু। দ্বিতীয় ছড়াটিতেও প্রতিবাদের সুর জোরালো। যেখানে 'নুন আনতে পান্তা ফুরোয়' সেখানে 'বেনারসী' শাড়ী প্রতিবাদের ভাষা মুখে তুলে দিয়েছে। শেষ ছড়াটিতে পড়শী তার সকল রাগ একেবারে উগ্‌রে ফেলেছে। 'ঢাম' অর্থাৎ বাহ্যাড়ম্বর, লোক দেখনো আতিশয্য — এ সবকিছু করা যায়, অজানা পরিবেশে যেখানে পড়শী নেই। কিন্তু পড়শীর সামনে তা যদি প্রকাশ পায়, গোপনীয়তা আর রক্ষা পায় না। তাই পড়শী ও তীব্র প্রতিবাদ করে ওঠে, যা আলোচ্য তৃতীয় ছড়ায় প্রতিফলিত হয়েছে।

ছড়া বয়স্ক লোকেদের কথাও বলে। বয়স্ক মানুষ, যারা সংসারে আর শ্রম দিতে পারে না, তাদের কেউ পছন্দও করে না। সমাজের এই দুর্বল, অসহায় মানুষের ছবি ছড়ায় প্রকাশ পেয়েছে —

ছিঁড়া জুতা বুড়া বাপ
যত(অ) খাটিবু তত(অ) লাব্

সমাজের প্রতিবাদী মানুষ তাই শানিত ভাষায় উপরোক্ত মন্তব্য করতে পিছ্‌পা হয়নি। অনেকেই ভাবে বয়স্করা বাড়ির চাকর। তাই তাদের যত খাটানো যায় ততই লাভ। 'ছিঁড়া জুতা' আর 'বুড়া বাপ' এ দুই-ই কার্যজীবন থেকে প্রায় অবসর নিয়েছে। তাই এই অবসর প্রাপ্ত পিতা আর জুতার কাছ থেকে উপরি পাওনা হিসেবে যা পাওয়া যায় তাই লাভ। সমাজ পর্যবেক্ষকের চোখে যে এই দৃশ্যটি আড়াল হয়নি, তাই-ই আশ্চর্য।

প্রতিবাদমুখর এই সব ছড়াগুলি উপকূলীয় অঞ্চল থেকে উঠে আসা সাধারণ খেটে খাওয়া, অভাবী, সহজ সরল মানুষের জীবন্ত দলিল। যার কিছু ছড়া এখানে আলোচিত হল।

বিবিধ বিষয়ক ছড়া ঃ

উপকূলীয় অঞ্চলে সংগৃহীত ছড়াকে এই অধ্যায়ে বিষয়বস্তু অনুযায়ী আপাতত (৬টি) ছয়টি উপবর্গে বিভক্ত করে আলোচনা করেছি। তবুও এখনও বেশকিছু ছড়া রয়েছে যেগুলিকে

ঐসব উপবর্গে বিভাজন করা যায়নি। আমার গবেষণালব্ধ ঐ সমস্ত ছড়াগুলিকে বিবিধ বিষয়ক উপবর্গে রেখেছি। এবং আমার আলোচনার সুবিধার্থে বিবিধ বিষয়ক ছড়াগুলিকে ও কয়েকটি ভাগে বিভাজন করে আলোচনায় অবতীর্ণ হয়েছি। ছড়া বহু বিচিত্র এবং এর বিষয়বস্তুও নানামাত্রিক। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের যে বিচিত্র জীবন প্রবাহ তা আজকের ছড়ার বিষয় পরিধিকে ব্যপ্তি ও ব্যাপকতা দান করেছে। তাই নিম্নের বিবিধ বিষয়ক ছড়াগুলিকে আবার কয়েকটি উপ-বিভাগে ভাগ করে আলোচনা করা গেল। যথাঃ —

১। ক্রীড়ামূলক ছড়া (শিশু এবং বড়দের)

২। বর্তমানের ছড়া

৩। জাতিমূলক ছড়া

৪। রাজনীতিমূলক ছড়া

৫। পাঠান্তর বিষয়ক ছড়া

৬। রঙ্গ - ব্যঙ্গামূলক ছড়া।

১। ক্রীড়ামূলক ছড়া (শিশু এবং বড়দের) —

লোক সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হ'ল লোকক্রীড়া। লোকক্রীড়া বা লোকখেলা হ'ল লোক সাধারণের খেলা, যার ইরেজি প্রতিশব্দ 'Folkgame'। জীবনচর্চার বিভিন্ন উপাদানগুলিকে মানুষ কিছুটা অনাবিল আনন্দের সঙ্গো সংমিশ্রণ করেই নানান খেলার জন্ম দিয়েছে। এই খেলা আদিম সমাজ জীবন থেকেই উদ্ভূত। আদিম মানুষ বাঁচার তাগিদে যা যা করত, তার -ই বিবর্তিত রূপ হ'ল খেলা। সাঁতারকাটা, শিকার ধরা, গুহায় লুকানো, গাছে ওঠা, বর্শা ছোঁড়া ইত্যাদির আধুনিকীকরণ হ'ল এক-একটা খেলা। খেলায় শিশুদের দৈহিক উৎকর্ষতার সঙ্গো সঙ্গো মানসিক, বৌদ্ধিক উৎকর্ষতাও লাভ করে। খেলার দ্বারা শিশুর শৃঙ্খল পরায়ণতা, নিয়মানুবর্তিতা, একাগ্রতা, নিষ্ঠা, প্রচেষ্টা, দৃঢ়তা, সৌহার্দ্যতা, ভাব বিনিময়, মানবিকতা, বোঝাপড়া, শিশুর দলবদ্ধতা ইত্যাদির বিকাশ সাধন হয়। সুস্থ্যজীবন, সুস্থ্যমন, ও সুস্থ্য দেহ কেবল খেলার মাধ্যমেই গড়ে ওঠা সম্ভব। উপনিষদে বলা হয়েছে, — 'বলহীনের দ্বারা আত্মলাভ হয় না'। আর এই আত্মলাভের জন্য বল রূপ খেলার প্রয়োজন। এই খেলা হবে শিশুর 'Play way in education', অর্থাৎ পড়া পড়া খেলা।

খেলার আকর্ষণ মানুষের কাছে চিরন্তন। খেলার মধ্যে রয়েছে নানা কৌশল। 'সীতাহরণ' বা 'বউ বাসন্তীতে নারী হরণের কৌশল ব্যক্ত হয়েছে', 'কুমীর ডাঙা'তে কুমীরের পাশে ডাঙার মানুষের বাস করার কৌশল ব্যক্ত হয়েছে, বাঘ - ছাগল খেলায় বুদ্ধির প্রখরতার প্রকাশ ঘটেছে। এইভাবে প্রতিটি খেলার মধ্যে লুকিয়ে আছে সমাজজীবনে বেঁচে থাকার গভীর বার্তা। বিভিন্ন ধরনের খেলাকে মোট চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা —

১। ছোটদের খেলা — নাচন, পাতা, লিলিস্টপ, বুড়ি ইত্যাদি।

২। বড়দের খেলা — বাঘ - ছাগল, কাছিটানা, লক্ষ্যভেদ ইত্যাদি।

৩। বিবাহের খেলা — কড়ি, জামাই ঠকানো, এঁটো খেলা ইত্যাদি।

৪। সর্বসাধারণের খেলা — অষ্টাং, রামলক্ষণ সীতাভরত, ডাংগুলি, পুলিশ চৌকিদার ইত্যাদি।

লোকক্রীড়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর ছড়া। ছড়া-ই লোকক্রীড়ার প্রধান আকর্ষণ। শিশুরা খেলতে খেলতে ছড়া কাটে। ছড়ার সুরে সুরে নানারকম খেলা খেলে। তবে বিভিন্ন খেলার ছড়াও বিভিন্ন। বিশেষ করে শিশুরা, এই খেলা যখন খুশি যেখানে খুশি খেলতে পারে, তবে বড়রা তারা ঘরের কোনে খেলে। খেলার যেমন নির্দিষ্ট সময় নেই, তেমনি সময়ের পরিসীমা ও নেই। লোকায়ত এই খেলাগুলিতে খেলোয়াড় কতজন খেলবে, তা কিছুক্ষেত্রে যেমন নির্দিষ্ট, তেমনি কিছুক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও। চিনি বিস্কুট, সীতাহরণ, কড়ি ডাং, গদি, খইদই, কিতকিত, নাচন খেলায় পাত্র-পাত্রীর সংখ্যা অনির্দিষ্ট হতে পারে, আবার লুডু খেলায় ২-৪ জন খেলতে পারে, দাবা দু'জনের, বাঘবন্দী দু'জনের ইত্যাদি। যাইহোক, একথা বলা যায় যে, খেলা সাধারণত দলগত হয়ে থাকে, একক খেলা নেই বললেই চলে।

খেলার ছড়া এই আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে বলি, ছড়ার একটি বিশেষত্ব হ'ল, ছড়া কোনো নির্দিষ্ট আঞ্চলের নয়, কেননা, ছড়া সংগ্রহ করতে গিয়ে জেনেছি যে, একটি ছড়া বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে। যেকোনো ভাবে হোক্ না কেন, ছড়াগুলি বিভিন্ন অঞ্চলে কেমন করে যেন ছড়িয়ে পড়েছে, কেবল কোনটাতে কিছু সংযোজন, আবার কোনোটাতে কিছু বিয়োজন মাত্র। আঞ্চলিকতার বিভেদে ভাষাগত, ভাবনাগত কিছু পরিবর্তন, যাকে ছড়ার পাঠান্তরে আলোচনা করেছি। আসলে প্রতিটি ছড়ার মধ্যে রয়েছে সর্বজনীনতা।

যাইহোক্, তবে খেলার ছড়া কিশোর কিশোরীদের নিজস্ব রচনা। এখানে ছড়াগুলি তারা রচনা করে থাকে। খেলার ছড়াগুলি যেহেতু অপরিণত মনের, তাই তারমধ্যে আগাগোড়া

ভাবনার পরিণতি প্রায় ক্ষেত্রে থাকে না। তাদের নিজস্ব একটা ছন্দ, মাত্রা, ঘরানা আছে। খেলার ছড়ায় (Game poem) অঙ্গ সঞ্চালন (Physical movement) রয়েছে, যাতে লোকনাট্যের (Folkdrama) নিদর্শন পাওয়া যায়। শিশুরা খেলতে খেলতে নানা রকম ভাব-ভাবনার সঙ্গে সংগতি রেখে নতুন নতুন বিষয় সংযুক্ত করে। খেলার ছড়া তাই সহজেই পরিবর্তিত হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ উত্তরবঙ্গের 'মেছেনি' গানের 'পাথারিয়া' অংশের কথা স্মরণযোগ্য। পথে বেরিয়ে নারীরা মুক্ত, স্বাধীন, সেখানে কেউ তার কণ্ঠরোধ করতে পারে না। চলতি পথের নানা প্রকার দৃশ্য যেমন আসে তেমন চলে যায়, তাই পাথারিয়ার গান ক্ষুদ্র ও অসংলগ্ন হয়। কেননা, যা দেখে তা বলতে গিয়ে অন্য একটি দৃশ্য সামনে আসে, আর নতুনের ভাবনায়, পুরোনো খেই হারিয়ে ফেলে। খেলার ছড়াও সেইরকম সহজেই পরিবর্তিত হয়ে যায়। আবার বিভিন্ন ছড়ার একটাই খেলা, খেলা হয়। বর্তমানে পাশ্চাত্যের ছোঁয়ায় নানারকম পাশ্চাত্যধর্মী ছড়ার ও প্রভাব দেখা যায়। তবে একথা বলে নেওয়া ভালো যে, বর্তমান আধুনিক জীবনধারার গতিময়তায় জীবন অনেকখানি সংক্ষিপ্ত, সময়হীন, যারফলে শিশুরা খেলতে পায় না। তাদের এই সময়হীন, বাঁধাধরা জীবনে খেলাগুলি ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। ফলে আমরা খেলার ছড়াগুলিকেও অনেকক্ষেত্রে হারিয়ে ফেলছি।

উপকূলীয় অঞ্চলে সংগৃহীত খেলামূলক ছড়াগুলি-ই লোকক্রীড়ার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। বিভিন্ন খেলার সাথে বিভিন্ন রকম খেলা যুক্ত। আমরা সভ্যতামুখী। চারিদিকে বড় বড় দেওয়াল আর প্রাচীরের পাহাড়ে যতই বন্দীজীবন শিশুদের উপহার দিই না কেন, শিশুরা তার স্বভাবজ কারণে গণ্ডীরূপ বিন্দুর মধ্যেও সিন্ধুরূপী খেলার স্বাদ খুঁজে নেয়। শহর থেকে গ্রাম যেদিকেই তাকানো যাক্ না কেন, শিশুরা সকাল, বিকাল, ছুটির ফাঁকে, দুপুর রাতে বাড়ির ভিতরে ও বাইরে নানা খেলা খেলে। খেলা তাদের জীবনসাথী, খেলা তাদের গান গাওয়া। শিশুরা নির্দিষ্ট ছন্দে কতকগুলি ছন্দোময় চরণ উচ্চারণ করতে করতে খেলতে যায়, খেলে, খেলা শেষও করে। তবে আমার এই আলোচনায় সেই খেলাগুলি তুলে ধরেছি যেগুলির সঙ্গে ছড়া সংযোজিত।

বেশির ভাগ খেলায় থাকে দুটি দল। এই দুইদলের কুশীলবের মধ্যে কারা আগে খেলবে। তা নির্বাচন করার জন্য একটি ছড়াবলা হয়। ছড়াটি যার কাছে শেষ হবে, সেখানেই থামতে হবে, এবং ঐ নির্দিষ্ট খেলোয়াড় যেকোনো একটি দলে যাবে, এবং পরে আবার ছড়াটি বলা হবে। এই ভাবে খেলোয়াড় নির্বাচন হয়, কোন দলে কে যাবে। যেমন উবু দশ

কুড়ি তিরিশ' — এই ছড়ায় 'উবু' হবে আকাশের দিকে, তার পর দলনেতা ডানদিক থেকে অন্যজনের বুকে হাত দিয়ে পর পর ছড়াটি বলবে। এবং সকলে এই সময় গোলাকার হয়ে দাঁড়াবে। ছড়াটি হ'ল —

১। উবু, দশ কুড়ি
তিরিশ চল্লিশ
পঞ্চাশ ষাট্
সত্তর আশি
নব্বই সয় [১৩৭]

খেলা শুরু করবার আরো কয়েকটি ছড়া হ'ল —

২। আঁতা পাতা তুলসী পাতা
যে হবে সে সবার রাজা

৩। আক্কর বাক্কর বম্বে বো
আশি নব্বে পুরে শ
শ পে লাগা ধাগা
চোর নিকালকে ভাগা [১৩৮]

কিংবা বলা হয় —

৪। রাধাকৃষ্ণ বাজায় বাঁশি
এক নিশাসে এক্স আশি

— এই ছড়াগুলি বলার সময়ে গোলাকার হয়ে দাঁড়াবে, হাতের উপর হাত রাখবে। সকলের একরকম মিলে গেলে ঠিক আছে, না মিললে, সেইজন বাতিল হয়ে যাবে। সাধারণত এই ভাবে যে কোনো খেলার ক্ষেত্রে নির্বাচনের প্রায় এই একই পদ্ধতি।

৫। সীতাহরণ খেলার পূর্বে অনেক সময় এই ধরনের ও ছড়া বলে —

এই ছেলেটা ভেলভেলেটা / খেলতে যাবি পয়সা পাবি / সীতাহরণ ছুটবি খালি / সীতার সাথে পালিয়ে যাবি / ধরা পড়লে ঠেঙ্গা খাবি / না পড়লে মিষ্টি পাবি / [১৩৯]

আগডুম বাগডুম খেলা ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে 'আগুডুম বাগ্‌ডুম ঘোড়াডুম সাজে' ছড়াটির চারখানি পাঠান্তর পাওয়া গেছে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলার লোকসাহিত্য' দ্বিতীয়খণ্ড ছড়ার খেলার অংশে মোট এগারো (১১টি) সংখ্যক পাঠ উত্থাপন করেছেন। যেখানে ২৪ পরগণা, ঢাকা, হুগলি, মুর্শিদাবাদ, সাঁওতাল পরগণা, মৈমনসিংহে প্রচলিত 'আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে' র নানা খেলামূলক ছড়া রয়েছে। ক্ষেত্রসমীক্ষা প্রাপ্ত উপকূলীয় অঞ্চলের সংগৃহীত ছড়াটি হ'ল —

আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে
ঢাক ঢোলক ঝাঁঝর বাজে
বাজতে বাজতে চলল ঢুলি
ঢুলি গেল সেই কমলাপুলি
কমলাপুলির টিয়েটা
সূর্যিমামার বিয়েটা
আয় রঙ্গা হাটে যাই
গুয়া পান কিনে খাই
একটি পান ফঁপরা
মায়ে ঝিয়ে ঝগ্‌ড়া
হলুদ বনে কলুদ ফুল
তারার নামে টগর ফুট। [১৪০]

ইচিং বিচিং খেলা ঃ 'ইচিং বিচিং' খেলাটি বেশ অভিনব। এটি মূলত বালিকাদের খেলা হলেও বালকরাও খেলতে পারে। ঘরে বাইরে সব জায়গায় খেলে। এই খেলার পাত্র-পাত্রী অনেকে হতে পারে। যারা নির্বাচনী পর্বে হেরে যাবে, তারাই দুই পা মাটিতে ফাঁকা করে বসবে, পরস্পর মুখোমুখি, পা দুটো জোড়া। হাত দুটো দেহের ভারসাম্য রক্ষার (Body Balance) জন্য পিছনে এলিয়ে বসে। এইবার যারা খেলবে, তারা এক পা মাঝখানে, আর এক পা বাইরে রেখে এমন ভাবে লাফাবে, যে দুটো উল্টে পাল্টে খেলবে আর ছড়াটি বলবে। যদি লাফাতে গিয়ে গায়ে লেগে যায়, তবে তাকে বসতে হবে। ছড়াটি হল —

ইচিং বিচিং চিচিং চা
প্রজাপতি উড়ে যা

ভাতে বুসল মাছি
কোদাল দিয়ে চাঁছি
কোদাল হ'ল ভোঁতা
খেঁক শিয়ালের মাথা। [১৪১]

ছড়ার এই ভাষার সবটাই হয়তো আঞ্চলিক ভাষা নয়। আধুনিক সভ্যতার আলোকে বর্তমান কিশোর - কিশোরীরা ছড়ার ভাষাকে কোথাও কোথাও অনেকখানি পরিমার্জিত করে নিয়েছে। তাছাড়া রাঢ়ী ভাষার নানা আঞ্চলিক ভেদও আছে এই অঞ্চলে, ফলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে শুদ্ধ রাঢ়ী ভাষারও প্রয়োগ আছে।

এই খেলার আরো একটি ছড়া হ'ল —

চাল্‌তাপাতা চাল্‌তাপাতা
বিয়ে দুবু তো দে
তোর বিয়েতে লাচ্‌তে যাব (অ)
ঝুমকো কিনে দে
দিদিকে দিল আশে পাশে
আমাকে দিল নদীর পাশে
নদীর জল কল্‌কল্‌ করে
মায়ের কথা মনে পড়ে
বাবার কি চোক্‌ ছিলনি
আর কি বর পেলনি [১৪২]

পিঠু উপুড় খেলা ঃ এই খেলায় কারা খেলবে, তার জন্য নির্দিষ্ট ছড়া দিয়ে দল নির্বাচন করা হয়। শেষে যে থেকে যাবে, সেই মাটিতে হাত দিয়ে পিঠ উপুড় করবে, এবং নিচু হয়ে থাকবে। বাকিরা সকলে তার পিঠের উপর দিয়ে হাইজ্যাম্প দিয়ে যাবে। লাফ দিতে গিয়ে যদি জামাকাপড়ের কোনো না কোনো অংশ লেগে যায় তখন তাকে উপুড় হয়ে খেলতে হবে। ছেলে মেয়ে সবাই খেললেও প্রধানত এটি মেয়েদের খেলা। এই খেলার সঙ্গো যুক্ত ছড়াগুলি হ'ল;—

১। লাবনি সরকার
গাছে উঠা দরকার

গাচ্ থেকে পড়ে গেলে

অসুদের দরকার

অসুদ নাই ঘরে

টাকা চুরি করে

সাদ্‌দিন পরে

জেল খাটিয়া মরে। [১৪৩]

২। একতলা দুতলা তিনতলা

পুলিশ যাবে নিমতলা

পুলিশের হাতে লম্বালাঠি

ভয় করে না কংগ্রেস পাটি

কংগ্রেস পাটি বারটা

ডিম পেড়েছে তেরটা

একটা ডিম নষ্ট

চড়াই পাখির কষ্ট। [১৪৪]

৩। টুম্পারে টুম্পা

গলায় তোর গাম্‌ছা

হাতে তোর বালতি

কাখে তোর কলসী

আমি যদি তোর ছেলে হতাম

কল্‌কাতাতে চাকরী পেতাম

ঝুমুর ঝুমুর পয়সা পেতাম

পান বিড়ি সিগারেট কিনে খেতাম [১৪৫]

৪। টুনটুনি পাখি

নাচত দেখি

না বাবা নাচব না

পড়ে গেলে বাঁচব না

পড়েছি বেশ করেছি

তোর কি ক্ষতি করেছি।[১৪৬]

৫। মিষ্টি দকানি

তুই খ্যাল্‌তে পারুনি

তোর গদা গদা পা

তুই হড়্‌কি পড়ি যা[১৪৭]

৬। ডিস্কো ডিবানী

তোকে খ্যালতে লিবানি

তোর গদা গদা পা

তুই হড়্‌কি পড়ি যা।[১৪৮]

— পিঠ উপুর খেলাটি বেশি জনপ্রিয় বলে এর ভিন্ন ভিন্ন পাঠ ও প্রচুর রয়েছে। এই উপকূলীয় অঞ্চলের খেজুরী, ভূপতিনগর, হলদিয়া, তমলুক, কাঁথি, এগরা, দীঘা প্রায় সব জায়গায় এই খেলাটি খেলা হয়।

খেলা মানে প্রতিযোগিতা। খেলা যেমন আমাদের নিয়মানুবর্তিতা শেখায়, তেমনি গড়ে তোলে প্রতিযোগী মনোভাবও। খেলার মধ্যে কে কত তাড়াতাড়ি একশ বলতে পারে তার প্রতিযোগিতা হয়। তাই শিশুরা তাড়াতাড়ি একশ বলার ছড়া বলে। যথা —

১। হারকিন বাস্‌ক

নিরানব্বই এ্যশক

২। রাধাকৃষ্ণ বাজায় বাঁশি

এ্যক নিশাসে একশ আশি

৩। অ্যাকে গোল গোল — একশ।

ছোঁয়াছুয়ি খেলা ঃ

ছোঁয়াছুয়ি খেলা ছেলে-মেয়ে সবাই খেলে। ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয় থেকে এসে বিকেলবেলা যখন মাঠে জড়ো হয়, তখন যেন এক মরুদ্যান রচিত হয় ফাঁকা মাঠে। যতক্ষণ না অন্ধকার হচ্ছে, বা মেঘ উঠছে ততক্ষণ পর্যন্ত মাঠে দাপিয়ে চলবে নানা রকম খেলা। সেই রকম একটি খেলা হ'ল, ছোঁয়াছুঁয়ি খেলা। ছোঁয়াছুঁয়ি খেলায় নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর যে

শেষে থাকবে, সে বুড়ি হবে। এবার বুড়িকে সামনের দিকে দাঁড় করিয়ে বাকি সবাই পিছনে থেকে একটি ছড়া বলবে। বুড়ি চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকবে। ছড়া বলা শেষ হলে একটু জোরে ঠেলে দিয়ে বাকিরা সবাই ছুটে পালিয়ে যাবে। বুড়ি এবার যাকে ছুঁতে পারবে সেই হবে পরবর্তী বুড়ি। ছড়াটি হ'ল —

বেলা রে বেলা
আমরা করি খেলা।
ওই মেয়েটা বসে আছে
ওর কোনো বন্ধু নাই
ওঠো গো ওঠো
চোখের জল মোছ
আকাশ পানে চাও
যাকে ছুঁবে ছুঁয়।[১৪৯]

এই খেলার আরো একটি ছড়া হ'ল —

ডুবডুবডুব নদীতে
বিড়াল কাঁদে গদিতে
ও বিড়াল তোর ভাগ্য ভালো
পৃথিবীটা উল্টে গেল
আপেল শক্ত
বেদানা রক্ত
মিষ্টির রস
খায় ঢক্ ঢক্।[১৫০]

কুমীর ডাঙা ঃ

কুমির ডাঙ্গা একটি আকর্ষণীয় খেলা। খেলা শুধু নিছক খেলা নয়। আদিম মানুষ নানা ছল চাতুরী করে শিকার করত। বন্যজন্তুদের কাছ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করত। খেলায় আছে নিজেকে রক্ষা করার নানা কৌশল। কুমির ডাঙ্গা খেলায় যা যা করতে হয়, — প্রথমে নির্দিষ্ট, গোলাকার গণ্ডী কেটে দেওয়া হয়, যাতে থাকে কুমীর রূপী খেলোয়াড়। গণ্ডীর বাইরে থাকবে

আর সবাই। তারা এবার কুমীর রূপী মানুষটাকে নানাভাবে বিরক্ত করবে। কুমীর রূপী খেলোয়াড় সুযোগ বুঝে, গণ্ডীর বাইরে যে কোনো একজনকে ধরে ফেলবে। এবং যাকে ধরবে সে হবে পরবর্তী কুমীর। যেহেতু কুমীর জলে থাকে এবং ডাঙ্গায় অন্যরা থাকে, তাই দু'য়ে মিলে এই খেলার নামকরণ হয়েছে কুমীর ডাঙ্গা কিংবা অন্যভাবে বলা যায় ডাঙায় কুমীর, তাই কুমীর ডাঙা। এটি একটি অতিপরিচিত এবং জনপ্রিয় খেলা সবার কাছে। এই খেলার ছড়াটি হ'ল—

আমার এ্যক দাদু ছিল
বিড়ি খাবার লোক
সেই বিড়ি খেয়ে দাদু
বাজারে গেল
বাজারে ছিল ভালুক ভায়া
তাড়া করিল
সেই তাড়া খেয়ে দাদু
গাছে উঠিল
গাছে ছিল কাটঠোক্‌রা
ঠোক্কর মারিল
সেই ঠোক্কর খেয়ে দাদু
মাটে পড়িল
মাটে ছিল বাব্‌লা কাঁটা
পায়ে ফুড়িল
সেই পা নিয়ে দাদু
বাড়ি ফিরিল
বাড়িতে ছিল টেঁপাটেঁপি
পা টিপিল
সেই পা নিয়ে দাদু
স্বর্গে চলিল
স্বর্গে ছিল শিবদুর্গা
আদর করিল
সেই আদর খেয়ে দাদু
বাঁদর সাজিল [১৫১]

ছড়ায় বর্ণিত হয়েছে একদাদুর হাজার দুরবস্থা। ছড়াটি যেন চিত্রশালা। ছড়ায় দাদুর নাকাল হওয়ার অবস্থা জীবন্ত দর্শনীয়। এটি একটি কেবল খেলার ছড়া হলেও জীবন অভিজ্ঞতার নানা দ্বন্দ্ব সংঘাত ছড়াটিতে চিহ্নিত।

এই ছড়াগুলিকে আমরা শৃঙ্খলিত ছড়া বলতে পারি। একটির সঙ্গে অপরটি শৃঙ্খলের ন্যায় বাঁধা হয়ে আছে। এই রকম শৃঙ্খলিত ছড়া এই এলাকায় বহুল লক্ষণীয়।

ইন্টু পিন্টু খেলা ঃ খেলাটি ভীষণ মজার। সাধারণত ১৪-১৫ বছর বয়সের ছেলে-মেয়েরা এই খেলা খেলে। পরস্পর হাত ধরে গোলাকার ভাবে ঘুরতে ঘুরতে ছড়াটি বলে। ছড়াটি হল—

ইন্টু পিন্টু টাপা টিন্টু
টান টুন ট্যাসা [১৫২]

হাত ধরাধরি খেলা ঃ

এই খেলায় নির্বাচনী পর্যায়ের ছড়া গুলির দ্বারা প্রথমে নির্বাচন হয়। নির্বাচনের পর দুই পক্ষ পরস্পর সামনাসামনি সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে। ছড়া শুধু অঙ্গ- সঞ্চালনের জন্য নয়, ছড়ায় গড়ে ওঠে শিশুদের শৃঙ্খলাবোধ, নীতিবোধ, ন্যায়পরায়ণতা, দলবদ্ধতা, ধৈর্যশীলতা, বিচারকরণ ইত্যাদি। এরপর একটি দল এগিয়ে আসবে, এবং ছড়াটি বলবে। এটি একটি সংলাপধর্মী ছড়া, যাতে একজন বলে, অন্যজন তার উত্তর দেয়। ছড়াটি হ'ল —

এলেটিং বেলেটিং সইলো
কিসের খবর হইলো
রাজামশাই একটি বালিকা চাইলো
কোন্ বালিকা চাইলো
অমুক বালিকা চাইলো [১৫৩]

যে মেয়েটিকে পছন্দ করবে, সেই মেয়েটি বাতিল হয়ে যাবে। এবং এই ভাবে যারা কম সংখ্যক বলে গণ্য হবে তারা হেরে যাবে।

কানামাছি খেলা ঃ

এই খেলাটি সকলের অতিপরিচিত একটি খেলা। ছোট থেকে বড় সবাই খেলে। কোনো একজন বুড়ি হলে তার চোখ কাপড় দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয় বলে একে কানামাছি খেলা বলে।

একটি গণ্ডী থাকে। সবাইকে গণ্ডীর মধ্যে থাকতে হয়। এরপর বুড়ি যাকে ছোঁবে সেই হবে পরবর্তী বুড়ি। আর বুড়ি যদি গণ্ডী থেকে বেরিয়ে যায়, তবে তাকে পেছন থেকে ঠেলে গণ্ডীর ভিতরে থাকার জন্য সচেতন করে দেয়। এই খেলার ছড়াটি হ'ল —

১। একেতে বালিশ খলা
দুয়েতে পাঁপর ভাজা
তিনেতে খেসারী
চারেতে খেজুরী
পাঁচে পাঁচরকমের ভাজা
ছয়েতে ছলা ভাজা
সাতেতে মটর ভাজা
আটেতে বাদামভাজা
নয়েতে ননাভাজা
দশেতে তেল চুপ্‌চুপ্ তেলেভাজা
এগারোতে ঘি চুপচুপ ঘিয়ে ভাজা
বারতে বাঘাবাগ্ খেলতে যায়
আশি টাকা পায়
আশি টাকার খেসারী কিনে
লাল বাজারে যায়। [১৫৪]

তালগাছ তালগাছ খেলা ঃ

এটি একেবারে শিশুদের খেলা। শিশুরা যখন বাড়িতে থাকতে থাকতে একঘেয়েমি অনুভব করে তখন কয়েকজন শিশুকে একসঙ্গো বসিয়ে আঙ্গুল মুড়ে পর পর হাত রেখে এই খেলা খেলা হয়। পূর্বে এই অঞ্চলে যৌথ পরিবার ছিল, পরিবারে অনেক শিশু থাকত। তাই বহু পূর্ব থেকেই এই খেলা খেলা হয়ে আসছে —

ঝড় হটে
তা গাচ লড়েঠে
তা গাছের গড়া কাটিয়া দেই
তা গুড়ি লিয়া যাই [১৫৫]

খেলাটি মনোমুগ্ধকর। ঝড়ে তালগাছ যতই নড়বে একটি করে গাছ পড়ে যাবে। শেষে সব গাছগুলি উল্টে যাবে।

লুকোচুরি খেলা ঃ

ছোট্ট শিশু যখন সবেমাত্র হাঁটি হাঁটি পা পা করে চলতে শুরু করে, পৃথিবীর এত হাসি, এত আলোর মাঝে সে হয়ে ওঠে দুরন্ত, তখন বাব-মা আহলাদে কতনা বিচিত্র স্বপ্ন বোনেন মনের আকাশে। শিশু খেলে নানা খেলা। কখন সে লুকিয়ে যায় কখন সে খিল্‌খিল্‌ করে হেসে ওঠে, কখনও বা দৌড়ে পালায়, আবার কখনও সে কোলের মধ্যে ঢুকে পড়ে, এযেন এক বিচিত্র জগৎ। এ জগৎ সম্পূর্ণরূপে শিশুর জগৎ। সেখানে তার একছত্র অধিকার। প্রিয় বাবা-মা কতখানি তার খেয়াল রাখে, এই জন্য সে বারে বারে লুকোচুরি খেলা খেলে। শিশু বাড়ির বাইরে এবং ভিতরে এই খেলা খেলে। এতে একজন ব্যতীত অন্যসবাই নির্দিষ্ট স্থানে লুকিয়ে পড়ে। যে লুকিয়ে থাকে সে বলবে ‘কুক’। এবং অন্যজন বলবে ‘কুক দিবে না গু খাবে’ এই কথা বলা মাত্র যে লুকিয়ে আছে সে উত্তরে ‘কুক’ দিবে। এই খেলার ছড়াটি হ’ল —

কচি কচি পেহারা
একি তোর চেহারা
কচি গেল পাক্‌তে
রাস্তার লোক দেখতে
বড় (অ) বাঁধে কে গ
কচা কচির মা
কচি কুক্‌
লবিন চুস।[১৫৬]

লাঠি খেলা ঃ

লাঠি খেলা বড়দের খেলা। সাধারণত ১০-১৮ বছর বয়সের ছেলে-মেয়েরা খেলে। এতেও নির্বাচন হয়। নির্বাচনের শেষে যে থাকবে তাকে বুড়ি হতে হবে। নির্দিষ্ট একটি দাগে গিয়ে সেখানে মাথার উপরে দুইহাতে লাঠি ধরে পিছন ঘুরে দাঁড়িয়ে থাকবে, আর তখন-ই দলের অন্যজন ছড়া বলবে।

তেতু গাছে বাঁসা
বউ ভাঙল কাঁসা

সে বউ কাই

জ আঁইতে যাইছে

সে জ কাই

সাপ ছুঁয়া দিচ্ছে

সে সাপ কাই

বঁয়ে ঢুকিছে

সে বঁ কাই

ধবা কাটিয়া লিছে

সে ধবা কাই

কাপড় কাচতে যাইছে

সে কাপড় কাই

রাজা পরিয়ালিছে

সে রাজা কাই

পাখি মারতে যাইছে

সে পাখি কাই

গগনে ফুরুত [১৫৭]

—এই ছড়া বলা শেষ হলে, পেছন থেকে দলের অন্যজন লাঠি দিয়ে বুড়ির লাঠি ছুঁড়ে দিবে যতদূর সম্ভব। বাকিরা তাদের লাঠিহাতে কলসী ভাঙা বা ইট ভাঙার টুকরোর উপর দাঁড়াবে। যদি কেউ কলসী ভাঙা বা ইট ভাঙার টুকরোর উপর না দাঁড়ায় তবে সে হবে পরবর্তী বুড়ি, কিন্তু তার পূর্বে, পূর্বের বুড়িকে তাকে ছুঁতে হবে। এইভাবে খেলা এগিয়ে চলে।

বাঁধাবাঁধি খেলা ঃ

খেলায় দুইজন হাত তুলে দাঁড়াবে। বাকিরা ঐ হাতের নিচ দিয়ে ঢুকে যাবে, আর ছড়া বলবে। যেখানে ছড়া বলা শেষ হবে, সেই খেলোয়াড়কে হাত তুলে আবার দাঁড়াতে হবে। ছড়াটি হ’ল —

ছেলিরে ছেলি

তোর ছেলি ধান খেয়েছে

আমার ছেলি লতাপাতা খেয়েছে

আমি তোর ছেলিকে বাঁধ্‌বো

বেঁধে নাও, বেঁধে নাও [১৫৮]

ছুটাছুটি খেলা ঃ

এই খেলায়ও দুই পক্ষ। উক্তি প্রত্যুক্তিমূলক এই ছড়াটি চমৎকার। ছেলেরা ছুটা ছুটি খেলে, এতে ও বুড়ি হয় একজন, ছড়া বলতে বলতে তাকে অন্যরা পেছন থেকে ঠেলে দিয়ে ছুটে পালাবে। এবং খেলার বুড়ি তাদের যতক্ষণ না ছুঁতে পারছে, ততক্ষণ ছুটাবে। ছড়াটি হ'ল —

দাদুগো দাদু

ঘুরতে যাব

এতদিন কোথায় ছিলি?

মামার বাড়ি

কী খেয়েছিস্‌?

দুদ ভাত

আমার জন্যে

কাচ্‌ কলা। [১৫৯]

রেলগাড়ি খেলা ঃ

এই খেলার ছড়াটি হ'ল —

ট্রেন ট্রেন ট্রেন

হাওড়ার ট্রেন

ট্রেন থেকে নেমে এল

সুচিত্রা সেন

সুচিত্রা সুচিত্রা

তোমার পকেটে কী

উত্তমদার জন্য আমি আপেল এনেছি

ও আপেল নেব না

দিদির বিয়ে দেব না

দিদিকে দেব সাজিয়ে

ঢাক ঢোল বাজিয়ে [১৬০]

ছোট্ট ছেলে-মেয়েরা কাঁধে হাত দিয়ে লম্বা হয়ে ছুটে, আর ছড়াটি বলে।

তালচুরি খেলা ঃ

এই খেলায় একজন বুড়ি থাকে। বুড়ির চারপাশে শিশুরা হাত ধরাধরি করে গোলাকার হয়ে ঘুরে। যে বুড়ি হবে সে বলবে—'তাল গাছে জ দিতে দিতে কোমর ভেঙে গেল'— ছড়াটি যেখানে শেষ হবে সেইখানে একটি শিশুকে চুরি করে নেবে। এইভাবে সব শিশু চুরি হয়ে গেলে খেলাও সমাপ্ত হয়ে যাবে। শিশুরা এই খেলায় এক একটি তালের সমান। তাই খেলার নাম তালচুরি খেলা। খেলাটির ছড়া নিম্নরূপ—

তা গাছে জ দিতে দিতে

কোমর ভেঙে গেল

এ্যক্‌টি তা খুঁজে পেলাম না

চোরের পেটে গেল

চোর চোর চিচিঙ্গা

চোরের মুখে মুতিঙ্গা

চোর গেল মহিষাগোঠ

খেয়ে এল গুরুগোঠ [১৬১]

শিশুরাই খেলার কুশীলব। কিন্তু বেশ কিছু খেলা আছে, সঙ্গে বড়রাও যোগদান করে। যেমন 'ইক্‌ড়ি মিক্‌ড়ি' খেলাটি উপকূলীয় অঞ্চলের প্রায় সব অংশেই হয়। এটি সব ঋতুতে ঘরে বসে বসে খেলা হয়। মাটিতে দুই হাতের আঙ্গুল ছড়িয়ে দিয়ে, অন্যজন বামহাত রেখে কেবল ডানহাত দিয়ে এই ছড়াটি বলে এমন ভাবে, যাতে করে ছড়া বলার সময় মাটিতে বিছানো প্রতিটি আঙ্গুলে যেন স্পর্শ করে যায়। ছড়াটি যেখানে শেষ হবে, সেখানেই তার আঙ্গুলটি মুড়ে দিতে হবে, এইভাবে যার সবগুলি আঙ্গুল প্রথম মোড়া হবে, সেই হবে বিজয়ী। সাধারণত বাড়ির বড়রা এতে যোগদান করে তবে ছোটদেরও সঙ্গে নেয়। ছড়াটি হ'ল —

ইক্‌ড়ি মিক্‌ডি চাম্‌ চিক্‌ড়ি

চামের কাটা মজুমদার

ধেয়ে এল দামোদর
দামোদরে হাঁড়িকুড়ি
দুয়ারে বুসে চালকাঁড়ি
চাল কুটতে হ'ল বেলা
ভাত খাব কত বেলা
ভাতে বুসল মাছি
কোদাল দিয়া চাঁছি
কোদাল হ'ল ভোঁতা
খা ছুতোরের মাথা।[১৬২]

শিশুদের অনাবিল সহজ সাদামাটা জীবন আজ যান্ত্রিকতাময় জীবনের নাগপাশে বন্ধ, রুদ্ধ, বিপর্যপ্ত। শিশুর জন্য খোলাবাতায়ন, উত্তাল নদী, নির্জন প্রান্তর সবুজ প্রকৃতি, আজ বড়ই দুর্লভ, দুষ্পাপ্য, দুরহ। আদিম বন্য জীবন শিশুকে অনেকবেশি স্বতঃস্ফূর্ত উদার ক্ষেত্র এনে দিত, তাই শিশুর কাছে প্রতিদিনের বিকাল সাজত কল্পনাসমৃদ্ধ নতুন নতুন খেলায়, যেখানে তারা পেত স্বস্তি, সুন্দর এক সময়। আজ আমরা শিশুদের অনেক কিছু দিয়েছি, কেড়ে নিয়েছি তার চেয়েও বেশিকিছু। না আছে খেলার মাঠ, না আছে সময়, না আছে প্রিয়জনের সান্নিধ্য, তার জন্যে আছে, বই বোঝাই পাহাড়, শিকল দেওয়া কক্ষ, বাতাসবিহীন বসত, বৃক্ষহীন প্রান্তর, ভালবাসাহীন জীবন। প্রতিযোগিতাময় বেশী নাম্বার পাওয়ার দৌড়। এই মানসিকতার হিংস্রতায় খাবি খাচ্ছে কচি শিশুরা। গ্রামগুলিও যেন কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে, চোরা প্রতিযোগীর স্রোতে।

অবশ্য এইসব লোকক্রীড়াগুলির হ্রাসজনিত একাধিক অন্তরায় আছে; যথা —

১। মানুষ শহরমুখী। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আধুনিকতার প্রতিযোগিতায় নিজেদের খাপখাওয়াতে গিয়ে শৈশবকে হারিয়ে ফেলছে। শৈশবের যে নিজস্ব ছন্দ, তা বোঝার পূর্বেই শিশুদের তুলে দেওয়া হচ্ছে ভারী ব্যাগ কিংবা বাক্স। ফলে গ্রাম আর গ্রামে নেই। গ্রাম হয়েছে শহরের অনুগামী, তাই খেলার মাঠ খেলোয়াড়হীন।

২। চিত্ত বিনোদনের অফুরন্ত ভাণ্ডার — টিভি, বক্স, মোবাইল, কম্পিউটার, সিনেমা ইত্যাদি।

৩। প্রাইভেট টিউশনের দাপাদাপিতে শিশুরা সময় খুঁজে পায় না খেলবার জন্য।

৪। তথাপি শিশুরা যেটুকু সময় পায় — ক্রিকেট, ফুটবল, হকি, ব্যাডমিন্টন ইত্যাদি বিষয়

নিয়ে ব্যস্ত থাকে। লোকখেলার আকর্ষণ শিশুদের কাছে বড়ই কম।

৫। বর্তমানের পরিবার ছোট্ট পরিবার। যেখানে আছে কেবল বাবা-মা, ভাই-বোন। যৌথ পরিবারের যে চিত্র, দাদু-দিদা, ঠাকুমা, কাকা-কাকি, জ্যাঠা-জেঠি, দাদা-বৌদি, বোন সবাইকে নিয়ে সুখী পরিবারের সেই চিত্র আর দেখা যায় না। নিউক্লিয় ফ্যামিলির ফলে শিশুদের খেলার সংগী-ই খুঁজে পাওয়া যায় না।

৬। বর্তমানে পরিবার খুব বেশি হলে চারজন সদস্য যুক্ত পরিবার তার আবার বাবা-মা দু'জনেই কোনো না কোনো পেশায় লিপ্ত। ফলে শিশু খেলবে কার সঙ্গে? শিশুরা সঙ্গীহীন জীবনযাপন করছে।

৭। কর্ম ব্যস্ততায় অধিকাংশ মায়েরা চায় সন্তান একটাই থাক। ফলে শিশুর সংখ্যা অতি অল্প।

৮। সংগীত, নৃত্য, অঙ্কন, আবৃত্তির দিকেই বর্তমানের চাহিদা বেশী।

৯। পাঠক্রমের সঙ্গে সঙ্গে সহ-পাঠক্রমিক শিক্ষা যতদিন না যুক্ত হচ্ছে, শিশু ততদিন পাঠক্রম নির্ভর গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে। এটিও একটি অন্তরায়।

১০। পিতা-মাতার স্বপ্ন ও ভাবাদর্শগুলি শিশুকে দিয়ে পূরণ করার ইচ্ছায়, শিশুর বাড়তি সময় অতি অল্প, ফলে শৈশবের প্রাণভরা, খেলার সময় তারা পায় না।

এই রকম বহু সমস্যা নিয়ে লোক খেলাগুলি হারিয়ে গেলেও একথা বলা যায়, খেলা শিশুর সহজাত প্রবৃত্তি। শিশু আপন মনের নিভৃতে নানা খেলা খেলে থাকে। লোকক্রীড়া তার অন্যতম। আবালবৃদ্ধাবনিতা সকলেই এই খেলা খেলে। একথা ঠিক যে, শিশুকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য অনেকসময় বড়দের ও সংগী হতে হয়। খেলার কোনো বয়স নেই। লোকখেলা সবার। ধনী, দরিদ্র, নারী, পুরুষ, শিশু নির্বিশেষে সকলেই এই খেলায় অংশ নেয়। ছড়া যদি মহাকাব্য হয়, তবে খেলাগুলি তার যেন অলিখিত খণ্ড মহাকাব্য। মহাকাব্য যেমন সমগ্র দেশ ও জাতির কথায় মুখর। এই উপকূলীয় অঞ্চলের খেলাগুলি এখানকার মানুষের রীতি, নীতি, আচার, আচরণ, শিক্ষা, সমাজ, জীবনভাবনা, চিন্তাদর্শ, প্রথা বিশ্বাসের এক জীবন্ত খণ্ড মহাকাব্য। এই উপকূলীয় ভূ-খণ্ডের সামগ্রিক চিত্রে চিত্রিত। খেলাগুলির জন্ম অজ্ঞাতপূর্বকাল হলেও আজও তা সমান ভাবে প্রবাহিত। তবে এই প্রবাহকে আরো গতিময়তা এনে দিতে সমাজের আরো রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে আমাদেরকে অতীতকে রোমন্থন করতে হবে। যাতে পাবো ঝর্ঝরে এক নির্মল সকাল, যে সকালের লোকক্রীড়া এনে দেবে অফুরন্ত প্রাণের ধারা।

২. বর্তমানের ছড়া ঃ

লোকসাহিত্য চলমান। যেহেতু জীবন চলমান, পৃথিবী গতিশীল, তাই গতিশীল বিশ্বের সাথে সামঞ্জস্য বিধান রাখতে লোকসাহিত্য ও গতিশীল হয়ে উঠেছে। কারণ গতিশীলতাই লোকসাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য যা আগামীর কাছে নিয়ে যাবে। আজকের দিনেও তাই রচিত হচ্ছে নানা ছড়া। মানুষের জীবন, পেশা, স্বাস্থ্য, স্বপ্ন তথা সমাজের সবকিছুতেই আজ ব্যাপকহারে লোকসাহিত্য রচিত হচ্ছে। লোকসাহিত্য তাই বর্তমানে একটি জনপ্রিয় সাহিত্য গ্রন্থ।

সাধারণত সুখ-দুঃখ স্বপ্ন, খেলার মতো লোকজীবনের সমস্যাগুলিও ছড়ার বিষয়। যেখানে আছে সমস্যা - সমাধানের নানামাত্রা। বিদ্যালয়ে, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে, ব্লক অফিসে, রাস্তাঘাটে, বিজ্ঞাপনে, প্রেমজীবনে নানা শাখায় বিস্তারলাভ করছে ছড়ার অঙ্গ। তাই ছড়ার আঙ্গিকে এসেছে নবজোয়ার।

'সবার জন্য শিক্ষা', সরকারের এই নয়া পদক্ষেপ মানুষকে নবজীবন দান করেছে। অনেকেই রয়েছে যারা পড়ার সুযোগ পায়নি। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে একটা চিঠির জন্য, কিছু জানার জন্য অপরের দারস্থ হয়। নিজের সম্পত্তি জমিজমা হারিয়ে বৃদ্ধবয়সে পথে বসে, কেবল শিক্ষা, লেখাপড়া নেই বলে। এই লেখাপড়ার স্বপ্নপূরণ হচ্ছে বয়স্ক শিক্ষার দ্বারা। সর্বশিক্ষা তার অন্যতম। তাই বৃদ্ধ বৃদ্ধরা নতুন করে ধরেছে বর্ণমালা —

হাতে খড়ি শ্লেট নিয়ে
বুড়াবুড়ি পড়বে গিয়ে [১৬৩]

শ্লেট নিয়ে শুরু জীবনের নয়া পদক্ষেপ, তা ছড়ায় ব্যক্ত —

সর্বশিক্ষা দিচ্ছে ডাক
সবশিশু শিক্ষা পাক্
সর্বশিক্ষা গ্রামে গ্রামে
আলোর শিখা আনল টেনে [১৬৪]

শুধু বুড়াবুড়ি নয়, যে সমস্ত শিশুরা এখনো শিক্ষার অঙ্গিনায় আসেনি, তারা ও শিক্ষার আলো পাক্ এখানে ছড়ায় সেকথাই ব্যক্ত। সর্বশিক্ষা নিয়ে এরকম বহুছড়া ক্লাবে, বিদ্যালয়ে, মার্কেটে লক্ষ্য করা যায়। শুধু সর্বশিক্ষা নয় (১০০) 'একশ দিনের কাজ' ও সরকারের একটি

নয়া পদক্ষেপ। মানুষের দু-বেলা দুমুঠো ভাতের চিন্তা অনেকটা লাঘব করেছে এই একশ দিনের কাজ। —

আমার কিসের কী
আমার আছে একশ দিন।[১৬৫]

একশ (১০০) দিনের কাজের সুযোগ মানুষকে অনেক বেশি স্বাধীন স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্ম-নির্ভরশীল করেছে। অপরের মুখাপ্রেক্ষী হয়ে থাকার দিন শেষ। আজ প্রায় গরীব খেটে খাওয়া মানুষদের কাজের সন্ধানে বাড়িঘর ছেলেপুলে ছেড়ে বহুদূর দেশে চলে যেতে হয়। হয়তো মন চায় না, তথাপি জীবনের তাগিদায়, বাঁচার জন্য, সবার মুখে হাসি ফোটানোর জন্য আজ বহুমানুষ বাড়ির বাইরে। কিন্তু এই একশ দিনের কাজ মানুষকে এই দোটানার থেকে স্বস্তি এনে দিয়েছে। এখানেই অনেক কাজ পেয়ে যাচ্ছে, ফলে সব হারানোর দুঃখ পেতে হচ্ছে না, তাই একে নিয়ে জনজীবনের ছড়া লেখা হচ্ছে —

একশ দিনের কাজ পাইছি
দিল্লী বোম্বাই ভুলে গেছি।[১৬৬]

পূর্বের তুলনায় মেয়েরা এখন সাবলম্বী হয়েছে। স্বনির্ভর প্রকল্প, আশাকর্মী, স্বাস্থ্যকর্মী, মাতাসংগঠন ইত্যাদি বিষয় গুলিতে মেয়েরা নিজেদেরকে নিয়োজিত করে সংসার এবং নিজের মান সম্মান দুই-ই বজায় রাখছে। এবং এই সব কাজে লিপ্ত মহিলারা নিজেদের কাজের নানাসুযোগ সুবিধা গুলির সুনিয়ন্ত্রণ ও করছে তাদের সমিতির দ্বারা। সেখান থেকে লোন নিয়ে নিজস্ব ব্যবসা, স্বনির্ভর প্রকল্প গড়ে তুলছে। তাই নিয়েও রচিত হচ্ছে আজকের ছড়া —

মহিলা সমিতি কর
পাড়ায় পাড়ায় মিছিল কর
পাবু অনেক সুযোগ টুযোগ
কম সুদে দিবে লোন।[১৬৭]

যেহেতু মেয়েরা ঘরে বাইরে উভয় দিক সামাল দিয়ে চলছে তাই সকলে সরকারের প্রকল্পের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের কন্যা সন্তানেরও মর্ম দিতে শিখেছে। সংগৃহীত ছড়ায় পাই —

কন্যা রত্ন
রাখিবু যত্ন

না রাখিবু আগ্‌লে
নিয়ে যাবে পাগলে [১৬৮]

কন্যারত্ন সত্যিকারেই রত্নহার। এই রত্নহার যদি মর্যাদাহীন হয় তা পাগলের নিয়ে যাওয়ার-ই মত স্বাভাবিক। এ বিষয়ে বর্তমান রাজ্যসরকার ও সচেতন, তাই নানা প্রকল্প পরিকল্পিত হয়েছে। যেমন কন্যাশ্রী। এই কন্যাশ্রী নিয়েও ছড়া লোকের মুখে মুখে —

লেখাপড়া যে মেয়ে করে
কন্যাশ্রী যায় তার ঘরে [১৬৯]

এইভাবে মেয়েরা আজ এই প্রকল্পের অধীনে এসে নতুন করে বাঁচার ঠিকানা পেয়েছে। শুধু কন্যাশ্রী বা একশ দিনের কাজ নয়, স্বাস্থ্যবিধি নিয়েও নতুন নতুন ছড়া রচনা হচ্ছে —

পরিচয় সভ্যতার
সবার ঘরে শৌচাগার
পেটের রোগের প্রবেশদ্বার
বন্ধ করে শৌচাগার [১৭০]

সরকারী কর্মসূচী গুলির অন্যতম 'নির্মল গ্রাম নির্মল জীবন' — এর একখানি নয়া পদক্ষেপ হ'ল শৌচাগার ব্যবহার করা। গ্রামজীবন বা লোকায়ত মানুষ বেশ কিছু দিন পূর্বে বনে জঙ্গালে তাদের নিত্য ক্রিয়া সম্পাদন করত। এতে যেমন পরিবেশ দূষিত হয়, তেমনি আবার রোগজীবাণু ছড়িয়ে পড়ে। ঠিক একারনেই শৌচাগার ব্যবহার বাধ্যতামূলক। মানুষকে অনেকবেশি বিজ্ঞানসম্মত জীবনযাপন এনে দিয়েছে। মানুষ এখন অনেকখানি রোগমুক্ত। এই রোগমুক্ত জীবন আরো বেশি করে সুন্দর হয়ে যাবে, যদি আমরা নিয়মকানন মেনে চলি। তাই সরকারী কাজকর্ম ও বিজ্ঞাপনের জন্য ছড়া একটি অন্যতম মাধ্যম। ছড়ায় পাই শৌচাগার ব্যবহারের পদ্ধতিও—

পায়খানার আগে প্যানে জল
শৌচ করে ঢালব জল
শৌচ পরে সাবান দিয়ে
হাতটি ধুব পরিষ্কার করে। [১৭১]

কিংবা —

ছোট্ট একটি চারাগাছ
তাকে বাড়তে দাও
নিয়মিত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে
টিকা নিতে যাও [১৭২]

উপরের ছড়াতে ঠিক কীভাবে নিত্যক্রিয়া করলে আমাদের জীবন রোগমুক্ত হয়ে উঠবে, সে কথাই বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে বলা হচ্ছে ছোট্ট শিশু একটি ছোট্ট চারগাছের তুল্য। চারাগাছকে যেমন নিয়মিত পরিচর্যা করে বড় করা হয়, তেমনি একটি শিশুও নিয়মিত স্বাস্থ্য পরিচর্যায় বড় হয়ে উঠবে। ছড়াটি একটি উপমা অলঙ্কারেরও দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে। শুধু কীভাবে স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখা যায় তাই নয়, আমরা অসুস্থ হলে কী খাব, সেকথা ও বলেদিচ্ছে ছড়া —

পেটের অসুখে ও. আর. এস.
ব্যবহার করতে যদি চাও
এক লিটার জলেতে
একটি প্যাকেট মেশাও [১৭৩]

পেটের অসুখ হলে ও. আর. এস. ব্যবহার করতে হবে। এবং লিটার জলে এক প্যাকেট ও. আর. এস. মিশ্রণ করে খাওয়ালে পেটের অসুখ সেরে যাবে।

সাধারণ মানুষ ওরা প্রত্যেকেই খেটে খায়। তাই ঘর থেকে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারে না। কেন না যদ্দিন জরির কাজ আছে, তদ্দিন কাঁচা পয়সাও আছে।

ছড়ায় পাই —

আয় করবু ঘরে রইবু
জরির কাজে মন দুবু [১৭৪]

বর্তমানে বাড়ির বুড়োবুড়ি, ছেলে-বউরা প্রত্যেকেই টিভির প্রতি আকৃষ্ট। টিভি সিরিয়াল হলে তো কথাই নেই। বিকেল থেকে প্রত্যেকেই টিভি খুলে বসে পড়ে রাত ১১টা পর্যন্ত সিরিয়ালের ম্যাজিক শোতে। ম্যাজিকের মতো ধোঁকা দেখিয়ে বসিয়ে রাখে ঘন্টার পর ঘন্টা।

আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ ও এমন ঘটনা ঘটাতে পারবে না মনে হয়। যাইহোক, এই সমস্ত সিরিয়াল নিয়েও ছড়া তৈরী হচ্ছে। একটি সংগৃহীত ছড়া হ'ল —

কাকু দ্যাখে বেহুলা
দাদু দ্যাখে খবর
দিদা দ্যাখে বাংলাছবি
কাঁদে সঁপর সঁপর। [১৭৫]

এরকম জলন্ত দৃষ্টান্ত কেবল ছড়াতেই সম্ভব। এছাড়া ছড়ায় পাই—

আমার জল মিশানো দুদ্ নয় গো
দুদ্ মিশানো জল
একে খেলে ছেলে বুড়া
পায় শরীরে বল
এই দুদেতে পেতে পার
কুচো চিংড়ি টিকে পনা
একে খেলে ফড়িং হয়
রাম গড়ুড়ের ছানা
বিক্রি আছে কিনবে যদি
এসো আমার বাটিকা
নামেই আমায় সবাই চিনে
নামটি নয়া টিকা [১৭৬]

ছড়াটি যেন সমাজ পরিদর্শক। সমাজের জীবনযাপনের কথা ফুটে উঠেছে। বর্তমান সমাজে খাঁটি জিনিস পাওয়া বড়ই দুষ্প্রাপ্য। এছাড়াও ছড়ায় উঠে এসেছে আজকের চালচিত্র।

পেট্রোল পাম্পের বিজ্ঞাপনে ছড়া—

পাম্পে আছে উদ্যম
বিদ্যুৎ লাগবে কম

সোনার বিজ্ঞাপনে ছড়ার ব্যবহার —

জীবন যখন একটু ভারি
হালকা সোনা মন বাহারি।

এছাড়া —

আসছে পূজার পাঁচটা দিন
কাটবে খুব মজাতে
প্রথমে আছে ডি. কে. বসাক
সক্কলকে সাজাতে [১৭৭]

সার্ফের বিজ্ঞাপনে ছড়া —

এবার পূজায় বাড়তি খুশি
সফেদ কিনলে বেনারসি।

ছড়ার Synchronic দিকটিকে মনে রেখে বলছি যে, ছড়া আজও রচিত হচ্ছে, আগামীতে ও রচিত হবে। তার-ই দৃষ্টান্ত এই উপ-অধ্যায়ের ছড়াগুলি। যতদিন মানুষ থাকবে, সমাজ থাকবে, গোষ্ঠীচেতনা থাকবে ততদিন সাহিত্যের অঙ্গনে ও রচিত হবে নতুন নতুন লোকছড়া। আর আমরা পাবো বর্তমানের ছড়া।

৩. জাতি-বর্ণমূলক ছড়া ঃ-

উপকূলীয় অঞ্চলে রয়েছে বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের সামবায়িক অবস্থান, যথা ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, ধোপা, কামার, কুমোর, গোয়ালা, ময়রা, ছুতার, জেলে, কামিলা, হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি। ছড়ায় এই সব মানুষদের কথা বেশি করে উঠে এসেছে।

কথায় আছে, ব্রাহ্মণ জাতিশ্রেষ্ঠ। সমাজে তাই তার বড়-ই সম্মান। ছড়ায় কিন্তু ব্রাহ্মণদের নিয়ে নানা কথা বলা হয়েছে। যেমন —

হাটের নিচ্ছা
বাম কে দান

ব্রাহ্মণ মাত্রই পূজা-অর্চনা করে। পূজার সময় দেবতার উদ্দেশ্যে যে নৈবেদ্য দেওয়া হয়, তাও গ্রহণ করে ব্রাহ্মণ। এই নৈবেদ্যে থাকে — আতব চাল, কাঁচকলা, বেগুন, আলু,

পাকাকলা, পান, কিছু পয়সা ইত্যাদি। পূজোর পরে ব্রাহ্মণ-ই তা গ্রহণ করে। কিন্তু তা হাটের একেবারে 'নিচ্ছা' অর্থাৎ খারাপ দ্রব্য বলে অনেকে মনে করে। যেহেতু ব্রাহ্মণকে দান করা হবে, তাই তা সবচেয়ে নিকৃষ্টতম, উপরোক্ত ছড়াটিতে সেকথাই ব্যক্ত হয়েছে। ছড়ায় প্রকাশিত হয়েছে—

বাম ঠাকুর ঠকর
দাওনা চাটি মকর

এখানে 'মকর' বলতে পূজার নৈবেদ্য, প্রসাদের কথা বলা হয়েছে। ব্রাহ্মণ সম্পর্কে মানুষ আরো বলে —

যত কর হাঁই পাঁই
পাঁচশিকার বেশী নাই

ব্রাহ্মণ ঠাকুর কোনো কোনো পূজা-পার্বনে ভীষণ কষ্ট করে। প্রতি গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি যাওয়া, রাত জাগা, সেই তুলনায় প্রণামী পায় বড়ই সামান্য। পূর্বে আলোচিত হলেও আলোচ্য ছড়াটি মূলত ব্রাহ্মণদের উদ্দেশে রচিত বলে আমার বিশ্বাস। তাই ব্রাহ্মণ ঠাকুরের মনোবেদনা ছড়ায় ব্যক্ত হয়েছে। অথচ ব্রাহ্মণ ঠাকুর আমাদের হিতসাধন করে —

আসতে যাইতে করে হিত
তার নাম পুরোহিত

যিনি যেতে আসতে আমাদের মঙ্গাল সাধন করেন তিনিই তো প্রকৃতপক্ষে পুরোহিত। ছড়াটি খুবই অর্থবহ। ব্রাহ্মণের চরিত্র বৈশিষ্ট্য নিয়েও ছড়া তৈরী হয়েছে —

১। লুচির উপর পড়ল ডাল
বাম লাচে তায়ে তা
২। লুচির উপর পড়ল দই
বাম বলে খই কই

কথায় আছে 'বামন হল লাখ টাকার ভিখারী', যতই অর্থ থাক তবু সহজেই লোভী হয়ে পড়ে, খাবার ব্যাপারেও তাই, এই রকম-ই সমাজ ভাবনার কথা ছড়াতে পাই—

মিষ্টি দকানী
তুই খ্যাল্‌তে পারুনি

তোর গদা গদা পা

তুই হড়্‌কি পড়ি যায়

—অনেকেই আছে মিষ্টির ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করে। এই মিষ্টি যারা বানায় তাদের 'ময়রা' বলে আলোচ্য ছড়াটিতে একথাই ব্যক্ত যে ময়রাগণ সারাদিন দোকানে বসে কারবার করে বলে তাই তাদের 'গদা গদা পা' এখানে খেলারচ্ছলে শিশুদের রসিকতাই প্রকাশ পেয়েছে।

ব্রাহ্মণের মতো বোষ্টমরা এই উপকূলীয় অঞ্চলে বাস করে। তাই ছড়া তাদের কথাও বলে—

বষ্টম টমাটম

কাঁকড়া খাবার যম

হাঁড়ি ভিতরে কাঁকড়া রাখিয়া

যায় বিন্দাবন [১৭৮]

ছড়ায় বৈষ্ণবদের ব্যাপারেও কম বলা নেই। যদিও আমরা জানি, বৈষ্ণবরা নিরামিষাশী। তবুও ছড়া তাদেরকে বলতে ছাড়েনি। তাই হাঁড়ির ভিতরে প্রিয় খাদ্য কাঁকড়া রেখে বৃন্দাবনে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এই বোষ্টম ততদিন শান্তিতে থাকতে পারে যতদিন বোষ্টমীও তার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। প্রবাদে বলে — 'বুড়ার বুড়ি মরবেনি' এবং 'টকার মা মরবেনি'। অর্থাৎ বুড়ার বুড়ি-ই অবলম্বন আর শিশুর অবলম্বন তার মা। সেইরকম-ই বোষ্টমের বোষ্টমী অবলম্বন। ছড়ায় আছে —

সারাদিন ভেবে মরি ভিক্ষা করি

রেঁদে দিবে কে

কাল থেকে বষ্টমী আমার

জবাব দিয়েছে। [১৭৯]

কিংবা অন্যভাবে পাই —

বুড়া ভাবছ কি বসে

দরে ফকির বসেছে

না, কাল থেকে বষ্টমী আমার
জবাব দিয়েছে। [১৮০]

এই বৈষ্ণবরা অনেকেই আবার জন্মগতভাবে বৈষ্ণব নয়, বৈষ্ণবের বৃত্তিগ্রহণ তাদের কেবল অভিনয়মাত্র, নকল বৈষ্ণব সাজা, কেননা, এই নকল বেশে রুজি-রোজগার বেশী হয়। ছড়ায় পাই —

যৌ ধবা কে সৌ ধবা
ব্যর্থ হইল বৈষ্ণব সাজা

আলোচ্য ছড়ায় জানতে পারি, ধোপা (ধবা) এখানে বৈষ্ণব (বোষ্টম) সেজেছে। কিন্তু তার এই নকল বৈষ্ণব সাজ সকলের কাছে গোপন থাকে নি। শেষ পর্যন্ত তা ব্যর্থ হয়েছে।

জাতির দিক দিয়ে পিতা-মাতা সমধর্মী নাও হতে পারেন। ছড়ায় আছে —

জাতর কথা কইব নিগো
জাতর কথা কইব নি
বাপ বাজায় তুতুর তুতুর
মা বিকে কুলা সেনি [১৮১]

অর্থাৎ বাবা এবং মা দু'জন দুই ভিন্ন জাতের মানুষ। বাবা ঝুমুর দলে গান বাজনা করে, আর মা বিক্রি করে কুলা, সেনি অর্থাৎ ডোম। সেই জন্য জাতের কথা না বলাই ভাল বলা হয়েছে ছড়ায়। অর্থাৎ এখানে সেই সমাজের কথা বলা হয়েছে, যেখানে বর্ণাশ্রম প্রথাকে ততটা মান্য করা হয় না।

ছড়ায় পাই—

মুসলমান অভিমান
দাঁড়ি কুচ্‌কুচ্‌ করে
একটা চুল পড়ে গেলে
আল্লা আল্লা বলে। [১৮২]

আলোচ্য ছড়াটিতে বলতে চেয়েছে, মুসলমানগণ খুবই অভিমানী হন, তাই তাদের কোনো কারণে যদি একটা চুল পড়ে যায়, তাহলে তারা তাদের আল্লাকে স্মরণ করেন। কেননা,

তাদের এই ‘দাঁড়ি’ তাদের কাছে খুব-ই অহংকারের ও গর্বের বিষয় তাই। কুচ্‌কুচে কালো চুলের দাঁড়িতে তাদের সৌন্দর্য থাকে অটুট ও অক্ষত। যাইহোক বেশ কয়েকটি জাতি-বর্ণমূলক ছড়ার আলোকে এই পর্যায়ের আলোচনা এখানে শেষ করা গেল।

৪. রাজনীতিমূলক ছড়া ঃ

ছড়াকে একসময় উদ্দেশ্যহীন বলে ভাবা হত, যেমন অসংলগ্ন, তেমনি ছড়ানো ছিটানো টুকরো টুকরো ভাঙ্গা চিত্রময় বলে। সময়ের পরিবর্তন হয়েছে, গতির আবর্তে ছড়াগুলি আর অনর্থক নয়। তাছাড়া নির্মলেন্দু ভৌমিক তাঁর ‘বাঙ্‌লা ছড়ার ভূমিকা’ গ্রন্থেও বলেছেন, ছড়াগুলি অনর্থক বা অসংলগ্ন নয়। একথা আমি পূর্বে আলোচনা করেছি। আপাতঃভাবে মনে হতে পারে যে, ছড়াগুলি অস্পষ্ট, অর্থহীন, কিন্তু আসলে তা নয়, তাদের প্রতিটির অর্থ ব্যাপকতা রয়েছে। হয়তো কোনো কোনো ছড়া ধুম্রময় ধূলিজাল নিয়ে আমাদের মনে ধোঁয়াশার সৃষ্টি করে থাকলে ও গভীরতর অর্থে গোটা ছড়ার মধ্যে এক অখন্ডভাব ব্যক্ত হয়ে থাকে। কেবল আমরা তার সার্বিক অর্থগ্রহণে অপারগ হয়ে উঠি মাত্র। কেননা ছড়া যদি উদ্দেশ্যহীন, অসংলগ্ন, অর্থহীন হতো, তবে তা কখনোই এত আনন্দদায়ক হতো না। প্রতিটি ছড়াই আমাদের মনের মধ্যে আনন্দ প্রদান করে, এক মহাতৃপ্তির স্বাদ এনে দেয়। তাই তো ছড়া এত উপভোগ্য, রসোত্তীর্ণ। যদি তা নাই বা হতো ছড়া এতখানি রসোত্তীর্ণ হতো কি করে? এখানেই ছড়ার সার্থকতা।

সমাজ পরিবর্তনশীল। সমাজ মানুষ ও তাই পরিবর্তনশীল। মানুষের ভালোলাগা, মন্দলাগা, চাওয়া-পাওয়া, লাভ-ক্ষতি ইত্যাদির সকল হিসাব সবসময় নির্দিষ্ট মাপকাঠিতে হয় না। তার সঙ্গো সঙ্গো সমাজভাবনা, ঐতিহ্য সংস্কৃতি, পারিবারিক বিনোদন, রাজনৈতিক চিন্তাধারা সবকিছুই পাল্টে যাচ্ছে। গতিয়মান এই জীবনে ছড়ার বিষয়বস্তুতে তাই ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, কূটনীতি, ষড়যন্ত্র, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, সংঘর্ষের এক বিরাট প্রেক্ষাপট ঢুকে পড়েছে। অর্থাৎ সমাজ বিবর্তণের সঙ্গো সঙ্গো মানুষের সামগ্রিক জীবনের বিবর্তণও ঘটে যাচ্ছে। তাই স্বাভাবিক কারণে ছড়ার মধ্যেও রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটে চলেছে।

কোনো একটি দেশের প্রশাসনিক পরিকাঠামো নির্দিষ্ট কোনো একটি দলের দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। কেননা একটি দল মানেই একটি গোটা রাষ্ট্র নয়। সেখানে নানা, জাতি, ধর্ম, বর্ণের সমন্বয়। বিশেষ করে বৃহৎ দেশ ভারতবর্ষের জন্য তো এই

কথা খাটে না। কেননা, ভারতবর্ষে বহুধর্মের বাস। তাই প্রতিটি জাতি তাদের চাওয়া-পাওয়া, উৎপাদন-বন্টন, ইত্যাদি বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষন করে। আর সেইখান থেকেই সৃষ্টি হয়, ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শ ও ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দল। এই মতাদর্শের মূল কেন্দ্রবিন্দু হল দেশের সম্পত্তি। প্রশ্ন হল এই সম্পদের অধিকারী হবে কোন্ রাজনৈতিক দল? তখন এর উত্তরে জন্ম নেয় বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠী বা দল।

এখন প্রশ্ন এই রাজনৈতিক দল বলতে আমরা কী বুঝি? কাকে আমরা রাজনৈতিক দল বলব? এদের কাজ-ই বা কী? একটি দেশ বা রাষ্ট্রে আছে বহু মানুষ, প্রাকৃতিক ও সামাজিক, অর্থনৈতিক সম্পদ। ভূ-প্রকৃতি, জলভাগ, স্থলভাগ, মহাকাশ। এই সমস্ত কিছুর ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতন, ভাঙ্গা-গড়া, ইত্যাদি নানা বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলি সমস্যার সমাধান করে থাকে, এবং তা যৌথভাবে, সংঘবদ্ধভাবে। একই মতাদর্শের দ্বারা চালিত দেশের নাগরিকবৃন্দ যখন কোনো রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান করে, তখন তারা একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে। রাজনৈতিক দলগুলি বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধভাবে সরকারী ক্ষমতা দখল করে নানা নীতি প্রনয়ন করে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি পোষ্টার, মিছিল মিটিং বক্তৃতা, জনসভার মধ্য দিয়ে জনগণের সামনে দেশের সমস্যাবলীর বিবরণ দেয়, তাতে দেশের আপামর জনগন বর্তমান দেশ-জাতি-রাষ্ট্র সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়, পারস্পরিক মত বিনিময় ভাবনা চিন্তা করে, তারা জনমত গঠন করে। জনমত গঠনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করে, দেশের তথা জনগনের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত করে, তবে তা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলকে নির্বাচন করে। গনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় এমনটাই বাঞ্ছনীয়। এতে দেশের ও রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক কাঠামো সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত হয়।

তাই রাজনৈতিক দল আমরা তাকেই বলব, যারা ভোটাভুটির মাধ্যমে দেশের রাষ্ট্রনৈতিক শাসন ব্যবস্থা সুপরিচালনার জন্য সরকারকে নিয়ন্ত্রিত করে, এবং জনদরদী নীতিপদ্ধতি প্রনয়ন করে। জনৈক সমালোচক আবুল ফজলহকের মতে, —

“বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে দলের উৎপত্তি হইতে পারে। কোন দেশেরই সকল ব্যক্তি সকল বিষয়ে একইরূপমত পোষন করে না। সুতরাং এক মতালম্বী একদল লোক সংঘবদ্ধ হইয়া একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে। যে সমস্ত দেশে ধর্ম-বর্ণ-জাত বা ভাষার

কারণে এক সম্প্রদায়ের সহিত অন্য সম্প্রদায়ের স্বার্থের বিরোধিতা বর্তমান থাকে, সেই সমস্ত দেশে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক দলের সৃষ্টি হইতে পারে। আধুনিককালে সাম্প্রদায়িক দল গঠনের প্রবণতা হ্রাস পাইয়াছে। কোন কোন দেশে বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ রাজনৈতিক প্রশ্নে মতপার্থক্য উপস্থিত হওয়ায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয় এবং একই প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া যাইবার পরেও উহাদের অস্তিত্ব থাকিয়া যায়।'' [১৮৩]

বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব নিয়ে লেখা একটি ছড়া যা আমাদের সকলের অতি পরিচিত —

সা রে গা মা পা ধা নি
বোম ফেলেছে জাপানি
বোমের ভিতর কেউটে সাপ
ব্রিটিশ বলে বাপরে বাপ [১৮৪]

এই ব্রিটিশদেরকে মানুষ কিছুতেই সহ্য করতে পারত না। প্রায় দু'শ বছরের অত্যাচারের গ্লানি, রাজনৈতিক বিপর্যয় তা আমাদের ইতিহাসের পাতায় খোদিত। উপকূলীয় এই অঞ্চলের মানুষজন দীর্ঘদিন ধরে নানা আন্দোলনের সামিল। বহুমানুষ এসেছে রাজনৈতিক আবেদন নিয়ে। তাদের প্রতি তাই এখানকার মানুষের যে প্রতিক্রিয়া তা ছড়ায় প্রকাশ পেয়েছে —

আভা মাতি আইলো
মাইলো ঘাঁটা খাইলো [১৮৫]

আজ থেকে প্রায় চল্লিশ - পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্বে যখন এই অঞ্চল কংগ্রেসের ছত্রছায়ায় ছিল, তখন বাংলার কন্যা সুন্দরী এম.এল.এ. আভা মাইতি-র যুগ ছিল। তিনি ছিলেন জনদরদী, মমতাময়ী, তাই সমাজের সকলের জন্য 'মাইলো ঘাটা' অর্থাৎ গমের তৈরী খাদ্য ঐ সময়ে সবাইকে দেওয়া হত। তাই তার-ই জয়ধ্বনিসূচক মানুষ এই ছড়ারূপ স্লোগান তৈরী করেছে —

আভা মাইতির মাইলো
জগৎ জুড়িয়া খাইলো

প্রতিটি রাজনৈতিক দলের বিরোধীদল তো থাকেই। এখানেও আছে। তাই বিরোধী পক্ষের রাজনৈতিক অঙ্গানে অন্য সুর প্রতিধ্বনিত হয়, —

শুনলে দাদা হাসি পায়
কাটা হাত ভোট চায়

ভোট দিন বাঁচতে

দা-হাতুড়ি কাস্তে।[১৮৬]

রাজনীতির নিজস্ব একটি নীতি আছে। মানুষ রাজনীতি করে আপামর জনগণের কল্যাণ সাধনার জন্য। কিন্তু যখন-ই মানুষ নিজেই আত্মস্বার্থ চরিতার্থের দিকে মন দেয়, তখন-ই তা বিপর্যয় ডেকে আনে। মানুষের মনের মণিকোঠায় খুব কম জনই পেরেছে আসন পেতে নিতে। তা ছড়ায় প্রকাশিত—

ভোট দিলে কাটা হাতে

মরতে হবে আঁতে ভাতে

ভোটের দিন এগিয়ে এলে, এখানকার বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী দলগুলি প্রত্যেকে, প্রত্যেককে নানা মন্তব্য প্রকাশ করে। তাই হাত চিহ্নে ভোট দিলে না খেয়ে বাঁচতে হবে বলা হয়েছে উপরোক্ত ছড়ায়।

স্বাধীনতার পর দীর্ঘ বৎসর ধরে এই এলাকায় বামফ্রন্ট সরকারের শাসন জারি হয়েছে। ফলে তাদের বিরোধী দল ও এই এলাকায় গড়ে উঠেছে। তারাও ভোটের সময় নানা ছড়া তৈরী করে, যথা —

আর নয় দরকার

বামফ্রন্ট সরকার

বামফ্রন্ট বিরোধীরা বলে উঠেছে —

১। জ্যোতিবসুর জ্যোতি নাই

হাত ছাড়া গতি নাই

২। জল নাই মেঘ নাই

সিপিএমের ভোট নাই

৩। অমুক তারিক আসচে দিন

জ্যোতিবসুর বিয়ের দিন

দীর্ঘদিনের বামফ্রন্ট সরকারের রাজত্বকালে বিরোধী দলনেতাগণ এরকম ছড়া তৈরী করে দেওয়ালে দেওয়ালে কিংবা স্লোগান দিয়ে জনমত গঠন করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু উল্টো

কথাটাও ঠিক। এতদিনের একজন নেতা, শুধু নেতা নন, তিনি ছিলেন তখনকার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবসু। বহুমানুষ জ্যোতিবসুকে শ্রদ্ধা করতেন। তার ভাষণ, ব্যক্তিত্ব, প্রতিশ্রুতি, পাণ্ডিত্য সবকিছুই মানুষের মনকে টেনে নিয়েছিল। তাই বামফ্রন্ট সরকার ও দীর্ঘদিন তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল। বহু মানুষ ছিল জ্যোতিবসুর ভক্ত। তখন এইভাবে বিভিন্ন রকম ছড়া রচিত হয় —

তোমার আমার দরে দরে
বামফ্রন্ট ঘরে ঘরে

এখনকার মেহনতি, খেটে খাওয়া মানুষজন থেকে সমাজের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি বামফ্রন্টকে ভোটে জিতিয়ে দিয়েছে। তাই তারা দীর্ঘদিন শাসনজারি করতে পেরেছে। তাই ছড়া বলেছে —

বন্দে মাতরম্
মুড়ি খেয়ে পেটগরম্

অর্থাৎ এই শ্লোগান বা ছড়া কংগ্রেস পার্টিকে ইঙ্গিত করে রচিত হয়েছে। আরো বলেছে—

লড়াই লড়াই লড়াই চাই
লড়াই করে বাঁচ্‌তে চাই

ভোটের দিন এলে যেন সাজ সাজ রব, এই অঞ্চলের মানুষজনের মধ্যে প্রত্যেকের মধ্যে থাকে চাপা উত্তেজনা, কে হারে বা কে জেতে, সেই পরীক্ষার জন্য দিন গুনতে থাকে সবাই, সকলেই চায় নিজের মতামতের যোগ্যতা যাচাই হোক, সেইমত ফলাফল পাবার আশায় ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার আয়োজন হয়। ছড়ায় পাই —

অমুক তারিক অমুক দিন
ভোট কেন্দ্রে যাবার দিন

রাজনীতির মঞ্চ যেন রঙ্গমঞ্চ। এই মঞ্চে কুশীলবরা আসে, তারা নিজেদের অভিনয় অংশ, কলা-কৌশল দেখিয়ে আবার চলে যায়। পুনরায় অপর জন আসে। এই আসা-যাওয়ার পথের মাঝে যার যাকে ভাল লাগে তাকেই মানুষ নির্বাচন করে। তবে এঁদের মধ্যে নানা মতাদর্শ

থাকে। কেউ ভাবে রাষ্ট্রীয় আদর্শকে চরিতার্থ করতে, কেউভাবে নিজস্বার্থ চরিতার্থ করতে, তাই রাজনীতির ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ বহুমাত্রিক ও বিভ্রান্তিকর।

বামফ্রন্টের শাসনকালে এদেশে আসে বিজেপি সরকার ও তৃণমূল সরকার। আসলে এক একটা সময় যেন এক এক রাজনৈতিক দলকে নির্দেশ করে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর থেকে গণতান্ত্রিক শাসক ক্ষমতা পালাবদলের মধ্য দিয়ে এগিয়ে এসেছে। তার মধ্যে উপকূলীয় অঞ্চলে মূলত চারটি দলকে বেশী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেখি। যথা - কংগ্রেস, সিপিএম, বিজেপি, তৃণমূল-কংগ্রেস। মিউজিক্যাল চেয়ারের মতো করে এক একজন আসছে, অপর জন চলে যাচ্ছে। ঠিক এই নিয়মে যেন বিজেপি সরকার এল। তাই ঘরে ঘরে ফুটল পদ্মফুল, মানুষ তাকে নিয়ে রচনা করল ছড়া। ভাবলে ভাল-ই লাগে মানুষ কেমন পরিবর্তনশীল এবং অভিযোজনকারী। খুব দ্রুত নিজেদেরকে মানিয়ে নিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্র যেদিকে যায়, সেদিকেই তাদের সৃষ্টিশীলতাকে, সৃজনশীলতাকে নিয়ে যায়, প্রকাশ করে মনের ভাবকে ছড়ার নানা ভঙ্গিমায় ও ছন্দে, —

ভোট দিবেন কুনখানে
পদ্মফুলের মাঝখানে

বিজেপি সরকারের পর দেশের মানুষ আবার পরিবর্তনের পথ খোঁজে। আসে ঘাসের উপর জোড়াফুল আঁকা তৃণমূল-কংগ্রেস দল। ফলে তৃণমূল-কংগ্রেসের প্রতীক জোড়াফুলকে নিয়ে রচিত হয় নানা ছড়া —

ভোট দিবেন কুনখানে
জোড়াফুলের মাঝখানে

এছাড়াও —

১। চুপচাপ
ফুলে ছাপ

২। ঘাসের উপর জোড়াফুল
ঘরে ঘরে তৃণমূল

৩। এবার ভোটে জিতবে কে
তৃণমূল কংগ্রেস আবার কে

তৃণমূল সরকারের প্রতীক জোড়াফুল আজ সবার ঘরে ঘরে, প্রত্যেকের মনের গভীরে। পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামের মাটিতে (২০০৭) ১৪-ই মার্চ যে রাজনৈতিক বিপর্যয় ঘটে গেল, তার জন্য উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের মনে স্থান করে নিল তৃণমূল সরকার। সবাই মনে করে, অশান্ত নন্দীগ্রামকে শান্ত নন্দীগ্রামে পরিণত করল আজকের তৃণমূল সরকার। মানুষকে, মানুষের মর্যাদা, বিশ্বাস, আশা-ভরসা, শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে দিল এবং স্থায়ী জীবনযাপনের অঙ্গীকারে রচনা করল ছড়া —

নন্দীগ্রামের মাটি
সোনার চেয়ে খাঁটি

শ'য়ে শ'য়ে মানুষ নিরন্ন, বস্ত্রহীন হয়ে রাজনৈতিক টানাপোড়েনে সেদিন একবস্ত্রে বাড়িছাড়া হয়ে বেরিয়ে এসেছিল, হারিয়েছিল স্বজন, প্রিয়জনদের মুখের হাসি, কত মা শিশুকে হারিয়েছে, কত স্ত্রী স্বামীকে হারিয়েছে, কত সন্তান পিতাকে হারিয়েছে কেবল ঊর্দ্ধশ্বাসে দু'চোখ যায় 'পালিয়ে চলো, পালিয়ে চলো' হাতে নগ্নশিশুর হাত, কোলে মাথায় কাপড়ের পুঁটলি নিয়ে যখন মাঠ দিয়ে ছুটে পালিয়ে যায়, তখন চতুর্দিক থেকে আসে আতঙ্ক, বোমাতঙ্ক, মানুষ ঐ মৃত্যুবোমার মাঝখান দিয়ে কেবল নিজেকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা, করে গেছে। এমন নির্মম, নিষ্ঠুর কালোরাতির অভিশাপ মুক্ত করে আলোর পথ দেখিয়েছিল তখন এই তৃণমূল সরকার। ভয়ে-বিস্ময়ে, মানুষ যখন বিভ্রান্ত, তৃণমূল দল এল শান্তিবারি নিয়ে। এই মা, মাটি, মানুষের সরকারকে যিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন, তিনি আর কেউ নয়, জনগণের সকলের গর্বের নেত্রী মমতা ব্যানার্জী। মমতা ব্যানার্জীর আশ্বাসে মানুষের মনে নতুন আশার সঞ্চার হলো, যারা ঘর ছাড়া তারা ঘরে ফিরে এলো, নিরন্ন, অসহায় মানুষের মুখ থেকে রচিত হল ছড়া। যা দিয়ে নন্দীগ্রাম হল ইতিহাসখ্যাত। নন্দীগ্রামের আমজনতার মুখে শুনি —

নন্দীগ্রামে মমতা
করে দিবে সমতা

এত মৃত্যু, এত ঘরছাড়া মানুষ, তাদের অশ্রু, দ্বন্দ্ব-সংঘাত সবকিছুর অবসান হয়ে যাবে বলে রচনা করেছে নতুন নতুন ছড়া। আর তা যার দ্বারা সম্ভব তিনি হলেন বর্তমান পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া মমতা ব্যানার্জী।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী আমজনতার সরকার। সবার সরকার হয়ে যে যে পদক্ষেপ নিচ্ছেন তা সত্যিই প্রশংসার দাবী রাখে। বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নানা প্রকল্প, বেকার যুবক-যুবতীর জন্য অনুদান, যথা—কন্যাশ্রী, শিক্ষাশ্রী, রূপশ্রী, সবুজসাথী, যুবশ্রী ইত্যাদি ইত্যাদি প্রকল্প আজ শুধু নন্দীগ্রাম নয়, গোটা পূর্ব মেদিনীপুর তথা পশ্চিমবঙ্গাকে পাল্টে দিয়েছে। বিশেষ করে আমার গবেষণার এই ক্ষেত্রটিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে।

এভাবে দেশ পরিচালনায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আসে আর যায়। আমজনতা তাদের বিভিন্ন রকম সমালোচনা ও করে। কোনো রাজনৈতিক দল যখন অতিরিক্ত দুর্নীতি, অবক্ষয়ের স্বীকার হয়ে পড়ে জনগণ কিংবা লোককবিরা বিভিন্ন ছড়ায় তাদের সমালোচনা করে সঠিক নীতি পদ্ধতিতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে। একটি ছড়ায় পাই—

আমি যদি ভোটে নামি
রাখ্‌বনি পচার কমই
কী বলবি আমারে আর
অঞ্চল করব ছারখার [১৮৭]

এই ধরনের নেতা ও পাওয়া যায়। যিনি নেতা হননি, অথচ যদি হন তবে তিনি ভোটের প্রচার প্রচুর করবেন এবং গোটা অঞ্চল কাঁপিয়ে তুলবেন। এই রূপ মানসিকতার মধ্যে কোথায় যেন জুলুমবাজির একটা ইংগিত পাওয়া যায়।

যাইহোক্ আমার ষষ্ঠ অধ্যায়ের 'রাজনীতি' মূলক উপঅধ্যায়ে ক্ষেত্রসমীক্ষায় যে সব ছড়াগুলি পাওয়া গেছে কেবল সেইগুলিই এখানে তুলে ধরেছি। রাজনীতি মানুষের কল্যাণে, রাষ্ট্রের কল্যাণে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশাসনিক কাজকর্ম - পর্যন্ত প্রভৃতি ক্ষেত্রকে তা প্রভাবিত করে, রাজনৈতিক দলগুলিও তাদের সুনীতি, সুপদ্ধতি প্রয়োগ করে। তাই কিছু কিছু রাজনৈতিক দল মানুষের কাছে তাদের সঠিক পন্থার জন্যই চিরকালের আসন গ্রহণ করে। আর তার প্রভাব পড়ে লোককবিদের মনে। তারা ভালোমন্দ বিচারের লোক-আদালত। তাদের মৌখিক সাহিত্য ছড়ায় সেগুলি তারা প্রতিফলিত করে। আর তার জন্যেই প্রকৃত একটি দলই পারে, জনগণের সঙ্গো সংযোগ রক্ষা করে, সরকারকে নিয়ন্ত্রিত করতে এবং সঠিক নীতি নির্ধারণ করতে।

৫. পাঠান্তর বিষয়ক ছড়া ঃ

লোকসাহিত্য গোষ্ঠীনির্ভর সমাজের লোকায়ত সৃষ্টি। সে কারণেই লোক সাহিত্যের বিভাগগুলি লোকায়ত সমাজের সৃজনশীলতার ফসল। উপকূলীয় অঞ্চলের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে প্রাপ্ত লোকছড়াগুলির ভিন্ন পাঠান্তর রয়েছে। যেহেতু এই বিভাগটি লোকসাহিত্যের সামগ্রিক সৃষ্টি এবং মুখে মুখে চর্চিত ও বাহিত, সেইহেতু একই পাঠের ভিন্ন ভিন্ন পাঠান্তর ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে রয়েছে। ছড়াগুলি একই বিষয়, একই উপাদান হওয়া সত্বেও বিভিন্ন জনের হাতে পড়ে বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে ছড়াগুলিকে মেঘের সহিত তুলনা করেছেন। এরা যদৃচ্ছাভাসমান এবং বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে বলেছেন যে —

"ছড়ায় বিশুদ্ধ পাঠ বা আদিম পাঠ বলিয়া কিছু নির্ণয় করিবার উপায় বা প্রয়োজন নাই। কালে কালে মুখে মুখে এই ছড়াগুলি এতই জড়িত মিশ্রিত এবং পরিবর্তিত হইয়া আসিতেছে যে ভিন্ন ভিন্ন পাঠের মধ্য হইতে কোনো একটি বিশেষ পাঠ নির্বাচিত করিয়া লওয়া সংগত হয় না। কারণ এই কামচারিতা কামরূপধারিতা ছড়াগুলির প্রকৃতিগত। ... ইহারা দেশকালপাত্র বিশেষে প্রতিক্ষণে আপনাকে অবস্থার উপযোগী করিয়া তুলিতেছে। ছড়ার সেই নিয়ত পরিবর্তনশীল প্রকৃতিটি দেখাইতে গেলে তার ভিন্ন ভিন্ন পাঠ রক্ষা করা আবশ্যক।" [১৮৮]

তবে লোকসাহিত্যের বিভিন্ন বর্গগুলি যথা — প্রবাদ, ধাঁধা, কথা প্রভৃতির মধ্যে এই পাঠান্তর লক্ষ্য করা গেলেও ছড়ার ক্ষেত্রে পাঠান্তর -ই সর্বাধিক পরিলক্ষিত হয়।

একই ছড়ার কীভাবে বিভিন্ন রকম পাঠান্তর লক্ষ্য করা যায় তা নিম্নে তুলে ধরা হল;—

বরুণকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত 'বাংলা ছড়া পরিক্রমা', পৃ — ১৫৬ - ১৫৭ তে, যশোর থেকে সংগৃহীত একটি ছড়া হ'ল —

'ইকিড় মিকিড় চামচিকি,
চামে কাটা মজুমদার,
দে এলো দামোদর।
দামোদরের হাটি কুটি,
গোয়ালি বসে চালকুটি।

চাল কুটতি হলো ব্যালা।

ভাত খাও সে দুপুর ব্যালা।

ভাতে পড়লো মাছি,

কুদাল দিইয়ে রাঁছি।

কুদাল হ'ল ভুঁতা,

খেক শিয়ালের মাথা।।' [১৮৯]

সিলেট থেকে সংগৃহীত অন্য একটি ছড়া হ'ল —

'ইটিমিটি

চাউল চি'টি

দু'পার গ'বর বাবুর্চি

দু' পায় আয়লা গুয়াল মাছ'

বউয়ে দিলা খু'লা

হক'ল কু'টমে খা'ইয়া দেখ' ইন

বউর পেট ফু'লা।' [১৯০]

রাজশাহী জেলা থেকে এই ছড়ারই অন্য একটি রূপান্তর হ'ল —

'ইকিড় মিকিড় চামচিকিড়,

চামের আড়া দক্ষিণ পাড়া,

ওঠ ওঠ ভাই রে,

মাথার (আমার) ছাতি ধরবে।

ছাতির উপর ঘুমরা,

মেঘে মারে টুকরো।' [১৯১]

অরুণ প্রকাশ সিংহের 'মানভূমের কিছু ছড়া ও গান রচনায় 'ইকড়ি মিকড়ি' ছড়ার স্বতন্ত্র পাঠটি হ'ল —

'ইকিড় মিকিড় — দাঁত কিড়মিড় —

দাঁতের পকা লইড়ল;

ওল গাছ বোল গাছ,

রাজা ঘরের জগন্নাথ,
জগন্নাথের হাঁড়িকুড়ি,
দুয়ারে বইসে চালকুঁড়ি।
চাল কুঁইড়তে হ'ল বেলা,
ভাত হ'ল ঢেলা ঢেলা,
দুয়ারে আছে নিমগাছটি
নিম ঝুরঝুর করে,
সদাই বিরালীর বিটি
লিত্যি লিয়াই করে। [১৯২]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের ২৩ সংখ্যক ছড়াটির একটি পাঠান্তর —

'ইক্‌ড়ি মিক্‌ড়ি চাম চিকড়ি
চাম কাটে মজুমদার।
ধেয়ে এল দামুদর।
দামুদর ছুতরের পো।
হিঙুল গাছে বেঁধে থো।।
হিঙুল করে কড়্‌মড়্‌।
দাদা দিলে জগন্নাথ।।
জগন্নাথের হাঁড়িকুঁড়ি।
দুয়োরে বসে চাল কাঁড়ি।।
চাল কাঁড়তে হ'ল বেলা
ভাত খাও সে দুপুরবেলা।।
ভাতে পড়ল মাছি।
কোদাল দিয়ে চাঁচি।
কোদাল হ'ল ভোঁতা।
খা ছুতরের মাথা।।' [১৯৩]

আশ্‌রাফ সিদ্দিকীর ‘লোকসাহিত্য’ গ্রন্থের ১৯৪ পৃষ্ঠায় এই ছড়াটির একটি রূপান্তর পাই —

ইট্‌কি বিট্‌কি,
চাম চিট্‌কি,
চামের বেটা লখিন্দর।
সাইজা আইল ডামাডোল।।
জামাডোলের ভিতরে আছে জোড়া কবুতর।
সেই কবুতর মারা পইলো খোপ্পের ভিতর।। [১৯৪]

উপকূলীয় অঞ্চলের লোকভাষায় প্রাপ্ত এই ছড়াটির পাঠান্তর হ’ল —

ইক্‌ড়ি মিক্‌ড়ি চামচিক্‌ড়ি
চামের কাটা মজুমদার
ধেয়ে এল দামোদর
দামোদরে হাঁড়িকুঁড়ি
দুয়ারে বুসে চাল কুঁড়ি
চাল কুটতে হ’ল বেলা
ভাতি খাব কত বেলা
ভাতে বুসল মাছি
কোদাল দিয়া চাঁছি
কোদাল হ’ল ভোঁতা
খা ছুতারের মাথা। [১৯৫]

শিশু মায়ের কাছে চির আদরের পাত্র। তাই কখনো সে সোনা, কখনো মানিক, কখনো চাঁদের তুল্য। যেখানে আকাশের চাঁদ আর মায়ের কোলের চাঁদের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। আর সেকারণেই মামাবাড়িতে চাঁদের খুব আদর। শিশুর কাছে মামার বাড়ি -ই সবচেয়ে প্রিয় জায়গা। কারণ মায়ের পরই মামাবাড়ির আদর শিশুর জীবনে স্নেহবর্ষণ করে। এই অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় ‘তাই তাই তাই’ ছড়াটির যে যে পাঠান্তর পাওয়া যায় —

১।   তাই তাই তাই
মামার বাড়ি যাই

মামার বাড়ি ভারী মজা

কিল চড় নাই [১৯৬]

২। তাই তাই তাই

মামার বাড়ি যাই

মামা দিল দই সন্দেশ

দুয়ারে বসে খাই [১৯৭]

৩। তাই তাই তাই

মামাদরকে যাই

মামাদরে ভারি মা

কিল চড় নাই। [১৯৮]

এ প্রসঙ্গো উল্লেখ্য পশ্চিম মেদিনীপুরের প্রচলিত ছড়াটি হল—

তাই তাই তাই

মামা বাড়ি যাই

মামি এল লাঠি নিয়ে

পালাই পালাই [১৯৯]

একই ভাবসম্পন্ন ছড়াটির নানা পাঠান্তর। আধুনিকতার ছোঁয়ায় মামা বাড়িতে এখন মামির প্রভাব লক্ষণীয়।

আশুতোষ ভট্টাচার্যের সংগ্রহে রয়েছে এই রকম ৯টি ছড়া, তার দু-একটি তুলে ধরলাম—

২-সংখ্যার ছড়াটি —

'তাই তাই তাই

মামা বাড়ি যাই

মামা ঘরে মনসা পূজা

পূজার কলা খাই' [২০০] (২৪ পরগণার ছড়া)

৩-সংখ্যার ছড়াটি —

‘তাই তাই তাই
মামা বাড়ি যাই
মামা ঘরে ভাত দিল না
সরায় খেয়ে যাই।। [২০১] (২৪ পরগণার ছড়া)

অনেক সময় ছড়ায় পাঠান্তর নির্ভর করে তার চরণসংখ্যার উপর। যেমন ‘বড় বউ বড় ঘরের ঝি’ এই ছড়াটির ভিন্ন ভিন্ন চরণ সংখ্যা। ২৪ পরগণার বলে —

বড় বউ বড় মানুষের ঝি,
তাকে বলতে পারি কি,
মেজ বৌটি বেগুনকুটি
কথা বল্লে ঠিক্‌রে উঠি [২০২]

চট্টগ্রামে পাই —

বড় বউ বড়ুয়ার ঝি
তান কথা কৈয়ম কি?
মধ্যম বউঅর্ হাতত হরা।
সকল গুষ্টি ভাতে মরা। [২০৩]

মেদিনীপুরে পাই —

বড় বউ বড়ালের ঝি
রান্না ঘরে বসে কর কি?
পটল ভেজে পালায় ঝি,
মেঝ বৌ মেঝের মাটি।
সব কথাতেই ঝনকে উঠি [২০৪]

পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চল থেকে সংগৃহীত এই ছড়ার পাঠান্তরটি হ’ল —

বড় বউ বড়(অ) ঘরের ঝি
তারে আর বলব কি

মাজিয়া বউ মজা কাটে
কথা কইনে ঝম্‌কি উঠে
সাজিয়া বউর মুখে পান
গুম্‌রি ভিতর কুটে ধান
ছোট বউ দুদের লাউ
তার দিয়া মোর জীবন যাউ [২০৫]

আরো একটি প্রচলিত ছড়ার কয়েকটি পাঠান্তর হ'ল —

১। উঁচু কপালী চিরুণ দাঁতি
তোর কপালে নাইকো পতি

২। উঁচু কপালী চিরা দাঁতি
তোর কপায়ে নাইকো পতি

৩। পাড়া ধড়্‌কী ধকড় ধাঁই
তোর কপালে পাল্‌কী নাই

বিবাহের জন্য নিজেকে সুন্দর হতে হয়। মেয়ে যদি সুন্দর না হয়, তাহলে তারপক্ষে ভালো ছেলে জোগাড় করা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তাই পাড়া প্রতিবেশীর শ্যেন দৃষ্টি জানিয়ে দেয়, মেয়েটির ভাগ্যে পতি নাই। এই ভাবনা কেবল এক জায়গায় সীমাবদ্ধ নেই, তাই বিভিন্ন স্থানের হলেও একই ভাবনার দ্বারা ভাবিত নানা পাঠান্তরের সৃষ্টি হয়েছে. এই রকম আরো একটি পাঠান্তর হলো —

১। পরের ছেলে পরমানন্দ
পড়ু নাই পড়ু মহা আনন্দ

২। পরের ছেলে পরমানন্দ
নষ্ট হইনে খুব আনন্দ

৩। পরের ব্যাটা পরমানন্দ
মূর্খ রইনে খুব আনন্দ

৪। আমার ছেলে ছেলেটা
খায় যেন এতটা

নাচে যেন ঠাকুরটা
পরের ছেলে ছেলেটা
খায় যেন এত্তটা
নাচে যেন বাঁদরটা [২০৬]

৫। পরের ছেলে পরমানন্দ
নাই পড়নে খুব আনন্দ

মানুষের জীবনের নানা উত্থান পতনের সঙ্গে সঙ্গে চলমান জীবন ও প্রভাবিত হয়। ছড়ায় লোকায়ত জীবনে জীবিকাগত কারণে এসেছে নানা পাঠান্তর। রবীন্দ্রনাথের 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে ৪১ ও ৪২ সংখ্যক ছড়ার পাঠান্তর হ'ল —

'মাসিপিসি বনকাপাসি। বনের মধ্যে টিয়ে।
মাসি গিয়েছে বৃন্দাবন দেখে আসি গিয়ে।।
কিসের মাসি কিসের পিসি কিসের বৃন্দাবন —
আজ হতে জানলাম মা বড়ো ধন।।
মাকে দিলাম শাঁখা শাড়ি।
বাপকে দিলাম নীলে ঘোড়া।।
ভাইয়ের দিলাম বিয়ে —
কলসীতে তেল নেইকো, কিবা সাধের বিয়ে,
কলসীতে তেল নেইকো, নাচব থিয়ে থিয়ে।।' [২০৭]

দ্বিতীয় পাঠান্তরটি হ'ল —

'মাসিপিসি বনকাপাসি বনের মধ্যে ঘর।
কখনো বল্‌লি নে মাসি কড়ার নাড়ু ধর।।' [২০৮]

উপকূলীয় অঞ্চলে সংগৃহীত এই ছড়ার পাঠান্তরটি হ'ল —

মাসিপিসি বনগাঁবাসি বনের ভিতর ঘর
কখনো মাসি বলেনি তো খই মোয়াটি ধর
কিসের মাসি কিসের পিসি কিসের বিন্দাবন
এতদিনে জানলাম মা বড় ধন [২০৯]

এই ছড়াটির আরো একটি পাঠান্তর হ'ল —

মাসিপিসি বনগাঁবাসি কয়াবঁয়ে ঘর
গটে কয়া দিলুনি মাউসি জামি - ভাতার কর [২১০]

'কাল থেকে বোষ্টমী আমার /জবাব দিয়েছে' — এই ছড়াটির পাঠান্তরটি হ'ল ;—

সারাদিন ভেবে মরি ভিক্ষা করি
রেঁদে দিবে কে?
কাল থেকে বোষ্টমী আমার
জবাব দিয়েছে [২১১]

দ্বিতীয়টি হ'ল —

বুড়া ভাব্‌চ কি বসে
দরে ফকির বসেচে
কাল থেকে বোষ্টমী আমার জবাব দিয়েছে। [২১২]

গ্রাম বাংলায় এভাবে আরো এক ধরনের ছড়া রয়েছে, যাতে সমাজ মনস্কতা প্রকাশ পেয়েছে। এই রকম একটি ছড়ার পাঠান্তর গুলি হ'ল —

১। ধ করতে পা নাই
কম্‌লী শাগে জিরা
২। পঁদ পুড়িয়া খাইতে নু নাই
কম্‌লী শাগে জিরা
৩। উদ্‌ খাইতে খুদ নাই
কম্‌লী শাগে জিরা।

মানুষের আতিশয্য মনোভাব লোকসমাজ মেনে নিতে পারে না। ছড়ার ভাষায় অসংগতি গুলোকে তাই তুলে ধরে, আর রচিত হয় নানা পাঠান্তর মূলক ছড়া, উপরোক্ত ছড়াগুলিতে সেকথাই ব্যক্ত হয়েছে।

শিশুরা খেলতে খেলতেও পাঠান্তর মূলক ছড়া বলে। সেরকম আরো একটি ছড়ার পাঠান্তরগুলি হ'ল ঃ—

মিষ্টি দকানি /তুই খেলতে পারুনি
তোর গদাগদা পা
তুই হড়কি পড়ি যা [২১৩]

দ্বিতীয় পাঠান্তরটি হ'ল —

ডিস্কোডিবানী
তোকে খেলতে লিবানি
তোর গদা গদা পা
তুই হড়কি পড়ি যা [২১৪]

শিশুদের 'চালতা পাতা চালতা পাতা' বলে খেলার ছড়াটির পাঠান্তর হল —

চালতা পাতা চালতা পাতা
বিয়ে দিবি তো দে
তোর বিয়েতে নাচতে যাবো
ঝুমকো কিনে দে।
দিদিকে দিল আশেপাশে
আমাকে দিল নদীর পাশে
নদীর জল কল্ কল্ করে
মায়ের কথা মনে পড়ে
বাবার কি চোক্ ছিল না
আর কি বর পেলনা [২১৫]

এই ছড়ার দ্বিতীয় পাঠান্তরটি হ'ল —

চালতা পাতা চালতা পাতা
বিয়ে দিবি তো দে
এতদূরে দিস্ না বাবা
ছাড়তে যাবে কে

দিদিকে দিল আশে পাশে
আমাকে দিল নদীর পাশে
বাবার কি চোক্ ছিল না
আর কি বর পেল না?[২১৬]

শিশুরা খেলাধূলা করে। শরীরচর্চার মধ্য দিয়ে তাদের গঠনগত, মানসিক, শারিরীক এবং বৌদ্ধিক বিকাশ লাভ হয়। মানসিকতার নানা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভাব - ভাবনার ও পরিবর্তন হয়। খেলার ছড়ায় অঙ্গ সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে ভাষাগত প্রভেদে ছড়ার পাঠান্তর ও সংগৃহীত হয়েছে।

'টুনটুনি পাখি নাচত দেখি' এই ছড়াটির পাঠান্তরগুলি হল, যথা —

১। টুনটুনি পাখি নাচত দেখি
না বাবা নাচব না
পড়ে গেলে বাঁচব না
পড়েছি বেশ করেছি
তোর কি ক্ষতি করেছি।[২১৭]

পাঠান্তরটি হ'ল —

২। টুনটুনি পাখি নাচত দেখি
না বাবা নাচব না
পড়ে গেলে বাঁচব না
পড়েছি বেশ করেছি
উল্টা ধারদিয়া পঁদ মেরেছি।[২১৮]

এখানে আরো একটি ছড়ার পাঠান্তর পাওয়া গেছে এই উপকূলীয় অঞ্চলের প্রাপ্তছড়া থেকে—

১। ইড়ি বিড়ি সিড়ি
দু পয়সার বিড়ি
বিড়িতে নাই আগুন

হয়্যা গেল বেগুন
বেগুনে নাই বিচি
হয়্যা গেল কাঁচি
কাঁচিতে নাই ধার
হয়্যা গেল হার
হারে নাই লকেট
হয়্যা গেল পকেট
পকেটে নাই টাকা
হয়্যা গেল ফাঁকা [২১৯]

দ্বিতীয় পাঠান্তরটি হ'ল —

ইড়ি বিড়ি সিড়ি
পাঁচ পয়সার বিড়ি
বিড়িতে নাই আগুন
হয়ে গেল বেগুন
বেগুনে নাই বিচি
হয়ে গেল কাঁচি
কাঁচিতে নাই ধার
হয়ে গেল হার
হারে নাই লকেট
হয়ে গেল পকেট
পকেটে নাই টাকা
হয়ে গেল ফাঁকা
ফাঁকাতে নাই গাড়ি
ফিরে এলাম বাড়ি
বাড়িতে নাই ভাত
বউকে মারি লাত্ [২২০]

তৃতীয় পাঠটি বরুণকুমার চক্রবর্তীর ‘বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস’ গ্রন্থে পাই —

‘ওয়ান টু থ্রি — পেয়ে গেলাম বিড়ি
বিড়িতে নাই আগুন পেয়ে গেলাম বেগুন
বেগুনে নেই বিচি পেয়ে গেলাম কাঁচি
কাঁচিতে নাই ধার পেয়ে গেলাম হার
হারে নেই লকেট পেয় গেলাম পকেট
পকেটে নেই টাকা চলে গেলাম ঢাকা
ঢাকায় নেই গাড়ি ফিরে এলাম বাড়ী
বাড়ী নেই চাল, পেয়ে গেলাম ডাল,
ডালে নেই গন্ধ আমাদের স্কুল বন্ধ।।’ [২২১]

শিশুদের খেলার ছড়ার পাঠান্তর বেশি। একই ছড়া বহু জায়গায় বহুরকমের। ‘লাবনি সরকার গাছে উঠা দরকার’ এই ছড়াটির পাঠান্তর হ’ল —

লাবনি সরকার
গাছে উঠা দরকার
গাছ থেকে পড়ে গেলে
অসুদের দরকার
অসুদ নাই ঘরে
টাকা চুরি করে
সাদ্ দিন পরে
জেল খাটিয়া মরে। [২২২]

এই ছড়ার দ্বিতীয় পাঠটি হ’ল —

মামনি সরকার
গাছে উঠা দরকার
গাচ থেকে পড়ে গেলে
অসুদের দরকার
অসুদ নাই ঘরে

টাকা চুরি করে
সাদ্ দিন পরে
জেল খেটে মরে
পুলিশ মামা টাটা
আন্ডার প্যান্ট ফাটা
আন্ডার প্যান্টে দড়ি নাই
বিয়ে করতে মনে নাই [২২৩]

ছড়ায় রয়েছে দাদুর নাকাল অবস্থা। 'আমার এক দাদু ছিল' এই ছড়াটিরও পাঠান্তর রয়েছে। উপকূলীয় অঞ্চল থেকে সংগৃহীত ছড়াটি হ'ল —

আমার এক দাদু ছিল
বিড়ি খাবার লোক
সেই বিড়ি খেয়ে দাদু
বাজারে গেল
বাজারে ছিল ভালুক ভায়া
তাড়া করিল
সেই তাড়া খেয়ে দাদু
গাছে উঠিল
গাছে ছিল কাট্ঠোক্রা
ঠোক্কর মারিল
সেই ঠোক্কর খেয়ে দাদু
মাটে পড়িল
মাটে ছিল বাব্লা কাঁটা
পায়ে ফুড়িল
সেই পা নিয়ে দাদু
বাড়ি ফিরিল
বাড়িতে ছিল ঢেঁপাঢেঁপি

পা টিপিল
সেই পা নিয়ে দাদু
স্বর্গে চলিল
স্বর্গে ছিল শিবদুর্গা
আদর করিল
সেই আদর খেয়ে দাদু
বাঁদর সাজিল [২২৪]

এই ছড়াটির একটি পাঠান্তর বরুণকুমার চক্রবর্তীর 'বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাসে' পাওয়া যায় —
(পৃ - ২১১)

'ছি ছি ছি দাদু	পান খেয়েছে
সেই পান খেয়ে দাদু	গাছে চড়েছে
গাছে ছিলো টিয়া পাখী	ঠোকর মেরেছে
সেই ঠোকর খেয়ে দাদু	নীচে নেমেছে
নীচে ছিলো বাবলা কাঁটা	পায়ে লেগেছে
সেই পা নিয়ে দাদু	ঘরে গিয়েছে
ঘরে ছিলো টেপা টেপী	পা টিপেছে
সেই পা নিয়ে দাদু	জলে নেমেছে।
জলে ছিলো কুমিরভায়া	কামড় দিয়েছে
সেই কামড় খেয়ে দাদু	স্বর্গে গিয়েছে
স্বর্গে ছিলো যমরাজ	বিচার করেছে
সেই বিচারের রায়ে দাদু	পটল তুলেছে।। [২২৫]

এছাড়া অন্য আরও একটি ছড়ার পাঠান্তর হল—

১।　আভা মাতি আইলো
মাইলো ঘাঁটা খাইলো
২।　আভা মাতির মাইলো
জগৎ জুড়িয়া খাইলো

উপকূলীয় ভাগে অন্য আরো একটি পাঠান্তর মূলক ছড়া হল—

১। এ বিলর লো গিমা সে বিলর লো গিমা
খসি পড়ু পাগ্‌লার শাশুর চখুর ডিমা

২। এ বিলর লো ফুল সে বিলর লো ফুল
খসি পড়ু পাগ্‌লীর শাশুর কানের দুল

৩। এ বিলর লো চিক্‌নী সে বিলর লো চিক্‌নী
খসি পড়ু পুতুলের শাশুর মাথার উক্‌নী

সুতরাং পাঠান্তর এভাবে বহু পাওয়া যাবে। ছড়াগুলি অন্তরধর্মে এক থেকেও পারিপার্শ্বিক ভাষা - ভাবনা, জীবন, জীবিকা, অর্থনীতির প্রভাবে নানাভাবে রূপবদল করেছে। তবে এর কোনো রূপকেই বর্জন করা যাবে না। ছড়ার আলোচনায় পাঠান্তরের গুরুত্ব তাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ছড়া যেহেতু সংহত সমাজের সামাজিক ফসল এবং তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্ট, সেহেতু লোকসাহিত্যের আলোচনায় ছড়াগুলির প্রতিটি পাঠান্তর-ই বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য।

৬. রঙ্গ-ব্যঙ্গ মূলক ছড়া ঃ

ষষ্ঠ অধ্যায়ে সংগৃহীত ছড়ার যে বিভাজন করেছি, সেই বিষয়ভিত্তিক বিভাজনের পরও আরো বেশকিছু ছড়া সংগৃহীত হয়েছে, যেগুলিকে আমি বিষয়াতিরিক্ত বিবিধ বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত করেছি। এই বিবিধ বিষয়ের একটি অন্যতম বিভাগ হল, রঙ্গ-ব্যঙ্গ ও বিচিত্র্য বিষয়।

ছড়া এবং প্রবাদ কোথাও কোথাও মিশে গেছে। আসলে দু'য়ের বৈশিষ্ট্যগুলি প্রায় সমধর্মী। ফলে সমাজ উদ্ভূত ছড়াগুলিকে প্রবাদ থেকে পুরোপুরি পৃথক করা যায়নি। তাই কিছু ছড়া রয়েছে যাদের আপাতভাবে প্রবাদ বলে মনে হতে পারে। কারণ ছড়ার ভাষা প্রবাদের মতো কোথাও কোথাও হয়ে উঠেছে তীক্ষ্ণ, ধারালো, শ্লেষাত্মক, ব্যঙ্গ-মধুরতা মিশ্রিত। ছড়া তো শুধু ভালো-মন্দের কথা বলেনি, বলেছে জীবনের অত্যন্ত কঠিন বাস্তবতাকেও। তাই বাস্তবের পোড় খাওয়া মানুষজনের অন্তরের কঠিন সত্যগুলি কখনও কখনও প্রবাদের মতো শোনায়। আবার জীবনের লঘুদিকটিও ছড়ায় পাই। তাই ছড়া হয়ে উঠেছে রঙ্গ-রসিকতাপূর্ণ।

'ওল' হল একপ্রকারের সব্জি। কিন্তু লোকভাষায় রসিকতা করে, শিশুদের ন্যাড়া মাথা বা চুলহীন মাথাকেও 'ওল' বলে রসিকতা করা হয়েছে। তাই নিয়ে একটি ছড়া হল —

ওল মুড়া গোল মুড়া

সাগর দাসের লাতি

জঁ পাঁচ-ছয় যুক্তি করিয়া

ওলে বুসিয়া মুতি। [২২৬]

মেয়েলি ভাষা (Women' Dialect) যেমন আছে, মেয়েলি সমাজ (Women' Society) ও আছে। সেই সমাজটা একান্তই তাদের। দুপুরবেলা, পড়ন্ত বিকেলে বাড়ির সমস্ত কাজের অবসরে মেয়ে-বউরা নানা-আলোচনার হাট বসায়। শাশুড়ী, ননদী, সম্পর্কিত নানা নেতিবাচক কথাবার্তা আলোচিত হয় অবসর-বিনোদনের আসরে। যথা —

এ বিলর লো চিকনী সে বিলর লো চিকনী

খসি পড়ু পুতুলের শাশুর মাথার উক্‌নী [২২৭]

অনেক মেয়ে-বউরা প্রচুর কথা বলে। এবং অনর্গল কথা বলায়, ভাষার মধ্যে যুক্তিধর্মীতা কিংবা সৌন্দর্যবোধ থাকে না, এমনকি অনেকের তা বোধগম্যও হয় না। তখন তাকে অন্যজন ছড়ায় বলে —

হাট গেলাম বাজার গেলাম

কিনে আনলাম লাউ

হারার মা লাউ খাইয়া

করে হাউহাউ [২২৮]

সমাজে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষ অনেকেই রয়েছে। বর্তমানে সরকার, প্রশাসন এ নিয়ে নানা গবেষণা এবং তাদের প্রতি বিশেষ যত্নবান হলেও বেশকিছু দিন পূর্বে তা ছিল না। যাইহোক্ এই ধরনের খোঁড়া, বোবা, তোত্‌লা, মানুষের প্রতি সকলেই সহানুভূতিশীল হয়, কিন্তু কখনও যদি দুই জন তোত্‌লা এক জায়গায় হয়, এবং উভয়ের কথোপকথন শোনা যায়, তবে অতি বেরসিক মানুষও না হেসে পারবেন না। এই অঞ্চলের ভূপতিনগর থানায় সংগৃহীত একটি ছড়ায় পাই, পাত্র-পাত্রী দুজনেই তোত্‌লা। ফুলসজ্জার রাতে এমন দুই পাত্র-পাত্রীর আলাপ-চারিতামূলক একটি ছড়া।

কি ফুয়ে ফুত্‌না ফুতন্

শায়ুক ফুয়ে ফুত্‌না ফুতন্

কি বিধাতার ঘতনা ঘতন। [২২৯]

পরস্পর যে তোত্‌লা, একথা ইতিপূর্বে কারও জানা ছিল না। অর্থাৎ বর জিজ্ঞাসা করছে 'কী ফুল ফুটে আছে?' তখন কন্যা উত্তরে বলছে 'শালুক ফুল ফুটে আছে'। কন্যার এই উত্তরে বর প্রথম জানল যে, কন্যাটিও তার মত তোত্‌লা। তখন বর বলল, — 'কী বিধাতার ঘতনা ঘতন'। ঈশ্বরের এমন-ই খেলা যে দুই তোত্‌লার এভাবে মিলন। লোকায়ত মানুষ তাই নিয়ে রচনা করেছে ছড়া।

অনেকের অনেক আশা থাকে। সেই আশা পূরণের জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্যে যাত্রা করে। কিন্তু বহুলোক আছে, সেই অবস্থায় না গিয়েও যদি এক-ই সুখ পেতে চায়, তখন সমাজের চোখে তা হাসির উদ্রেক করে। এই রকম ছড়া হল —

ঘর নাই দর বাঁধে
মাউগ্ নাই পোর তরে কাঁদে

কিংবা —

আদরিণী চাদর গায়
ভাত পায়নি ভাতার চায়

অর্থাৎ 'ঘর' থাকলে 'দর' থাকবে, 'বৌ' থাকলে তেমনি পুত্র সন্তানের আশা করা যাবে। কিন্তু না থাকলে তা আশা করাই বৃথা, সমাজের কাছে তা হাসির উদ্রেক করে। তেমনি যে মেয়ে দুমুঠো ভাত-ই জোগাড় করতে পারে না, তার বিয়ের হওয়ার স্বপ্নও অবাস্তব। তাই সমাজের চোখে তা হাসির-ই কারণ হয়ে উঠেছে।

ভুয়ো ডাক্তারে দেশটা ছেয়ে গেছে। তবে হ্যাঁ, এ সংবাদ বর্তমানের। কিন্তু আমার সংগৃহীত ছড়া বহুদিনকার, আমি সেকথা পূর্বেই বলেছি। সমাজের চোখে এরকম বহু ভুয়ো ডাক্তার আছে, যাদের কোন প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি নেই, তথাপি ডাক্তারি করে চলেছে। এই রকম ডাক্তার সম্পর্কে ছড়া তৈরী হয়েছে —

ভজহরি ডাক্তার
    আগে ছিল মোক্তার
হয় যদি জ্বর-কাশি
    খেতে দেয় পান্তাবাসি
হলে কারো অম্বল
    দেয় চাপা কম্বল।[২৩০]

ছড়া জানাচ্ছে যাদের বাড়ির বিবাহ তাদের তো আর কাজের অন্ত নেই। বরের বাড়ি বিশেষ করে 'মা' -এর যদি একটু কম চিন্তা তো, কন্যার বাড়ির মায়ের চিন্তা দুর্বিসহ, কন্যা হারানোর সঙ্গো সঙ্গো কন্যার ভাবী ভবিষ্যৎ 'মা'কে আরো ব্যথাতুর করে তোলে। তার সঙ্গো বিবাহবাড়ির ঝামেলা। খাওয়া-দাওয়া ঘুম সবই টুটে যায়। এদিকে প্রতিবেশিনী কাকী জেঠির দৃষ্টি ও তা এড়ায় না। এমনি দারুণ দিনে প্রতিবেশিনীর কণ্ঠে রঙ্গা-রসিকতাময় ছড়া শোনা যায়—

কন্যিয়ার মা কাঁদিয়া মুতে
বরের মা হাসিয়া লুটে [২৩১]

কেননা মেয়েকে বিদায় দেওয়ার ব্যথায় মা মেনকার মতো সব মায়ের-ই বুক কাঁদে। এদিকে বরের মা তো পুত্রবধূ লাভের আশায় ভীষণ খুশিতে মশগুল। তাই হেসে অস্থির।

ছড়া শুধু মনের খোরাক মেটায় না, ব্যঙ্গা-বিদ্রুপের সঙ্গো বাস্তবের ছবিকেও তুলে ধরে—

বার্‌তি বার করছে
মুক করছে লেউল
রাইত পাইনে লিয়া বুসবে
এগরার দেউল [২৩২]

'বারতি' অর্থাৎ ব্রতী, বার করেন যিনি। বার করলে না খেয়ে উপোস করতে হয়, তাই তার মুক 'লেউল' অর্থাৎ 'নেউল' -এর মতো সরু হয়ে গেছে। কিন্তু ক্রমে লক্ষ্য করা যায় যে, কোনো রকম রাতটা পার হলেই থালায় নিয়ে বসেছে 'এগরার দেউল' (এগরা মহকুমার অন্তর্গত), অর্থাৎ মন্দির, যার উচ্চতা আকাশ ছোঁয়া। এখানে খাদ্যতালিকার পরিপাট্যের কথাই বিদ্রুপ করে বলা হয়েছে, ভোজ্য-তালিকার উচ্চতার প্রতি দৃষ্টি রেখে।

প্রবাদে বলে 'ভাগ্যের দোষ না যায় খণ্ডন'। আমরা ভাগ্যের উপর বিশ্বাস করি, তাই যার ভাগ্যে যা আছে তাই ঘটে। তার বেশী চাইলে হয় না, সেইজন্য কথায় বলে, 'ভাগ্যে নাইকো ঘি / ঠক্‌ঠকালে হবে কী' কিংবা 'যত কর হাঁইপাঁই / পাঁচশিকার বেশী নাই'। — এ যেন নিয়তি নির্দিষ্ট। সেইরকম যার ভাগ্যে বউ দেখতে খারাপ জুটবে, তা সে যতবার-ই বিয়ে করুক

না কেন তাই ঘটবে। সুন্দরী বউ তার অধরাই থেকে যায়, ছড়ায় তাই শুনি —

কপা কপা ভানুমতি
তিন ব্যায়া হইনে
সউ চিরোলদাঁতি

'কপা' অর্থাৎ কপাল এমন, এ যেন ভানুমতীর খেলা। একবার নয় তিন তিন বারেও 'চিরোলদাঁতি' অর্থাৎ চিরুণীর মতো দাঁত ফাঁকা বউ জুটল, — এ বড় জ্বালার কথা। যাইহোক্ এমন বউ নিয়ে কোনরকমে চলে। কিন্তু বউ যদি আবার খুব পট পট করে অর্থাৎ খুঁত ধরা মেয়ে হয় তার জন্য ছড়ায় বলে—

পট পট করে যে
পোক পড়িয়া মরে সে

বেশ কিছু ছড়া আছে, সেগুলি বিচিত্র ধরনের, উদ্ভট রসেরও বলতে পারি। যার সঙ্গে বাস্তবের তেমন কোন মিল নেই। এই রকম একটি ছড়া হল —

গড়ের মাঠে দেখে এলাম
মশার পেটে হাতি
এমন খবর শুনেছ কি
হিচড়ে পোয়াতি [২৩৩]

বুড়ি ঠাকুমা, দিদিমা, মাসিমা সম্পর্কগুলি রঙ্গ-রসিকতার সম্পর্ক। বাঙালী সমাজে রসিকতা থাকবেই। ছড়ায় তার দৃষ্টান্ত পাই —

আমি মরিঠি পানের তরে
গাঁড়্পশানে ঠাট্টা করে।

ঠাকুমা দিদিমা বয়সী কোনো একজনের বক্তব্য এটি, যা নাতি-নাত্নীদেরকে উদ্দেশ্য করে হয়তো বলা হয়েছে।

বর্তমানে বহু স্থানে গ্রাম্য লোকমেলা বসে। এই লোকমেলায় কেমন লোক হয়েছে প্রশ্ন করলে রসিকতারচ্ছলে একটি ছড়া বলে —

লোকে লোকারণ্য জনমানব শূন্য
গায়ে গা লাগেনি ভিড়ে চলা যায়নি।

এটি একটি বিপরীত ভাব-প্রকাশক ছড়া। 'লোকে লোকারণ্য' অর্থাৎ বহুলোক, কিন্তু পরক্ষণে বলা হচ্ছে, 'জনমানব শূন্য' অর্থাৎ লোকহীন। 'গায়ে গা লাগেনি' অর্থাৎ লোক সমাগম অল্প, পরক্ষণে বলা হচ্ছে 'ভিড়ে চলা যায়নি' অর্থাৎ বহুলোকসমাগমের ইঙ্গিত। রসিকতার দরুণ এমন ছড়ার জন্ম। এইরকম আরো একটি ছড়া হল —

নিরামমিষ্য / পাঁঠার ঝোল

কী খাওয়া হল এরূপ জিজ্ঞাসা করলে রসিকতার ছলে ঐরকম ছড়া-ই বলে, — নিরামমিষ্য অথচ পাঁঠার ঝোল, আমিষ, নিরামিষের সমন্বয়। যাইহোক্ অন্য দুটি ছড়া হল —

১। ট্যারা গাড়ি কিনেছে
টেরি চড়বে বলেছে
ট্যারা ব্রেক টিপেছে
টেরি উল্টে পড়েছে [২৩৪]

২। পচা পচা পঞ্চান্ন
পচার বউ ছাপান্ন
পচা যাইছে দিল্লী
পচার বউ আঁড়িয়া বিল্লি [২৩৫]

ট্যারা এবং টেরি দুজনের-ই কাণ্ড-কারখানা বড়ই হাস্যকর। তেমনি স্বামী বাড়িতে না থাকলে স্ত্রীরা যে কতখানি বেপরোয়া জীবনযাপন করে, তার নিদর্শন উপরের দ্বিতীয় ছড়াটি।

গ্রাম্যনারীদের অবসর সময় বড় কম। সারাদিন সংসারে কাজকর্ম, ছেলেমেয়েদের ঝামেলা, বাড়ি-কৃষি, চাষ-বাস, রান্না-বান্না, স্বামীর মনযুগিয়ে চলার পর কখনও কখনও বিকেলে কিছুটা সময় পায় কেবল চুল বাঁধার জন্য। এই চুল বাঁধতে গিয়ে লোকায়ত মেয়েরা, বউরা একসঙ্গে বিকেলের আসর মাতায়, সেখানে তাদের একটা নিজস্ব জগৎ খুঁজে পায় তারা। চেনা গণ্ডির বাইরে এই সময়টা তাদের একেবারে ব্যক্তিগত নিজেদের। সেখানে কোনো পুরুষ মানুষের থাকার অধিকার নেই, ঢুকতেও পারে না। তাই সেই সময় নারীরা তাদের সুখ-দুঃখ, রঙ্গ-তামাসা, ঠাট্টা-রসিকতা নানা ধরনের আলাপ-আলোচনা করে থাকে। এই ছড়াগুলি ঠিক সেইরকম চেনা জগতের বেশ কিছু চিত্র। —

লালি লাল গাম্‌ছা গায়

লালি হড়কা কাঁচাড় খায়

লালি লালেশ্বরী

চোখে চশমা পরি

হাতে তোর লেডিস ঘড়ি

লালি তোর শ্বশুর বাড়ি।[২৩৬]

লালি এখানে এখন একটি চটপটে নির্মল, নিষ্পাপ মেয়ে। পড়ন্ত বিকেলের রক্তিম আভায় লালি এখন লীলাবতী কন্যা, যে এখনও ঠিকভাবে চলতে পারে না; কিন্তু দেখতে অতিচমৎকার। প্রকৃতির সব রঙ যেন তার মধ্যে আছে তাকে তাই অপরূপ সুন্দরী লাগছে। তার চোখে চশমা হাতে লেডিস ঘড়ি, যাতে আছে আধুনিক নগরায়ণের হাতছানি এইরকম মেয়েকেই শ্বশুর বাড়িতে পাঠানোর উপযুক্ত সময় এসে গেছে। ছলাকলা পটীয়সী লালী এখন শ্বশুর বাড়ি আলো করে বসে আছে। তার বিশাল রাজত্ব। আখার, বাখার, বাগান, বাড়িঘর কোনোকিছুর অভাব নেই। সে এখন রাজরাজেশ্বরী। সংসার বেড়েছে তাই জামাই এসেছে। পরিপূর্ণ সংসারের সাম্রাজ্ঞী সে।

সমষ্টিগত জীবনে প্রত্যেকে নিবিড় বলে, পরস্পর যেমন পরস্পরের দুঃখে দুঃখী হয়, তেমন অপরের ত্রুটি দেখলেও বলতে ছাড়ে না। ছড়ায় আছে —

কাঁহির কালে নাইকো দুলি

আজ দেইছন দু-ঠ্যাং তুলি

অর্থাৎ কোনো কালে দুলি বলে কোনোকিছু ছিল না, প্রতিবেশির চোখে তাই পড়াতেই, ছড়ায় তা ব্যক্ত হয়েছে।

ত বগ্‌লা খসুছি

উপর বগ্‌লা হাসুছি

মাঝি বগ্‌লা কউছি

মোর বি দিন আসুছি[২৩৭]

এটি রূপকাশ্রিত ছড়া, যা নারকেল গাছের প্রতীকে ব্যক্ত। যেমন করে নারকেল গাছের নীচের ডাল (বগ্‌লা) খুলে পড়ে, এবং তাই দেখে উপরের ‘বগ্‌লার’ হাসির কথা বলা হয়েছে,

আবার মাঝের ডাল এই দৃশ্য দেখে তার জীবনের বাতি নিভে যাবার কথা আশঙ্কা করেছে, ঠিক একইভাবে মানবজীবনে ও আসে পরিসমাপ্তির ডাক। আজ যে যৌবনের জোয়ারে আত্মহারা, একদিন সেও প্রৌঢ়তায় পরিণত হবে, এবং মৃত্যু এসে কুড়িয়ে নেবে জীবন, একথা যৌবনের সমাগমে প্রায় জন-ই ভুলে যায়। এখানে মানবজীবনের সমগ্র জীবনচক্রটি রূপকের আশ্রয়ে ছড়ায় প্রকাশিত।

প্রতিটি সমাজে দুই ধরনের মানুষ পাওয়া যায়। এক দল মুর্খ, অথচ তারা ভাবে, তাদের দ্বারা পৃথিবীর সবকিছু করা সম্ভব। আর একদল পণ্ডিত, যারা নিজের বিদ্যার জাহির করতে চায় না। ছড়ায় আছে —

পণ্ডিত যেঠি নাই পারে
মুর্খ সেঠি লাফিফ পড়ে

বোকা লোকের বড় জ্বালা। কেননা, বিদ্রুপের ভাষাও তাদের বোধগম্য নয় —

বেহায়ার পঁদে বেনিয়া জয়ে
সে কয় আরতি করে

এমন বোকা মানুষের সবদিকেই জ্বালা। না পারে ঘর সাম্‌লাতে, না পারে পর সামলাতে। উভয় সমস্যা নিয়ে সংসার জীবনেও ঠক্‌তে হয়। ছড়ায় পাই —

কাব্‌জি রসের ফেনারে ভাই
কাব্‌জি রসের ফেনা
পদা দিয়া বউ পালিল
তুই শালা কি কানা [২৩৮]

‘পদা’ শব্দের অর্থ 'high land' উঁচু জায়গা, এবং ‘গদা’ শব্দের অর্থ 'Low land' — যাইহোক্ এখানে সেই ‘পদা’ অর্থাৎ উঁচু জায়গা দিয়ে বউ পরবাড়ি চলে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। যা তার স্বামী দেবতা জানতেও পারেনি। তাই তাকে কানা বলা হয়েছে। এই রকম মূর্খ স্বামীর বড়ই দুঃখ। আর তার-ই জীবনে যত বিপদের পর বিপদ এসে পড়ে। তখন মাথার ঠিকও থাকে না। হিসেবে ভুল করে। তাই একই কথা উচ্চারিত হয় অন্যভাবে —

জ্বালার উপর জ্বালা
আইজ মরল বউর ভাই
কাল মরল শালা [২৩৯]

আসলে 'বউ' -এর ভাই এবং 'শালা' দুজনেই একব্যক্তি।

যাইহোক্ ছড়া আমাদের জানায় কিসে কি হয় —

টকায় টকায় খিটির মিটির
জুঁয়াঁয় জুঁয়াঁয় হাসাহাসি
বুড়ায় বুড়ায় কাশাকাশি [২৪০]

'টকা' অর্থাৎ বাচ্চা ছেলে, 'জুঁয়া' অর্থাৎ যুবক, 'বুড়া' অর্থাৎ বৃদ্ধ, প্রত্যেকের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ হয়েছে ছড়ায়। এছাড়া খেতে বসে ছড়ায় বলে —

লুচি গোল হরিবোল
দে দই দে পাতে
ওরে ব্যাটা হাঁড়ি হাতে [২৪১]

শিশুরা পড়াশুনার ব্যাপারে কিছুটা হলেও ভীতি প্রদর্শন করে। তার মধ্যে সব বই সবার ভালো লাগে না। ইতিহাস, ভূগোল, বাংলা বিশেষ করে গণিতে তো সকলের-ই ভয়, তাই ছড়ায় ব্যক্ত হয়েছে —

ইতিহাসে ইতিগজ
ভূগোলেতে গোল
বাংলাতে মোটামুটি
অংকে হরিবোল [২৪২]

উপরোক্ত প্রতিটি ছড়ার মধ্যে রয়েছে হাসির খোরাক।

এছাড়া শিশুদের ছড়ায় পাই —

মাষ্টারমশাই মাষ্টারমশাই
পেট কেমন করে
পেটের ভিতর বিড়ালছানা
মেউ মেউ করে। [২৪৩]

এই রকম রঙ্গ-রসিকতামূলক বহু ছড়া উপকূলীয় অঞ্চলের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগৃহীত হয়েছে, সংগৃহীত ছড়াগুলিকে এই উপ-অধ্যায়ে আলোচনাও করা গেল, তবে সময়ের সীমা পেরিয়ে কালজয়ী হয়ে আছে লোক মুখে মুখে এই ছড়াগুলি।

গঠনশৈলী বা আঙ্গিকগত দিক ঃ

'সংসদ বাঙ্গালা অভিধানে' 'গঠন' শব্দের অর্থ হিসেবে 'নির্মাণ', 'রচনা', 'বিন্যাস', 'গড়ন' শব্দগুলি রয়েছে,[১] যাকে ইংরেজিতে 'Structure' বলি। সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ের মতো ছড়া সাহিত্যেরও গঠনশৈলী বা আঙ্গিকগত দিকটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। ছড়ার এই গঠনশৈলী বলতে ছড়ার দেহ-কাঠামোর যে অবয়বগুলি ফুটে উঠে, সেই অবয়বের একটি রেখাচিত্র আমরা এই ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথমেই তুলে ধরেছি। এখন আমরা সেই গঠনশৈলী বা আঙ্গিকগত দিকের উপ-বিভাগীয় আলোচনায় প্রবিষ্ট হব।

১. বাক্যনির্ভর ছড়া ঃ

পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলে ক্ষেত্র সমীক্ষায় প্রাপ্ত ছড়াগুলির গঠনশৈলী বা আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্যের উল্লেখযোগ্য বিষয় হল বাক্যনির্ভর ছড়া। ছড়া বলতে মনে আসে ছন্দ, মিল, বাঁধা ধরা ফ্রেমে অন্তত দুই বা তার অধিক চরণের যে পদ সমূহ। বাক্যনির্ভর ছড়া এদের থেকে একটু পৃথক ধর্মের। নির্দিষ্ট একটি বাক্যে রচিত ছড়াগুলি মনের সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশক, কোথাও বাক্যে কর্তা উহ্য, আবার কোথাও বা কর্তা প্রত্যক্ষভাবে উক্ত হয়। এই বাক্যনির্ভর বেশ কয়েকটি ছড়া হল নিম্নরূপ, যার প্রথমটি জটিল বাক্যে ও শেষ ছড়াটি যৌগিক বাক্যের হলেও বাকি সবগুলি সরল বাক্যের দৃষ্টান্ত ঃ

১। আঙ্গুলে জড়িতে কানা নাই তাঁবুর ফরমাস (জটিল, নির্দেশক বাক্য, প্রবাদমূলক)
২। ম্যায়ালোকের পদে পদে দোষ (সরল, নির্দেশক)
৩। লয় ছয় ভাগ্যে হয় (সরল, নির্দেশক)
৪। ঘড়া দেখিয়া খড়া (সরল, নির্দেশক)
৫। মা মরু মাউসী থাউ (যৌগিক, নির্দেশক, প্রবাদমূলক)

২. পংক্তিনির্ভর ছড়া ঃ

বাক্য নির্ভর ছড়ার সংখ্যা খুব অল্প দেখা গেলেও পংক্তিনির্ভর ছড়া এই অঞ্চলে অধিক লক্ষণীয়। ছড়ার আঙ্গিকের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। আমরা জানি, ছড়া মুখে মুখে চর্চিত, শ্রুতি ও স্মৃতিনির্ভর সাহিত্য। এই যে সহজেই আমরা ছড়াকে স্মৃতি ও শ্রুতি নির্ভর করতে পারি, তার অন্যতম কারণ এই পংক্তিনির্ভরতার জন্য। এই পংক্তিগুলির মধ্যে বিভিন্নতা লক্ষণীয়, কখন দুই পংক্তির, আবার কখনও বা তিন, চার, ছয়, আট এমন কি আটের অধিক পংক্তির ছড়াও

উপকূলীয় অঞ্চলে বহুল দেখা যায়। নিম্নে এই বিভিন্ন পংক্তির ছড়াগুলির দৃষ্টান্ত তুলে ধরলাম। যথা ঃ

দুই পংক্তির ছড়া ঃ মন ভাঙ্গালে চপ্‌রা
হাঁড়ি ভাঙ্গালে খপ্‌রা [২৪৪]

তিন পংক্তির ছড়া ঃ কি থেনি কি হেনি
দেখ্‌না মোর চালিকি
আউরি দেখবু কালিকি [২৪৫]

চার পংক্তির ছড়া ঃ জয়ের পরে খরা হয়
তার বড় চিড়্‌চিড়ানি
বউড়ি হইয়া শাউড়ি হয়
তার বড় ফড়্‌ফড়ানি [২৪৬]

ছয় পংক্তির ছড়া ঃ এ্যাতো বড় কমলালেবু
তার ভিত্‌রে জামাইবাবু
জামাইবাবু অপমান
বউ করেছে বুদ্ধিমান
ছেলে মেয়েরা পাড়ায় যাবে
লাল্‌ কুত্তা ভেজে খাবে [২৪৭]

সাত পংক্তির ছড়া ঃ আয়লারে আয়লা
জেষ্ঠ মাসের পইলা
জামা দুটা মইলা
গেঞ্জি দুটা ফুটা
প্লাসটিকের জুতা
আলমারিতে গোলাপ ফুল
টেস্কিয়ালার টাকে চুল [২৪৮]

আট পংক্তির ছড়া ঃ বড় বউ বড় ঘরের ঝি
তাকে আর বলব কি
মাজিয়া বউ মজা কাটে

কথা কই্নে ঝম্কি উঠে

সাজিয়া বউর মুখে পান্

গুম্রি ভিতর্ কুটে ধান্

ছোটো বউ দুদের লাউ

তার দিয়া মোর জীবন থাউ [২৪৯]

আটের অধিক পংক্তির ছড়া ঃ

১। এক দুই তিন

পায়ে পড়ল ডিম

পা হল ঘা

ডাক্তারখানায় যা

ডাক্তারখানা বন্ধ

আমার নাম নন্দ

নন্দ ব্যাটারি

পুকুর কাটারি

পুকুরে নাই মাচ্

নন্দ তোর বউকে লিয়া লাচ্ [২৫০]

২। মেদিনীপুরে জন্ম আমার

বিদ্যাসাগরের দেশে

প্রাণ দিল যেথায় বিনয় বাদল

দেশকে ভালোবেসে

শহীদ হল বীর ক্ষুদিরাম

গলায় নিল ফাঁসি

জন্ম মোদের এই দেশেতে

দেশকে ভালোবাসি

গর্ব করি দেশের লাগি

জন্ম মেদিনীপুরে

অর্ধেকেরও বেশি আছি
জ্ঞানহীন অন্ধকারে
পন কর্ছি আমরা সবাই
স্বাক্ষর এবার হব রে ভাই
মেদিনীপুরে স্বাক্ষরতার
আলো মোরা জ্বালাবই [২৫১]

৩. মিল ও ছন্দনির্ভর ছড়া ঃ

ছড়ার গঠনে দেখা যায়, ছড়া পদ্যধর্মী এবং ছন্দনির্ভর। মূলত পদ্যধর্মী বলে ছড়ার এক চরণের সঙ্গে অপর চরণের মিল পাওয়া যায়। বেশিরভাগ ছড়া হয় মিলধর্মী। উপকূলীয় অঞ্চলের ছড়াও তার ব্যতিক্রম নয়। এই মিলকে কাব্যের ভাষায় অলংকার বলা হয়। অলংকারের মধ্যে অনুপ্রাস অংলকারের-ই অধিক প্রয়োগ উপকূলীয় অঞ্চলের ছড়ায় বেশি করে লক্ষিত হয়। এই অনুপ্রাসের কারণে ছড়াগুলি অধিকজন চর্চিত ও বাহিত। গ্রামজীবনের গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ শিষ্ট-সাহিত্যের অলংকার বলতে যা বোঝায়, তা তারা বোঝে না। তবে স্বতস্ফূর্তভাবে ছড়া রচনার ক্ষেত্রে তাদের অজান্তেও কিছু কিছু অলংকার ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে আমরা ছড়ার সেই দিকগুলিকে তুলে ধরার চেষ্টা করছি মাত্র।

বেলা হল তা গাছে
চোখের জলে শাগ ভাজে

ছড়াটিতে অন্ত্যানুপ্রাস হয়েছে। চরণের শেষে 'ছে' এবং 'জে' দুটি একই বর্গের বর্ণ।

অনুরূপভাবে অন্ত্যানুপ্রাসের আরো কয়েকটি ছড়া হল ঃ

১। ভান্ডারে নাইকো ঘি
ঠক্‌ঠকালে হবে কি

২। আল্লাদের বিল্লি যার
গালের চিবা কাড়িয়া খায়

বার বার উচ্চরিত হলে সরল অনুপ্রাস হয়। প্রাপ্ত কয়েকটি সরল অনুপ্রাসের ছড়া হলঃ

১। ডুব ডুব ডুব নদীতে
বিড়াল কাঁদে গদীতে

২। ট্রেন ট্রেন ট্রেন / হাওড়ার ট্রেন /
ট্রেন থেকে নেমে এল / সুচিত্রা সেন [২৫২]

উপরোক্ত প্রতিটি ছড়ায় একটি ধ্বনি বার বার ব্যবহৃত হয়ে সরল অনুপ্রাসের সৃষ্টি করেছে।

ছড়াতে গুচ্ছানুপ্রাসের ও দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায়। কেননা, একাধিক ব্যঞ্জনধ্বনি বারবার ধ্বনিত হয়েছে। এই গুচ্ছানুপ্রাস অলংকারের কয়েকটি দৃষ্টান্ত হল ঃ

১। ইচিং বিচিং চিচিং চা
পজাপতি উড়ে যা

২। আক্কর বাক্কর বম্বে বো
আসলি নব্বে পুরে শ

ছড়াতে আমরা যমকের দৃষ্টান্তও পেয়ে থাকি। ক্ষেত্র সমীক্ষায় লব্ধ 'আয় আয় চাঁদ মামা / টি দিয়ে যা / চাঁদের কপালে চাঁদ / টি দিয়ে যা'। ছড়াটিতে প্রথম 'চাঁদ' হল শিশুচাঁদ এবং দ্বিতীয় 'চাঁদ' হল আকাশের চাঁদ। যাতে সুন্দরভাবে যমকের সৃষ্টি হয়েছে।

অপ্রাণীবাচক বস্তুর মধ্যে প্রাণের আরোপ হলে হয় সমাসোক্তি অলংকার ঃ

শুষনি শাক্ বলেরে ভাই
আমার চার মাথা
ঘুম ঘুম পায়রে ভাই
খাইলে আমার পাতা [২৫৩]

শুষনি শাকের চারপাতাকে 'চারমাথা' বলায় এবং পরবর্তী চরণগুলিতেও শুষ্নি শাকের উপর প্রাণের ধর্ম আরোপ করা হয়েছে। আবার ছড়ায় পাই 'কংগ্রেস পার্টি বারোটা / ডিম পেড়েছে তেরটা / কংগ্রেস পার্টির প্রাণীর মতো 'ডিম পাড়া' এই ধর্ম আরোপেও সমাসোক্তি অলংকার হয়েছে। এছাড়া 'জয়ের পরে খরা হয় / তার বড় চিড়্চিড়ানি' ছড়াটিতেও সমাসোক্তি অলংকার হয়েছে। 'চিড়্চিড়ানি' শব্দটি মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। এখানে 'রোদ্দুর' এই অপ্রাণীবাচক বস্তুতে তা ব্যবহৃত হওয়ায় সমাসোক্তি অলংকার হয়েছে।

গোলাপ ফুল তুলতে গেলে
হাতে লাগে কাঁটা
বন্ধুর কথা মনে পড়্নে
প্রাণে লাগে ব্যাথা [২৫৪]

ছড়াটি স্মরণোপমার দৃষ্টান্ত হয়েছে। গোলাপ দেখে বন্ধুর কথা মনে পড়েছে। তুলনীয় হিসেবে পদাবলী সাহিত্যের ‘কালো জল ঢালিতে সই / কালা পড়ে মনে’ - এই পদটির উল্লেখ করা যায়।

ছন্দ ঃ ছড়ার ছন্দ নিয়ে আমরা পূর্বের অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। তবু বলা যায় ছড়ার ছন্দ বলতে বোঝায় স্বরবৃত্ত বা শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দকে। প্রতি পর্বের স্বর সংখ্যা গণনা করা হয় বলে একে স্বরবৃত্ত ছন্দ যেমন বলা হয়, তেমন ছড়ার চরণের প্রতিটি শব্দে শ্বাসবায়ুর ঝোঁক বেশি প্রয়োজন হয় বলে একে শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দও বলে। এই ছড়ার ছন্দে আবার প্রতিটি দল বা অক্ষর অনুযায়ী একমাত্রা করে হয়, তাই একে দলবৃত্ত ছন্দও বলা হয়ে থাকে। ছড়ার ছন্দে পর্বভাগ থাকে, প্রতিটি পূর্ণ পর্ব ৪ মাত্রার এবং অপূর্ণ পর্ব ১, ২, ৩ মাত্রারও দেখা যায়। এই ছন্দে সাধারণভাবে যে পর্ববিভাগ এবং মাত্রা দেখা যায়, তা - ৪+৪+৪+২, কখন ৪+৪, কখনও বা ৪+৩, কখনও শুধু এক পর্বের ছড়া, প্রভৃতি। তবে উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাপ্ত ছড়ায় যে ভিন্ন ভিন্ন বৈচিত্র্যপূর্ণ পর্বের ছড়া লক্ষিত হয়, নিম্নে সেগুলি তুলে ধরলাম ঃ

১। বড় বড় / গাচ্ দেখিয়া / পাখি করে / বাসা ৪+৪+৪+২
বড় বড় / ঘর দেখিয়া / দুঃখী করে / আশা ৪+৪+৪+২

আলোচ্য ছড়াতে মোট পর্ব সংখ্যা চার। তিনটি পূর্ণ পর্ব এবং একটি অপূর্ণ পর্ব দুই মাত্রার রয়েছে।

অন্য একটি ছড়ায় পাই —

ঘরের ধারে / লংকা গাচ্ / ৪+৩
লংকা তুলে / খাই ৪+১
বন্ধুর কথা / মনে পড়্‌নে / ৪+৪
ঝায়ে মরে / যাই ৪+১

উপরোক্ত ছড়াটিতে প্রথম চরণে দুটি পর্ব, একটি পূর্ণ পর্ব এবং অপরটি অপূর্ণ পর্বের। দ্বিতীয় চরণের পর্ব সংখ্যা দুই। একটি চার মাত্রার পূর্ণ পর্ব অপরটি একমাত্রার অপূর্ণ পর্বের। তৃতীয় চরণে ও দুটি পর্ব, প্রতিটি পূর্ণ পর্ব, চতুর্থ চরণের দুটি পর্ব, একটি পূর্ণ পর্ব ও অপরটি এক মাত্রার অপূর্ণ পর্ব। এছাড়া পাই—

দুটি চরণ-ই পূর্ণ পর্বের —

জিনি পোকার / পঁদে আলো / ৪+৪
বড়্ ভাই একটি / গল্প বলো / ৪+৪

দুটি চরণে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার পর্ব রয়েছে —

কর্তা গেছে / কাচারি ৪+৩
চিগনি শাকের / হাপরি ৪+৩

এরকম আরো একটি ছড়ায় ছন্দ পাই —

চোর পড়শি / বব্‌রা ভাই ৪+৩
ছাঁদা ঘটি / দুষ্ট গাই ৪+৩

দুই মাত্রার অপূর্ণ পর্বও এই উপকূলীয় অঞ্চলে দেখা যায় —

বেগুন বাড়ির / পাশে ৪+২
ভুঁড় শিয়ালী / লাচে ৪+২

দুটি চরণে ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যার পর্বও লক্ষিত হয় —

চির্‌কাল গেল / ঝোট পাতা খাই/য়্যা ৪+৪+১
বুড়া শিবকে / সেলাম করে / চিৎপিটিয়া শুই/য়্যা ৪+৪+৪+১

উপরোক্ত শেষের ছড়ার প্রথম চরণের পর্ব সংখ্যা তিনটি। দুটি পূর্ণ পর্ব এবং একটি অপূর্ণ পর্ব। দ্বিতীয় চরণে মোট পর্বসংখ্যা চারটি। তিনটি পূর্ণ পর্ব এবং একটি এক মাত্রার অপূর্ণ পর্ব রয়েছে।

এক পর্বের ছড়াও লক্ষিত হয় এই অঞ্চলে —

১। ঝি দুবুনি / ৪
পঁয়ে ফাটিবু / ৪
২। লয়ায় ল পঁ / ৪
পুন্যায় ছ পঁ / ৪

উপরোক্ত ছড়া দুটিতে চরণগুলি অতি ছোটো। সেকারণে পর্ব কেবল একটি। তবে পর্বগুলি প্রতিটি পূর্ণ মাত্রার অর্থাৎ চারমাত্রার। ছন্দের এইরূপ চলন বিশেষত উপকূলীয় অঞ্চলের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ছড়ার এইরূপ ছন্দ, গঠনশৈলীর এক অন্যতম দিক।

৪. শব্দ সৌকর্যগত ছড়া ঃ

'সৌকর্য' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল, 'সহজসাধ্যতা', সুবিধা (ব্যবহারের সৌকর্য, পাঠের সৌকর্য)।[২৫৫] শব্দ সৌকর্য বলতে সেই অর্থে শব্দের সহজসাধ্যতা, শব্দ ব্যবহারের সহজসাধ্যতা এবং শব্দ পাঠেরও সহজসাধ্যতা কিংবা সুবিধা। ছড়ার আলোচনায়, বিশেষ করে ছড়ার গঠনশৈলীর ক্ষেত্রে শব্দের এই সহজসাধ্যতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক বিষয়। আমরা জানি, ছড়ার ভাষা আর পরিশীলিত সাহিত্যের ভাষা কখন-ই এক নয়। ছড়ার রচনাকার অধিকাংশ ক্ষেত্রে জনজীবন, গোষ্ঠীবন্ধ জীবন থেকে উঠে আসা মানুষ, যারা তাদের দৈনন্দিন জীবন, গার্হস্থ্য জীবনের সাধারণ অনুভূতির কথা খুব সাধারণ ভাষায় ব্যক্ত করে। এই সাধারণ ভাষার শব্দগুলি অনেক সময় অমার্জিত, অশিষ্ট হয়ে থাকে। তবে যার প্রকাশ ভঙ্গী থাকে খুব-ই সহজ-সরল, সাধারণ, যা পড়ে আমাদের কোথাও কোনো সংশয় বা না-বোঝা ব্যাপারখানা থাকে না; ঠিক তেমনি বুঝতেও আমাদের কোনো অসুবিধা হয় না, যে কারণে সহজসাধ্যতা, সুবিধা-ই হয়। তাই ছড়ার গঠনশৈলীর অন্যতম একটি সংরূপ শব্দের সৌকর্যগত দিকটি আলোচ্য বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। পল্লীবাংলার জল-আলো-হাওয়ায় বেড়ে ওঠা এই লোকায়ত অধিকাংশ মানুষজনের জীবনে না আছে, ভোগ-প্রাচুর্য, না আছে আড়ম্বর। আছে কেবল দু-মুঠো অন্নের লড়াই, বেঁচে থাকার প্রয়াস, বন্য-আদিম ভালবাসা। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই তাদের লিখিত এই ছড়াগুলি, তাদের-ই সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনের জীবনবেদ। জীবনের এই সরলতার কারণে ভাষা, শব্দ এবং সরল প্রকাশ ভঙ্গী দিয়ে গড়ে তোলা ছড়াগুলিও সহজানুভূতিতে, সহজসাধ্যতায় আমাদের কাছে টানে। উপকূলীয় অঞ্চলের ছড়ার এই গঠনশৈলী বা আঙ্গিকগত দিকটি কীভাবে এই অঞ্চলের ছড়ায় প্রতিফলিত, কয়েকটি ছড়ার আলোকে তা জেনে নেবো ঃ

১। আদরিণী চাদর গায়
ভাত পায়নি ভাতার চায়

২। কপা কপা ভানুমতি
তিন ব্যায়া হইনে
সউ চিরোলদাঁতি

৩। তোর লিয়া শিল লড়া
তোর ভাঙ্ব দাঁতের গড়া

৪।　চিনি খাওয়া পো গয়ে
কুঁড়া খাওয়া পো বয়ে

৫।　শুষ্‌নি শাগের চারপাতা
ভাইসুর ভাইবউর একমাথা

৬।　বাঁশ মরে ফুলিয়া
মায়ুষ মরে বুলিয়া

৭।　সাত গাইর রস
এ্যাক বুড়া হ্যালিয়ার চাষ

উপরোক্ত প্রতিটি ছড়ার গঠনে রয়েছে সাবলীলতা। একবার শুনলেই বোধগম্য হয়। প্রথমটিতে জানতে পারি মাত্রাতিরিক্ত আকাঙ্খা। গরীব, খেটে খাওয়া, অন্ত্যেবাসী লোক-সাধারণের স্বপ্ন, দু-বেলা দু-মুঠো ভাত পাওয়া। সেখানে আদরের চাদর গায়ে মেয়েটি যে কিনা দুটো ভাত পায় না, তার 'ভাতার চায়' অর্থাৎ স্বামীর ঘরে যাওয়ার স্বপ্ন বাস্তবিক-ই অলীক কল্পনা (সংস্কৃত ভর্তা > ভাতার এসেছে, যার অর্থ স্বামী)। দ্বিতীয় ছড়ায় ব্যক্ত হয়েছে পুরুষের জীবনে চাওয়া-পাওয়া। কিন্তু নিয়তি এসে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই তিন-তিন বার বিয়ে করলেও ভাগ্যে সেই 'চিরোলদাঁতি' অর্থাৎ ফাঁকা ফাঁকা দাঁতওয়ালা অসুন্দরী নারী-ই জোটে। তৃতীয় ছড়াটি অতি বাস্তব। আমাদের বর্তমান সমাজটাই এমন, যার খায় তার-ই নিন্দা-মন্দ করে। ছড়াটিতে আছে যার 'শিল' যার 'নোড়া' তার ভাঙ্গাবে দাঁতের গোড়া এমন-ই অকৃতজ্ঞ। চতুর্থ ছড়াটিতে পাই অতি যত্ন, অযত্নের-ই কারণ। তাই যে ছেলে-মেয়েদেরকে আদর-স্নেহ দিয়ে তুলে ধরা হয়, তারাই স্বাস্থ্যবান হতে পারে না। কিন্তু যাদেরকে গরীব বাবা-মায়েরা যথাযথ আহার্য টুকু দিনের শেষে খাওয়াতে পারে না, কোনো রকমে এটা ওটা খাইয়ে বড় করায়, দেখা যায়, তারা অনেক বেশি বলশালী ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। পঞ্চম ছড়াতে সমাজের অবৈধ সম্পর্কের ইঙ্গিত স্পষ্ট। 'ভাইসুর ভাইবউর একমাথা' পংক্তিটি ঐ তাৎপর্য-ই বহন করছে। ষষ্ঠ ছড়াটি শিক্ষা দেয় সমাজ জীবনের অতি ঘরোয়া ব্যাপারে। বাঁশ মরে যদি সে ফুলে যায়, আর মানুষ মরে যদি সে বুলে বেড়িয়ে খায়। দুটি-ই নষ্ট হওয়ার মূল কারণ। সপ্তম ছড়ায় পাই খেটে-খাওয়া মানুষদের জীবন থেকে নেওয়া অভিজ্ঞতা। গৃহস্থ বাড়িতে যে গাই গরু পোষা হয়, তা কেবল দুধ দিয়ে আমাদের উপকার করে। আর বলদ গরু লাঙ্গল টানে, অর্থাৎ চাষ-আবাদে হাল করে কৃষকবন্ধুদের সাহায্য করে। তবে বাস্তবে অনেক বেশি গুরুত্ব পায় সেই

বলদ গরুটি, যে বৃদ্ধ হলেও হাল করতে সক্ষম, কেননা সে সাতটি গাভীর চেয়েও অধিক মূল্যবান। অনুরূপ ভাবে পাই —

১। কাকু দ্যাখে বেহুলা
দাদু দ্যাখে খবর
দিদা দ্যাখে বাংলা ছবি
কাঁদে সঁপর সঁপর [২৫৬]

২। ট্যারা গাড়ি কিনেছে
টেরি চড়বে বলেছে
ট্যারা ব্রেক টিপেছে
টেরি উল্টে পড়েছে। [২৫৭]

৩। কানের ভাতার কান খড়কিয়া
হাঁসের ভাতার দড়ি
ম্যায়ার ভাতার মদ্দ বটে
মদ্দর ভাতার কড়ি

উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রতিটি ছড়াই শব্দ সৌকর্যের অধিকারী। জীবন থেকে নেওয়া কথ্য, অমার্জিত অতি বাস্তব এই শব্দাবলী, ছড়াগুলিকে অনেকবেশি জীবন্ত ও অকপট করে তুলেছে।

৫. শৃঙ্খলামূলক ছড়া ঃ

ক্ষেত্রসমীক্ষায় লব্ধ হয়েছে এমন অনেক ছড়া, যেখানে ছড়ার আঙ্গিকে নতুনত্ব দেখা দিয়েছে। আঙ্গিকের নতুন দিকটি হল শৃঙ্খলামূলক দিক। এটি ছড়ার আঙ্গিকের অন্যতম একটি উপ-বিভাগ। এই শৃঙ্খলিত ছড়াতে কথার পর কথা জুড়ে তৈরী হয়েছে শৃঙ্খল। কথার পর কথার মালা গেঁথে যেমন তৈরী হয় লোককথা, তেমনি কথার পর কথা দিয়ে তৈরী হয়েছে, শৃঙ্খলিত ছড়া এখানে শৃঙ্খলিত সেই ছড়াগুলি তুলে ধরা হল, যেখানে একটি সূত্র ধরে ছড়াটি পর পর এগিয়ে গেছে ঃ

১. ইড়ি বিড়ি সিড়ি / তিন পইসার বিড়ি / বিড়িতে নাই আগুন / হয়্যা গেল বেগুন / বেগুনে নাই বিচি / হয়্যা গেল কাঁচি / কাঁচিতে নাই ধার / হয়্যা গেল হার / হারে নাই লকেট / হয়্যা গেল পকেট / পকেটে নাই টাকা / হয়্যা গেল ফাঁকা। [২৫৮]

২. আমার এক দাদু ছিল / বিড়ি খাবার লোক / সেই বিড়ি খেয়ে দাদু / বাজারে গেল/
বাজারে ছিল ভালুক ভায়া / তাড়া করিল / সেই তাড়া খেয়ে দাদু / গাছে উঁঠিল /
গাছে ছিল কাট্‌ঠোক্‌রা / ঠোক্কর মারিল / সেই ঠোক্কর খেয়ে দাদু / মাটিতে পড়িল/
মাটিতে ছিল বাব্‌লা কাঁটা / পায়ে ফুড়িল / সেই পা নিয়ে দাদু / বাড়ি ফিরিল /
বাড়িতে ছিল টেপাটেপি / পা টিপিল / সেই পা নিয়ে দাদু / স্বর্গে চলিল / [২৫৯]
স্বর্গে ছিল শিবদুর্গা / আদর করিল / সেই আদর খেয়ে দাদু / বাঁন্দর সাজিল

৩. একতলা দুতলা তিনতলা / পুলিশ যাবে নিমতলা / পুলিশের হাতে লম্বা লাঠি /
ভয় করবে না কংগ্রেস পার্টি / কংগ্রেস পার্টি বারোটা / ডিম পেড়েছে তেরটা /
একটা ডিম নষ্ট / চড়াই পাখির কষ্ট। [২৬০]

৪. একেতে বালিশ খলা / দুয়েতে পাঁপর ভাজা / তিনেতে খ্যাসারি / চারেতে খেজুরী/
পাঁচে পাঁচরকমের ভাজা / ছয়েতে ছলা ভাজা / সাতেতে মটর ভাজা /
আটেতে বাদাম ভাজা / নয়েতে ননাভাজা / দশেতে তেল চুব্‌চুব্‌ তেলে ভাজা /
এগারতে ঘি চুব্‌চুব্‌ ঘি ভাজা / বারতে বাঘা বাগ খেলতে যায় / ৮০ টাকা পায় /
৮০ টাকার খ্যাসারি কিয়ে / লাল বাজারে যায়। [২৬১]

৫. মামনি সরকার / গাছে উঠা দরকার / গাচ থেকে পড়ে গেলে /
অসুদের দরকার / অসুদ নাই ঘরে / টাকা চুরি করে / সাদ্‌দিন পরে /
জেল খেটে মরে / পুলিশ মামা টাটা / আন্ডার প্যান্ট ফাটা /
আন্ডার প্যান্টে দড়ি নাই / বিয়ে করতে মনে নাই। [২৬২]

৬. ওয়ান / খায় পাকা পান / টু / খায় গু / থ্রি / পায়খানার মিস্ত্রি /
ফোর / জুতা চোর / ফাইভ / পঁদে পাইপ / সিক্স / খায় ভিক্স /
সেভেন / গল্লা খাবেন /এইট / ওড়ায় কাইট / নাইন / সুপার ফাইন /
টেন / পকেটে পেন। [২৬৩]

৭. আলুপটলের তরকারি / শিবের মাথায় জলঢালি / শিব গেল বোম্বে /
পার্বতী গেল সঙ্গো / উঁচা উঁচা রাস্তা / হিল তুয়া জুতা /
জুতার হিল ভেঙ্গো গেল / পার্বতী পড়ে গেল। [২৬৪]

৮. বেলা রে বেলা / আমরা করি খেলা / ওই মেয়েটা বসে আছে /
ওর কোনো বন্ধু নাই / ওঠো গো ওঠো / চোখের জ মোছ /
আকাশ পানে চাও / যাকে ছুঁবে ছুঁয়। [২৬৫]

৬. বিপরীতভাবধর্মী ছড়া ঃ

গঠনশৈলীর একটি অন্যতম বিষয় হল বিপরীতভাবধর্মী ছড়া। সংগৃহীত ছড়ার মধ্যে এমন বেশ কয়েকটি ছড়া আছে, যা মূল বক্তব্যের দিক দিয়ে বিপরীত। আঙ্গিকগতভাবে এই ধরনের ছড়া সত্যিই অভিনব। ছড়া সাহিত্যে এটি এক নতুন সংযোজন। এই ধরনের ছড়াগুলির দেহ-কাঠামো অত্যন্ত ছোট, বেশির ভাগ দুই পংক্তির ছড়া, যার প্রথম চরণে যে ভাব প্রকাশিত, দ্বিতীয় চরণে তার বিপরীত ভাব প্রকাশিত। যথা ঃ

১। লোকে লকারণ্য
জনমানব শূন্য

২। ধন আছে ত মন নাই
মন আছে ত ধন নাই

৩। খঁড়ে কাজ নাই
মাগির দঁড়ে অব্‌সর্‌ নাই

৪। যাকে দেখ্‌বুনি হাটে বাটে
তাকে দেখ্‌বু গেড়িয়াঘাটে

৫। পৈতা কালো বামুন ভালো
পৈতা সাদা বামুন গাধা

৬। কাজের কুড়িয়া
ভোজনের দেড়িয়া

৭। কাঁক পেটা খায় দায়
ডাবুর পেটার নাম যায়

৮। দিষ্টে আঁটেনি
ফাঁড়ে ধরেনি

উপরোক্ত প্রতিটি ছড়ায় বিপরীতভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। এই বিপরীত ভাবনা সবসময় যে ঠিক বিপরীত শব্দ প্রয়োগে ঘটেছে, এমনটা নয়। বিপরীত শব্দের পরিবর্তে বিপরীত ভাবনা-চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে, আমি সেটাই বোঝাতে চেয়েছি। প্রথম ছড়াতে বলা হয়েছে,

‘লোকে লোকারণ্য’ প্রচুর ভিড়, অথচ পরের চরণে বলা হচ্ছে ‘জনমানব শূন্য’ অর্থাৎ একেবারেই লোকজন নেই। এই ছড়াটিতে, পূজা-পার্বণ-অনুষ্ঠানে-মেলায় মানুষের ভিড়-ভাট্টার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু মেলায় ভিড় না হয়ে খুব কম লোকজন এলে, তখন-ই ঠাট্টার চ্ছলে বলা হয় উপরোক্ত মন্তব্যটি, যার অর্থ, মেলায় লোকজন নেই বললেই চলে। দ্বিতীয় ছড়াটিতে বলা হয়েছে, ‘ধন’ এবং ‘মন’ একসঙ্গে একমানুষের মধ্যে থাকে না। কোনো মানুষের মধ্যে যদি ‘ধন’ থাকে তাহলে তার ‘মন’ থাকে না, আবার ‘মন’ যার আছে তার ‘ধন’ নেই। তৃতীয়টিতে ব্যক্ত হয়েছে, কোনো অলস মেয়ের কথা। যে কোনো কাজ করে না, অথচ গল্প যে তার সাথে করা যাবে এমন ‘অবসর’ সময় ও তার নেই। অর্থাৎ কর্মহীন অথচ অবসর নেই। তাই ছড়ায় বক্তা তাকে এমনভাবে বিদ্রুপ করেছে। চতুর্থ ছড়াটিতে ব্যক্ত হয়েছে, যাকে বাড়ির বাইরে হাটে-বাটে কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না, তাকে কিন্তু ‘গেড়িয়াঘাটে’ অর্থাৎ পুকুরঘাটে দেখা যাবে। ‘হাট-বাট’ এখানে দূর অর্থে এবং ‘গেড়িয়াঘাট’ নিকট অর্থে প্রয়োগ হয়েছে। পঞ্চম ছড়াটি আরো মজার। বলা হয়েছে ‘পৈতা কালো’ তবে বামুন ভালো, আর যদি পৈতা সাদা হয় তবে সে বামুন ভালো নয়। এখানে ‘কালো’-‘সাদা’ এই বৈপরীত্যের সঙ্গে সঙ্গে ‘ভালো’ আর ‘গাধা’ এই বিপরীত ভাবনাটি প্রকাশ হয়েছে। ষষ্ঠ ছড়াটিতে কর্মহীন ব্যক্তির বেশি বেশি খাদ্য খাওয়ার ভাবনাটি প্রকাশিত। আমরা জানি যে বেশি পরিশ্রম করে, সে বেশি আহার করে, অথচ ছড়ায় দেখছি এই ভাবনার বিপরীত চিত্র। কামকর্ম নেই, এদিকে প্রায় একজনের বেশি মানুষের খাওয়ার খেয়ে নেওয়ার কথাই ব্যক্ত। সপ্তম ছড়াটিও একই ভাবনার ফলশ্রুতি। ‘কাঁক পেটা’ খায়-দায় আর ‘ডাবুর পেটা’-র নাম যায়। এখানে ‘কাক পেটা’-র অর্থ পরিমাপমত খাদ্য গ্রহণের পরও যাদের পেট নিচু হয়ে থাকে, ফুলে ওঠে না। আর ‘ডাবুর পেটা’র অর্থ যার আহারের আগে পরে পেটখানা ভর্তি, ফোলা ফোলা লাগে। শেষ ছড়াটি ও খাওয়া-দাওয়ার কথা বলে। ছড়াটিতে বলা হয়েছে, অনেকে ভাবে সব খাবে, এই অল্প আহারে তার কিচ্ছু হবে না। বাস্তবিক-ই দেখা যায়, তারা মুখে ও মনে এই ভাব থাকলেও কার্যকালে কিছু খেতে পারে না, কেননা ‘ফাঁড়ে’ অর্থাৎ ‘পেটে’ ধরে না বলে তাই।

সুতরাং উপরোক্ত বিপরীতভাব ধর্মী ছড়াগুলি এককথায় অনবদ্য। বিপরীত শব্দে নয়, বিপরীত ভাবনায় ছড়াগুলি বেশ আকর্ষণীয়।

৭. প্রশ্ন উত্তরধর্মী ছড়া ঃ

প্রসঙ্গাক্রমে আলোচিত যে, ছড়া মূলত পদ্যধর্মী। লোকমন তাদের সাতকাহন রচনা করেছেন এই ছড়ায়। ছড়া স্বতঃস্ফূর্ত হলেও গার্হস্থ জীবন থেকে বিলাসিতাময় জীবন পর্যন্ত জীবনের সব খুঁটি নাটি দিক এতে উঠে এসেছে। ফলে ছড়ার আঙ্গিকে কিছু নতুনত্ব দেখা দিয়েছে। কখনো গদ্যে, কখনো পদ্যে, কখনো বা নাটকাকারে, আবার কখনো সংলাপের মধ্য দিয়ে বহু লোকছড়া সংগৃহীত হয়েছে যা, সংলাপমূলক (Dialogue) অর্থাৎ প্রশ্ন-উত্তরধর্মী। যাকে আমরা উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলকও বলতে পারি।

সংলাপধর্মীতার বৈশিষ্ট্যই হল সেখানে পাত্র-পাত্রী থাকবে। একজন নয়, দুই বা ততোধিক। মূলত ছড়ার সংলাপে দুইজন কুশীলব তো থাকবে। পৃথিবীর নাট্যশালায় দেখা যায় নানা রকমের সংলাপ। যার জন্য রাজার রাজপ্রাসাদ থেকে গরিবের কুঁড়েঘর এক আসনে বসে নাট্যরস আস্বাদন করে। এই ধরনের একটি ছড়া হল, —

১। চাড়ি রে চাড়ি তোর ঘর যে পুড়ি গেলা
ঘর পুড়নে কি হইলা আমার চাড় তো রইলা [২৬৬]

কিছু মানুষ আছে আড়ম্বর প্রিয়। এখানে ছড়ায় তাই 'চাড়ি' অর্থাৎ চাড় দেখায় যে, মিথ্যে আড়ম্বর, সেই চাড়ির ঘর পুড়ে যাচ্ছে তবুও দেখানো আভিজাত্য কমছে না, তাই প্রতিবেশীর গলায় সতর্কবার্তা। তাতে কিন্তু চাড়ির কিছু যায় আসে না। তার মতে ঘর পুড়লেও তার 'চাড়' ঠিক বজায় আছে।

এই রকম কোন এক নারীকে তার প্রতিবেশিনী প্রশ্ন করছে যে সে কোথায় যাচ্ছে? উত্তরে সে যা জানায়, তা আজকাল ঘটে চলা বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি। ছড়ায় কি না পাওয়া যায়। ছড়া যেন ২৪ ঘন্টার তাজা টাট্‌কা খবর। যা সারাদিন রাত আমাদের বলেই চলেছে সংবাদ। শুধু একটু কান রাখলেই হলো —

২। যাচ্ছ কোথায়? পিরিত্‌ যেথায়
আস্‌বে কবে? চট্‌বে যবে

এ যেন যতদিন ভাব, ততদিন ভক্তির পসরা। তাই ছড়া জানায় যেখানে পিরিত্‌ অর্থাৎ ভালবাসা নেই সেখানে থেকেও কাজ নেই। তাই ভালবাসার অন্বেষণে বিরহী যক্ষের মতো

অলকাপুরীর অভিযানে চলেছে। তবে এখানে যক্ষের আরো এক ঘাট উপরে ছড়া আগে ভাগে জানিয়ে দেয়, সেই দিন-ই ফিরে আসবে, যেদিন ভালবাসা (চটবে) ফুরিয়ে যাবে। মানুষ চায় ভালবাসা প্রেম প্রীতি। ছড়া তাই বলছে যেখানে ভালবাসা নেই সেখানে থাকারও কোন মানে নেই।

জীবন প্রবহমান। নদী যেমন যৌবন অবস্থা থেকে প্রৌঢ় অবস্থায় অতিবাহিত হয়, আমাদের জীবনও তদ্‌রূপ উত্থান-পতন সমৃদ্ধ। আজ যে তরুণী কাল সে প্রৌঢ়া। একটি ছড়ায় পাই —

প্রশ্ন - ঠাক্‌মা, তুমি কেমন আছ?
উত্তর - আমার কি লুবু ভাই,
পাকা আম ঝড়তে বুসছি
না, পাকা আম মিষ্ঠি বেশী

বৃদ্ধ বয়সের জীবনাভিজ্ঞতা থেকে বেরিয়ে আসা এই ছড়াটি। প্রবাদ আছে — 'পুরানো চাল ভাতে বাড়ে', তেমনি বয়স্ক দাদু-ঠাকুমাদের প্রয়োজনীয়তাও ফুরয় না। কিন্তু বর্তমানে বৃদ্ধ পিতা-মাতার যে কতখানি আদর-আপ্যায়ন করা হয় তার দৃষ্টান্ত বৃদ্ধাশ্রম-ই জানে। তাই লোকায়ত মানুষ জীবনের পাঠশালায় যে শিক্ষাগ্রহণ করেছে তার জ্বলন্ত দগ্‌দগে ঘা হল আলোচ্য ছড়াটি।

সংসার বড় কঠিন। কতখানি কঠিন তা বোঝা যায়, যখন নিজের হাতে গড়া হয়। আর তা না হয়ে যদি পরের হোটেলে জীবন কাটায় তাতে সে বুঝতেই পারে না দু-বেলা দুমুঠো শাক-ভাতের জোগাড় কত কষ্টে হয়। তাই ছড়া বিদ্রুপের চাহনিতে দেখিয়ে দেয় চোখে আঙ্গুল দিয়ে—

প্রশ্ন - পায়ের উপর পা কেনিরে?
উত্তর - এক্‌ঠি আছি
প্রশ্ন - দাঁত মাজতে মাজতে শাগ্ তয়ায় জ কেনিরে?
উত্তর - না, আল্‌দা হই্‌ছি।

কথায় বলে 'কাঁধে জোয়াল পড়লে গরু ঠিক লাঙ্গাল করে', অর্থাৎ চাপ পড়লে মানুষও তেমনি ঠিক কাজ করে। যার কোনো কাজ নেই সেই মানুষ ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। অথচ

ঐ একই ব্যক্তি সংসারের দায়িত্ব নিলে দেখা যায়, একটুও সময় নষ্ট করে না। উপরের ছড়াটিতে সেই চিত্র-ই চিত্রিত।

গ্রামবাংলার মানুষজন সংহত এবং সমষ্টিগত ঐক্যে একীভূত। এখানকার গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন একের সমস্যায় অন্যজন ঝাঁপিয়ে পড়ে, কোনো একজনের সমস্যা ব্যক্তিগতভাবে তার হলে ও তা কিন্তু সকলের, সমষ্টির। বিপদকালে তা সর্বজনের। যা আমাদের শিষ্ট জীবনে দেখাই যায় না বললে হয়। তাই এই অঞ্চলের কোনো মানুষ কোথাও গেলে প্রত্যেকে জিজ্ঞাসা করে যে, কোথায় যাবে? কেন যাবে? তেমনি উত্তর দাতাও ভাবেই না যে উত্তর দেবে না, বরং স্বতঃস্ফূর্তভাবে উত্তর দেয়। এই ছবি কেবল সংহত সমাজেই দেখা যায়। কেননা, ছড়ার উদ্ভব তো সেই সংহত জীবন প্রণালী থেকে —

প্রশ্ন - কে যাওঠ(অ)গ সকাবেলা
মড়ির মা দিদি নাকি
কেমা যাবে গ
লয়া জুতা, লয়া কাপড় পিঁন্ধি [২৬৭]
উত্তর - যাবা বলে মাইঝি দোকে
লিকি লাড়ু চাউল ভাজা
ঝি - ঝাঁইকে ডাকতে যাবা
প্রশ্ন - সেদিন আর নাই রে বামনী [২৬৮]
উত্তর - তয়ে ভাত তাউ উপরে আমানী

উপরের ছড়াটিতে গ্রামাঞ্চলের মায়েরা মেয়ের বাড়ি গেলে, সঙ্গে কিছু বাড়ির তৈরী উপহারও নিয়ে যায়, এবং যাওয়ার সময় প্রতিবেশিনীকে পরিচিতজনও ঠিক এইভাবে জিজ্ঞাসা করে — 'কেমা যাবে গ' অর্থাৎ কোথায় যাওয়া হবে? নতুন জুতা, নতুন কাপড় পরে (লয়া জুতা, লয়া কাপড় পিঁন্ধি)। এই প্রশ্নের উত্তরে যাত্রাকারী মহিলা জানায় যে, মেয়ে জামাইকে (ঝি-ঝাঁইকে) ডাকতে যাবে।

ছড়ায় বহুরকম উক্তি প্রত্যুক্তির কথা জানতে পারি। সংগৃহীত পিতা-পুত্রের প্রশ্ন-উত্তরধর্মী চমৎকার একটি ছড়া হল নিম্নরূপ —

পুত্র - পূজনীয়

বাপ

তোমারে আমি জানাই

পড়ার ভীষণ চাপ

টাকার অভাব

টাকা আমার চাই

ইতি স্নেহের নিমাই

পিতা -স্নেহের

নিমাই

তোরে আমি জানাই

তোকে জন্ম দুয়া পাপ

ইতি তোর বাপ। [২৬৯]

এই ছড়াটি কেবল সংলাপধর্মী নয়, ছড়াটি রচিত হয়েছে চিঠির ঢং-এ। তাই এর গঠন কৌশল ভিন্ন মাত্রার। শব্দ যোজনায় আধুনিকতার ছাপ। পুত্র পিতার কাছে টাকাপ্রার্থী। কিন্তু এই টাকা চাওয়া যে অমূলক তা যোগ্যপুত্রের, যোগ্য পিতার বুঝতে দেরী হয়নি। তাই আক্ষেপের সুরে বলেছে এমন ছেলেকে জন্ম দেওয়া পাপ। একেবারে আধুনিক ভাব-ভাবনার প্রতিফলন।

প্রশ্ন-উত্তরধর্মী ছড়া প্রসঙ্গে আশ্রাফ সিদ্দিকীর 'লোকসাহিত্য' [২৭০] ১ম খণ্ড মহাশয়ের একটি ছড়া হল —

'বুড়া -ভাত রান্ধ্যা দাও তুমি। হাল বাইতে যাইব আমি।।

বুড়ী - ভাত রান্ধতে পারব না। বাপের বাড়িতে যাইব আমি।।

বুড়া - বাপের বাড়িতে যাইবা তুমি। চুল ধরইয়া আন্‌ব আমি।।

বুড়ী - চুল ধরইয়া আনবা তুমি। লেছুড় দিয়া থাকব আমি।

বুড়া - লেছুড় দিয়া থাকবা তুমি। কান্ধ করইয়া আনব আমি।।

বুড়ী - কান্ধ করইয়া আনবা তুমি। থু থু দিয়া পলাইবাম আমি।।

বুড়া - থু থু দিয়া পলাইবা তুমি। বানার নদীতে ধুমবাম আমি।।

বুড়ী - বানার নদীতে ধুইবা তুমি। পানির তলে পলাইবাম আমি।।

বুড়া - পানির তলে পলাইবা তুমি। জাল দিয়া ছাঁকব আমি।।
বুড়ী - জাল দিয়া ছাঁকবা তুমি। কাঁকড়ার গাথায় পলাইবাম আমি।।
বুড়া - কাঁকড়ার গাথায় পলাইব তুমি। কোদাল দিয়া তুলবাম আমি।।
বুড়ী - কোদাল দিয়া তুলবা তুমি। ছন ক্ষেতে পলাইবাম আমি।।
বুড়া - ছন ক্ষেতে পলাইবা তুমি। আগুন দিয়া পুড়বাম আমি ।।
বুড়ী - আগুন দিয়া পুড়বা তুমি। তোমারে থুইয়া মরবাম আমি।।
বুড়া - আমারে থুইয়া মরবা তুমি। তোমার সাথে যাইবাম আমি।।' [২৭১]

লেখক একে 'Forget me not' -এর বাংলার সঙ্গে তুলনা করেছেন।

ছড়ায় এই সংলাপধর্মীতা নতুন নয়। বহুদিন থেকে চলে আসছে, আজও হচ্ছে, আগামী দিনেও হবে। এই রীতি উপকূলীয় অঞ্চলের লোকছড়ায়ও লক্ষ্য করা যায়। সিদ্দিকী মহাশয়ের ময়মনসিংহের টাংগাইল থেকে প্রাপ্ত ছড়াটির মতো এই অঞ্চলে প্রাপ্ত ছড়াটি হল —

বালিকা- বুড়ী তোর হাঁড়ি কুঁড়ি কাই?
বুড়ী - হাঁড়িকুঁড়ি কাই পাব ভাই গ্যাড়ায় রান্দিয়া খাই।
বালিকা- গ্যাড়ায় রাঁন্দিয়া খাউ বুড়ী তোর চুলার পাঁউস কাই?
বুড়ী - চুলার পাঁউস কাই পাব ভাই বাড়ে বিছি দেই।
বালিকা- বাড়ে বিছি দউ বুড়ী তোর বাড়ির খন্দ কাই?
বুড়ী - বাড়ির খন্দ কাই পাব ভাই হাটে বিকিয়া দেই।
বালিকা- হাটে বিকিয়া দউ যদি তোর পয়সা কড়ি কাই?
বুড়ী - পয়সা কড়ি কাই পাব ভাই পান দক্তা খাই।
বালিকা- পান দক্তা খাউ বুড়ী তোর ঠোঁট রাঙা কাই?
বুড়ী - ঠোঁট রাঙা কাই পাবু ভাই ডেলি পান্তা খাই।
বালিকা- ডেলি পান্তা খাউ বুড়ী তোর পেট গাড়ু কাই?
বুড়ী - পেট গাড়ু কাই পাবু ভাই ডেলি হাগতে যাই।
বালিকা- ডেলি হাগতে যাউ বুড়ী তোর পঁদ অদা কাই?
বুড়ী - পঁদ অদা কাই পাবু ভাই উনানে সেঁকিয়া লেই।
বালিকা- উনানে সেঁকিয়া লউ বুড়ী তোর উনানে আগুন কাই?
বুড়ী - উনানে আগুন কাই পাবু ভাই লোকে দরকে যাই।

বালিকা- লোকের দরকে যাউ বুড়ী তোর লোকের ঘর কাই?

বুড়ী - লোকের ঘর কাই পাবু ভাই দিল্লী কটক যাই।[২৭২]

শিশুরা যে খেলার ছড়া বলে তাতেও সংলাপ ধর্মীতা আছে —

১ম জন - আঁতা পাতা ব্যাঙের ছাতা

২য় জন - কী ব্যাঙ?

১ম জন - কলা ব্যাঙ।

২য় জন - কী কলা?

১ম জন - বিচা কলা।

২য় জন - কী বিচা?

১ম জন - লাউ বিচা।

২য় জন - কী লাউ?

১ম জন - পানি লাউ

২য় জন - কী পানি?

১ম জন - মুত পানি।

২য় জন - কী মুত?

১ম জন - ছেলি মুত।

২য় জন - কী ছেলি?

১ম জন - রাম ছেলি।

২য় জন - কী রাম?

১ম জন - শ্রীরাম শ্রীরাম[২৭৩]

অনুরূপ আরও একটি ছড়া হল ঃ

ও দাদা

একটা কথা

কী কথা

ব্যাঙের কথা

কী ব্যাঙ

কলা ব্যাঙ

কী কলা

ভোদ্‌কা কলা

কী ভোদ্‌কা

গু চট্‌কা

কী গু

কা মানুষের গু

কী কা

আদা কা

কী আদা

তুই একটা হারামজাদা।[২৭৪]

৮. পুনরাবৃত্তিমূলক ছড়া ঃ

'পুনরাবৃত্তি' শব্দটির অর্থ বার বার আবৃত্তি করা, ইংরেজিতে যাকে বলে 'Repetition', আভিধানিক অর্থ 'পুনরায় পাঠকরণ বা কথন ঃ পুনরায় করণ বা সংঘটন (পুরাতনের পুনরাবৃত্তি); প্রত্যাবর্তন'।[২৭৫] একই শব্দগুচ্ছের পুনরায় কথন ছড়ার মতো লোকসাহিত্যের অন্যান্য বিভাগেও লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে এ প্রসঙ্গে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি' গ্রন্থের কথা বলতে পারি। তাঁর এই গ্রন্থে 'শীত-বসন্ত' গল্পে দেখা যায়, এই পুনরাবৃত্তিমূলক পংক্তি। যেখানে রূপবতী কন্যা সোনার টিয়াকে জিজ্ঞাসা করছে —

"সোনার টিয়া, বল্ তো আমার আর কি চাই?"

উত্তরে টিয়া বলল —

"সাজতো ভাল কন্যা, যদি সোনার নূপুর পাই।"

সোনার নূপুর পরে রাজকন্যা আবার বলল, —

"সোনার টিয়া, বল্ তো আমার আর কি চাই?"

টিয়া বলল, —

'সাজতো ভাল কন্যা, যদি ময়ূর পেখম পাই!"[২৭৬]

এছাড়াও 'নীলকমল লালকমল', 'কিরণমালা' গল্পে আমরা এই পুনরায় কথন লক্ষ্য করি। সুতরাং 'পুনরাবৃত্তি' এই বৈশিষ্ট্য, ছড়ার গঠনশৈলীতেও লক্ষণীয়। তবে ছড়ার ক্ষেত্রে এই

পুনরাবৃত্তি কখনও শব্দের, কখনও শব্দগুচ্ছের, আবার কখনও বা পুরো একটি চরণের হতে পারে। পুনরায় কথনের জন্যে ছড়ার দেহ-কাঠমোতে যেমন সৌন্দর্য বর্ধিত হয়, তেমন আবার ছড়ার ছন্দ-প্রবাহ, গতিময়তাও হয় ঝরঝরে এবং প্রাণময়। ছড়ার নির্মাণে পুনরাবৃত্তিমূলকতা তাই একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। নিম্নে কয়েকটি পুনরাবৃত্তিমূলক ছড়ার উল্লেখ করা গেল ঃ

কানের ভাতার কান খড়কিয়া
হাঁসের ভাতার দড়ি
ম্যায়ার ভাতার মদ্দ বটে
মদ্দর ভাতার কড়ি [২৭৭]

উপরোক্ত ছড়ায় 'ভাতার' শব্দটির বার বার প্রয়োগ ঘটেছে। এরকম অনুরূপ একটি ছড়া হল ঃ

পচা পচা পঞ্চান্ন
পচার বউ ছাপান্ন
পচা যাইছে দিল্লী
পচার বউ আঁড়িয়া বিল্লি [২৭৮]

ছড়াটিতে প্রথম চরণে 'পচা পচা পঞ্চান্ন' দ্বিতীয় চরণে 'পচার বউ' তৃতীয় চরণে 'পচা যাইছে' চতুর্থ চরণে আবার 'পচার বউ' শব্দগুচ্ছগুলি বার বার প্রয়োগে পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। তাই ছড়াটি পুনরাবৃত্তিমূলক ছড়ার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে পরিগণিত। তুলনীয় নিম্নোক্ত ছড়াটিও ঃ

ট্যারা গাড়ি কিনেছে
টেরি চড়বে বলেছে
ট্যারা ব্রেক টিপেছে
টেরি উল্টে পড়েছে। [২৭৯]

৯. চিঠিধর্মী ছড়া ঃ

প্রতিটি শিল্পকর্ম প্রতিনিয়ত নিজেকে পরিবর্তন করছে। এই পরিবর্তনের জোয়ারে ছড়াও নিজের কায়া গঠনে সর্বদা সচেষ্ট। তাই এতদিন ছড়া বলতে যে পদ্যে রচিত ছন্দবন্ধ পদকে বুঝতাম, সেই ছড়ার গঠনে দেখা দিয়েছে নতুনত্বের ছোঁয়া। তাই চিঠিধর্মী ছড়াও রচিত হচ্ছে।

ছড়াকে চিঠির আদলে লিখে মনের কথা বলা হচ্ছে। আর এ ধরনের চিঠিধর্মী ছড়ার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে উপকূলীয় অঞ্চলের সংগৃহীত ছড়ায়। তবে চিঠিধর্মী ছড়ার সংখ্যা অতি নগন্য। আমার এই এলাকায় যে দুটি ছড়া পেয়েছি, সেগুলি এখানে তুলে ধরলাম। ছড়ার গঠনশৈলীর আলোচনায় আশা করি এই নবরূপ এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন হবে ঃ

পূজনীয়

বাপ,

তোমারে আমি জানাই

পড়ার ভীষণ চাপ

টাকার অভাব

টাকা আমার চাই

ইতি স্নেহের নিমাই

স্নেহের

নিমাই,

তোরে আমি জানাই

তোকে জন্ম দুয়া পাপ

ইতি তোর্ বাপ। [২৮০]

উপরোক্ত ছড়াটিতে পুত্র তার পিতাকে চিঠিখানা লিখেছে। অনুরূপ আর একটি চিঠিধর্মী ছড়া পাওয়া গেছে, যে ছড়াটিতে স্ত্রী তার স্বামীকে চিঠিখানা লিখেছে ঃ

পূজনীয়

স্বামী,

তুমাকে আমি বলি

সংসারের বড়(অ) জ্বালা

বৃথা পরেছি মালা

তাই অনেক ভেবে চিন্তে

গেলাম বাপের দর

কখনও যদি পড়ে মনে

আসব তুমার ঘর
ইতি তুমার পর

আদরের
স্ত্রী,
তোকে আমি বলি
তোকে ব্যায়া হওয়াটাই পাপ
এমন জান্‌লে আগেভাগে
ব্যায়া দিত নি বাপ
ডিভোর্স যেদিন দুব তোকে
সেদিন যাব আমি
ইতি তোর স্বামী।[২৮১]

১০। গল্পকথনধর্মী (বিবরণধর্মী) ছড়া ঃ

ছড়ার মধ্য দিয়ে কোনো ঘটনার বর্ণনা করা গঠনশৈলীর এক অন্যতম বিষয়। ছড়া কেবল দুই, চার, ছয় পংক্তির মধ্যে কয়েকটি ভাবনামাত্র প্রকাশ করে তা নয়, কখনও কখনও আমরা ছড়ার সেই ভাবনার মধ্যে গল্পকথননির্ভর বিবরণধর্মীতার ধরনটিও পেয়ে থাকি। এই রকম বিবরণধর্মী কয়েকটি ছড়া হল নিম্নরূপ ঃ

১।　টুম্পারে টুম্পা
গলায় তোর গাম্‌ছা
হাতে তোর বাল্‌তি
কাখে তোর কল্‌সি
আমি যদি তোর ছেলে হতাম
কল্‌কাতাতে চাক্‌রি পেতাম
ঝুমুর ঝুমুর পয়সা পেতাম
পান বিড়ি সিগারেট কিনে যেতাম[২৮২]

২।　লাবনি সরকার
গাছে উঠা দরকার

গাচ্ থেকে পড়ে গেলে
অসুদের দরকার
অসুদ নাই ঘরে
টাকা চুরি করে
সাদ্দিন পরে
জেল খাটিয়া মরে। [২৮৩]

৩। চাল্তা পাতা চাল্তাপাতা
বিয়ে দুবু তো দে
তোর বিয়েতে নাচ্তে যাব
ঝুমকা কিনে দে
দিদিকে দিল আশেপাশে
আমাকে দিল নদীর পাশে
নদীর জল কল্কল্ করে
মায়ের কথা মনে পড়ে
বাবার কি চোক্ ছিল নি
আর কি বর পেল নি। [২৮৪]

৪। বাজনা বাজে মাইক বাজে বাজে জগঝম্প
মাঘের শেষ তবু কিন্তু যায়নি শীতের কম্প
উৎসবে আজ মাত্ছে সবাই মানছে না কুন ক্লেশ
একে একে উৎসবে সবাই মেতে উঠেছে বেশ
কালকে ছিল শিবরাত্রি আনন্দ সবার মনে
জল ঢেলে তাই শিবের মাথায় মানস করেন সবে
অমঙ্গল আজ দূর কর সব সবার মনোভাবে
শিবরাত্রির মানত করে যত কুমারী গনে
উপোষ করে পূজা দেয় বাবা শিবের পদে
দিনটি রবে পরিচিত মানব কুলের মাঝে
শিব-দুর্গার বিয়ে হল শিবরাত্রির সাঁঝে। [২৮৫]

৫।	রথে চড়ে মাসী বাড়ি যাবে জগন্নাথ

সুভদ্রা বোন বলরাম ভাই যাবে একসাথ্

ভক্তেরা মিলে রথে দিল টান

গড়গড়িয়ে জগন্নাথ মাসিবাড়ি যান্

রথ টানে সবাই দেখ হাসিখুশি মনে

মেলায় ঘুরে খুশিমত জিনিসপত্র কিনে

মেলায় দেখ দোকানগুলা আম-কাঠালে ভরা

বাড়ি যাবে তাইতো সবাই করছে তাড়াহুড়া

খাওয়ার মত দোকান সব ভীড়ে ঠাসা লোকে

খুশিমত কিনছে জিনিস কেবা কাকে দেখে

চল্‌ল সবে আপন ঘরে রথের মেলা থেকে [২৮৬]

৬।	তা গাছে জ দিতে দিতে

কোমর ভেঙ্গো গেল

একটা তা খুঁজে পেলাম না

চোরের পেটে গেল

চোর চোর চিচিঙ্গা

চোরের মুখে মুতিঙ্গা

চোর গেল মহিষাগোঠ

খেয়ে এল গোরুগোঠ [২৮৭]

৭।	আমার জল মেশানো দুদ্ নয় গো

দুদ্ মেশানো জল

একে খেলে ছেলে বুড়ো

পায় শরীরে বল

এ দুদেতে পেতেই পার

কুচো চিংড়ি টিকে পনা

একে খেলে ফড়িং হয়

রাম গরুড়ের ছেনা

বিক্রি আছে কিনবে যদি
এসো আমার বাটিকা
নামেই আমায় সবাই চিনে
নামটি নয়া টিকা [২৮৮]

৮। মাঘেতে মকর মিঠা কটুতলে শিম্
ফাগুনেতে দ্বিগুন মিঠা বাড়তিকেতে নিম্
চৈত্রেতে শ্রীফল মিঠা খেয়েছিলেন রাম
বৈশাখেতে শসা মিঠা শোলমাছেতে আম
জৈষ্ঠ্যেতে পাকা আম আষাঢ়ে কাঁঠাল
শ্রাবণেতে খই দই ভাদ্রে পাকা আম
আশ্বিনেতে ঝুনা নারকেল কার্ত্তিকেতে ওল
মক্রিরেতে নবাঅন্ন চিংড়িমাছে ঝোল
পৌষেতে পিঠাপুলি খেতে লাগে মজা
ঘন আউটা তপ্তা দুধে বাসি পড়া পিঠা [২৮৯]

৯। নানা ভাইরে তানা ভাই মো বুলিটি শুন
বিলর মাচ চিল খাইলা ধৌড়ি গটে বুন
ধৌড়ি গলা ভাসিরে পটা গলা খসি
নানা ভাই যে কাঁদুথিলে হিড় মাথায় বসি [২৯০]

১০। আয়রে আয় তিতিবনি গাই দুইতে জিবা
মা বাপ গালি দিনে সন্ন্যাসী হইবা
ভুখ্ কর্নে কি খাইবা কঁসাইনদীর জল
নিদ্ মাড়্নে কেঠি শুইবা গাইপাদতল [২৯১]

উপরোক্ত ছড়াগুলির প্রত্যেকটি বিবরণধর্মী অথচ যার মধ্যে রয়েছে গল্প বলার ধরন। এগুলির প্রতিটিতে কোনো না কোনো ঘটনার বিবরণ বর্ণিত আছে। প্রথম ছড়াটিতে প্রথম চারলাইনে টুম্পা বলে মেয়েটির কথা ব্যক্ত হয়েছে। যার গলায় গামছা, হাতে বাল্তি এবং কাঁখে কলসীর কথা বলা হয়েছে। তারপর-ই পরের চার লাইনে তার ছেলের কথা বলা হয়েছে সে যদি তার ছেলে হতো, তবে কল্কাতাতে চাক্রি করত এবং প্রচুর পয়সা রোজগার করে পান,

বিড়ি, সিগারেট কিনে আধুনিক ভোগ-সর্বস্ব জীবনের স্বপ্নে মশগুল হতো। ছড়াটিতে নাগরিক জীবনের চিত্র আভাসিত। দ্বিতীয় ছড়ায় লাবনি সরকার বলে একটি সরল সহজ গ্রাম্য নারীর কথা বলা হয়েছে। যার কিনা, গাছে ওঠা দরকার, উঠতে গিয়ে যদি পড়ে যায়, তার জন্য অসুদের প্রয়োজন এবং সেই অসুদ সে টাকা চুরি করে কিনতে গিয়ে ধরা পড়ে এবং তার জন্য জেল খেটে মারাও যায়। সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার যে লড়াই, এই ছড়াটিতে সেই লড়াই এর বিবরণ বর্ণিত হয়েছে। তৃতীয় ছড়াটিতে বিবাহিত জীবনে বেদনার ছাপ স্পষ্ট। যে বরে বিয়ে দেওয়া হয়েছে, তা যথাযথ নয়, তাই আক্ষেপ করতে শোনা যায়, এই কারণে যে, দিদিকে আশেপাশে বিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাকে নদীর পাশে অর্থাৎ দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাই তার দুঃখ প্রকাশিত হয়েছে। চতুর্থ ছড়াটিতে শিবরাত্রির ব্রত ও উপবাসের বর্ণনা রয়েছে। যেখানে বাজনার সঙ্গে সঙ্গে বহু মানুষের উৎসব-কোলাহলের উচ্ছ্বাস প্রকাশিত হয়েছে, এতে বাঙালির লৌকিক সংস্কৃতির এক অনবদ্য প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত। পঞ্চম ছড়াটি আমাদের রথযাত্রাকে নিয়ে রচিত। যেখানে রথে চড়ে জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রা মাসি বাড়ি যাচ্ছে। ভক্তেরা পথের দুইধারে দাঁড়িয়ে আনন্দে রথ টানছে এবং মেলায় এসে আম-কাঁঠাল কিনছে, খুশিমনে হাসি-ঠাট্টায় ব্যস্ত, ভিড়ে ঠাসা লোকজন উৎসব মুখর হয়ে সব শেষে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। রথযাত্রার এমন সুন্দর বিবরণ সত্যিই চমৎকার। পুরো বিষয়টা আমাদের কাছে গল্পের আকারে বর্ণিত হয়েছে। ষষ্ঠ ছড়ায় তাল চুরির বিবরণ এবং সপ্তম ছড়ায় জল মেশানো দুধের বর্ণনা রয়েছে, যা আমাদের সুস্বাস্থ্য গড়ে তুলতে সাহায্য করে, এবং তা কেনার জন্য বাড়িতে যাওয়ার কথা ব্যক্ত হয়েছে এবং তার অসুদের নামটি নয়া টীকা বলে খ্যাত। অষ্টম ছড়াতে বাঙালির বারো মাসে বারো রকমের খাদ্যানুষ্ঠানের বিবরণ সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। নবম ছড়াটিতে গ্রাম-বাংলার মাঠে ঘাটে 'ধৌড়ি' দিয়ে মাছ ধরবার পরিকল্পনা ব্যক্ত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত 'ধৌড়ি' যখন বানের জলে ভেসে গেল তখন 'নানা' ভাইয়ের মাঠের 'হিড়মাথায়' বসে কান্নার চিত্র ধরা পড়েছে। দশম ছড়াটিও একই রকম ভাবনার বাণীমূর্তি। এতে গাই দুয়ানো, পিতা-মাতার বকুনিতে সন্ন্যাসী হওয়া খিদে পেলে কাঁসাই নদীর জল খাওয়া এবং ঘুম পেলে 'গাইপাদতল' গরুর পদতলে ঘুমিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। সবটাই পল্লী বাংলার সহজ সরল প্রকৃতির চিত্রের মতো যেন ছোট ছোট শিশুমনের কল্পনা। যা এক নিমেষে আমাদের মনকে গল্পের আমেজ এনে দেয়। পরিশেষে বলা যায় যে, প্রতিটি ছড়াতে রয়েছে গল্পকথনের ভঙ্গী, যা পুরোপুরি গল্প হয়ে না উঠলেও বিবরণ ধর্মীতায়, গল্পের আদলকে ছুঁয়ে গেছে। আর এখানেই উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাপ্ত ছড়াগুলির সার্থকতা ও যথার্থতা।

১১. পুরুষের ছড়া ঃ

বেশকিছু ছড়া রয়েছে যেগুলি শুনলেই বোঝা যাবে ছড়াগুলি পুরুষদের-ই জবানীতে রচিত। তাদের-ই মনের কথা ব্যক্ত হয়েছে। গঠনশৈলীর অন্যান্য বিষয়গুলির মতো তাই 'পুরুষের ছড়া' এই শ্রেণি বিভাজনও করেছি। ছড়ার বিষয় যেমন বহুবিচিত্র; তেমনি ছড়ার ভাষায় অনেকেই কথা বলে, পুরুষ, নারী, শিশু, এমনকি মনুষ্যেতর জীবজন্তুও তাদের কথা বলে ছড়াতে। তাই এমন কিছু ছড়া আছে, যেগুলি শুধু পুরুষের মনের ভাবনা-চিন্তা ব্যক্ত করেছে, এখানে সেইরকম কয়েকটি ছড়া উদ্ধৃত হবে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, সপ্তম অধ্যায়ে আমরা ছড়ায় পুরুষ, নারী, শিশুদের জীবন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে তাই স-বিস্তারে না বলে এই তিন শ্রেণীর কয়েকটি ছড়াকে কেবল তুলে ধরব, গঠনশৈলীর বিষয় হিসেবে। নিম্নে কয়েকটি পুরুষের ছড়া তুলে ধরা হল ঃ

১। মা মরল মাউগ বেইল
যউ তিনকে সউ তিন হইল।

২। যারুর খাবু যারুর পরবু
তারুর বুকের চু ছিঁড়বু

১২. নারীর ছড়া ঃ

১। নাই দুয়ার ভাতার যে
নানা গীত গায় সে

২। নাঙ্গের ঘর নয়
গাঙ্গের ঘর।

নারীর ছড়া বলতে, এই ছড়াগুলি কেবল নারী জীবনের কথা বলে। তাদের সুখ, দুঃখ, বিরহ, মিলনের কথা এগুলিতে ব্যক্ত। যা দেখে সহজেই পৃথক করা যায় যে, এগুলি কেবল নারীদের মনের কথা। ছড়ার গঠনশৈলীর এটি একটি অন্যতম দিক বলে আমার মনে হয়।

১৩. শিশুদের ছড়া ঃ

১। কানা মাছি ভোঁ ভোঁ
যাকে পার তাকে ছুঁয়

২।　ডিস্কো ডিবানী
তোকে খেলতে লিবানি
তোর গদাগদা পা
তুই হড়্কি পড়ি যা

ছড়ার রাজ্যে শিশুরাই শ্রেষ্ঠ। ছড়া পুরুষ নারী সকলের হলেও একথা আমরা বলতে পারি যে, প্রথম ছড়া রচিত হয়েছিল শিশু ভোলানাথদের জন্যে। শিশুদের ভোলানোর জন্যই মাতৃজননীর মুখ নিঃসৃত বানী-ই ছড়ার রূপ পায়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের 'ছেলেভুলানো ছড়া' অংশের মন্তব্যটি স্মরণযোগ্য —

"এক্ষণে বঙ্গগৃহের যিনি সম্রাট, যিনি বয়সে ক্ষুদ্রতম অথচ প্রতাপে প্রবলতম, সেই মহামহিম খোকা-খুকু বা খুকুনের কথাটা বলা বাকি আছে। প্রাচীন ঋগ্‌বেদ ইন্দ্র-চন্দ্র-বরুণের স্তবগান উপলক্ষে রচিত-আর মাতৃহৃদয়ের যুগলদেবতা খোকা এবং পুটুর স্তব হইতে ছড়ার উৎপত্তি।" [২৯২]

প্রসঙ্গ নির্দেশ ও মন্তব্য ঃ

১. পর্তুগীজ মিশনারী, যাঁরা বাংলা ভাষা চর্চা ও তাতে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তাঁরা ১) মানোএল দ্য-আস্‌সুম্পসাঁউ, ২) দোম আন্তোনিও-দো রোজারিও। এরপর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকের কয়েকজন ইংরেজ মিশনারী হলেন— ১) উইলিয়াম কেরী, ২) টমাস এছাড়া ওয়ার্ড, বার্ণসডন, মার্শমান প্রভৃতি।

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-ই প্রথম মৌখিক ছড়াগুলিকে নিয়ে রসজ্ঞ গভীর আলোচনা করেন এবং এগুলি যে জাতীয় সম্পত্তি, সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের সময় হয়েছে তার উপরে আলোকপাত করেন।

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লোকসাহিত্য (১৯০৭), গ্রন্থের চারখানি প্রবন্ধের অন্যতম একটি হল 'ছেলে ভুলানো ছড়া'।

৪. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোকসাহিত্য, বিশ্বভারতী, ২০০৪, কলি-১৭, পৃ-৪৯।

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মৌখিক ছড়াগুলিকে জাতীয় সম্পত্তি বলে তাঁর লোকসাহিত্য গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

৬. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা—২, পৃ—৮৮।

৭. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৮৮ দ্রষ্টব্য।

৮. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৮৮ দ্রষ্টব্য।

৯. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৮৮ দ্রষ্টব্য।

১০. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা—৬, পৃ—৯২ দ্রষ্টব্য।

১১. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯২ দ্রষ্টব্য।

১২. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা—২, পৃ—৮৮ দ্রষ্টব্য।

১৩. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৮৮ দ্রষ্টব্য।

১৪. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা—৩১, পৃ—১১৭ দ্রষ্টব্য।

১৫. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১১৭ দ্রষ্টব্য।

১৬. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা—৪, পৃ—৯০ দ্রষ্টব্য।

১৭. উপকূলীয় দক্ষিণবঙ্গো কথ্য ভাষায় বিবাহিতা মেয়েদের পিত্রালয়কে বাবার বাড়ি না বলে বাপের দর-ই বলে।

১৮. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ক্ষেত্রসমীক্ষা লব্ধ তথ্য ও ঐতিহ্যবাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা—৪, পৃ—৯০ দ্রষ্টব্য।

১৯. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯০ দ্রষ্টব্য।

২০. 'টুই' হল খড় বা টালির ছাউনী বাড়ির সর্বোচ্চ উপরের অংশ।

২১. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা—৪, পৃ—৯০ দ্রষ্টব্য।

২২. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯০ দ্রষ্টব্য।

২৩. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯০ দ্রষ্টব্য।

২৪. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯০ দ্রষ্টব্য।

২৫. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯০ দ্রষ্টব্য।

২৬. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-২৩, পৃ—১০৯ দ্রষ্টব্য।

২৭. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-২৭, পৃ—১১৩ দ্রষ্টব্য।

২৮. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১১৩ দ্রষ্টব্য।

২৯. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১১৩ দ্রষ্টব্য।

৩০. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১১৩ দ্রষ্টব্য।

৩১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-১২, পৃ—৯৮ দ্রষ্টব্য।

৩২. 'ভাতার' শব্দটি আঞ্চলিক। স্বামী অর্থে গ্রাম-গঞ্জে শব্দটির বহুল ব্যবহার আছে। শব্দটির মধ্যে কিছুটা অশ্লীলতাও আছে। কারণ স্বামীকে অসম্মানার্থে শব্দটির বেশি প্রয়োগ দেখা যায়।

৩৩. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-১২, পৃ—৯৮ দ্রষ্টব্য।

৩৪. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯৮ দ্রষ্টব্য।

৩৫. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯৮ দ্রষ্টব্য।

৩৬. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯৮ দ্রষ্টব্য।

৩৭. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৩, পৃ—৮৯ দ্রষ্টব্য।

৩৮. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৪, পৃ—৯০ দ্রষ্টব্য।

৩৯. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯০ দ্রষ্টব্য।

৪০. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯০ দ্রষ্টব্য।

৪১. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯০ দ্রষ্টব্য।

৪২. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯০ দ্রষ্টব্য।

৪৩. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৬, পৃ—৯২ দ্রষ্টব্য।

৪৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত ছোটগল্প 'দেনাপাওনা'। গল্পটির প্রকাশ।

৪৫. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৬, পৃ—৯২ দ্রষ্টব্য।

৪৬. 'গড়িয়াঘাট' হল পুকুরঘাটের কথ্য রূপ। গ্রামাঞ্চলে সবাই এই পুকুরঘাটেই ব্যবহারিক নিত্য কাজকর্ম করে থাকে। এমনকি চাষবাস, কৃষিজ ফসল ও ফলায় এই জল দিয়ে।

৪৭. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৬, পৃ—৯২ দ্রষ্টব্য।

৪৮. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯২ দ্রষ্টব্য।

৪৯. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯২ দ্রষ্টব্য।

৫০. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯২ দ্রষ্টব্য।

৫১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৪, পৃ—৯০ দ্রষ্টব্য।

৫২. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯০ দ্রষ্টব্য।

৫৩. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯০ দ্রষ্টব্য।

৫৪. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯০ দ্রষ্টব্য।

৫৫. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯০ দ্রষ্টব্য।

৫৬. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯০ দ্রষ্টব্য।

৫৭. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯০ দ্রষ্টব্য।

৫৮. শিশু পাঠ্য পুস্তকে এমন ছড়া আমরা শৈশব থেকে শুনে আসছি। এগুলির রচয়িতা কে বা এর প্রথম সংগ্রাহক কে তা সঠিকভাবে আজ আর বলা সম্ভব নয়।

৫৯. পূর্বোল্লিখিত পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৬০. পূর্বোল্লিখিত পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৬১. পূর্বোল্লিখিত পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৬২. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৩৪, পৃ—১২০ দ্রষ্টব্য।

৬৩. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১২০ দ্রষ্টব্য।

৬৪. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১২০ দ্রষ্টব্য।

৬৫. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৪, পৃ—৯০ দ্রষ্টব্য।

৬৬. গিমা শাক হল এক ধরণের স্থলজ শাক্, মাঠে ঘাটে, পুকুরের পাড়ে হয়ে থাকে, বর্তমানে এই শাক্ ও চাষবাস করা হয়। রন্ধন ভাল লাগবে এর সাথে মরা মাছ যুক্ত হলে।

৬৭. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-১৫, পৃ—১০১ দ্রষ্টব্য।

৬৮. 'গিরিয়া' শাক্ প্রকৃতিগতভাবে লবণযুক্ত। এই অঞ্চলে লবণাক্ত মাটিতে এগুলি হয়।

৬৯. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-১৫, পৃ—১০১ দ্রষ্টব্য।

৭০. 'লাতুন' 'নাতনী'র কথ্য রূপ লাতুন।

৭১. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-১৫, পৃ—১০১ দ্রষ্টব্য।

৭২. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১০১ দ্রষ্টব্য।

৭৩. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১০১ দ্রষ্টব্য।

৭৪. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১০১ দ্রষ্টব্য।

৭৫. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-২৩, পৃ—১০৯ দ্রষ্টব্য।

৭৬. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-১৮, পৃ—১০৪ দ্রষ্টব্য।

৭৭. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৩৫, পৃ—১২১ দ্রষ্টব্য।

৭৮. নিজস্ব সংগ্রহ, পৃ—২৬৭ দ্রষ্টব্য।

৭৯. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-১৫, পৃ—১০১ দ্রষ্টব্য।

৮০. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১০১ দ্রষ্টব্য।

৮১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য আর.এম. সরকার, সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান, এম.রায় ৫৬, পটুয়াটোলা লেন, ২০১৪, কলি-৯, পৃ-৩২৯।

৮২. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-৩২২ দ্রষ্টব্য।

৮৩. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-৩২৯-৩৩০ দ্রষ্টব্য।

৮৪. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-২৮, পৃ—১১৪ দ্রষ্টব্য।

৮৫. বাংলার লোকসাহিত্য গ্রন্থটি আশুতোষ ভট্টাচার্যের রচিত, প্রকাশ ক্যালকাটা বুক হাউস, প্রকাশ-১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দ।

৮৬. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য, ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৬২, কলি-১২, পৃ-৬৪৪।

৮৭. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৬৪৪ দ্রষ্টব্য।

৮৮. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-২৮, পৃ—১১৪ দ্রষ্টব্য।

৮৯. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১১৪ দ্রষ্টব্য।

৯০. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১১৪ দ্রষ্টব্য।

৯১. 'ছিপ' দিয়ে সাধারণত বড় বড় দিঘি এবং পুকুরে মাছ ধরা হয়। এই ছিপকে এই অঞ্চলে বলে হুল বঁড়শি।

৯২. 'বঁড়শি' হল ছোটো ছিপ। বাঁশের একদম সুরু অংশ কঞ্চি দিয়ে এই বঁড়শি তৈরী হয়। যার থাকে রেশমের ডুরি এবং পাট কাঠির ফাত্না। এবং শেষ প্রান্তে থাকে জিজ্ঞাসা চিহ্নের (?) মত কাঁটা। এই কাঁটায় খাওয়ার রূপ আধার দিয়ে মাছ ধরা হয়।

৯৩. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-২৮, পৃ—১১৪ দ্রষ্টব্য।

৯৪. সাধারণত কেঁচো, আটা, পাউরুটির টুকরো, ময়দা, পিটুলি, পিঁপড়ের ডিম এবং ছোটো ছোটো চিংড়ি মাছ, ব্যাঙ্গা ইত্যাদি দিয়ে তা প্রস্তুত করা হয়।

৯৫. লোকসাহিত্য ১ম খণ্ড গ্রন্থটির রচয়িতা আশ্‌রাফ সিদ্দিকী, প্রকাশক-নয়া উদ্যোগ, প্রকাশ-২০১২ খ্রীষ্টাব্দে।

৯৬. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য আশ্‌রাফ সিদ্দিকী, লোকসাহিত্য ১ম খণ্ড, নয়া উদ্দ্যোগ, ২০১২, কলি-৬, পৃ-১৯০।

৯৭. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-২৮, পৃ—১১৪ দ্রষ্টব্য।

৯৮. গ্রন্থটির রচয়িতা নির্মলেন্দু ভৌমিক, প্রকাশ সাহিত্যশ্রী, ১৯৭৮।

৯৯. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নির্মলেন্দু ভৌমিক বাঙলা ছড়ার ভূমিকা ২য় খণ্ড, সাহিত্যশ্রী, ১৯৭৮, কলি-৯, পৃ-১১২।

১০০. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-১৩, পৃ—৯৯ দ্রষ্টব্য।

১০১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নির্মলেন্দু ভৌমিক বাঙলা ছড়ার ভূমিকা ২য় খণ্ড, সাহিত্যশ্রী, ১৯৭৮, কলি-৯, পৃ-১০৬।

১০২. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-১৩, পৃ—৯৯ দ্রষ্টব্য।

১০৩. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য আশ্রাফ সিদ্দিকী, লোকসাহিত্য ১ম খণ্ড, নয়া উদ্যোগ, ২০১২, কলি-৬, পৃ-১৮৯।

১০৪. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-১৩, পৃ—৯৯ দ্রষ্টব্য।

১০৫. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯৯ দ্রষ্টব্য।

১০৬. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নির্মলেন্দু ভৌমিক বাঙলা ছড়ার ভূমিকা ২য় খণ্ড, সাহিত্যশ্রী, ১৯৭৮, কলি-৯, পৃ-১১৪, ছড়া সংখ্যা-১৩৯।

১০৭. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-১৩, পৃ—৯৯ দ্রষ্টব্য।

১০৮. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৬, পৃ—৯২ দ্রষ্টব্য।

১০৯. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯২ দ্রষ্টব্য।

১১০. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নির্মলেন্দু ভৌমিক বাঙলা ছড়ার ভূমিকা ২য় খণ্ড, সাহিত্যশ্রী, ১৯৭৮, কলি-৯, পৃ—১৯১।

১১১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য আশ্রাফ সিদ্দিকী, লোকসাহিত্য ১ম খণ্ড, নয়া উদ্যোগ, ২০১২, কলি-৬, পৃ—১৯১।

১১২. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-১৩, পৃ—৯৯ দ্রষ্টব্য।

১১৩. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঞ্চয়িতা, বিশ্বভারতী-২০১১, কলি-৬, পৃ-৯৬।

১১৪. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৬৯ দ্রষ্টব্য।

১১৫. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য মঞ্জুলা বেরা, চণ্ডীদাস চর্চা, গৌরহরি দাস, ১৭ বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট, ২০১৯, কলি-৯।

১১৬. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-২৪, পৃ—১১০।

১১৭. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১১০ দ্রষ্টব্য।

১১৮. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১১০ দ্রষ্টব্য।

১১৯. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১১০ দ্রষ্টব্য।

১২০. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৬, পৃ—৯২।

১২১. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-২৪, পৃ—১১০।

১২২. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৬, পৃ—৯২।

১২৩. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-১২, পৃ—৯৮।

১২৪. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-১৫, পৃ—১০১।

১২৫. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১০১ দ্রষ্টব্য।

১২৬. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বিদ্যাপতি পদাবলী, বসুমতী কর্পোরেট লিমিটেড, ১৯৯৬, কলি-১২, পৃ-২৬৫, ২০নং পদ।

১২৭. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-১৫, পৃ—১০১।

১২৮. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১০১ দ্রষ্টব্য।

১২৯. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৪, পৃ—৯০।

১৩০. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-২২, পৃ—১০৮।

১৩১. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১০৮ দ্রষ্টব্য।

১৩২. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১০৮ দ্রষ্টব্য।

১৩৩. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১০৮ দ্রষ্টব্য।

১৩৪. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১০৮ দ্রষ্টব্য।

১৩৫. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১০৮ দ্রষ্টব্য।

১৩৬. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, শিশু সাহিত্য সংসদ।

১৩৭. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-২৮, পৃ—১১৪।

১৩৮. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১১৪ দ্রষ্টব্য।

১৩৯. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১১৪ দ্রষ্টব্য।

১৪০. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-২৯, পৃ—১১৫।

১৪১. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১১৫ দ্রষ্টব্য।

১৪২. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১১৫ দ্রষ্টব্য।

১৪৩. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৩৫, পৃ—১২১।

১৪৪. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১২১ দ্রষ্টব্য।

১৪৫. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১২১ দ্রষ্টব্য।

১৪৬. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১২১ দ্রষ্টব্য।

১৪৭. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় সাক্ষাৎকার সংখ্যা-২৯, পৃ—১১৫।

১৪৮. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১১৫ দ্রষ্টব্য।

১৪৯. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৩৫, পৃ—১২১।

১৫০. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১২১ দ্রষ্টব্য।

১৫১. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১২১ দ্রষ্টব্য।

১৫২. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১২১ দ্রষ্টব্য।

১৫৩. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১২১ দ্রষ্টব্য।

১৫৪. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১২১ দ্রষ্টব্য।

১৫৫. নিজস্ব সংগ্রহ, পৃ—৩০৩ দ্রষ্টব্য।

১৫৬. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-২৯, পৃ—১১৫।

১৫৭. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-১৮, পৃ—১০৪।

১৫৮. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-১৯, পৃ—১০৫।

১৫৯. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১০৫ দ্রষ্টব্য।

১৬০. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১০৫ দ্রষ্টব্য।

১৬১. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১০৫ দ্রষ্টব্য।

১৬২. নিজস্ব সংগ্রহ, পৃ—৩০৮ দ্রষ্টব্য।

১৬৩. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-২১, পৃ—১০৭।

১৬৪. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১০৭ দ্রষ্টব্য।

১৬৫. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১০৭ দ্রষ্টব্য।

১৬৬. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১০৭ দ্রষ্টব্য।

১৬৭. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১০৭ দ্রষ্টব্য।

১৬৮. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৫, পৃ—৯১।

১৬৯. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯১ দ্রষ্টব্য।

১৭০. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯১ দ্রষ্টব্য।

১৭১. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯১ দ্রষ্টব্য।

১৭২. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯১ দ্রষ্টব্য।

১৭৩. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯১ দ্রষ্টব্য।

১৭৪. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-১৫, পৃ—১০১।

১৭৫. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১০১ দ্রষ্টব্য।

১৭৬. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-১৬, পৃ—১০২।

১৭৭. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-২১, পৃ—১০৭।

১৭৮. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-২৫, পৃ—১১১।

১৭৯. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১১১ দ্রষ্টব্য।

১৮০. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১১১ দ্রষ্টব্য।

১৮১. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১১১ দ্রষ্টব্য।

১৮২. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১১১ দ্রষ্টব্য।

১৮৩. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় বরুণকুমার চক্রবর্তী, বাংলা ছড়া পরিক্রমা, অক্ষর প্রকাশনী, ২০১৪, কলি-৬, পৃ—৩৬৯।

১৮৪. ছড়াটি সকলের পরিচিত একটি জনপ্রিয় ছড়া। যা বিশ্বযুদ্ধের সময় রচিত হয়েছিল।

১৮৫. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-১৪, পৃ—১০০।

১৮৬. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১০০ দ্রষ্টব্য।

১৮৭. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১০০ দ্রষ্টব্য।

১৮৮. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোকসাহিত্য, বিশ্বভারতী, ২০০৪, কলি-১৭, পৃ—৫০।

১৮৯. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য বরুণকুমার চক্রবর্তী, বাংলা ছড়া পরিক্রমা, অক্ষর প্রকাশনী, ২০১৪, কলি-৬, পৃ-১৫৬।

১৯০. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১৫৬ দ্রষ্টব্য।

১৯১. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১৫৬ দ্রষ্টব্য।

১৯২. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১৫৭ দ্রষ্টব্য।

১৯৩. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লোকসাহিত্য, বিশ্বভারতী, ২০০৪, কলি-১৭, পৃ-৬০, ২৩ সংখ্যক ছড়া।

১৯৪. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য আশ্‌রাফ সিদ্দিকী, লোকসাহিত্য ১মখণ্ড, নয়া উদ্যোগ, ২০১২, কলি-৬, পৃ-১৯৪।

১৯৫. নিজস্ব সংগ্রহ, পৃ—৩৩০ দ্রষ্টব্য।

১৯৬. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-১১, পৃ—৯৭।

১৯৭. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯৭ দ্রষ্টব্য।

১৯৮. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯৭ দ্রষ্টব্য।

১৯৯. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯৭ দ্রষ্টব্য।

২০০. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য ২য় খণ্ড ছড়া, ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৬২, কলি-১২, পৃ-৪০৩, ২ সংখ্যক ছড়া।

২০১. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৪০৩ দ্রষ্টব্য।

২০২. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য সৌগত চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত বাংলার ছড়া ঃ ছড়ার বাংলা বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৮, কলি-৯, পৃ-২০৫।

২০৩. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—২০৬ দ্রষ্টব্য।

২০৪. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—২০৫-২০৬ দ্রষ্টব্য।

২০৫. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-১০, পৃ—৯৬।

২০৬. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯৬ দ্রষ্টব্য।

২০৭. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোকসাহিত্য, বিশ্বভারতী, ২০০৪, কলি-১৭, পৃ—৬৭।

২০৮. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৬৭ দ্রষ্টব্য।

২০৯. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৯, পৃ—৯৫।

২১০. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯৫ দ্রষ্টব্য।

২১১. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৮, পৃ—৯৪।

২১২. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯৪ দ্রষ্টব্য।

২১৩. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-২৯, পৃ—১১৫ দ্রষ্টব্য।

২১৪. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১১৫ দ্রষ্টব্য।

২১৫. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৩৪, পৃ—১২০।

২১৬. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১২০ দ্রষ্টব্য।

২১৭. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৩৫, পৃ—১২১।

২১৮. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১২১ দ্রষ্টব্য।

২১৯. নিজস্ব সংগ্রহ, পৃ—৩৩৮ দ্রষ্টব্য।

২২০. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৩৫, পৃ—১২১।

২২১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য বরুণকুমার চক্রবর্তী, লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, ২০০৮, কলি—৯, পৃ-২১২।

২২২. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৩৫, পৃ—১২১।

২২৩. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১২১ দ্রষ্টব্য।

২২৪. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১২১ দ্রষ্টব্য।

২২৫. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য বরুণকুমার চক্রবর্তী, লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, ২০০৮, কলি—৯, পৃ—২১১।

২২৬. নিজস্ব সংগ্রহ, পৃ—৩৪৩ দ্রষ্টব্য।

২২৭. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৬, পৃ—৯২।

২২৮. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯২ দ্রষ্টব্য।

২২৯. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৮, পৃ—৯৪।

২৩০. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-১, পৃ—৮৭।

২৩১. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-১৭, পৃ—১০৩।

২৩২. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১০৩ দ্রষ্টব্য।

২৩৩. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৮, পৃ—৯৪।

২৩৪. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯৪ দ্রষ্টব্য।

২৩৫. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯৪ দ্রষ্টব্য।

২৩৬. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৩৫, পৃ—১২১।

২৩৭. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১২১ দ্রষ্টব্য।

২৩৮. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৮, পৃ—৯৪।

২৩৯. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯৪ দ্রষ্টব্য।

২৪০. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-১১, পৃ—৯৭।

২৪১. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯৭ দ্রষ্টব্য।

২৪২. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৯, পৃ—৯৫।

২৪৩. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯৫ দ্রষ্টব্য।

২৪৪. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৮, পৃ—৯৪।

২৪৫. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৬, পৃ—৯২।

২৪৬. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-১০, পৃ—৯৬।

২৪৭. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৩৫, পৃ—১২১।

২৪৮. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১২১ দ্রষ্টব্য।

২৪৯. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-১০, পৃ—৯৬।

২৫০. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা—৩৪, পৃ—১২০।

২৫১. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-১৪, পৃ—১০০।

২৫২. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-২৯, পৃ—১১৫।

২৫৩. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১১৫ দ্রষ্টব্য।

২৫৪. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-২৪, পৃ—১১০।

২৫৫. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, সংসদ বাংলা অভিধান, শিশু সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৪, কলি-৯, পৃ—১৮৮।

২৫৬. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-১৫, পৃ—১০১।

২৫৭. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৮, পৃ—৯৪।

২৫৮. নিজস্ব সংগ্রহ, পৃ—৩৬০ দ্রষ্টব্য।

২৫৯. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৩৪, পৃ—১২০।

২৬০. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১২০ দ্রষ্টব্য।

২৬১. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১২০ দ্রষ্টব্য।

২৬২. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৩৫, পৃ—১২১।

২৬৩. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১২১ দ্রষ্টব্য।

২৬৪. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১২১ দ্রষ্টব্য।

২৬৫. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১২১ দ্রষ্টব্য।

২৬৬. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-২৬, পৃ—১১২।

২৬৭. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-২৭, পৃ—১১৩।

২৬৮. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১১৩ দ্রষ্টব্য।

২৬৯. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৫, পৃ—৯১।

২৭০. আশ্‌রাফ সিদ্দিকী লোকসাহিত্য, ১মখণ্ড, নয়া উদ্যোগ, ২০১২।

২৭১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য আশ্‌রাফ সিদ্দিকী, লোকসাহিত্য, ১মখণ্ড, নয়া উদ্যোগ, ২০১২, পৃ—১৮৫, ১৮৬।

২৭২. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৯, পৃ—৯৫।

২৭৩. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৩৪, পৃ—১২০।

২৭৪. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১২০ দ্রষ্টব্য।

২৭৫. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, সংসদ বাংলা অভিধান, শিশু সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৪, কলি-৯, পৃ-৪৩০।

২৭৬. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, ঠাকুমার ঝুলি বাঙ্গালার রূপকথা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ২০১০, কলি-৭৩, পৃ-৮৩, ৮৪।

২৭৭. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৮, পৃ—৯৪।

২৭৮. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯৪ দ্রষ্টব্য।

২৭৯. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯৪ দ্রষ্টব্য।

২৮০. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৫, পৃ—৯১।

২৮১. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯১ দ্রষ্টব্য।

২৮২. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৩৫, পৃ—১২১।

২৮৩. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১২১ দ্রষ্টব্য।

২৮৪. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-২৯, পৃ—১১৫।

২৮৫. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-১৪, পৃ—১০০।

২৮৬. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১০০ দ্রষ্টব্য।

২৮৭. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-১৬, পৃ—১০২।

২৮৮. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১০২ দ্রষ্টব্য।

২৮৯. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৬, পৃ—৯২।

২৯০. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯২ দ্রষ্টব্য।

২৯১. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯২ দ্রষ্টব্য।

২৯২. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোকসাহিত্য, বিশ্বভারতী, ২০০৪, কলি-১৭, পৃ—৪১।

সপ্তম অধ্যায়

ছড়ায় ব্যবহারিক জীবন ও নারী, পুরুষ, শিশু এবং সমাজ সম্পর্কিত মনস্তত্ত্বের অনুসন্ধান ও তার পর্যালোচনা।

সপ্তম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাপ্ত লোকছড়ায় 'ব্যবহারিক জীবন ও নারী, পুরুষ, শিশু এবং সমাজ সম্পর্কিত মনস্তত্ত্বের অনুসন্ধান ও তার পর্যালোচনা।' মূল অধ্যায়ে অভিনিবেশের পূর্বে মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে জেনে নিলে আলোচনা পূর্ণতা পাবে।

সংস্কৃত মনস্ + তত্ত্ব 'মনস্তত্ত্ব' যার পারিভাষিক পরিচিতি 'মনোবিজ্ঞান', এই মনোবিজ্ঞানের আভিধানিক অর্থ 'কাহারো মনের যথার্থ অবস্থা[১],' যাকে ইংরেজিতে বলে 'Psychology'। এই মনোবিজ্ঞানের জনক সিগমুণ্ড ফ্রয়েড[২]। বিজ্ঞানী ফ্রয়েড-ই মানুষের মনের কথা প্রথম বললেন, "তাঁর লিখিত 'The Interpretation of Dreams[৩],' (1899) গ্রন্থে, তিনি গ্রীক মিথের 'ইডিপাস' চরিত্রকে মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করে এই পদ্ধতির সূচনা করেন"[৪]। তাঁর থেকে জানতে পারি প্রতিটি মানুষকে বাইরে থেকে যা দেখি, আসলে তার সবটা দেখি না। তার দেখা আর না দেখা নিয়ে তার মধ্যে মোট তিনটি সত্তা কাজ করে। মানব মনের এই তিনটি স্তর যথাক্রমে ঃ

১। চেতন মন বা সংজ্ঞান মন (Conscious Mind)

২। প্রাক্ চেতন মন বা অসংজ্ঞান মন (Pre-Conscious Mind) এবং

৩। অবচেতন মন বা নির্জ্ঞান মন (Unconscious Mind)[৫]

মানুষ চেতন মনে যা ভাবে, চায়, চিন্তা করে তার সবগুলি পূরণ হয় না। তখন সেই না পাওয়াগুলি অবচেতন মনে জমতে থাকে, এবং তা স্বপ্নের মধ্যদিয়ে প্রকাশ পেতে থাকে। এই অবদমিত ইচ্ছাগুলো অচেতন স্তর থেকে স্বপ্নে পরিণত হয়ে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ অবচেতন মনে কি হচ্ছে তার প্রতিফলন হচ্ছে স্বপ্নে। ফ্রয়েডের মতে, "Conscious Mind -এর সাহায্যে আমরা চিন্তা করি। অতীতকে স্মরণ করি এবং মনের এই স্তরের সাহায্যে বাইরের জগতের সঙ্গে, সংযোগ রক্ষা করে চলি। আমাদের Conscious Mind ও Unonscious Mind-এর মধ্যবর্তী স্তরে আছে Pre-Conscious Mind। আমাদের মনের গভীরতর স্তরের নাম হল, Unconscious Mind।"[৬]

স্বাভাবিক জীবনে যে সব আকাঙ্খা, তাড়না, অনুভূতি কামনা-বাসনা চিন্তা প্রকাশ করতে পারি না, তা মনের অবচেতন স্তরে জমা হয়। গবেষক মকবুল ইসলামের মতে, "মনের এই তিনটি স্তরের পারস্পরিক সংযোগ ও ক্রিয়াশীলতার ফলেই, মনের চলিষ্ণুতা রক্ষিত হয়।" [৭]

মনস্তত্ত্ব সম্পর্কিত এই ধারণার আলোকে ক্ষেত্রসমীক্ষায় প্রাপ্ত নির্দিষ্ট পর্যায়ের ছড়াগুলির পর্যালোচনা এই অধ্যায়ে আলোচিত হবে। এখন আলোচনার সুবিধার্থে উপরোক্ত বিষয়গুলিকে কয়েকটি উপ-অধ্যায়ে বিভাজন করা হল ঃ

১। ছড়ায় ব্যবহারিক জীবন ও নারী মনস্তত্ত্বের অনুসন্ধান

২। ছড়ায় পুরুষ মনস্তত্ত্বের অনুসন্ধান

৩। ছড়ায় শিশু মনস্তত্ত্বের অনুসন্ধান এবং

৪। সমাজ মনস্তত্ত্বের অনুসন্ধান।

১। ছড়ায় ব্যবহারিক জীবন ও নারী মনস্তত্ত্বের অনুসন্ধান ঃ

লোকসাহিত্যের অন্যান্য বিভাগগুলির মধ্যে ছড়া হল একটি অন্যতম চর্চিত, সর্বজনালোচিত, জনপ্রিয় বিভাগ। অজ্ঞাতপূর্বকাল এই ছড়াগুলি অতীতের হয়েও সমকালীন, সীমার মধ্যে অসীম এবং ব্যক্তি অনুভূতি থাকলেও বিশ্বজনীন। ছড়াগুলিকে তাই সীমায়িত করার চেষ্টা বৃথা। তথাপি ভাষাগত, সমাজ প্রকৃতিগত, পরিবেশগত, এবং ঐতিহাসিকতার মধ্য দিয়ে কোনো কোনো ছড়াকে চিহ্নিত করা যায়। বিশেষ করে পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাপ্ত ছড়াগুলি তার স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। ব্যবহারিক জীবন ও নারী মূলক ছড়াগুলি এইরূপ স্বাতন্ত্রে উজ্জ্বল।

সংগৃহীত নারীমূলক ছড়ায় ব্যবহারিক জীবন ও নারীজীবনের মনোবেদনা, নারীভাবনা, নারীদের অনালোকিত দিকটির অনুসন্ধান করা গেল। পূর্ব উল্লিখিত যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছড়া সম্পর্কে তাঁর 'লোকসাহিত্য' [৮] গ্রন্থে বলেছেন—

> "ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি। বহুকাল হইতে আমাদের দেশের মাতৃভাণ্ডারে এই ছড়াগুলি রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে.... আজকাল এই ছড়াগুলি লোক ক্রমশই বিস্মৃত হইয়া যাইতেছে। অতএব জাতীয় পুরাতন সম্পত্তি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে।" [৯]

এই জাতীয় পুরাতন সম্পত্তি আমাদের ঘরোয়া পরিবেশে আনাচে-কানাচে, মাঠে-প্রান্তরে, জীবনে-মননে, সুখে-দুখে, প্রীতি-প্রেমে, মান-অভিমানে, হাসি-কান্নায়, কাছে-দূরে, ঘরে-বাইরে, সর্বত্র ছড়ানো ছিটানো ; যাতে আছে বেঁচে থাকবার আশা-আকাঙ্খা, ভাবী জীবনের বেদনা-বাসনা, হারিয়ে যাওয়ার আনন্দ-অনুভূতি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারী আজ দ্বিধা বিভক্ত। হরিণীর মতো সন্ত্রস্ত পায়ে জীবন অতিবাহিত করে, পদে পদে নানা বাধা, তবুও সব বাধাকে জয় করে সুখে স্বামীর ঘর করতে বদ্ধ পরিকর, কিন্তু সমাজের নানা সমস্যা এসে কণ্ঠরোধ করে, এরকম-ই নারীজীবনের এক অভিশপ্ত প্রথা হল সতীন প্রথা। যেখানে ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে সঙ্গে নারী জীবনের কথা ব্যক্ত। নারী সব পারে, পারে না শুধু স্বামীর অধিকার হারাতে। সংসারের এইখানেই তার একছত্র শাসন। তাই ছড়া আমাদের মনে করিয়ে দেয় অতীত ইতিহাসের দৃষ্টান্ত,—

বড় বউকে ঠেঙ্গা লাঠি
কন্যিয়া বউকে সনার কাঁঠি
বড় বউকে মার মার
কন্যিয়া বউকে গলার হার [১০]

মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্য সাহিত্যের লহনা-খুল্লনার [১১] কথাতো আমরা সকলেই জানি। এই ছড়া যেন সেই বিয়েরই প্রতিধ্বনি। যেখানে সতীন এসে কেড়ে নেয় সব সুখ, তাই সতীন পরিণত হয় সোনার কাঁঠি ও গলার হারেতে, সেক্ষেত্রে বড় বউ-এর কপালে জোটে কেবল লাঠির বাড়ি। নারী মনোবেদনার মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টান্ত আর কী-বা বেশি হতে পারে? ছড়াটিতে জীবনের এই চরম লাঞ্চনার দিকটি সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাংলার ব্রত' [১২]-এ পাই—

ময়না, ময়না, ময়না!
সতীন যেন হয় না
হাতা, হাতা, হাতা!
খা সতীনের মাথা
বেড়ি, বেড়ি, বেড়ি।
সতীন মাগি টেরি!

পাখি, পাখি, পাখি।
সতীন মাগি মরতে যাচ্ছে—
ছাদে উঠে দেখি![১৩] (সাঁজ পূজনী)

তবু নারী আশাবাদী। মধ্যযুগীয় চিন্তাধারার পরিবর্তে আধুনিক নারী আজ আপন ভাগ্য জয় করার জন্য চির প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যৌবনের দ্রাক্ষাবনে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল ফুটেছে, কিন্তু আহরণে তাকে সার্থক করে তুলবে এমন মানুষ কই? তাই নারী আজ মুহ্যমান, ব্যথাহত। বয়সের সন্ধিক্ষণে আজ তার নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার সময় এসেছে। সে মুক্ত, সে স্বাধীন। দেহে মনে প্রাপ্তির আকাঙ্খা, যদিও বাড়ির পিতা-মাতার কাছে সে এখনো বিবাহযোগ্যা নয়, তবু তার আক্ষেপোক্তি ব্যক্ত হয়েছে নিম্নোক্ত ছড়ায়—

মায়ে কয় ছোটো ছোটো
বাপে না দেয় ব্যায়া
আর কতদিন রাখব যৌবন
অঞ্চল ঢাকা দিয়া[১৪]

এ যেন শ্রীরাধিকার বিরহযন্ত্রণাকেও হার মানায়। মেয়ে বুঝি করে বিপথে গমন। ভেবে চিন্তে তাই আকুল মায়ের মন, মেয়ে চলে অপসঙ্গে এতে পাড়া-পড়শি নানা জনে নানা কলঙ্ক ছড়ায়। প্রাপ্ত বয়স্কা মেয়ে নিজের অবদমিত ইচ্ছা আড়াল করে এই বলে—

কে তার কি কথা কয়
গেলি তার মার কথা কয়[১৫]

'গেলি'[১৬] শব্দটি আদুরি কন্যা অর্থে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। মনে মনে গেলি নীড় বাঁধার স্বপ্ন দেখে। যাতে থাকবে একটি ছোটো জান্‌লা, পাশ দিয়ে বয়ে যাবে তটিনী, তার পারে বসে ভাবী জীবনের স্বপ্ন দেখবে সে, এই চিত্র ঠিক যেন পদাবলীর শ্রীরাধিকার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আসলে নারীর কামনা-বাসনা তা চিরকালীন, বিশ্বজনীন। সেখানে রাধা আর গ্রামবাংলার সাধারণ নারীর মন বিশ্বানুভূতিতে একাকার হয়ে গেছে। তাই ছড়া বলে—

সাদ্ ছিল মোর বাঁধব ছোটোঘর
জান্‌লা দিয়া দেখব আমি
বার নদীর চর্[১৭]

নদীমাতৃক বাংলাদেশের মতো উপকূলবর্তী পূর্ব মেদিনীপুরের এমন বাস্তবচিত্র, জীবন্ত মানুষের ভাব-ভাবনার প্রতিচ্ছবি এই ছড়াগুলি।

সংস্কৃতে একটি কথা আছে 'নারীনাং ভূষণাং পতি' [১৮] নারীদেহের অলংকার হল তার স্বামী। বিবাহিতা নারীর কাছে স্বামীই তার একমাত্র অবলম্বন, তেমনি স্বামীবিহীন জীবন শুষ্কবালুতট, তাতে যতই জলদ্বারা সজীব করতে চাও না কেন নিমেষে সে হারিয়ে ফেলে আর্দ্রতার শীতল পরশ। দূরে প্রবাসে থাকা নারী স্বপ্ন দেখে নদীর কলধ্বনির, স্বামী থাকলে তার জীবন হতো উত্তালময় কল্লোলিনী। নিম্নোদ্ধৃত ছড়ায় ব্যক্ত হয়েছে নারীর সেই স্বপ্নজগৎ—

নদীর জল কল্‌কল্‌ করে
সোয়ামীরে মনে পড়ে [১৯]

'বিবাহ' শব্দটি যেমন বিশেষরূপে বহনকে নির্দেশ করে, তেমনি দুটিমনের বেনীবন্ধনও ঘটায়। মেয়েরা পরিণত বয়সে পদার্পণ করলে বিবাহের নানা স্বপ্ন দেখে। তা সে ধনীর মেয়ে হোক্‌ বা গরীবের মেয়ে হোক্‌। সমাজগত বৈষম্য থাকলেও আশা-আকাঙ্খা, কামনা-বাসনার রোম্যান্টিক জগতে দু-জনেই নব পরিণীতা। তাই বাদ্য সহকারে জাঁকজমকপূর্ণ এক আড়ম্বরের পরিবেশ চায় মেয়েটি। তখনই প্রতিবেশিনীর শাণিত কণ্ঠস্বরে শোনা যায়—

অমুন খাঁদির [২০] ব্যায়া যায়নি
ঢোল খুঁজিয়া মরে

উপকূলীয় অঞ্চলের মধ্যবিত্ত সমাজের অর্থনৈতিক দিকটির ছবি ব্যক্ত আলোচ্য ছড়াটিতে, যাতে নারীর ব্যথা-বেদনা প্রকটিত। কিন্তু অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল নাই বা হোক্, সুন্দর দেখতে নাই হোক্, তবুও বিয়ে তো প্রত্যেকেই করতে চায়? কেননা, সুন্দরী রূপসীর জয় সর্বত্র বলে কুৎসিত মেয়ের কি স্বপ্ন থাকতে নেই? গ্রাম্য, অসুন্দর 'গাঁয়ের কন্যা সিকন্‌ [২১] নাকি' বলে কি তার বিয়ে হবে না? যেন এই প্রশ্নই সত্যি হয়ে ওঠে নিম্নোক্ত ছড়ায়—

উঁচ কপালী চিরুণ দাঁতি
তোর কপালে নাই কো পতি [২২]

যতই অভিশাপ আর গালমন্দ করুক না কেন অভাগীর কপালে সিঁন্দুর তো জুটবে। কিন্তু বিধাতা বাম। তাই স্বামীর ঘরে কালসাপিনীর মতো শাশুড়ী ননদীর তো অভাব নেই। শাশুড়ী একগুণ বলে তো ননদ তার তিনগুণ বলে—

১। বৌদি পুকুরঘাটে কী
দাদা এলে বলে দেবো
আচ্ছা মাগীর ঝি [২৩]

২। বৌদি পুকুরঘাটে কী
দাদা এলে বলে দেবো
শাকচুন্নীর ঝি [২৪]

সারাদিনের কর্মক্লান্তের পর বাড়ির বউরা পুকুর ঘাটে এসে একটু জিরিয়ে নেয়। তাছাড়া গ্রাম্য বউ-ঝিরা পুকুর ঘাটেই তাদের মনের কথা বলার সুযোগ পায়। প্রতিবেশীদের পরস্পরের কথাবলার জায়গা হল পুকুর ঘাট। কিন্তু এরকম ননদ যে বাড়িতে আছে, সে বাড়ির বউটির যে কী দুরবস্থা তা অনুমান করা বড়ই সহজ ব্যাপার। বাড়ির বউ-এর অহেতুক পুকুরঘাটে বা পুকুরের পাশে দাঁড়ানো মানে মিথ্যে কলঙ্কের বোঝা। তাই বউটি তার ননদের উদ্দেশে বলে ওঠে—

তু ননদ কইবু যেতে
তো ননদ কইবে তেতে [২৫]

অর্থাৎ আজ ননদ হয়ে যেভাবে তার বৌদিকে বলছে ঐ ননদও যখন পরের বাড়ি যাবে, সেখানেও তার ননদ সেইরূপ আচরণ করবে। আসলে আমাদের এই গার্হস্থ্য জীবনের নানা টানাপোড়েনের চিত্র ছড়ায় প্রতিফলিত, যাতে নারী মনোভাবনার প্রকাশ পেয়েছে। বৌদি এবং ননদ-এর সম্পর্ক কখনই চিরমধুর হয় না, তার তিক্ততা তাই ছড়ায় প্রতিবিম্বিত। আর একটি ছড়ায় পাই—

ননদিনী রায় বাঘিনী
দাঁড়িয়ে আছে কাল সাপিনী
ননদিনী যদি মরে
সুখের বাতাস বইবে ঘরে [২৬]

একে তো সংসারে নানা যন্ত্রণা দুঃখ-কষ্ট। তার মাঝে কালসাপরূপী ননদ যেন শাইলকের[২৭] ও বাড়া। তাই নববধূর সুখের কাঁটা ঐ ননদ যদি মরে যায়, তবেই তার জীবনটা কন্টকমুক্ত হবে। ওদিকে আবার শাশুড়ীর তীব্র কটুক্তি। কেননা 'যাকে দেখতে নারি তার চরণ বাঁকা।' নববধূর কোনো কিছুই সন্তুষ্টিজনক নয়, তাই শাশুড়ী বিদ্রুপের বাক্য প্রকাশ করেছে—

ছিলে ঘুটে কুড়ানি
হইচেন্ রাজরাণী[২৮]

ছড়ায় সাধারণত, সাধারণ মেয়ের সাধারণ মনোবাসনা ব্যক্ত হয়, সে স্বামী সংসারে ভরে থাকতে চায়, কিন্তু পারে না, সাধ্যমতো সকলকে সুখী করতে গিয়ে তাকে পদে পদে বিঘ্নিত হতে হয়। তার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়। শেষ পর্যন্ত ভাবে উপরোক্ত পথের কাঁটা যতদিন থাকবে, ততদিন সুখ থাকবে অধরা, তখন সেই সাধারণ নারী কণ্ঠে ও উচ্চারিত হয় কঠিনবাণী। আর এই দুষ্টজনের চক্রব্যুহে স্বামীকে ও নিজের করে পায় না, তাই বলে উঠেছে—

ভাতার বাপা তেলের কপা
সুরু ধানের খই
শুনরে ভাতার কানে কানে
মনের কথা কই[২৯]

কিন্তু স্ত্রীর মনের মতো করে এত সুন্দর সহজ সরল হয়ে ওঠা স্বামীটির পক্ষেও বড়-ই কঠিন কাজ, কেননা কঠোর প্রতিকূল পরিস্থিতিতে লড়াই করতে করতে সেই স্বামী দেবতাটিও কখন হয়ে ওঠে শাসনযন্ত্র, অত্যাচারের কঠিন খড়্গ। তাই বিবাহের শুভক্ষণে ভাত-কাপড়ের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সেই প্রতিশ্রুতিও আজ বিস্মৃত হয়ে যেতে বাধ্য হয় সে। মেয়েটি তাই ভারাক্রান্ত মনে বলে—

নাই দুয়ার ভাতার যে
নানা গীত গায় সে[৩০]

কেবল নানা গীত নয়, অগ্নিসাক্ষী করে সাত পাকে ঘোরা স্ত্রীকে যে কত অত্যাচার সহ্য করতে হয়, তার সুতীব্র প্রতিবাদ, ছড়াতে প্রকাশিত—

ভাত দুয়ার মুরত নাই
কিল মারবার গোঁসাই[৩১]

নারী যে তার প্রাপ্য মর্যাদা থেকে অনেক দূরে, লোকমানস তা স্মরণ করিয়ে দেয় ছড়ায়। সমাজের এই ছড়াগুলি স্মরণ করিয়ে দেয় নারীবঞ্চনার ইতিহাসকেও। পরের ঘর তাই পিতার ঘরের ন্যায় জীবন গড়ার নয়, জীবনকে শেষ করে দেওয়ার স্বপ্ন দেখায়—

নাঙের [৩২] ঘর নয়
গাঙ্গোর ঘর

লোক সাধারণের মধ্যে এমন ধারণা আছে যে, মেয়েকে যথাযথ ঘরে বা বরে না দিতে পারলে গাঙে কেটে ভাসিয়ে দেওয়াই অধিক সমীচীন, অর্থাৎ মৃত্যুর সঙ্গো সহবাস। সেই একই ভাবনায় ভাবিত হয়ে জীবনের ইতি টানার কথা উপরোক্ত ছড়ায় প্রকাশিত হয়েছে, তাই স্বামীর ঘর যেন মৃত্যুর পরোয়ানা।

লোকসাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল সর্বকনিষ্ঠের জয়। ছড়ার ক্ষেত্রেও দেখি সবচেয়ে ছোটোর জয় ঘোষিত হয়েছে—

ছোট বউ ভাত রাঁদে
চায়ে উঠে ধূঁয়াঁ
বড়ো বউ মুড়ি ভাজে
ব্যাগ মুড়ি চুঁয়া [৩৩]

'ব্যাগ' অর্থাৎ সব মুড়ি 'চুঁয়া' অর্থাৎ পুড়ে গেছে। এখানে বড় বউ অপটু। আর ছোটো বউ কর্মপুটু, সেকথা ব্যক্ত হয়েছে ছড়াটিতে। আসলে ছোটো হল সকলের নয়নের মণি, প্রিয় পাত্রী। আরো একটি ছড়ায় পাই—

পরের বউ ভালো
নিজের বউ কালো [৩৪]

কথায় আছে, মানুষ যা চায় ভুল করে চায়, যা পায় তা চায় না। আলোচ্য ছড়ায় এক বউকে ভালো বলতে গিয়ে আরেক বউকে কিন্তু কালো বলে বিদ্রুপ করা হয়েছে। আর তাই নিজের নিজের প্রাপ্তিতে অসন্তোষ প্রকাশিত। নিজের স্ত্রী যতই সুন্দরী হোক্ না কেন পরের স্ত্রী অধিকতর সুন্দরী— এমন ভাবার কারণ নেই। যাইহোক উপরোক্ত ছড়াগুলিতে নারীজীবনের অনালোকিত, অনালোচিত বঞ্চিত জীবনের ইতিকথার চিত্র-ই প্রতিফলিত।

যুগে যুগে নারী বঞ্চিত, শোষিত, নিপীড়িত ও নির্যাতিত। আজও সেই চিত্র প্রাপ্ত ছড়াগুলিতে বিদ্যমান। উপকূলীয় অঞ্চলের ছড়ায় এরকম বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে যাতে নারী জীবন, বেদনার গানে গাঁথা। প্রতিটি ছড়া-ই তাদের স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল, অনবদ্য, অতুলনীয়। যার মধ্যে নারী মনস্তত্ত্ব ফুটে উঠেছে।

২। ছড়ায় পুরুষ মনস্তত্ত্বের অনুসন্ধান ঃ

ছড়া শুধু নারীর কথা বলে না। ছড়ার রাজ্যে পুরুষের স্থান নারীর তুলনায় কোনো অংশে কম নয়। পারিবারিক জীবনের বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন, আত্মীয় স্বজন, পরিজনদের ছবি ছড়ার মধ্যে স্থান লাভ করে। ছড়ায় তাই পুরুষও কথা বলে, যার মধ্যদিয়ে পুরুষদের মনের অভ্যন্তর আমাদের সামনে আয়নার মত জ্বলজ্বল করে ওঠে। তাতে ফুটে ওঠে তাদের মনস্তাত্ত্বিক দিকটিও। সভ্যতার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ছড়ায় দেখা দিয়েছে নানা বৈচিত্র্য, নানা মনস্তত্ত্ব, নারী তথা পুরুষের জীবন এই বৈচিত্র্যতায় হয়ে উঠেছে আরো অনন্য।

সভ্যতার কৌলিন্যে মানব জীবন চাকার মতো ঘর্ঘর করে ছুটছে। কিন্তু এত গতিময়তায়ও গ্রাম্য নারী পুরুষের প্রেম ভালবাসা ঠিক ততখানি ছুটতে পারছে না। কেননা, সমাজের চোখে এই প্রেম যেন অপরাধমূলক কাজ। বিশেষত এই উপকূলীয় ভূ-ভাগে প্রেম বড়ই অবাঞ্ছনীয়, অসামাজিক, তাই আজও এখানে ছেলে-মেয়েরা লুকিয়ে প্রেম করে। বাড়ির অভিভাবকদের চোখ এড়িয়ে মনের মানুষের কাছে যাওয়া তো অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। বড় ভাইয়ের চোখে পড়া এমন একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছে ছড়া—

বোনের সঙ্গে দুপুরবেলা
হলুদ জামা গায়
আমকাঁঠালের ছায়া পথে
কোন্ গাঁয়ে সে যায়।[৩৫]

প্রেম চিরন্তন। প্রেমে এ হেন প্রতিচ্ছবি তাই খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু কখনও কখনও তা যেন একতরফা হয়ে দাঁড়ায়। উভয়ের ভালোবাসা মাপকাঠিতে সমান হয় না। কেউ হয়তো সত্যি ভালোবাসে, আর কেউ বা তা নয়। ছেড়ে দিতে চায়, কিন্তু অপরজন ছাড়ে না তাই ছাড়া

হয়ে ওঠে না। এতে যেন ছেলেটির কোনো দোষ নেই। এই রকম-ই এক দৃশ্য নিম্নোক্ত ছড়াটিতে, যেখানে ছেলেটি বলেছে—

হাম্‌তো কম্‌লীকে ছাড়ে গা
কম্‌লীতো নেহি ছাড়ে গা[৩৬]

ছড়াটিতে বাংলা ভাষার সঙ্গে চল্‌তি হিন্দি ভাষারও মিশ্রণ ঘটেছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষ মনস্তত্বটি আলোচ্য ছড়ায় প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের এই সমাজে দেখা যায়, বহু পুরুষ তার বিবাহিত স্ত্রীকে ফাঁকি দিয়ে পরকীয়া প্রেমে লিপ্ত থাকে। অথচ সবাইকে জানাতে চায়, এরজন্য মেয়েটি দায়ী, সে নয়। 'কমলী'ই ছাড়ে না। এ হেন পুরুষ মনোভাবনাটি ছড়ায় সুন্দরভাবে প্রকাশিত।

শুধু বিয়ে করলে হয় না। বিবাহিত জীবনকে সুখ ও সমৃদ্ধিতে ভরিয়ে তুলতে সমান দক্ষ হতে হয় বাড়ির ছেলেদের। এবং ছেলেরা তা পারেও বটে। তবে কেউ কেউ হয়তো পারে না। সেই না পারার দিকটি ছড়ার সুনজরে পড়েছে, তাই এমন না পারা পুরুষটির আক্ষেপোক্তি ছড়ায় ব্যক্ত হয়েছে এইভাবে—

গরু হারা মাউগ্‌ মরা
দাউদ্‌ গায় যার
সদাই বিরস বদন
মনে সুক্‌ নাই তার[৩৭]

গৃহস্থ্য মানুষের গরু-বাছুর-ছাগল নিয়ে সংসার। কিন্তু উপরোক্ত ছড়ায় পুরুষ মানুষটির জন্য আমাদের দুঃখ না করে উপায় নেই। তার গরু হারিয়ে গেছে। তাতে আবার 'মাউগ'[৩৮] অর্থাৎ স্ত্রী ও মরে গেছে, গোটা শরীরে চামড়ার রোগ 'দাউদ'[৩৯] হয়েছে। এমন যার অবস্থা তার 'বিরস বদন' ছাড়া সরস হওয়ার উপায় বা কী? আর যার মনের এমন অবস্থা, তারজন্য ছড়ার মতো আমাদেরও অন্তর কেঁদে ওঠে। তার এমন অবস্থায় সংসারে বাকি লোকজন বকাবকি তো করবেই। যার সংসারে মন নেই, মনে শান্তি নেই, মুখে হাসি নেই, বাড়ির লোকজন তার প্রতি সদয় হবেন কীভাবে? তাই পুরুষ মানুষের কণ্ঠে নিঃসৃত হয়েছে হৃদয় বিদারক আর একটি ছড়া—

বক আর ঝক্‌ কানে দিছি তুলা
মার আর ধর পিঠে বাঁধ্‌ছি কুলা[৪০]

এতে কানের মতো পিঠও রক্ষা পাবে। তাই সে কোনো কথায় কর্ণপাত করে না। এখানে একটি অতি পরিচিত প্রবাদের কথা মনে পড়ছে— 'বোবার কোনো শত্রু নাই।'

পুরুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে ফুটে উঠেছে মনস্তাত্ত্বিক দিকটি। যা ছড়ার চোখে এড়িয়ে যায় নি। ব্যক্তি মানুষের ভুল-ত্রুটি, গুণাগুণগুলি ও ব্যক্ত হয়েছে ছড়ায়—

আমার কত্তা সভায় হারন্নি
কারুর কথা শুনন্ নি [৪১]

নারীর উক্তির মধ্যদিয়ে স্বামীর না-হারার বার্তাটি সঘোষিত। সভায় বসলে সে কারো কথা শোনে না। তাই সে হারেও না। অর্থাৎ কিছু মানুষ থাকে এমন তর্ক-বাগীশ, তারা নিজের ভাবনা ও মতকে প্রাধান্য দেয়। ছড়াটিতে সেকথাই বলতে চাওয়া হয়েছে।

ছড়ায় পাই আটপৌরে জীবনের নানা সমস্যার কথা। বাড়ির কর্তার কথা আজকালকার গিন্নি-ছেলে-মেয়েরা একদম শোনে না। ছড়া বলছে, সমাজের এমন ধর্ম, পরিবারে যে কষ্ট করে, আয় উপার্জন করে সংসার চালায়, বাকিজনরা তার প্রশংসার চেয়ে নিন্দা করে বেশি—

যারুর খাবু যারুর পরবু
তারুর বুকের চু ছিঁড়্বু [৪২]

অর্থাৎ যে পুরুষ মানুষটি শ্রম-অর্জিত অর্থ দিয়ে সংসার পরিবারবর্গকে বাঁচিয়ে রেখেছে, সবাই সেই পুরুষ মানুষটিকে আরো বেশি জাঁতাকলে পিষ্ট করে। সংসার জ্বালায় পিষ্ট মানুষটি যখন শোনে বাড়ির নানারকম ফরমাস, তখন না সহ্য করতে পেরে বলে—

আঙ্গুলে জড়িতে কানা নাই
তাবুর ফরমাস [৪৩]

সংসারে 'কানা' [৪৪] অর্থাৎ সামান্য কাপড়ের টুকরো যেখানে নেই, সেখানে তাঁবুর ফরমাস মানায় না। তাই ছড়া ও মাঝে মাঝে প্রতিবেশির কণ্ঠে প্রতিবাদী হয়।

যা দেখিনু বাপের কালে
গোপ আঁকিনু তপ্ড়া গালে [৪৫]

কোনো কালে গোঁফ বলে যে পুরুষের নাই, সে আবার বয়সকালে 'তপড়া গালে' গোঁফ এঁকে ঢং করে— ছড়া এমন পুরুষ মানুষের সরাসরি প্রতিবাদ না করে পারে না। আসলে এখানে এই ছড়ার মধ্যদিয়ে পুরুষ মনস্তত্ত্বটি সুন্দরভাবে প্রকাশিত। প্রত্যেকেই চায় তার রূপ যৌবন ধরে রাখতে, এখানে সেই কথাই ব্যক্ত হয়েছে।

ছড়া আরো বলে, প্রতিটি মানুষ যে, যে বৃত্তি নিয়ে বড় হোক্ না কেন, সেই সেই বৃত্তিনির্ভর মানুষদের মধ্যে একটা সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে—

চোরে চোরে মাসতুতো ভাই
এর ব্যায়ায় ওর হা কামাই[৪৬]

চোর হলেও চোরে চোরে থাকে এক মধুর সম্পর্ক। সে মধুরতা হল একজনের বিয়েতে অন্য জনের 'হা' অর্থাৎ হাল কামাই। এরা প্রকৃতভাবে মাসতুতো ভাই না হলে ও বৃত্তিতে এক।

মনস্তাত্ত্বিক মূলক আরো একটি ছড়া হল—

সুজন বাজায় কুজন গায়
অতি পড়ামুয়া লাচ্‌তে যায়[৪৭]

সুজন ও কুজন সমাজ মাপকাঠিতে দু-ধরণের মানুষ হলেও এদের সমাজ গ্রহণ করে, সমাজ গ্রহণ করে না যারা সংসারের কোনো কাজে আসে না। যারা নিষ্কর্মা, অলস, তারাই গাল খায় 'অতি পড়ামুয়া' বলে। অর্থাৎ অতি বিশেষণ যোগে মুখপোড়া মানুষকে সমাজ চায় না, সেই মনস্তত্ত্বটি ছড়ায় ব্যক্ত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কবিতায় বাঙালির বর্ণনা করেছেন— 'দেখা হলেই মিষ্ট অতি / মুখের ভাব শিষ্ট অতি'[৪৮]— (দুরন্ত আশা) বাঙালির এই স্বভাব বৈশিষ্ট্য উপকূলীয় ছড়ায়ও লক্ষণীয়। খুব স্বাভাবিক জিজ্ঞাসা— 'কেমন আছো?' এই কেমন আছো এই প্রশ্ন সমাজের এক বাস্তব ট্র্যাজেডিকে তুলে ধরেছে, যা ছড়ায় প্রতিফলিত, —

দাদু কেমন ভালো
চোক্ কাঁদো কাঁদো[৪৯]

সমাজের বৃদ্ধ দাদুটির মানসিক অবস্থা তথা তার এই বাঁচাটা যে কোনো দিক দিয়ে সুখের নয়, তা আর আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না। চোখ দেখেই বোঝা যায়। পুরুষ মনস্তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চারপাশের ছবিটা যে দিন দিন বড় যন্ত্রণাকাতর হয়ে উঠছে, ছড়ার ভাষায় তা বড়ই স্পষ্ট। ছড়াগুলি পুরুষ চরিত্রের প্রতিটি পদক্ষেপকে যেভাবে নিখুঁত করে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে, তাতে করে পুরুষ মনস্তাত্ত্বিকতার চিত্র সুন্দরভাবে প্রকাশিত।

৩। শিশু মনস্তত্ত্বের অনুসন্ধান ঃ

মাতৃগর্ভ থেকে বয়ঃসন্ধিকাল পর্যন্ত সময়কাল, শিশু মনোবিজ্ঞানের পাঠ্য বিষয়। বয়স বাড়ার সাথে সাথে শিশুর যে শারীরিক বৃদ্ধি ঘটে এবং এই শারীরিক বৃদ্ধির ফলে তার আচরণে যে পরিবর্তন সংঘটিত হয়, তা- শিশু মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। শিশুর সামাজিক পরিবেশ বিশেষ করে পরিবার, সঙ্গী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা শিক্ষক, শিক্ষিকাগণ শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে প্রভাব বিস্তার করে। শিশুর শারীরিক, মানসিক, আবেগিক, সামাজিক, নৈতিক বিকাশ প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনাই শিশু মনোবিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য।

ছড়ার রাজ্যে শিশুদের একছত্র অধিকার। অনেকেই মনে করেন ছড়া মানেই শিশু। শিশু-ই ছড়ার শেষকথা। সেখানে অন্যকারোর আবির্ভাব ঘটতে পারে না। যদিও পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বলেছি যে, ছড়ার রাজ্যে কেবল শিশু নয়, পরিণত মানুষ, জগৎ, জীবন প্রভৃতি এই পৃথিবীর সবকিছুই ছড়ার বিষয়বস্তু। তবুও বলবো ছড়ার রাজ্যে শিশুর স্থান সবার উচ্চে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, ছেলে ভুলানোর জন্যই ছড়া রচিত হচ্ছে। আবার শিশুরাও নিজেদের প্রয়োজনে কিছু ছড়া রচনা করছে। গোষ্ঠীনির্ভর লোকায়ত জনজীবনে বসবাসকালে শিশুরা নানারকম বিষয় নির্ভর ছড়া আনন্দবর্ধনের জন্য রচনা করে থাকে। যার সব অর্থ বোধগম্য হয়, কখনো বা বোধগম্য হয় না। কিন্তু তারা নিজেদের জন্য নানা ছড়া কাটে। যার মধ্যে শিশু মনস্তত্ত্বের অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা করা গেল।

শিশুরা নিজেদের মধ্যে কোনো কিছু নিয়ে হঠাৎ ছড়া বলে। কোনো ছেলের একপায়ে জুতা, তাই দেখে ছড়া কাটে—

এক পায়ে জুতা
খাঁড়াহারে কুত্তা
খাড়াদরকে যাবনি
কুত্তা ভাজা খাবনি[৫০]

এরমধ্যে আছে শিশু মনস্তত্ত্ব। কোনো সামান্য কারণে মজা পাওয়া ওদের সহজাত প্রবৃত্তি। এরকম বহু দৃষ্টান্ত মিলবে উপকূলীয় শিশুদের ছড়ায়—

বেরাহারে ঢ্যারা পূজা
ঘি চচ্চড় কুত্তা ভাজা
বেরাদরকে যাবনি
কুত্তা ভাজা খাবনি[৫১]

এই অঞ্চলের বেশিরভাগ পদবী— বেরা, মাইতি, জানা, মান্না, খাঁড়া, মণ্ডল, প্রধান, দাস, পাল প্রভৃতি। ফলে এরাই ছড়ার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে।

শিশুদের কাছে 'দাদাবাবু'[৫২] এই সম্পর্ক অতি প্রিয় এবং আদরের। শিশুর রাজ্যে দিদির মতো, দাদাবাবুও অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে। কেননা, দিদিকে সুখী করার ভবিষ্যৎ কারিগর দাদাবাবু। তাই দাদাবাবু নিয়ে রচিত ছড়া হল—

দাদাবাবু কমলালেবু
একা খেয় না
আমার দিদি ছোট্ট খুকু
কিচ্ছু জানে না[৫৩]

আরো একটি ছড়া—

দাদাবাবু কমলালেবু
আপেল খাবে গটা
দাদাবাবু মটা[৫৪]

—দাদাবাবু এবং শ্যালক-শ্যালিকার সুমধুর ঠাট্টা-তামাসার সম্পর্ক ছড়া দুটিতে ধরা পড়েছে। দিদি এবং ভাইয়ের সম্পর্কও আরো মধুর। দিদিরা কখনো কখনো ছোটো ছোটো ভাই-বোনের কাছে মায়ের সমান। তার স্নেহ কোমল আঁচলে তারা বড় হয়। এই নিবিড় সম্পর্ক গ্রামবাংলার চিরকালীন 'আগমণি ও বিজয়া'র[৫৫] পদগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। স্মরণ করিয়ে দেয় অপু-দুর্গার[৫৬] স্নেহ-সুনিবিড় সম্পর্কটিকে, তেমনি এক চিরকালীন

বাৎসল্য রসের ফল্গুধারা, নির্ঝরিণীর ন্যায় ধৌত হচ্ছে এই উপকূলীয় ছড়াগুলিতে। শিশুদের ছড়ায় যেন শাক্তপদাবলীর সুর ভাসে—

খুকুরাণি ফড়ফড়ানি
ভালো বেগুনের চ্যারা
খুকুর তরে বর আইস্‌বে
আয়ে বিয়ে পাস করা[৫৭]

অতি আদরের এই ছোট্ট খুকুর জন্য আয়ে বিয়ে পাশ করা পাত্র-ই কাম্য।

আরো একটি ছড়া হল—

দোল দোল দুলুনী
রাঙা মাথায় চিরুণী
বর আইস্‌বে যখুনি
লিয়ে যাবে তখুনী[৫৮]

—এই রকম একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলার লোকসাহিত্য'[৫৯] ১ম খণ্ড গ্রন্থে—

দোল্‌ দোল্‌ দোলনি
কাল যাব বেলুনি
কিনে আন্‌ব দোলনি॥
বেলুনির পাকা আম্‌ড়া।
খেয়ে অম্বলে বুক চাব্‌ড়া॥[৬০]

কিংবা—

দোল্‌ দোল্‌ দোলানি
কানে দেব চৌদানি॥
কোমরে দেব ভেড়ার টোপ
ফেটে মর্‌বে পাড়ার লোক॥[৬১]

প্রকৃতির রূপচিত্র শিশুর মনোজগতে আরো এক জগৎ তৈরী করে চলে। সেই জগতে থাকে, শিশুর কল্পনা, অনুভূতি ও সরলতার বাণীমূর্তি, সেখানেই ধরা পড়ে শিশুর মনস্তত্ত্ব উপলব্ধিগুলো, আর ছড়ায় তার প্রকাশ—

আয়রে পাখি ল্যাজ ঝোলা
খেতে দুব চাল ছোলা
খাবি দাবি কল্‌কলাবি
ছেলেকে নিয়ে খেলা করবি [৬২]

শিশুর সরলতায় ল্যাজঝোলা পাখি এবং মাটির ঘরের ছোট্ট শিশু দুই-এরই সহজ সহাবস্থান।

বর্ষাকালে গ্রামজীবন জলমগ্ন রূপ নেয়, মাঠ-ঘাট থৈ থৈ করে, নদী খাল বিল প্লাবিত হয়, পল্লীপ্রকৃতি প্রাণবন্ত, সজীব, শ্যামল হয়ে ওঠে। তাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে জলের প্রাণীও স্বাধীনভাবে বিচরণ করে—

পা ত দিয়া জ যায়
পুটি মাছের ঝালা যায়
খইরা পাখি তামুক খায়
প্যাঁচা বলে হায় হায় [৬৩]

—এখানে পা, ত, জ শব্দগুলি অসম্পূর্ণ শব্দ। যার সম্পূর্ণ রূপ পদ, তল, জল। উপকূলীয় অঞ্চলের কথ্যভাষার এটি একটি উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য। এই শব্দগুলির দ্বারা পল্লীবাংলার বর্ষার রূপবৈচিত্র্য প্রকাশিত যথা— জল প্রবাহিত হওয়া, তারমধ্যে পুঁটি মাছের ঝাঁকের চলে যাওয়া, খইরা পাখির তামাক খাওয়া এবং প্যাঁচার হায় হায় বলে অবাক হওয়া, বিস্ময়ের এরূপ ছবি শিশুর সরলতার মতোই নির্মল।

শিশুরা চিত্রকর। ভালো করে যখন কথা বলতে পারে না, তখন থেকেই চলে শিল্পের অনুশীলন। আর তার এই শিল্পানুভূতি আমাদের পরিণত মনে সবটা ছাপ না ফেললেও, সে যে ঐ সময়ের শ্রেষ্ঠ রূপকার, যার আবির্ভাবে আকাশে জ্বল জ্বল করে উজ্জ্বল নক্ষত্র, যার

দ্যুতিতে আমাদের কালো জগৎ কিছুটা হলেও আলোকিত হয়, একথা সত্য। সর্বাংশে সেই সত্য-শিশুটি খড়িমাটি নিয়ে যে চিত্র অঙ্কন করে, তাও হয় বড় বিচিত্র—

দ কে জ্বর হইল
বুসতে দিল লাঠি
বাইস জঁ ডাক্তার আইল
খাইতে দিল বটি
উল্টিয়া ধার দিয়া ছিঁটিয়া দিনে
হইল টিয়া পাখি [৬৪]

সংখ্যা শেখার ছড়া—

ওয়ান— খায় পাকা পান
টু— খায় গু
থ্রি— পায়খানা মিস্ত্রি
ফোর— জুতা চোর
ফাইভ— পঁদে পাইপ
সিক্স— খায় ভিক্স
সেভেন— গল্লা খাবেন ?
এইট— ওড়ায় কাইট
নাইন— দেখতে ফাইন
টেন— পকেটে পেন [৬৫]

ছড়াটিতে সংখ্যা শেখার এক মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি রয়েছে। খেলারচ্ছলে শিশু অবলীলায় শিখে যায় সংখ্যা।

ইন পিন সেপ্টিপিন
দাদু খায় ভিটামিন [৬৬]

বয়স্কদের যে ভিটামিন খেতে হয় ছড়ায় সেকথা বলা হয়েছে। এমনিভাবে শিশুরা অভিমানী মুসলমানদের নিয়েও ছড়া বলে—

মুসলমান অভিমান
দাঁড়ি কুচকুচ করে

একটা চুল পড়ে গেলে

আল্লা আল্লা বলে [৬৭]

শিশু জীবনের গতিতে ছুটে চলে, বড় হয়, আর প্রাণের আনন্দে ছড়া কাটে—

ও পিলা

   কী পিলা

কাঁচা পিলা

   কী কাঁচা

লেবু কাঁচা

   কী লেবু

পাতিলেবু

   কী পাতি

মোমবাতি

   কী মোম

গরম মোম

   কী গরম

দুদ্ গরম

   কী দুদ্

খাঁটি দুদ্

   কী খাঁটি

মারব চাঁটি

   কী চাঁটি

মানুষের চাঁটি

   কী মানুষ

বনমানুষ

   কী বন

আদাবন

   কী আদা

তুই একটা হারামজাদা [৬৮]

শিশুর মতো সহজ সরল শৃঙ্খলিতভাবে ছড়াটি পরিণতির দিকে প্রবাহিত। শেষে গালাগালি দিয়ে শেষ হয়েছে। আরো একটি ছড়ায় শিশুর অভিমান ব্যক্ত হয়েছে এইভাবে—

আরে ও দাদা ও দিদি
এত করে ডাক্‌ছি
শুনতে নাহি পাচ্ছ ?
এতটুকু তেঁতুল চক্‌লেট খাচ্ছ ?
বেস্‌ বেস্‌ বেস্‌
খেয়ে নাও খেয়ে নাও
চেটে পুটে খেয়ে নাও
কাল মামা আনবেন
রসগোল্লা লেডিকেনি
তখন তুমি যদি চেয়েছো
এই ক্যাঁচকলাটি পেয়েছো [৬৯]

খেলবার সময় শিশুরা নানা ধরনের ছড়া বলে, যার মধ্যে শিশু মনস্তত্ত্বটি প্রকাশিত। কখনো কখনো বাংলায় ছড়া বলতে বলতে, ছড়ার নিজস্ব সুরে ইংরেজিতে ঐ ছড়ার অর্থ অপরিবর্তিত রেখে ছড়া বলে। যেমন—

সেই ছেলেটা সেই যে গেল
গেল তো গেল আর এল না। [৭০]

ইংরেজিতে বলে—

That boy gone ganganagan
ganganagan not return.

শিল্পী ইকবালের গানের ভাষায়ও শিশুরা ছড়া বলে, এখানে শিশুর অনুকরণমূলক মনস্তত্ত্বটি ফুটে উঠেছে—

সাঁরে যাঁহা সে আচ্ছা
ভিম্‌রুর পঁচিশটা বাচ্চা
তাই গোরুর কি লজ্‌জিয়া [৭১]

ছড়াটিতে শিশু মনস্তত্ত্বটি চমৎকার। তারা আধুনিক, তারা যুগোপযোগী। তারা ছড়া বললেও বিষয়বস্তুর নতুনত্ব ও পুরাতন গানের ধারা—এই দুয়ের মেলবন্ধনে ছড়াকে গতিবান করে তুলেছে। এরমধ্যে Syncronic দিকটিও ফুটে উঠেছে। তাই টি.ভি. সিরিয়ালের ছাপও ছড়ায় লক্ষ্য করা যায়—

টম্ অ্যাণ্ড জেরি
টম্ অ্যাণ্ড জেরি
বিস ফ্রাম ডে
আইলা হো হো হো
আইলা সি সি সি
আইলা হো
আইলা সি
আই অ্যাম এ পেপ্‌সি [৭২]

শিশুদের কার্টুন-এর দুনিয়ায় 'টম অ্যাণ্ড জেরি' [৭৩] খুবই জনপ্রিয়। তার সঙ্গো 'আইলা' [৭৪] সাইক্লোনের কথা আমাদের সকলের জানা। ২৪ পরগণা জেলায় আইলার জন্য ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। শিশুরা ছড়ায় তার প্রয়োগ করেছে।

আয়লারে আয়লা
জেষ্ট মাসের পইলা
জামা দুটা মইলা
গেঞ্জি দুটা ফুটা
প্লাসটিকের জুতা
আলমারিতে গোলাপ ফুল
টেক্সিয়ালার টাকে চু [৭৫]

— শিশুদের এই ছড়াগুলিতে শিশু মানসিকতার প্রকাশ পেয়েছে। কখনো হাসি-তামাসা, কখনো ঠাকুর দেবতা, কখনো বা রূপচিত্রধর্মী আবার কখনো বা স্নেহ-মায়া মমতার মিষ্টি মধুর সম্পর্ক, যাতে আছে শিশুদের সরল স্বাভাবিক জীবন বৈশিষ্ট্য।

৪। সমাজ মনস্তত্ত্বের অনুসন্ধান ঃ

সমাজের প্রতিটি মানুষ-ই সমাজবন্ধ। সাহিত্য সেই সমাজের দর্পণ। যে সমাজের মূল উপজীব্য মানুষ। তাই স্বাভাবিকভাবে মানুষের কথা বলতে গেলে সমাজের কথা উঠে আসে, কেননা মানুষের জীবন যাপনের মধ্যদিয়ে সমাজের ছায়াপাত ঘটে। সমাজ রাজনীতি, অর্থনীতি, আচার-বিচার, স্বার্থপরতা, পরার্থপরতা, প্রতারণা, প্রতিবাদ, হিংসা-বিদ্বেষ, স্নেহ-প্রীতি-অপ্রীতি, ভদ্র-অভদ্র, ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ সবকিছুতেই আছে সমাজের প্রতিচ্ছবি, আর এসবের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয় সমাজ-মনস্তত্ত্ব। পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলে ক্ষেত্রসমীক্ষায় প্রাপ্ত ছড়ায় উঠে আসবে এরকম বহু সমাজ-মনস্তত্ত্বের বাস্তব ক্যানভাস।

সমাজে নানা মানসিকতার মানুষের বাস। এইসব মানসিকতার মানুষজনকে কখনো চিহ্নিত করতে পারি, কখনো বা তা হয় না। তার মানে এই নয় যে, মানুষের মনগহনে তার কোনো ছাপ পড়ে না ; বাস্তবিক-ই ছাপ পড়ে। এরকম-ই একটি মনো ভাবনা, অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে ছড়ায়—

খরার দিনে খরারে
বর্ষার দিনে পাঁয়ি
যে যেমন লোক আমি
চলিয়া গেনে জাঁয়ি [৭৬]

সমাজের ভালো-মন্দ জ্ঞান সমাজ-শিক্ষা থেকেই আসে। যেমন প্রকৃতির পরিবর্তনের শিক্ষা প্রকৃতি-শিক্ষা থেকে আসে। প্রকৃতিতে কখন গ্রীষ্মকাল কখন বর্ষাকাল তা আমাদের বুঝতে কোনো সমস্যা হয় না, 'খরা' অর্থাৎ রৌদ্রের দিনে রৌদ্র, বর্ষার দিনে বর্ষার মতো সমাজের মানুষ কে কেমন তাও সহজে বোঝা যায়। ছড়াটিতে সেকথাই বলা হচ্ছে। অর্থাৎ জীবনের শিক্ষায় মানুষ শিক্ষিত। সুতরাং জীবনে চাই প্রকৃত শিক্ষা। ব্যবসা-বাণিজ্য যে যাই করুক না কেন, লেখাপড়ার মতো বিদ্যা এবং ধন লাভ যে কোথাও সম্ভব নয়, সমাজ-মনস্তত্ত্বসম্পন্ন ব্যক্তিরা তা সকলেই জানে—

ব্যাপারে হ্যাপার লাব
  লক্ষ আয় চাষে
তা হইতে অধিক লাব
কলম ক্ষুচার কাছে [৭৭]

'ব্যাপারে'[৭৮] শব্দটি 'ব্যাপারী' থেকে এসেছে। অর্থ ব্যবসা-বাণিজ্য করা। আর 'হ্যাপা' অর্থাৎ সমস্যা বহুল। তাহলে ব্যাপারে আছে হ্যাপা, তার চেয়ে চাষে আছে বেশী আয়, তার থেকে আরও বেশী লাভ্যাংশ জুটবে পড়াশুনা করে চাকরী করলে যা ছড়ার চরণে ব্যক্ত— 'কলম ক্ষুচার কাছে চরণটিতে।' সমাজ-মনস্ক মানুষ উক্ত ছড়ার মধ্যদিয়ে সেই কথাই ব্যক্ত করেছে। কাগজের উপর লেখালেখিতে অনেক বেশী উপার্জন সম্ভব। ছড়ায় সমাজ যেন জীবন্ত। এতে সমাজের মূল স্রোতটার মানসিকতা স্পষ্ট উঠে এসেছে, যেমন উঠে এসেছে—

পড়সি নাই যেঠি
ঢাম দেখিবু সেঠি

—পাড়া-পড়সি নিয়েই সবার ঘর। সমাজের এই অংশই সবচেয়ে বড় সমাজ সমালোচক। অদৃশ্যভাবে বসে থেকে সবই দেখে এবং ছড়ায় তার দোষ-গুণ প্রকাশ করে। আলোচ্য ছড়ায় ব্যক্ত হয়েছে, যেখানে প্রতিবেশি নেই, সেখানে ঢাম দেখানো যায়, কিন্তু যেখানে আছে, সেখানে তেমনটা চলে না। ছড়ায় আরও পাই—

সেই ঘইতা করলু
বয়স গড়ি গড়ি

—সব কিছুর নির্দিষ্ট সময় আছে। বিবাহেরও উপযুক্ত বয়স আছে। তাতে কেউ যদি বেশি বয়সে বিবাহ করে, সমাজ ভালো চোখে তা নেয় না, 'বয়স গড়ি গড়ি' অর্থাৎ বয়স বেড়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। ছড়ায় আরো পাই—

কপা কপা[৭৯] ভানুমতি[৮০]
তিন ব্যায়া হইনে
সউ চিরোলদাঁতি[৮১]

যার ভাগ্যে যা নেই, তা কিছুতেই হওয়ার নয় সবই ভাগ্যের দোষ। কেননা, বার বার বিয়ে করেও সেই 'চিরোলদাঁতি'[৮২] বউ জুটে। সুন্দরী বউ-এর জন্য তাই একবার নয়, দু'বার নয়, তিনবার বিয়ে করেও চিরুণীর মতো ফাঁকা দাঁতের বউ জুটেছে। সমাজের চোখে বিষয়টি গোপন থাকে নি। ছড়ায় পাই—মন ভেঙে গেলে তা আর জোড়া লাগে না,—

মন ভাঙলে চপ্‌রা[৮৩]
হাঁড়ি ভাঙলে খপ্‌রা[৮৪]

মনের সঙ্গে মনের মিল ভেঙে গেলে তা দানাশস্যহীন খোসার মত শুধুই চপরা হয়ে পড়ে থাকে। যেমন মাটির হাঁড়ি, কলসী ভাঙলে তার টুকরো অংশ খপ্‌রা হয়, ঠিক তেমনি।

জীবন থেমে থাকে না। এ জীবন গতির আবর্তে একটু সুখের আশায় ঘুরপাক খায়।

যাচ্ছ কোথায় ? পিরিত যেথায়
আস্‌বে কবে ? চট্‌বে যবে [৮৫]

অপূর্ব প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গীতে আলোচিত ছড়াটিতে খুব সহজ সরল স্বীকারোক্তির প্রকাশ। ভালবাসা সবাইকে বশ্‌ করে, তাই যতদিন ভালবাসা থাকবে ততদিন থাকবে, না থাকলে পুনরায় ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি ছড়াটিতে ব্যক্ত হয়েছে।

সমাজ মনস্কতার বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে এরকম আরও একটি ছড়া হল—

ধান ঘাটু ঘাটু কন্যাগো হস্তে পাকা পান
বুকের মাঝে বিফল দুটি ব্রাহ্মণকে কর দান
ভালো বলেছো ব্রাহ্মণ ঠাকুর ভাল বলেছ তুমি
চোদ্দ বছর না জানি স্বামী
হাটের হাটানি বলে ওটি তোমার কে
লজ্জার খাতিরে পড়িয়া ওটি আমার ঠাকুরদা হে [৮৬]

উক্ত ছড়াটিতে অবৈধ প্রণয়ের কথা বলা হয়েছে, যেখানে বয়সের সামঞ্জস্য নেই, মনের অবদমিত আকাঙ্খা-বাসনাকে চরিতার্থ করার জন্য বুড়ো ব্রাহ্মণের সঙ্গে সংসার বাঁধে, অথচ যার পরিচয় সমাজের কাছে ঠাকুরদা হিসেবে, দীর্ঘদিন স্বামীসঙ্গহীন জীবনের নিদারুণ চরম সিদ্ধান্ত ছড়াটিকে সমাজ বাস্তবতার প্রত্যক্ষদর্শী করে তুলেছে।

আলোচ্য ছড়ায় জানা গেল ব্রাহ্মণের পদস্খলন, তেমন আরো একটি ছড়ায় বলা হয়েছে, কোন্‌ ব্রাহ্মণ উৎকৃষ্ট এবং কোন্‌ ব্রাহ্মণ নিকৃষ্ট—

পৈতা কালো বামুন ভালো
পৈতা সাদা বামুন গাধা [৮৭]

যার পৈতা যত কালো, স্বাভাবিকভাবে ধরে নেওয়া হয়, সেই ব্রাহ্মণ দীর্ঘদিনের সৎ, একনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। তাই দীর্ঘদিন পৈতা থেকে থেকে কালো পড়ে গেছে। কিন্তু যে ব্রাহ্মণের

পৈতা সাদা, তিনি কি সত্যি ব্রাহ্মণের আচার- ধর্ম নিষ্ঠা সহকারে পালন করেন? তাঁর ব্রাহ্মণত্বে তাই সংশয় দেখা দিয়েছে এবং সমাজ মানসিকতায় তাকে গাধাও বলা হয়েছে। যাতে সমাজের মনস্তাত্ত্বিক দিকটি ফুটে উঠেছে।

পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের রাজনীতির চিত্রও ছড়ায় প্রতিফলিত। মানুষের কাছে 'ভোট' যেন অস্ত্র স্বরূপ। ভোটের নামে আস্ফালন চলে অঞ্চল জুড়ে। তার প্রতিফলন ছড়ায়—

আমি যদি ভোটে নামি
রাখবনি পচার কমই
কি বলবি আমারে আর
অঞ্চল করব ছার্খার্[৮৮]

একসময় নন্দীগ্রামের রাজনৈতিক অস্থিরতা যে ছিল, একথা আমাদের সকলের-ই জানা। ইতিহাসও জানে তা। অস্থিরতাময় মানসিকতার প্রভাব এবং সেই সময় মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঐখানে এলে জনগণের ভাবনা ছড়ায় যেভাবে ব্যক্ত হয়েছে—

নন্দীগ্রামে মমতা
করে দিবে সমতা[৮৯]

বিভিন্ন স্থান নামও বৈশিষ্ট্য নিয়ে ছড়া এই ক্ষেত্র সমীক্ষায় পাওয়া গেছে, এরকম কিছু ছড়ার মধ্যে যে, সমাজ মনস্তত্ত্বের দিকটি প্রকাশিত তা এককথায় অনবদ্য—

কুঞ্জপুরের কুঠিয়া
সাত্খণ্ডের লোক মুঠিয়া
কাদিরপুরের কুলি
ফুলবাড়ির তেলি[৯০]

—এই গ্রামগুলি খেজুরী থানার অন্তর্গত। গ্রামের সহজাত বৈশিষ্ট্যগুলি লোকমানসে ধরা পড়েছে।

যার নাই জাইতকুল
সে যায় বাজকুল[৯১]

বাজকুল এগরা মহকুমার অন্তর্গত এলাকা। এইরকম কয়েকটি ছড়া হল—

১। খায় দায় রয় সুখে
তার বাড়ি তমলুকে [৯২]

তমলুক পূর্ব মেদিনীপুর জেলার জেলা শহর।

২। খায় দায় না দেয় দাম
তার ঘর নন্দীগ্রাম [৯৩]

হলদিয়া মহকুমার অন্তর্গত থানা।

৩। কিছু ভালো কিছু জ
তার নাম মহিষাদ [৯৪]

হলদিয়া মহকুমার আর একটি থানা এলাকা।

প্রতি স্থান নামের সঙ্গো তাদের স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যগুলি এখানে ব্যক্ত হয়েছে। যার মধ্যে সমাজ মনস্তত্ত্বের রূপটি ধরা পড়েছে।

এরকম হাজারো দৃষ্টান্ত মিলবে। কিন্তু বিষয় দীর্ঘায়িত না করে, একথা বলা যায় যে, সমাজ মনস্তত্ত্বগত ভাবনা যে আলোচ্য ছড়াগুলির মূল উপজীব্য, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রসজ্ঞা নির্দেশ ও মন্তব্য ঃ

১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, সংসদ বাংলা অভিধান, শিশু সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৪, কলি-৯, পৃ-৫৫৮।

২. 'সিগমুণ্ড ফ্রয়েড', হলেন মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির জনক। তাঁর লিখিত 'The Interpretation of Dream' (1899) গ্রন্থে গ্রীক মিথের ইডিপাস চরিত্রকে মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করে, এই পদ্ধতির সূচনা করেন।

৩. গ্রন্থটি প্রকাশিত ১৮৯৯ খ্রীঃ, এই গ্রন্থে তিনি গ্রীক মিথের ইডিপাস চরিত্রের ব্যাখ্যা করেন।

৪. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য শেক মকবুল ইসলাম, লোকসংস্কৃতি বিজানতত্ত্ব, পদ্ধতি ও প্রয়োগ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১১, কলি-৯, পৃ-১৯৯।

৫. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—২০০ দ্রষ্টব্য।

৬. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—২০১ দ্রষ্টব্য।

৭. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—২০১ দ্রষ্টব্য।

৮. 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৯০৬, প্রকাশক বিশ্বভারতী, কলি-১৭।

৯. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছেলে ভুলানো ছড়া ঃ ২, বিশ্বভারতী, ২০০৪, কলি-১৭, পৃ-৪৯।

১০. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-১০, পৃ—৯৬।

১১. 'লহনা-খুল্লনা' এই চরিত্র দুটি চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যধারার বণিক খণ্ডের দুটি সতীন চরিত্র।

১২. গ্রন্থটি গ্রন্থাগার প্রকাশিত হয় ১৯১৯ খ্রীঃ প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, পরবর্তীকালে বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত হয়। বিশবিদ্যা সংগ্রহ ১১৮ নামে।

১৩. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলার ব্রত, বিশ্বভারতী, ২০১০, কলি-১৭।

১৪. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-১০, পৃ—৯৬।

১৫. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯৬ দ্রষ্টব্য।

১৬. 'গেলি' আদুরি কন্যাকে বলে, যে হয় খুব প্রাণোচ্ছল এবং স্বতঃস্ফূর্ত।

১৭. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-১০, পৃ—৯৬।

১৮. এটি একটি সংস্কৃত বাক্য যার অর্থ নারীর অলংকার হল তার স্বামী।

১৯. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-১০, পৃ—৯৬।

২০. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯৬ দ্রষ্টব্য।

২১. 'সিকন' শব্দটি সর্দির কথ্য রূপ। যে গাঁয়ের কন্যার নাকে অনবরত সর্দি ঝরতে থাকে, তাকে সিকন্ নাকি বলা হয়েছে।

২২. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-১০, পৃ—৯৬।

২৩. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯৬ দ্রষ্টব্য।

২৪. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯৬ দ্রষ্টব্য।

২৫. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯৬ দ্রষ্টব্য।

২৬. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯৬ দ্রষ্টব্য।

২৭. শেক্সপিয়রের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' নাটকের ভিলেন চরিত্র। বড় ব্যবসাদার যে অর্থের বিনিময়ে শরীরের মাংসও কেটে নিত।

২৮. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৬, পৃ—৯২।

২৯. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯২ দ্রষ্টব্য।

৩০. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯২ দ্রষ্টব্য।

৩১. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯২ দ্রষ্টব্য।

৩২. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯২ দ্রষ্টব্য।

৩৩. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৭, পৃ—৯৩।

৩৪. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯৩ দ্রষ্টব্য।

৩৫. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯৩ দ্রষ্টব্য।

৩৬. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-২০, পৃ—১০৬।

৩৭. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১০৬ দ্রষ্টব্য।

৩৮. মাগ > মাউগ শব্দটি এসেছে। যার অর্থ স্ত্রী। শব্দটিতে মধ্যস্বরাগম ঘটেছে।

৩৯. 'দাউদ' শব্দটি 'দাদ' শব্দটিতে মধ্যস্বরাগম ঘটেছে। এটি একধরণের চর্মরোগ।

৪০. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৪, পৃ—৯০।

৪১. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯০ দ্রষ্টব্য।

৪২. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯০ দ্রষ্টব্য।

৪৩. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯০ দ্রষ্টব্য।

৪৪. কাপড় > কানা, অর্থাৎ কাপড়ের টুকরোর কথা বলা হয়েছে।

৪৫. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৮, পৃ—৯৪।

৪৬. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯৪ দ্রষ্টব্য।

৪৭. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯৪ দ্রষ্টব্য।

৪৮. ‘দুরন্ত আশা’ কবিতায় কবি বাঙালীদের স্বভাব বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা করতে গিয়ে আলোচ্য মন্তব্য করেন।

৪৯. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-১০, পৃ—৯৬।

৫০. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-২৮, পৃ—১১৪।

৫১. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১১৪ দ্রষ্টব্য।

৫২. ‘দাদাবাবু’ দিদির বরকে এই এলাকায় দাদাবাবু সম্বোধন করে।

৫৩. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-২৪, পৃ—১১০।

৫৪. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১১০ দ্রষ্টব্য।

৫৫. ‘আগমণি-বিজয়ার’র পদগুলি শাক্তপদীর অন্যতম মধুর পদ। যেখানে ঘরের মেয়ে উমার চারদিন কৈলাসে মহেশ্বরকে ছেড়ে পিত্রালয়ে মেনকার ঘরে আসার কথা বলা হয়েছে।

৫৬. ‘অপু-দুর্গা’ চরিত্র দুটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসে রয়েছে।

৫৭. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-২৪, পৃ—১১০।

৫৮. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১১০ দ্রষ্টব্য।

৫৯. গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৬২, প্রকাশক ক্যালকাটা বুক হাউস, কলি-১২।

৬০. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য ১মখণ্ড, ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৬২, কলি-১২, পৃ—১৫৩।

৬১. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১৫৩ দ্রষ্টব্য।

৬২. নিজস্ব সংগ্রহ, পৃ—৪১০ দ্রষ্টব্য।

৬৩. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৪১০ দ্রষ্টব্য।

৬৪. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৪১০ দ্রষ্টব্য।

৬৫. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৪১০ দ্রষ্টব্য।

৬৬. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-২৮, পৃ—১১৪।

৬৭. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৫, পৃ—৯১।

৬৮. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-২৯, পৃ—১১৫।

৬৯. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১১৫ দ্রষ্টব্য।

৭০. নিজস্ব সংগ্রহ, পৃ—৪১৩ দ্রষ্টব্য।

৭১. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-২৮, পৃ—১১৪।

৭২. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১১৪ দ্রষ্টব্য।

৭৩. 'টম অ্যাণ্ড জেরি' হল জনপ্রিয় ধারাবাহিক ছোটোদের সিরিয়াল। ছোটোদের দুনিয়ায় এমন এপিসোডের জুড়িমেলা ভার।

৭৪. 'আইলা' হল নিম্নচাপ জনিত একধরণের অসম্ভব গতিসম্পন্ন ঝড়। যার গতি ছিল ঘন্টায় প্রায় ১০ কিলোমিটার। এই সাইক্লোনের ফলে অন্যান্য জেলা সহ গোটা দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

৭৫. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-২৯, পৃ—১১৫।

৭৬. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৮, পৃ—৯৪।

৭৭. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯৪ দ্রষ্টব্য।

৭৮. ব্যাপারী > ব্যাপারে-তে শব্দে পরিবর্তিত হয়েছে। যার অর্থ ব্যবসা বাণিজ্য করা।

৭৯. কপাল > কপা, এখানে অন্ত্যব্যাঞ্জনধ্বনি লোপ পেয়েছে।

৮০. 'ভানুমতি' কে নিয়ে নানা লোককথা প্রচলিত। যাইহোক এই ভানুমতি নামক কন্যাটি যে ক্রীড়া বিদ্যায় পটু ছিল এবং নানারকম খেল দেখাতে পারত, সে বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই।

৮১. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৮, পৃ—৯৪।

৮২. চিরুণীর মতো দাঁত যে নারীর তাকে চিরোলদাঁতি বলে। ফাঁকা দাঁত, সৌন্দর্যহীনা।

৮৩. 'চপরা' অর্থাৎ যার মধ্যে আসল বলে আর কোনো কিছু নেই, মন ও এখানে একেবারে ফাঁকা, শূন্য, যে মনে আর কোনো কথা নেই। অন্য অর্থে বীজহীন, খোসা।

৮৪. 'খপরা' অর্থাৎ সারবস্তু বলে আর কিছু নেই। 'খপরা'র পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত হাঁড়িটা ছিল গোটা একটা বস্তু, যার মূল্যায়ণ করা যায়, কিন্তু ভেঙে টুকরো টুকরো হওয়ায় তার আর 'খপরা' ছাড়া কিছু নেই।

৮৫. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৮, পৃ—৯৪।

৮৬. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৬, পৃ—৯২।

৮৭. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-২০, পৃ—১০৬।

৮৮. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-১৪, পৃ—১০০।

৮৯. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১০০ দ্রষ্টব্য।

৯০. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৫, পৃ—৯১।

৯১. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৯১ দ্রষ্টব্য।

৯২. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় ঐতিহ্যবাহক সাক্ষাৎকার সংখ্যা-২৩, পৃ—১০৯।

৯৩. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১০৯ দ্রষ্টব্য।

৯৪. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১০৯ দ্রষ্টব্য।

—ঃঃ—

অষ্টম অধ্যায়

প্রাপ্ত ছড়ার মোটিফ অন্বেষণ এবং তার গ্রহণযোগ্যতা বিশ্লেষণ।

'পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাপ্ত ছড়ায় লোকজীবন এবং সমাজচিত্রের পরিচয় অন্বেষণ এবং তার পর্যালোচনা' শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভের অষ্টম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় 'প্রাপ্তছড়ার মোটিফ অন্বেষণ এবং তার গ্রহণযোগ্যতা বিশ্লেষণ।' এই আলোচনায় আমরা প্রথমেই জেনে নেবো মোটিফ কাকে বলে ?

বিশ্বের অন্যতম লোকসংস্কৃতি গবেষক স্টিথ টমসন ছিলেন মোটিফ-ইনডেক্স গ্রন্থের প্রণেতা। ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৩৬ সালের মধ্যে টমসন মোটিফ-ইনডেক্সের তালিকা প্রকাশ করেন। টমসনের এই বিশ্ব বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 'মোটিফ-ইনডেক্স অব ফোক-লিটারেচার'।[১] টমসনের মতে, পৃথিবীর সমস্ত জনগোষ্ঠীতে লক্ষ-কোটি লোককথা ছড়িয়ে আছে। এদের অধিকাংশের উৎপত্তি হয়েছে মৌখিক ঐতিহ্য থেকে। প্রত্যেকটি লোককথার মধ্যে এক বা একাধিক মূল বিষয় আছে। এই মূল বিষয়কে বলে 'মোটিফ।'[২] Motif শব্দটি ফরাসী ভাষা থেকে আগত। অর্থাৎ একটি লোককথাকে ভেঙে কাহিনী-ব্যবচ্ছেদ করলে তার এক বা একাধিক কাহিনী অংশ পাওয়া যাবে, এই কাহিনী অংশ বা কাহিনী অংশসমূহকে টমসন বলেছেন মোটিফ। তিনি মোটিফ ইনডেক্সের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন,

"A motif in the smallest element in a tale having a power to persist in tradition. In order to have this power it must have something unusual and striking about it."[৩]

টমসন তাঁর গ্রন্থে লোককথার কাহিনীগুলিকে নিয়ে মোটিফের আলোচনা করেছেন। আমরা এই অধ্যায়ে পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাপ্ত লোকছড়াগুলির মোটিফ নির্ধারণ এবং তার গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ে আলোচনা করব। আমরা ইংরেজি অক্ষরের ডব্লিউ, এক্স ব্যতীত 'এ' থেকে জেড' পর্যন্ত অক্ষরগুলি নিয়েছি এবং মূল মোটিফগুলির নামকরণ

করেছি। এছাড়া টমসন তাঁর 'মোটিফ-ইনডেক্স অব ফোক-লিটারেচার' গ্রন্থের ভূমিকায় সংখ্যার বিষয়ে বলেন ঃ

"A numbering system was devised, remotely similar to that used by the Library of congress, so that the Index can be indefinitely expanded at any point. Every motif has a number indicating its place in the classification. The details of the system are not difficult." [8]

আমার সংগৃহীত ছড়ার মোটিফগুলি নিম্নে এইভাবে সাজানো হল ঃ

১. এ. শাশুড়ী-বউমা-ননদ-ভাসুর	৯. আই. জামাই	১৭. কিউ. জীবন ও প্রকৃতি
২. বি. শিশু	১০. জে. প্রেম	১৮. আর. পিঠেপুলি
৩. সি. জাতি-ধর্ম	১১. কে. প্রতিবাদ	১৯. এস. দেব-দেবী
৪. ডি. নিন্দা-প্রশংসা-অভিশাপ	১২. এল. খেলা	২০. টি. শাক-সব্জি
৫. ই. বিচিত্র বিষয়	১৩. এম. জাদু-বিশ্বাস	২১. ইউ. পশুপাখি
৬. এফ. সতীন ও বিবাহ	১৪. এন. আত্মীয়-স্বজন	২২. ভি. ভাই-বোন
৭. জি. অবৈধ সম্পর্ক	১৫. ও. শিক্ষা	২৩. ওয়াই. নারী-পুরুষের সম্পর্ক
৮. এইচ. রঙ্গ-রসিকতা	১৬. পি. বিধি-নিষেধ	২৪. জেড. জীবিকা

আমার এই তালিকাটি এমনভাবে করা হয়েছে, যাতে পরবর্তীকালে যদি নতুন মোটিভ পাওয়া যায়, তাও এই তালিকাভুক্ত করা যাবে। কারণ এ. থেকে জেড (ডব্লিউ এবং এক্স ব্যতীত) পর্যন্ত প্রতিটি মোটিফে সংখ্যা এবং প্রয়োজনে দশমিক চিহ্ন ব্যবহার করে নতুন মোটিফগুলিকে সংযোজিত করা যাবে। তাই তালিকাটি যতদূর সম্ভব বিজ্ঞান সম্মত এবং যথাযথ করার চেষ্টা করেছি। ছড়াসংক্রান্ত মোটিফের এই তালিকাটিতে আমাদের জীবন ও পরিবেশের সমস্ত দিকগুলি প্রায় রয়েছে, যার বাইরে আর কোনো বিষয় থাকতে পারে না। তাই বলা যায়, নতুন মোটিফ পাওয়া গেলেও কোনো অসুবিধা হবে না।

নিম্নে উপরোক্ত চব্বিশটি (ডব্লিউ এবং এক্স ব্যতীত) মোটিফের একটি করে ছড়া তুলে ধরা হল, এবং ছড়াগুলির টাইপ ও মোটিফ নির্ধারণ করা হল ঃ

১. এ. শাশুড়ী-বউমা-ননদ-ভাসুর

ছড়া ঃ বড়(অ) বউ বড় ঘরের ঝি

তারে আর বলব কী

মেজ(অ) বউ মজা কাটে

কথা কইনে ঝম্‌কি উঠে

সাজিয়া বউর মুখে পান

গুম্‌রি ভিতর্‌ কুটে ধান

ছোট(অ) বউ দুদের লাউ

তার্‌ দিয়া মোর জীবন থাউ

টাইপ ঃ বধূর শ্রেণী

মোটিফ ঃ

১. বড়(অ) বউ ঃ i) বড় বাড়ির মেয়ে

ii) নিন্দার উর্দ্ধে অবস্থান।

২. মেজ(অ) বউ ঃ i) মজা করে

ii) তার্কিক

৩. সেজ(অ) বউ ঃ i) পান-রাঙা-ঠোঁট

ii) অপ্রকাশিত নিষ্ঠুর স্বভাব

৪. ছোট(অ) বউ ঃ i) আহ্লাদি

ii) আশ্রয়ময় নির্ভরশীলতা

২. বি. শিশু ঃ শৃঙ্খলামূলক (শিশুক্রীড়া)

ছড়া ঃ এই ছেলেটা ভেল্‌ভেলেটা

খেলতে যাবি পয়সা পাবি

সীতাহরণ ছুটবি খালি

সীতার সাথে পালিয়ে যাবি

ধরা পড়লে ঠেঙ্গা খাবি

না পড়লে মিষ্টি পাবি।

টাইপ ঃ সহজ সরল ছেলে

মোটিফ ঃ

১. ভেলভেলে ছেলেটা

২. খেলার মাধ্যমে মিথ্যা উপার্জনের লোভ

৩. সীতাহরণ খেলা

৪. সীতার সাথে পলায়ন

৫. ধরা পড়ার শাস্তি ঃ ঠেঙ্গা

৬. ধরা না পড়ার পুরস্কার ঃ মিষ্টি পাবে

৩. সি. জাতি-ধর্ম বিষয়ক

ছড়া ঃ ভজহরি ডাক্তার
আগে ছিল মোক্তার
হয় যদি জ্বর-কাশি
খেতে দেয় পান্তা বাসি
হলে কারো অম্বল
দেয় চাপা কম্বল

টাইপ ঃ ভজহরি ডাক্তার

মোটিফ ঃ

১. মোক্তার ঃ বর্তমান ডাক্তার

২. রোগ ঃ জ্বর-কাশি

৩. পথ্য ঃ বাসি পান্তা

৪. রোগের নাম ঃ অম্বল

৫. প্রতিকার ঃ কম্বল চাপা

৪. ডি. নিন্দা-প্রশংসা-অভিশাপ

ছড়া ঃ খাঁদি কোল্‌কা পঁদি
খাঁদির বাড়ে লাউ
খাঁদিকে সাত শিয়ালে খাউ

টাইপ ঃ খাঁদি (খাটো নাক) বিষয়ক

মোটিফ ঃ

১. খেঁদা নাকের বিড়ম্বনা

২. কোল্‌কে ঃ নিন্দিত পশ্চাদ দেশ

৩. খাঁদির সব্জি বাগান ঃ লাউ

৪. অমঙ্গাল কামনা ঃ সাত শিয়াল (বাঘ) কর্তৃক খাঁদিকে ভক্ষণের অভিশাপ

৫. ই. বিচিত্র বিষয়

ছড়া ঃ গড়ের মাঠে দেখে এলাম
মশার পেটে হাতি
এমন খবর শুনেছ কি
হিচ্‌ড়ে পোয়াতি

টাইপ ঃ অবাস্তব ঘটনা

মোটিফ ঃ

১. স্থান ঃ গড়ের মাঠ

২. দর্শনীয় বিষয় ঃ i) মশা
ii) তার পেটে হাতি

৩. অজানা সংবাদ ঃ হিচ্‌ড়ে পোয়াতি

৬. এফ. সতীন ও বিবাহ

ছড়া ঃ সারাদিন গেল হেলা ফেলা
রাইত পাইনে সতীনের জ্বালা

টাইপ ঃ সংসারে সতীন

মোটিফ ঃ

১. সারাদিন ঃ ভাবনাহীন, সমস্যাহীন জীবন।

২. রাত্রিতে ঃ সতীন যন্ত্রণা, সমস্যাপূর্ণ জীবন।

৭. জি. অবৈধ সম্পর্ক

ছড়া ঃ ধান ঘাটু ঘাটু কন্যাগো হস্তে পাকা পান
বুকের মাঝে বিফল দুটি ব্রাহ্মণকে কর দান

ভাল বলেছ ব্রাহ্মণ ঠাকুর ভাল বলেছ তুমি

চোদ্দ বছর না জানি স্বামী

হাটের হাটানি বলে ওটি তোমার কে

লজ্জার খাতিরে পড়িয়া ওটি আমার ঠাকুরদা হে

টাইপ ঃ বৈধব্য (নারীর) জীবন

মোটিফ ঃ

১. কর্ম ঃ i) ধান শুকানো

ii) হস্তে পাকা পান

২. যৌবনাবতী ঃ ব্রাহ্মণের কু-দৃষ্টি

৩. ব্রাহ্মণের পরামর্শ ঃ চমৎকার

৪. চোদ্দ বৎসর ঃ বৈধব্য জীবন-যন্ত্রণা

৫. প্রশ্ন ঃ i) হাটের হাটানীর

ii) লোকটি কে ?

৬. লজ্জাজনক ঘটনা ঃ i) পরিচয়

ii) ঠাকুরদা বলে

iii) অসামঞ্জস্য সম্পর্ক

৮. এইচ. রঙ্গ-রসিকতা সমন্ধীয়

ছড়া ঃ যদি খেতে চাও বোঁদে

বাটি লিয়ে চলে যাও

ছাগলের পঁদে

টাইপ ঃ মিষ্টি খাওয়ার ইচ্ছা

মোটিফ ঃ

১. অভীষ্ট বস্তু ঃ বোঁদে

২. প্রয়োজনীয় পাত্র ঃ বাটি

৩. লক্ষ্য ঃ ছাগলের পশ্চাদ দেশ

৯. আই. জামাই

ছড়া ঃ এসো জামাই বসো খাটে

গা ধুয়ে আসো গেড়িয়াঘাটে

পিট্ ভাঙ্ব(অ) চ্যালা কাঠে

কাঁদবে শুদু মাঠে ঘাটে

টাইপ ঃ জামাই-এর আপ্যায়ণ (পরোক্ষ ঃ নিপীড়ন)

মোটিফ ঃ

১. জামাইকে আহ্বান ঃ পরে আপ্যায়ণ

২. স্নানের নির্দেশ ঃ পুকুরঘাটে

৩. নিপীড়ন ঃ i) শাসনদণ্ড, চ্যালা কাঠ

৪. ফলশ্রুতি ঃ i) কান্না

ii) ফাঁকা প্রান্তরে

১০. জে. প্রেম

ছড়া ঃ জলে যখন নেমেছি মাচ্ তো ধরবই

ভাল যখন বেসেছি বিয়ে তো করবই

টাইপ ঃ প্রতিশ্রুতি

মোটিফ ঃ

১. জলে নামা ঃ i) পরিণাম

ii) মাছ ধরা

২. ভালবাসা ঃ i) পরিণাম

ii) বিবাহ

১১. কে. প্রতিবাদ

ছড়া ঃ ঘর নাই দর বাঁদে

মাউগ নাই পোর তরে কাঁদে

টাইপ ঃ সংসারী হওয়ার ইচ্ছা (প্রচলিত সমাজ-প্রথা না মেনে)

মোটিফ ঃ

১. অসামঞ্জস্য ভাবনা ঃ ঘরহীন দর

২. অবিবাহিত জীবন ঃ দার পরিগ্রহ না করে পুত্র কামনা

১২. এল. খেলা

ছড়া ঃ বেলা রে বেলা

আমরা করি খেলা

ওই মেয়েটা বসে আছে

ওর কোনো বন্ধু নাই

ওঠো গো ওঠো

চোখের জ মোছ

আকাশ পানে চাও

যাকে ছুঁবে ছুঁয়

টাইপ ঃ খেলা বিষয়

মোটিফ ঃ

১. সম্বোধন ঃ বেলা রে বেলা

২. খেলা ঃ দলবদ্ধ

৩. বালিকা ঃ i) নিঃসঙ্গা

ii) বসে আছে

৪. জীবন ঃ বন্ধুতাহীন

৫. প্রাপ্তি ঃ বন্ধুত্ব

৬. দুঃখের অবসান ঃ অশ্রুহীন

৭. মুক্ত জীবন ঃ আকাশের মত

৮. স্পর্শ ঃ যাকে খুশি

১৩. এম. জাদু বিশ্বাস

ছড়া ঃ আমি হই ব্যায়া ম্যানা

মন্ত্র তন্ত্র আছে জানা

ভূত্ পেত্ শাকচুন্নী

বাক্স ভিত্রে করব বন্দী

টাইপ ঃ জাদু জ্ঞান

মোটিফ ঃ

১. পরিচয় ঃ ব্যায়া ম্যানা

২. শিক্ষা ঃ তন্ত্র-মন্ত্র জ্ঞান

৩. বিষয় ঃ ভূত-প্রেত-শাকচুন্নী

৪. জাদুবিদ্যার প্রয়োগ ঃ বাক্স ভিত্‌রে বন্দী

১৪. এন. আত্মীয়-স্বজন

ছড়া ঃ দিনে দিনে করিয়া

খাইলি মাসে

এক্কাদিনা পৌঁছি গেল

জঁ তিরিশে

টাইপ ঃ দুখীর দুঃখ-ই সার

মোটিফ ঃ

১. দিনযাপনের কৌশল ঃ দিন দিন করে মাস কাটানো

২. পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়া ঃ হঠাৎ করে তিরিশ জন অতিথির আগমন

১৫. ও. শিক্ষা বিষয়ক

ছড়া ঃ পেটের অসুখে ও. আর. এস.

ব্যবহার করতে যদি চাও

এক লিটার জলেতে

একটি প্যাকেট মিশাও

টাইপ ঃ রোগ নিরাময়

মোটিফ ঃ

১. লক্ষণ ঃ i) পেটের রোগ

ii) প্রতিকার ঃ ও. আর. এস.

২. ব্যবহারের ইচ্ছে

৩. পদ্ধতি ঃ এক লিটার জল

৪. মিশ্রণ ঃ এক প্যাকেট দিয়ে

১৬. পি. বিধি-নিষেধ সংক্রান্ত

ছড়া ঃ পড়াশুঁয়া করে যে

গাড়ি চাপা খায় সে

টাইপ ঃ পড়াশোনার বিপত্তি

মোটিফ ঃ

১. চর্চা ঃ পড়াশোনা

২. পরিণাম ঃ গাড়ি চাপা

১৭. কিউ. জীবন ও প্রকৃতি বিষয়ক

ছড়া ঃ গিমা শাগ্ বলেরে ভাই

আমি বড় তিতা

আমাকে যে ভাঙ্‌তে আইস্‌বে

মরা মাছের গুতা

টাইপ ঃ গিমার স্বীকারোক্তি

মোটিফ ঃ

১. বক্তা ঃ গিমা শাক্

২. স্বাদ ঃ তিতা

৩. গিমার ঃ রান্নায়

৪. প্রয়োজন ঃ মরা মাছ

১৮. আর. পিঠেপুলি

ছড়া ঃ ভাতকে টান টান

পিঠাকে খান খান

টাইপ ঃ আতিশয্য

মোটিফ ঃ

১. পারিবারিক অবস্থা ঃ ভাতের অভাব

২. বাড়াবাড়ি ঃ পিঠার বেলায় খান খান

১৯. এস. দেব-দেবী

ছড়া ঃ হারার মা রে হারার মা

রত্ দ্যাক্‌তে যাবু

পথে আছে ভাঙাঠাকুর

তাই দ্যাখ্‌তে পাবু

টাইপ ঃ রথদেখা

মোটিফ ঃ

১. সম্বোধন ঃ হারার মা রে

২. উদ্দেশ্য ঃ রথ দেখতে যাওয়া

৩. দর্শনীয় বিষয় ঃ ভাঙা ঠাকুর, জগন্নাথ

৪. প্রাপ্তি ঃ ঈশ্বর লাভ

২০. টি. শাক্-সব্জি

ছড়া ঃ লাতুন লাতুন লাতুন লো

শাগ্ তুইতে যাইলো

শাগে আছে বাওয়া পকা

তোর দাদু খাইলো

টাইপ ঃ রসিকতা (দাদুকে নিয়ে)

মোটিফ ঃ

১. সম্বোধন ঃ নাত্‌নীকে

২. পরামর্শ ঃ শাক্ তোলার

৩. স্থির বিশ্বাস ঃ শাকে বাওয়া পোকার অবস্থান

৪. রসিকতা নাত্‌নীর সঙ্গো ঃ দাদু পোকা খাবে

২১. ইউ. পশু-পাখি বিষয়ক

ছড়া ঃ টুনটুনি পাখি

নাচত দেখি

না বাবা নাচব না

পড়ে গেলে বাঁচব না

পড়েছি বেশ করেছি

তোর কি ক্ষতি করেছি

টাইপ ঃ টুনটুনির বৃত্তান্ত

মোটিফ ঃ

১. পাখির নাম ঃ টুনটুনি

২. পরামর্শ ঃ নাচার

৩. অস্বীকার ঃ না নাচার

৪. কারণ ঃ i) বিপদ

ii) পরিণামে মৃত্যু

৫. পরক্ষণে ঃ পড়ে যাওয়ার স্বীকারোক্তি

৬. ভাঙ্গো তবু মচ্কায় না ঃ কিচ্ছু না হওয়ার ভান

২২. ভি. ভাই-বোন

ছড়া ঃ দোল দোল দুলুনি

রাঙা মাথায় চিরুণী

বর আইস্‌বে যখুনি

লিয়ে যাবে তখুনি

বরের মাথায় ল্যাট্‌কাচুল

কনের মাথায় গেঁদা ফুল

টাইপ ঃ বিবাহিতা বোন

মোটিফ ঃ

১. বোন ঃ দোলনরতা

২. বিবাহিতা ঃ i) সিন্দুর রাঙা মাথা

ii) চিরুণী

৩. হঠাৎ আগমন ঃ বরের

৪. হঠাৎ প্রস্থান ঃ বোনকে নিয়ে

৫. বর দেখ্‌তে ঃ লম্বা চুলওয়ালা

৬. কনের সাজ ঃ মাথায় গাঁদা ফুল

২৩. ওয়াই. নারী-পুরুষের সম্পর্ক

ছড়া ঃ ভাতার বাপা তেলের কপা

সুরু ধানের খই
শুনরে ভাতার কানে কানে
মনের কথা কই

টাইপ ঃ সুখী দম্পতি

মোটিফ ঃ

১. প্রিয়জন ঃ i) স্বামী
ii) তেলের কপার মতো

২. তুলনীয় ঃ সুরু ধানের খই

৩. গোপনীয়তা ঃ স্বামী-স্ত্রীর কথাবার্তায়

৪. যা ব্যক্ত হবে ঃ হৃদয়ের কথা

২৪. জেড. জীবিকা

ছড়া ঃ আমার জল মিশানো দুদ নয় গো
দুদ মিশানো জল
একে খেলে ছেলে বুড়া
পায় শরীরে বল
এ দুদেতে পেতেই পার
কুচো চিংড়ি টিকে পনা
একে খেলে ফড়িং হয়
রাম গড়ুড়ের ছোনা
বিক্রি আছে কিনবে যদি
এসো আমার বাটিকা
নামেই আমায় সবাই চিনে
নামটি নয়া টিকা

টাইপ ঃ চালাক দুধ ব্যবসায়ী

মোটিফ ঃ

১. স্বগর্বে ঘোষণা ঃ i) জল মেশানো দুধ নয়
ii) দুধ মেশানো জল

২. পানীয় ঃ আবালবৃদ্ধবনিতার জন্যে

৩. খাদ্যগুণ ঃ বলবান হবে

৪. দুধে ভেজাল বস্তু ঃ কুচো চিংড়ি, টিকে পনা (ছোট্ট পনা)

৫. জাদুবিদ্যা প্রয়োগ ঃ বিজাতীয় হওয়া, গড়ুড়ের ছানা ফড়িং

৬. বেচাকেনার স্থান ঃ ব্যবসায়ীর বাড়ি

৭. পরিচয় ঃ নামের জন্যে

৮. নামটি ঃ নয়া টিকা

আলোচ্য অংশে আমরা 'বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন' এর মতো কেবল চব্বিশটি ছড়ার টাইপ ও মোটিফ নির্ধারণ করেছি। এভাবে সংগৃহীত সব ছড়ার টাইপ এবং মোটিফ নির্ধারণ হলে ভালো হত, তবে এক্ষেত্রে তা সম্ভব হল না, তাই সংগৃহীত ছড়ার 'এ' থেকে 'জেড' (ডব্লিউ এবং এক্স ব্যতীত) পর্যন্ত মোট চব্বিশটি মোটিফের চব্বিশটি ছড়ার উপরে টাইপ ও মোটিফ নির্ধারণ করা হল।

'প্রাপ্ত ছড়ার মোটিফ অন্বেষণ এবং তার গ্রহণযোগ্যতা বিশ্লেষণ' শীর্ষক গবেষণার এই অষ্টম অধ্যায়ের দ্বিতীয় বিষয়টি হল মোটিফের গ্রহণযোগ্যতা বিশ্লেষণ। এখন আমরা বর্তমান পরিস্থিতিতে এই মোটিফ কতখানি গ্রহণযোগ্য সে বিষয়ে দৃক্পাত করব।

১৯১০ সালে এন্টি আর্নে লোককথার শ্রেণী বিভাজন করতে গিয়ে টাইপ-ইনডেক্সের সঙ্গে সঙ্গে মোটিফের গুরুত্বও অনুভব করেছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি তাঁর টাইপ-ইনডেক্স গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছিলেন,

> "So far as possible a complete narrative has served as a basis for each type. It might also naturally be conceivable to work out a classification of seperate episodes and motifs, yet this would have necessitated such a cutting into pieces of all complete folktales that the scholar would be able to make a much more limited use of the classification." [৫]

গবেষণার সুবিধার্থে আমি বেছে নিয়েছি পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলের সীমানা। তাই আমার সংগৃহীত ছড়াগুলির উৎসস্থলও স্বাভাবিক কারণে এই এলাকাকেন্দ্রিক। অজ্ঞাতপূর্বকাল এই ছড়াগুলি আঞ্চলিকতায়, ভাষাবৈচিত্র্যে ও বৈশিষ্ট্যে, আঙ্গিকতায়

এখানকার হলেও আসলে তা সর্বজনীন, সর্বকালীন। বিশ্বের যেকোনো দেশের ছড়াকে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাবো, এর মধ্যে যে মানসিক অভিপ্রায় রয়েছে, যে নানান, সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক, ও নানা প্রকারের প্রেক্ষাপট রয়েছে সেই ছড়াগুলিতেও তাই রয়েছে। কেননা, ছড়াগুলি আঞ্চলিক হলেও সর্বজনীন। এর কারণ হিসেবে বলতে পারি, আমরা, আমাদের সংস্কৃতি, ভাষা-শিল্পকলা, লোকাচার-বিশ্বাস, অনুষ্ঠান, আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন হলেও প্রতিটি জন-গোষ্ঠীগত চেতনাবোধে সমধর্মী। আর সেইখানেই এর বিশ্বজনীনতা। এই বিশ্বজনীন মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে মোটিফ-ইনডেক্সের মধ্যদিয়ে। তাই ঐতিহাসিক—ভৌগোলিক, তুলনামূলক, মনোসমীক্ষণমূলক, জাতীয়তাবাদী প্রভৃতি পদ্ধতিগুলিকে মেনে নিয়েও বলতে পারি ছড়ার আলোচনায়, মোটিফ-ইনডেক্স্ পদ্ধতির যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

এই পদ্ধতিতে মানুষের অন্তরের অন্ধকার দিকগুলি, হৃদয়ের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি, খুব স্পষ্টভাবে উদ্ভাসিত হয়। যার মধ্যে প্রতিফলিত হয় জীবনের খণ্ড খণ্ড চিত্র। আর ছড়ায়ও তা প্রকাশিত। তাই ছড়ায় ব্যক্ত এই খণ্ড খণ্ড চিত্ররূপ মোটিফগুলি কালের প্রবাহে স্বাধীনভাবে নিজেদের অস্তিত্ব যেমন টিকিয়ে রেখেছে, ভবিষ্যতেও পরবর্তী প্রজন্মের কাছে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে নিশ্চয়ই পারবে, এদিক থেকেও মোটিফ ইনডেক্সের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাই এই পদ্ধতির গুরুত্বের কথা স্বীকার করে নিয়ে লোকসংস্কৃতিবিদ্ অ্যালান ডানডেসও বলেছেন,

> "এই সূচির হয়তো কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, কিন্তু এই সত্য কোনোভাবেই অস্বীকার করা যাবে না যে, টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্সের বিস্তৃত তালিকার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতির প্রসার, জনপ্রিয়তা ও অন্তর্নিহিত মানবিক সত্যের স্বরূপ উপলব্ধি করা যাবে। সুশৃঙ্খল শ্রেণিবিভাজন এখনও পর্যন্ত এই দুই পদ্ধতিতেই অনুশীলন করা হয়েছে। তাই লোকসংস্কৃতি বিশ্লেষণে এর উপযোগিতা ও প্রাসঙ্গিকতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছেন, International folklore indexes, all of which are extremely useful to the folklorist. Such indexes enable him to establish in a matter of moments that a given item collected from the folk is in fact a traditional item and they also provide some hint of the item's distribution and popularity. ।" [৬]

তাছাড়া, মোটিফ ইনডেক্সের মধ্যদিয়ে পুরাতন রীতি-নীতির কথা আমরা সহজে জানতে পারি। এখনেই এর গ্রহণযোগ্যতা। যেহেতু ছড়া মৌখিক ঐতিহ্যগুলির অন্যতম একটি ধারা, অজ্ঞাতপূর্বকালের, তাই এর সঠিক কাল নির্ধারণ সম্ভব নয়। কিন্তু ছড়ার বিষয়ের মধ্যে যে খণ্ড খণ্ড মোটিফ অংশগুলি রয়েছে, তা দিয়ে আমরা সমাজের সংস্কার-বিশ্বাস, রীতি-নীতি ইতিহাস বিষয়ে জানতে পারি। যেমন সমাজের 'পণপ্রথা' [৭] বিষয়টি। তবে এই পণ কন্যাপণ, বহুপূর্বে মাতৃতান্ত্রিক সমাজে প্রচলিত ছিল। তখনকার দিনে বিয়ে করলে মেয়েকে পন দিয়ে বিয়ে করতে হত। বর্তমানে ছেলেকে পণ দিয়ে বিয়ে করার রেওয়াজ। এই যে কন্যাপণের কথা তা আমরা একটি ছড়ায় পাই 'ঝি দুবুনি / পনে ফাটিবু'— মোটিফ-ইনডেক্স-এ আমাদের তখনকার সমাজের এই প্রাচীন রীতিটি ধরা পড়েছে। যা দিয়ে একটি বিশেষ কালকে বা বিশেষ সময়কে চিহ্নিত করতে পারি। আর এখানেই এই মোটিফ-ইনডেক্সের গ্রহণযোগ্যতা ও উপযোগিতা। তাই দিব্যজ্যোতি মজুমদার তাঁর 'বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ-ইনডেক্স' [৮] গ্রন্থে এই মোটিফ ইনডেক্সকে বলেছেন,—

> "এই পদ্ধতিকেই আমার সবচেয়ে মানবিক পদ্ধতি বলে মনে হয়েছে। লোক-ঐতিহ্যের মানসিক-মানবিক অভিপ্রায়ের সন্ধান মেলে এই সমন্বিত পদ্ধতির বিশ্লেষণে।" [৯]

'মোটিফ-ইনডেকস্ পদ্ধতির গ্রহণযোগ্যতা'—এই আলোচনা শেষ করব রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের অন্যতম প্রবক্তা জওহরলাল হাণ্ডু'র মোটিফের স্বরূপ বিশ্লেষণ সংক্রান্ত মন্তব্য দিয়ে। তিনি বলেছেন,

"Motif is a kind of a characteristics which is used in comparative method to trace common elements in folklore, more particularly oral narrative. Motif as a unit of classification at once suggests or measures the charecter (actor), the action and objects. Motif are generally believed to have diffused from one gregraphycal area to another is a genetically determined manner of in a manner which signifies borrowing. The motifs can be universal is a good possibility।" [১০]

প্রসঙ্গ নির্দেশ ও মন্তব্য ঃ

১. 'মোটিফ-ইনডেক্স্ অব ফোক-লিটারেচার' গ্রন্থটির রচয়িতা স্টিথ টমসন, প্রকাশি হয় ১৯৫৫-৫৮, প্রকাশক-ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটি প্রেস।

২. 'মোটিফ' শব্দটি ফরাসী ভাষা থেকে আগত। প্রত্যেকটি লোককথার একাধিক মূল বিষয় আছে, এই মূল বিষয়কে মোটিফ বলে।

৩. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দিব্যজ্যোতি মজুমদার, বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেকস্, ২০০৫, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলি-৩৭, প—৯।

৪. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১৫ দ্রষ্টব্য।

৫. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—৮ দ্রষ্টব্য।

৬. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—২১ দ্রষ্টব্য।

৭. 'পণপ্রথা' মেয়েকে পাত্রস্থ করতে কন্যার বিবাহকালে যৌতুক হিসেবে প্রদান করা হয়। পণপ্রথা নিয়ে লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত ছোটগল্প 'দেনাপাওনা' গল্পটি।

৮. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দিব্যজ্যোতি মজুমদার, বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেকস্, ২০০৫, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলি-৩৭, পৃ-২১। পরিশিষ্ট-১ চিত্রসংখ্যা—৬১ পৃ—৫৩৩ দ্রষ্টব্য।

৯. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১০ দ্রষ্টব্য।

১০. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ—১০ দ্রষ্টব্য।

—ঃঃ—

নবম অধ্যায়

একালে এই জাতীয় চর্চার প্রাসঙ্গিকতা বিচার।

যে-কোনো সাহিত্য-ই হোক্ না কেন, তার গুরুত্ব এবং প্রাসঙ্গিকতা তখন-ই অনুভূত হয়, যখন তার সঙ্গো থাকে সেই দেশের গভীর সম্পর্ক। দেশ ও দেশের জনজাতির নিবিড় সম্পর্ক যে সাহিত্যে ধরা পড়ে, সে সাহিত্য কালোতীর্ণ হয়ে ওঠে। মানুষের ভালো লাগা, মন্দ লাগা, কান্না-হাসির ইতিকথা ফুটে ওঠে সাহিত্যে। ছড়া-সাহিত্যও তেমন-ই এক সাহিত্য, যেখানে আছে সাধারণ মানুষের অতীত ইতিহাস। বহু প্রাচীনকাল থেকে ছড়া রচিত। অজ্ঞাতপূর্বকালের সেই ছড়াগুলির পাঠে আমরা জানতে পারি তৎকালীন সমাজ-সংস্কৃতি, মানুষের খাদ্য-বাসস্থান, পোষাক-পরিচ্ছদ, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি-শিল্পকর্ম প্রভৃতি যা আজ সমাজ বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। তাই একথাও বলতে পারি যে, সমাজ বিজ্ঞানের বিশ্লেষণেও অবশ্যই প্রয়োজন এই ছড়া-চর্চার প্রাসঙ্গিকতা।

অনেকের মনে এমনও ধারণা রয়েছে, ছড়া গ্রাম্য, নিরক্ষর, অশ্লীল, অমার্জিত জনগণের দ্বারা চর্চিত। তাই তার চর্চার কোনো প্রয়োজন নেই। তাকে যেন কোনো অন্ধকার দ্বীপে অনাদরে নির্বাসন করাই শ্রেয়। আবার অনেকের ধারণা ছড়া আমাদের মৌখিক ঐতিহ্য, আমাদের পিতা-মাতা, পিতামহ-মাতামহীদের প্রাণের অফুরন্ত সুর লহরী, যা আজও মনে দোলা দেয়, সুর প্রবাহে নিয়ে যায় মাটির কাছাকাছি আমাদের প্রিয় চির-শৈশবের ধূলি-ধূসরিত আঙিনার অতীত প্রভাতী-সুর মূর্চ্ছনায়। এই প্রিয় অপ্রিয়ের যৌথ মেলবন্ধনে ছড়া আজ বিশ্বের দরবারে নিজের অকূল পসরা মেলে দিয়েছে, যার স্বর্ণসায়রের সোনার ফসল তুলবার জন্য বহু কবি-সাহিত্যিক, লোকসংস্কৃতিবিদ্ গবেষক আজ ছড়া চর্চায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করে রেখেছে। আর এখানেই এর প্রাসঙ্গিকতা ও গুরুত্ব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে ছড়ার আলোচনা প্রসঙ্গো বলেছেন, "ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি। বহুকাল হইতে আমাদের দেশের মাতৃভাণ্ডারে এই ছড়াগুলি রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে;"[১] তাই এই জাতীয় সম্পত্তিগুলিকে আমাদের হৃদয়ের সুরভি ঢেলে সযত্নে লালন করতে হবে, কেননা এগুলি আমাদের জাতীয় ফসল। এই ফসলগুলিতে আছে অতীত প্রভাতী-সুর অতীত ইতিহাস, অতীত ঐতিহ্য। তাই ছড়া চর্চার প্রাসঙ্গিকতা আজও অটুট।

পূর্বে আলোচিত হয়েছে, ছড়ার বিষয় বহুবিধ। মানুষ থেকে শুরু করে পশু-পাখি, আকাশ-বাতাস, গ্রহ-তারা, কৃষি-মাটি, সভ্যতা-সমাজ, ঐতিহ্য-সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে ছড়ার পরিবার আজ মস্ত বড়, বিপুল বিশাল। এতসব বিষয় বস্তুর সমন্বয়ে ছড়া আজ তাই বহু আলোচিত ও চর্চিত। ছড়ার এই বিষয়বস্তুর মূল কেন্দ্রে যেহেতু মানুষ আছে, আছে তার বেড়ে ওঠার সকল প্রয়াস ও প্রচেষ্টা, আছে জীবন প্রবাহ, তাই তা একদিন, একবছর বা কেবল এককালীক হতে পারে না। তা কাল থেকে কালে, অতীত থেকে ভবিষ্যতে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের হাটে ক্রমাগত হেঁটে চলেছে। কোনো বাঁধা ধরা ফ্রেমে নয়, ছড়া উদার প্রকৃতির পল্লী-প্রান্তরে, কিশলয়ের দোদুল দোলায় আপন উল্লাসে ফল্গুধারার মতো স্বতস্ফূর্তভাবে প্রবাহিত। আর তাকে কেন্দ্র করে যুগে যুগে দেশে দেশে সাহিত্যিকগণ ভরিয়ে তুলেছে তাদের সৃষ্টি সুখের পসরা। তাই ছড়ার প্রাসঙ্গিকতার এখানেই সার্থকতা। এ প্রসঙ্গো বিখ্যাত সমালোচক Carvel Collins বলেছেন ঃ

"In this matter of dominant motif and over all structure, the perspective combining of folklore study and literary criticism has informaed the readers of countless other novels and poems... For example, Wiliam Troy's presentation of the Garden-of-Eden motif has enlightened readers of Jame's 'Portarit of a Lady'. The reader of Eliot's 'The Waste Land and Capote's other Voices, Other Rooms will go through those works with more perception if he knows of the studies which show their debt to 'Grail Legends' for motifs and structure... have helped critics and readers of Hemingway by bringing to bear on The Sun Also Rise's their knowledge of the folklore aspects of bullfight ritual." [২]

'একালে এই জাতীয় চর্চার প্রাসঙ্গিকতা বিচার' গবেষণার এই নবম অধ্যায়ে ছড়া চর্চার প্রাসঙ্গিকতার বিষয়ে বলা যায় যে, প্রসঙ্গা তো একা আসে না, অনেক কিছুকে সঙ্গো নিয়ে আসে। ছড়া চর্চার প্রসঙ্গোও তাই বলা যায়, এই বাংলা—রূপকথা, গীতিকথা, উপকথা, নীতিকথার দেশ, এই বাংলা 'কুমোর পাড়া গরুর গাড়ির দেশ', ধান গম যবের দেশ, সাম্য মৈত্রী ঐক্যের দেশ, এই বাংলা মহামারী দুর্ভিক্ষের দেশ, যুদ্ধ সংগ্রাম, দেশভাগ, স্বাধীনতার দেশ, শত শত কবি সাহিত্যিকের দেশ, ছড়ার দেহের প্রতিটি পলে পলে

তার-ই আঁচড়ের দাগ। সেই অক্ষত আঁচড়েই আছে এই বিপুল প্রবহমান জনজাতির জীবনপ্রবাহ। তা সে যে সাহিত্য-ই হোক্ আর যে কাল-ই হোক্, এদেশের এই বিস্তর রসভাণ্ডারের প্রগাঢ় রসদ্যুতি যে ছড়া চর্চার মধ্যে অব্যাহত থাকবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এ প্রসঙ্গে সাহিত্য সমালোচক টি.এস.এলিয়ট-এর মন্তব্যের বাংলা তর্জমা করে আশরাফ সিদ্দিকী বলেন,

> "প্রতি শতবর্ষ সময়সীমার ভেতর জাতীয় অতীত সাহিত্যের পর্যালোচনার ও পরিমাপের জন্য এক-একজন সাহিত্য-সমালোচকের আবির্ভাব হওয়া প্রয়োজন। তিনি কবি ও কাব্যের যথাযথ মূল্যায়ণ করবেন। এ বিপ্লব নয়-সংহতি স্থাপন। আমরা যা দেখি, মোটামুটি তা একই দৃশ্য। তাকে আলাদাভাবে এবং দূর চক্রবালে যখন আমরা দেখি, সামনে নতুন বিষয় অনুভূত হয়। এগুলোকে আমাদের কাল-চক্রবালের সাথে সঠিকভাবে সাজাতে হয়। যেখানে সব হয়ে পড়ে অদৃশ্য যার চোখ আছে এবং যিনি নিজে সমালোচক তাঁর থাকে শক্তিশালী দূরদৃষ্টি। তিনি এক নজরে সমস্ত দূরত্ব মাপতে পারেন, তিনি দৃশ্যপটের সবকিছু বুঝেন, তুলনামূলক বিচার করতে পারেন, তিনি চারদিকের সবকিছু কালের প্রেক্ষিতে অবলোকন ও মূল্যায়ন করতে পারেন।"[৩]

অতীতের সঙ্গে বর্তমানের মেলবন্ধনে আজকের এই ছড়া চর্চার প্রাসঙ্গিকতা এবং প্রয়োজনীয়তা উভয়ই তাৎপর্যপূর্ণ। আজকের দিনে বসে ভাবতেই পারি না, অতীতে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ছিল, পুরুষতান্ত্রিক নয়, তার প্রমাণ ছড়াতে রয়েছে—

ঝি দুবুনি
পণে ফাটিবু

সেই সঙ্গে সতীন প্রথা, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি অতীত ঘটনাবলীর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ছড়া। বর্তমানের আলোকে অতীত নিরীক্ষণ, সেইসঙ্গে জাতীয় চেতনার, দেশাত্মবোধ জাগরণে, ভারতবর্ষের ঐক্য স্থাপনে ছড়াচর্চা যে অপরিহার্য শুধু তাই নয়, প্রয়োজনও। তাই অতীতকে ফিরে ফিরে দেখতে হয়। এ প্রসঙ্গে আশরাফ সিদ্দিকীর মন্তব্যটি স্মরণযোগ্য

> "... বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবন রচনার ভার যাদের ওপরে তাঁরা যে এ সম্পর্কে অবহিত নন তা নয়, তবু মাঝে মাঝে এ কথাগুলো স্মরণ করার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করি।"[৪]

ছড়া চর্চার প্রাসঙ্গিকতা প্রসঙ্গে বলা যায়, ছড়ার আলোচনায় দুই ধরণের মতবাদের অস্তিত্ব পাওয়া যায়—

১। Diachronic বা পুরাতনপন্থী

২ ।Synchronic বা নব্যপন্থী

ছড়া চর্চার প্রসঙ্গে এই দুই পন্থীদের প্রাসঙ্গিকতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। Diachronic বা পুরাতনপন্থীগণ মনে করেন, ছড়া বর্তমানে আর রচিত হয় না। ছড়া রচনার কাল শেষ। ছড়ার জন্য নির্দিষ্ট অতীতকাল-ই যথাযথ। কিন্তু Synchronic বা নব্যপন্থীগণ মনে করেন, ছড়া পূর্বের ন্যায় আজও রচিত হচ্ছে, আগামীদিনেও রচিত হবে। যতদিন সংহত সমাজ থাকবে, মানুষের প্রবৃত্তিগুলো বেঁচে থাকবে, ততদিন রচিত হবে ছড়া। অনেকের মতে আবার ছড়া শুধু গ্রামে রচিত হয়, শহরে নয়। আসলে গ্রাম বা শহর নয়, ছড়ার উৎস মানবভূমি। গোষ্ঠীবন্ধ মানুষ যেখানে থাকে তা গ্রাম বা শহর যাইহোক্ না কেন সেখানে রচিত হবে ছড়া। তাই ছড়ার ধারা প্রবহমান, তাই তার প্রাসঙ্গিকতা ও সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

ছড়ার বিষয়বস্তু বহুবিধ। বর্তমানে বহুক্ষেত্রে সরকারী নানা কর্মসূচীর জন্যও ছড়ার ব্যবহার ঘটছে। যথা— পোলিও, সর্বশিক্ষা অভিযান, স্বাস্থ্যবিধি অভিযান, নির্মল বাংলা দিবস, স্বচ্ছ ভারত, সেভ ড্রাইভ সেফ লাইফ, এছাড়া যাত্রা-নাটকের বিজ্ঞাপন, সোনার গহনার বিজ্ঞাপন প্রভৃতিতে ছড়ার প্রয়োগ ছড়া চর্চাকে নবতর মাত্রায় ভূষিত করছে। এ প্রসঙ্গে বর্তমানের কয়েকটি সংগৃহীত ছড়া হল ঃ

১। মহিলা সমিতি কর / পাড়ায় পাড়ায় মিছিল কর্ (নারী সচেতনতা)

২ ।সর্বশিক্ষা দিচ্ছে ডাক / প্রতিটি শিশু শিক্ষা পাক (সর্বশিক্ষা অভিযান)

৩ ।পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখব / নির্মল বাংলা গড়ব (নির্মল বাংলা)

৪ ।জীবন যখন একটু ভারি / হালকা সোনা মন বাহারি (সোনার বিজ্ঞাপন)

৫ ।কন্যাশ্রী দিচ্ছে ডাক / মেয়ে হওয়া তো আশীর্বাদ (কন্যাশ্রী প্রকল্প)

৬ ।পাম্পে আছে উদ্যম / বিদ্যুৎ লাগবে কম (পেট্রলের বিজ্ঞাপন)

দিন বদলেছে, চিন্তাধারা অভিমতেরও পরিবর্তন ঘটেছে। আজকের সমাজ তথা নাগরিক মনও নতুন নতুন ছড়া তৈরী করছে, তবে হয়তো অন্যভাবে অন্যরূপে। পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলকে কেন্দ্র করে একই ভৌগোলিক অবস্থানে থাকা

জনপদবাসীদের জীবনালেখ্য ঘিরে যে লোকছড়া, সেই লোকছড়া-ই আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভের মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। যে কারণে ছড়ার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই নবম অধ্যায়ের 'একালে এই জাতীয় চর্চার প্রাসঙ্গিকতা' কোনো অংশেই কম মূল্যহীন নয়, বরং ছড়া বর্তমানে পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি জনসংযোগকারী ও বিজ্ঞাপনমুখী হয়ে উঠেছে। ছড়ার সুর এবং ছন্দ মানুষকে অনেক বেশি আকর্ষণ করে। এমনি বক্তব্য বিষয় মানুষের কাছে যা না গ্রহণীয় হয়, তার চেয়ে ছড়ার আঙ্গিকে কোনো বিষয় অনেকবেশি গ্রহণীয় ও স্মৃতিবাহক হয়ে ওঠে। এই অধ্যায়ের আলোচনায় একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, অতীতের ন্যায় ছড়ার গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা এবং প্রাসঙ্গিকতা বর্তমান জীবনেও অনেকবেশি দামী হয়ে উঠেছে।

একথা অনেকেই মনে করেন, শিল্প সভ্যতা, নাগরিকতা শহর বিলাসী সভ্য-ভব্য জীবনে লোকসাহিত্য দূর নীহারীকার এক অনুজ্জ্বল আলোকবর্তিতা। সেখানে শিক্ষিত, অতি-আধুনিক মনস্ক মানুষজনের কাছে এমন গ্রাম্য, নিরক্ষর ব্রাত্য লোকভাবনার কর্দমাক্ত ফসলের কোনো জায়গা নেই। কিন্তু দিন ও সময় পরিবর্তনের সঙ্গো সঙ্গো শিল্পসভ্যতার সমৃদ্ধির কারণে শহরে আজ বহু শ্রমিকের মাথা গোঁজার ঠাঁই হয়েছে। কাতারে কাতারে মানুষ আজ শহরমুখী। তাই শহর শুধু শহর নয়, খেটে-খাওয়া শ্রমিক অধ্যুষিত জনগোষ্ঠীর আবাসস্থল ও কর্মস্থল। শহর তার শারিরীক আকৃতিতেও বিস্তারলাভ করেছে। এর কারণে লোকসাহিত্য, যা ছিল শুধু গ্রামকেন্দ্রিক, আজ সে শহুরে জীবনের পাশে নিজের স্থান তৈরী করে নিয়েছে।

লোকসাহিত্যিকগণ ও তাই, যে লোকসাহিত্যের ফসল তুলবার জন্য কেবল গ্রামকেন্দ্রিক নিরক্ষর অশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত খেটে খাওয়া শ্রমিক কৃষকজনের কাছে দৃষ্টি দিতেন, আজ তাঁরা তাঁদের ভাবনার দৃষ্টিকে শহরে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়েছেন। তাতে হয়তো নাগরিক মনের সবটাতে লোকসাহিত্যিকগণ পৌঁছাতে পারেন নি, তবে চেষ্টার কোনো ফাঁকও রাখেন নি। তাই লোকসাহিত্যের এই অন্যতম ধারা ছড়াও আজ শুধু, অতীত কল্পনা নয়, ভবিষ্যতের মাইলস্টোন। শহুরে অস্থিরতা, ব্যস্ততাময় যান্ত্রিক জীবনে ছড়া তার তরবারি শানিয়ে রেখেছে। ডিজিটাল ও কম্পিউটারের দুনিয়ায় ও ছড়া তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবে নিশ্চয়। এমন একদিন হবে মানুষ কম্পিউটারে ছড়া শুনবে, একে

অপরকে কম্পিউটারের সাহায্যে ছড়া পাঠাবে, আলোচনা করবে। ভার্চুয়াল লাইফে ছড়া ও ভার্চুয়ালি দশজনের কাছ থেকে বহুজনের কাছে পৌঁছে যাবে সে বিষয়ে কেনো সন্দেহ নেই। আর একথাও ঠিক যে, সাধারণ খেটে খাওয়া গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষদেরকে আমরা, জীবন থেকে একেবারেই ছেঁটে ফেলে দিতে পারি না। কেননা, বাঁচার জন্য নাগরিক শহুরে মানুষদের এই পলিমাটির স্রোতে বেড়ে ওঠা কৃষক শ্রমিকদেরকে চিরকাল-ই প্রয়োজন হবে। তাই তারা থাকলে ছড়া তথা লোকসাহিত্য ও অক্ষুন্ন থাকবে। দেশ, গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র যে যে পথেই হাঁটুক না কেন, মাটির বরপুত্র এই সাধারণ মানুষদের কখনই উপেক্ষা করা সম্ভব হবে না। সে কারণেই এই সব লোক ঐতিহ্যও অন্তসলিলা ফল্গুধারার মত বহমান অবশ্যই থাকবে।

পরিশেষে বলা যায়, ছড়া সাহিত্য তাই কোনো রকমে টিকে আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে না, এমন ভাববার কোনো কারণ নেই। গোটা বিশ্বের গবেষকগণ যেভাবে এই সাহিত্য নিয়ে প্রতিমুর্হূতে গবেষণা করছেন এবং নতুন নতুন উদ্ভাবন করেছেন তাতে ছড়া তার আসন আগামীতেও যে অখণ্ড রাখবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এ প্রসঙ্গে মযহারুল ইসলামের 'ফোকলোর পরিচিতি ও পঠন-পাঠন'[৫] গ্রন্থের মন্তব্যটি উল্লেখ করে এই আলোচনার ইতি টানবো—

"সুতরাং শিল্পোন্নত সমাজ ও নগর সভ্যতাকেন্দ্রিক সংস্কৃতি গড়ে উঠলেই আধুনিক বা ভবিষ্যৎ বিশ্ব থেকে ফোকলোর বিদায় গ্রহণ করবে, একথা ভেবে আশঙ্কিত হবার কোনো কারণ দেখি না। সমাজ ও সভ্যতার পরিবর্তনের সাথে সাথে ফোকলোরের মেজাজ ও চরিত্রেও সেই পরিবর্তন সূচিত হবে—ঐতিহ্যও সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটলে ফোকলোরের বিচিত্র ক্ষেত্রেও সেই রূপান্তরের প্রতিফলন ভাস্বর হবে। ফোকলোর সমাজেরই সৃষ্টি। সমাজ অবিনশ্বর। ফোকলোরও তাই মানব সভ্যতায় অবিনশ্বর সম্পদ ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।"[৬]

মন্তব্য ও প্রসঙ্গ নির্দেশ ঃ

১। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোকসাহিত্য, প্রকাশক-বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ২০০৪, কলি-১৭, পৃ-৪৯।

২। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য আশ্‌রাফ সিদ্দিকী, লোক-সাহিত্য, ২য় খণ্ড, প্রকাশক-নয়া উদ্যোগ-২০১৩, কলি-৬, পৃ-২৫৯-২৬০।

৩। পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-২৬১, দ্রষ্টব্য।

৪। পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ-২৬১, দ্রষ্টব্য।

৫। বিস্তারিত বিবরণের জন্য পরিশিষ্ট চিত্রসংখ্যা—৬২, পৃ—৫৩৪ দ্রষ্টব্য।

৬। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য মযহারুল ইসলাম, ফোকলোর পরিচিতি ও পঠন-পাঠন, প্রকাশক—অবসর প্রকাশনা সংস্থা,-১৯৬৭, ঢাকা-১১০০, প—৪২৪।

—ঃঃ—

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১.

গবেষণা অভিসন্দর্ভের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক চিত্র ও তথ্যাবলী।

চিত্রসংখ্যা—১

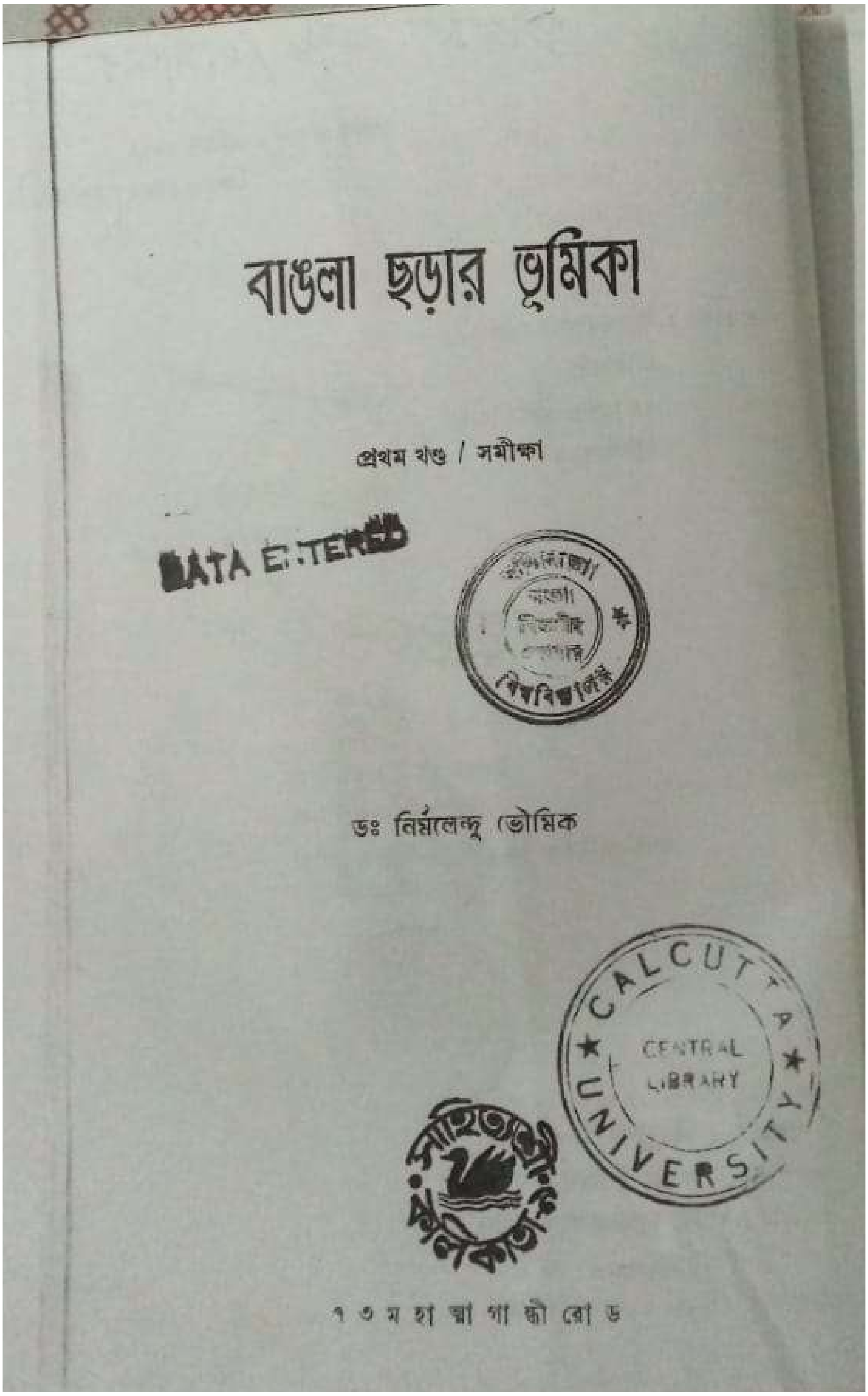
বাঙলা ছড়ার ভূমিকা

প্রথম খণ্ড / সমীক্ষা

DATA ENTERED

ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক

CALCUTTA UNIVERSITY
CENTRAL LIBRARY

৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড

নির্মলেন্দু ভৌমিক রচিত ‘বাঙলা ছড়ার ভূমিকা’ গ্রন্থের নামপত্রের প্রতিলিপি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য প্রথম অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-১, পৃ—৩৩।

চিত্রসংখ্যা—১.ক

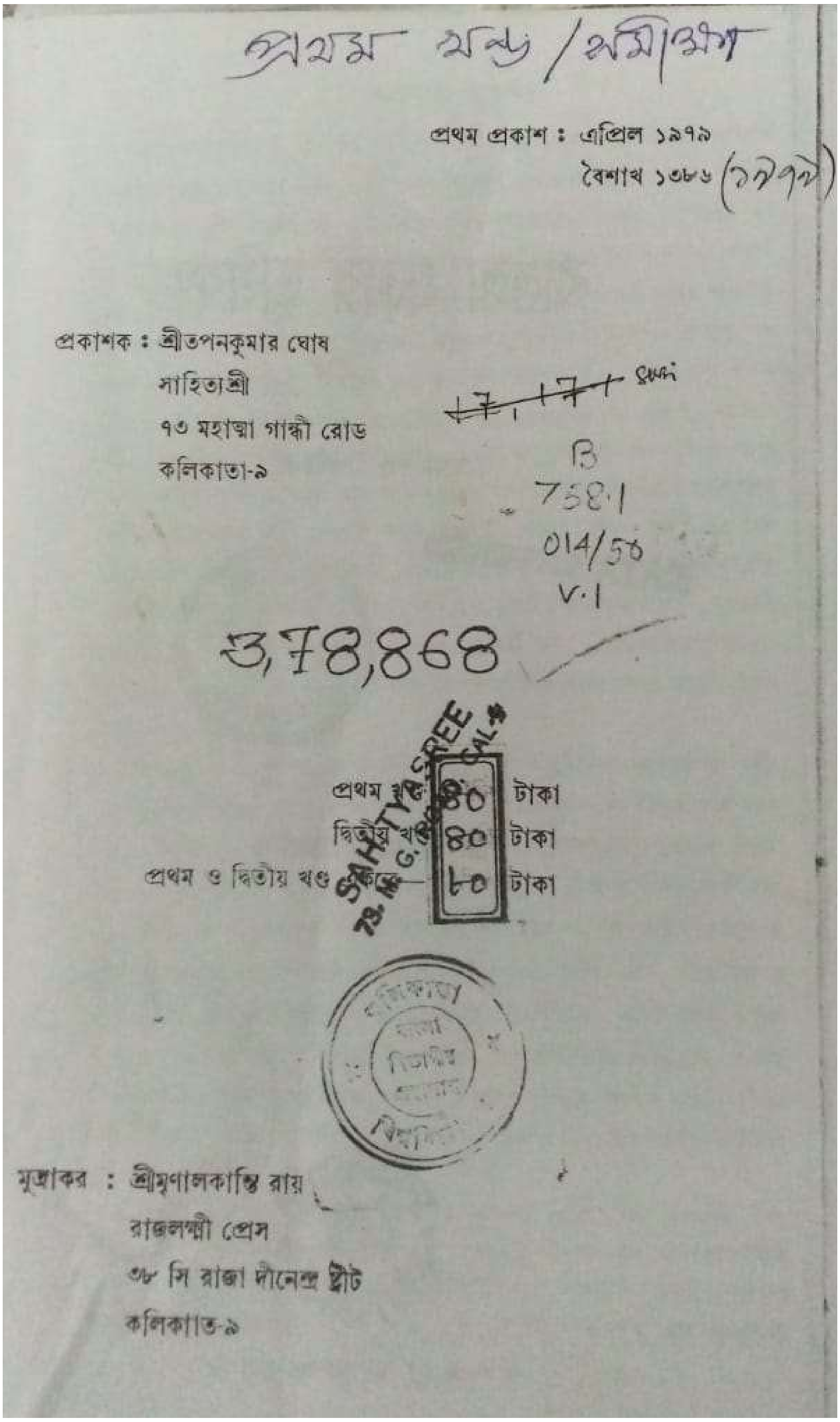
প্রথম খণ্ড / অমীমাংসা

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৭৯
বৈশাখ ১৩৮৬

প্রকাশক : শ্রীতপনকুমার ঘোষ
সাহিত্যশ্রী
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

B
758.1
014/56
V.1

3,78,868

SAHITYASREE
73, M. G. ROAD, CAL-9

প্রথম খণ্ড ৪০ টাকা
দ্বিতীয় খণ্ড ৪০ টাকা
প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে ৮০ টাকা

মুদ্রাকর : শ্রীমৃণালকান্তি রায়
রাজলক্ষ্মী প্রেস
৩৮ সি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

চিত্রটি ‘বাঙলা ছড়ার ভূমিকা’ গ্রন্থের প্রতিলিপি। নির্মলেন্দু ভৌমিক রচিত ‘বাঙলা ছড়ার ভূমিকা’ গ্রন্থ থেকে গৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য প্রথম অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-১, পৃ-৩৩।

চিত্রসংখ্যা—২

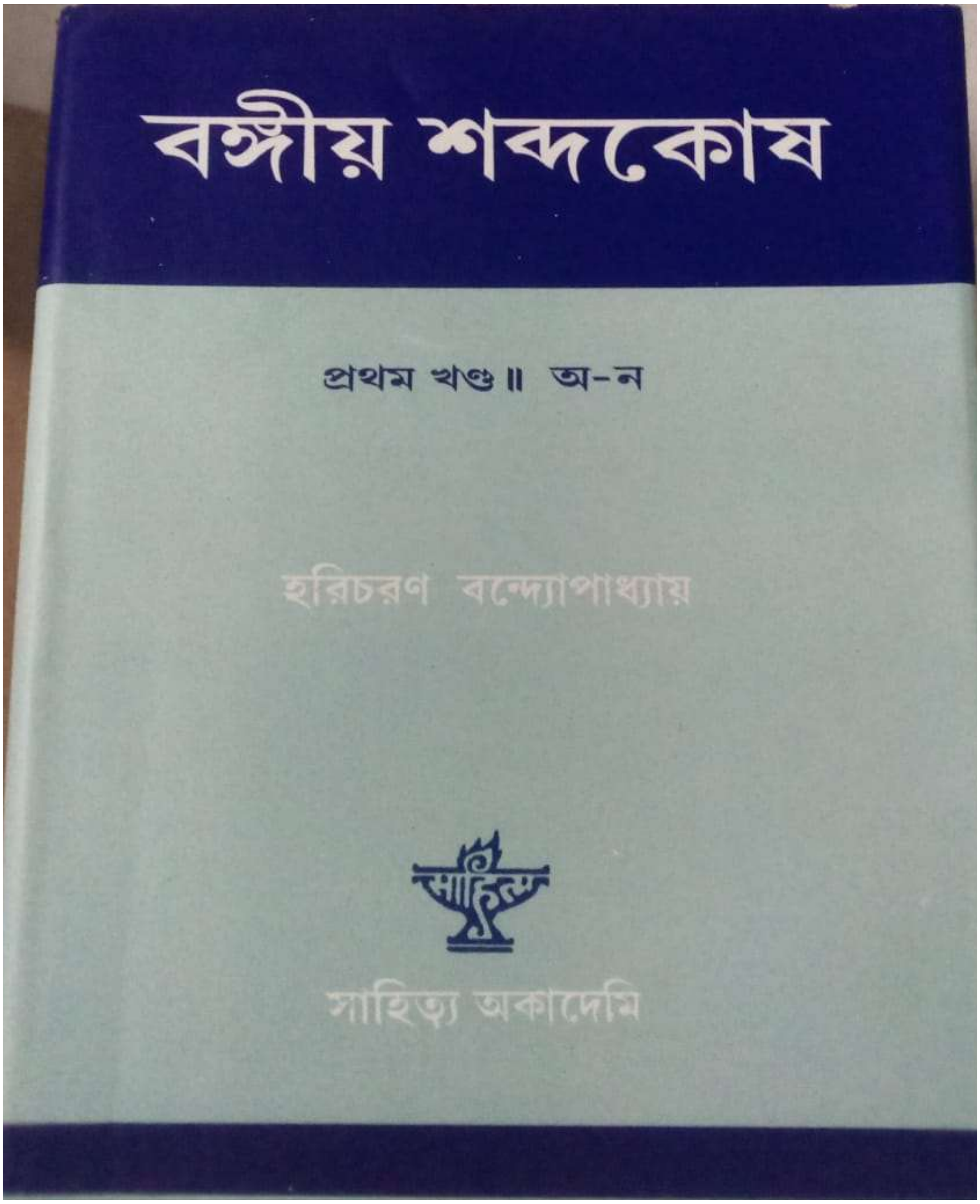

চিত্রটি হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' ১ম খণ্ড অভিধানের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য প্রথম অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-১৩, পৃ-৩৪।

চিত্রসংখ্যা—৩

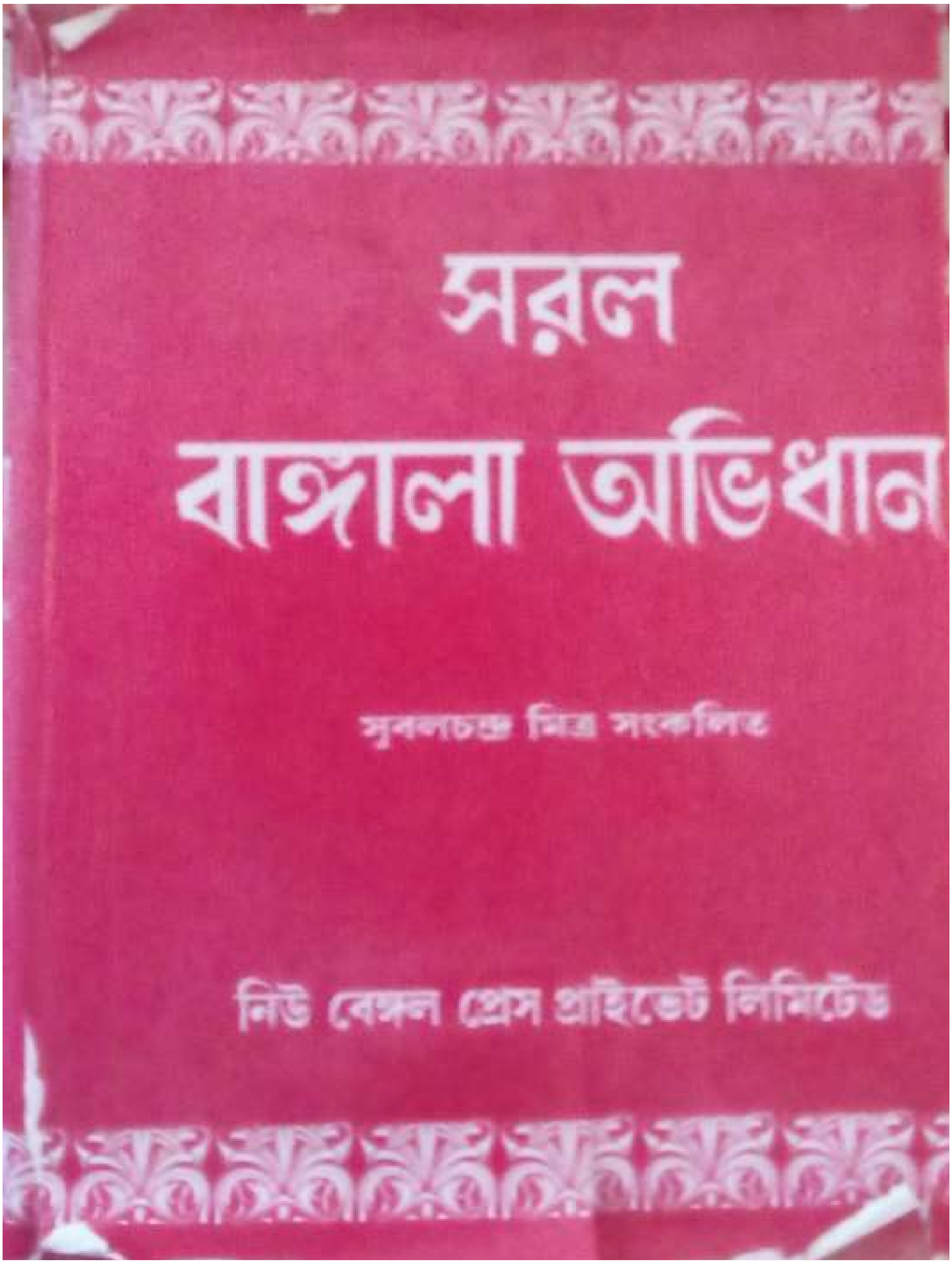

চিত্রটি সুবলচন্দ্র মিত্র সংকলিত 'সরল বাঙ্গালা অভিধান' গ্রন্থের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য প্রথম অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-১৪, পৃ-৩৪।

চিত্রসংখ্যা—৪

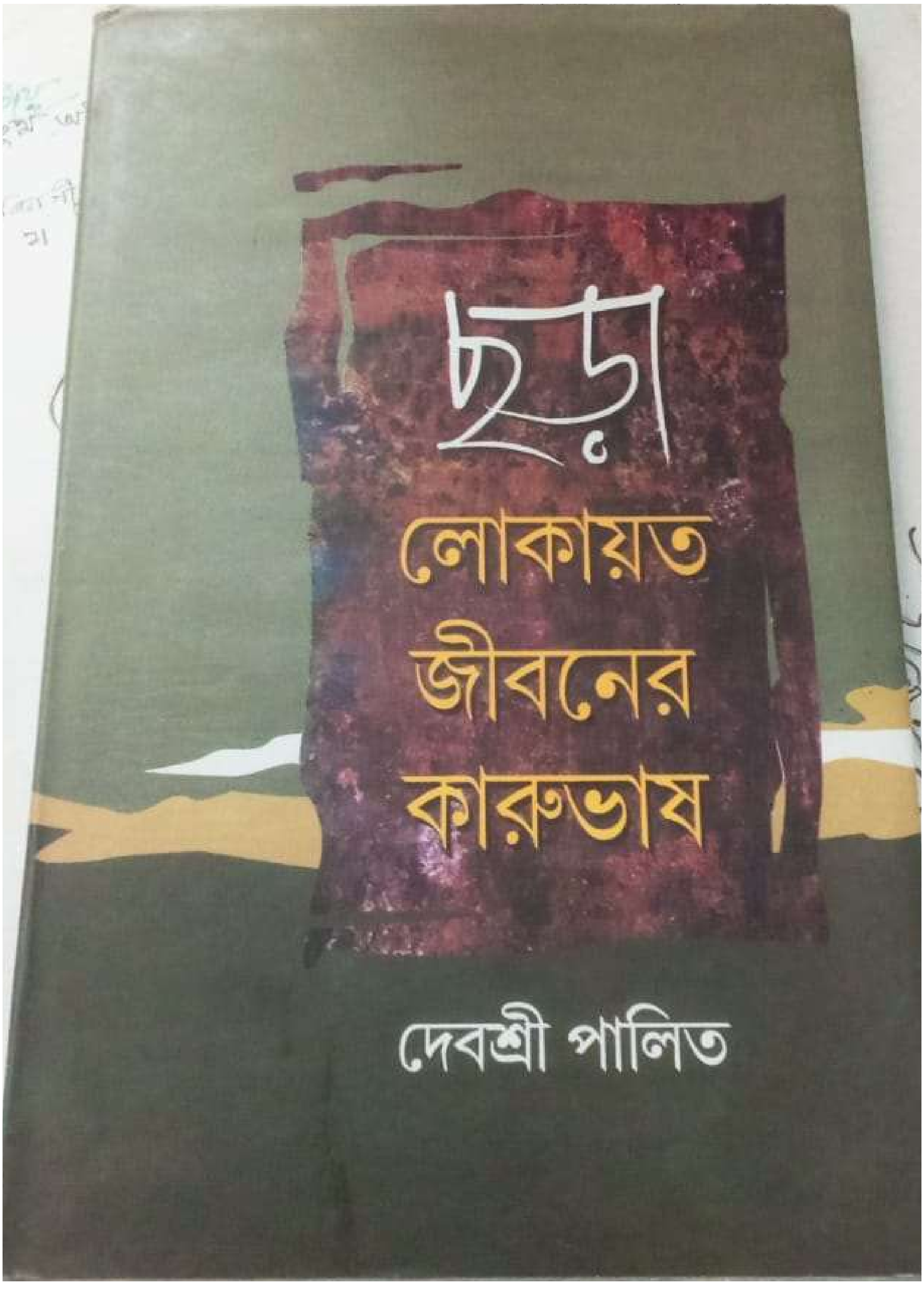

চিত্রটি দেবশ্রী পালিত রচিত 'ছড়া লোকায়ত জীবনের কারুভাষ' গ্রন্থের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য প্রথম অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৩০, পৃ-৩৫।

চিত্রসংখ্যা—৫

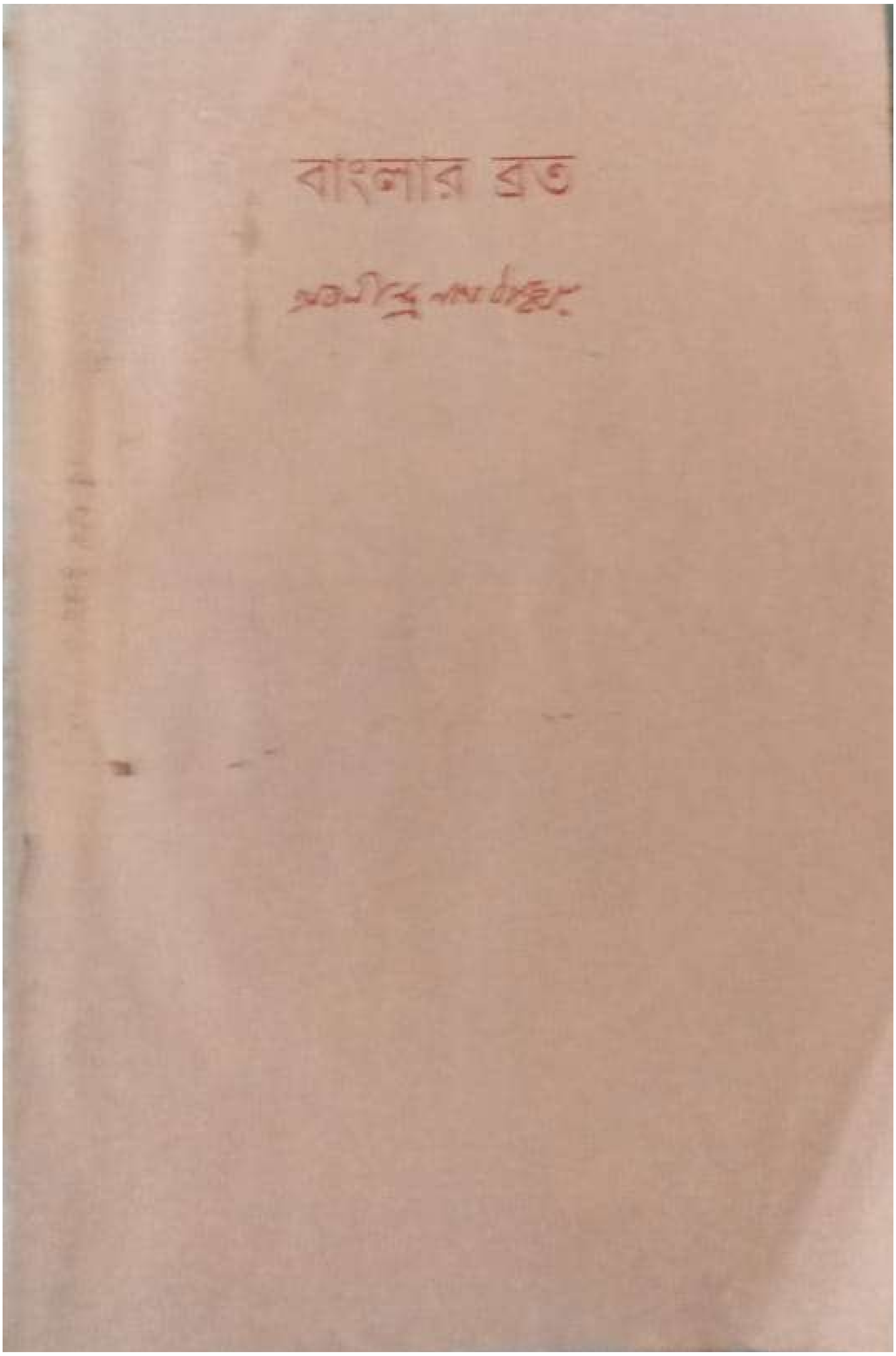

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ‘বাংলার ব্রত’ গ্রন্থের প্রচ্ছদপত্রের ফটোকপি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য প্রথম অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৭৯, পৃ-৩৮।

চিত্রসংখ্যা—৬

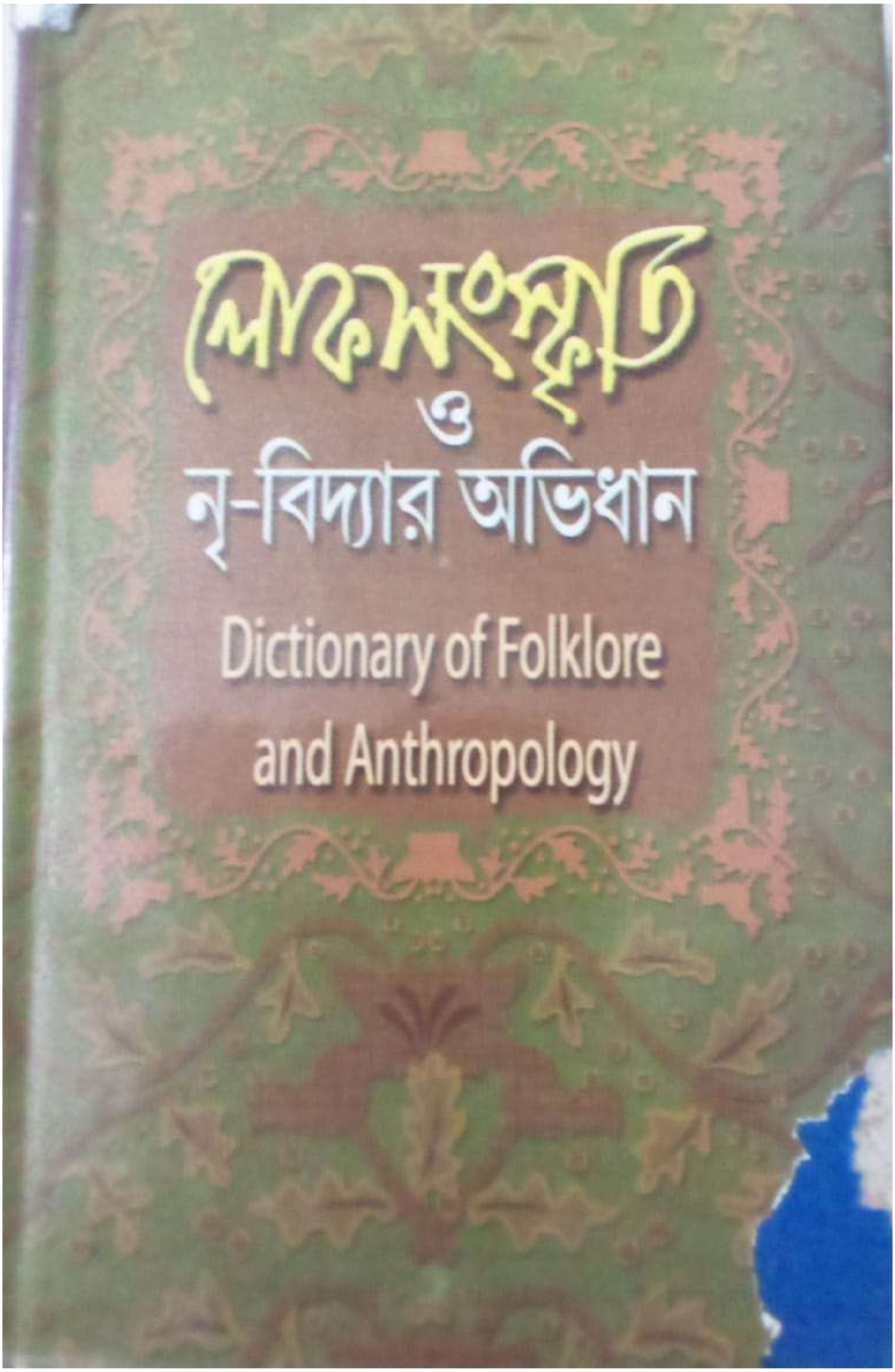

বরুণকুমার চক্রবর্তী রচিত 'লোকসংস্কৃতি ও নৃ-বিদ্যার অভিধান' গ্রন্থের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য প্রথম অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৯৬, পৃ-৩৯।

চিত্রসংখ্যা—৭

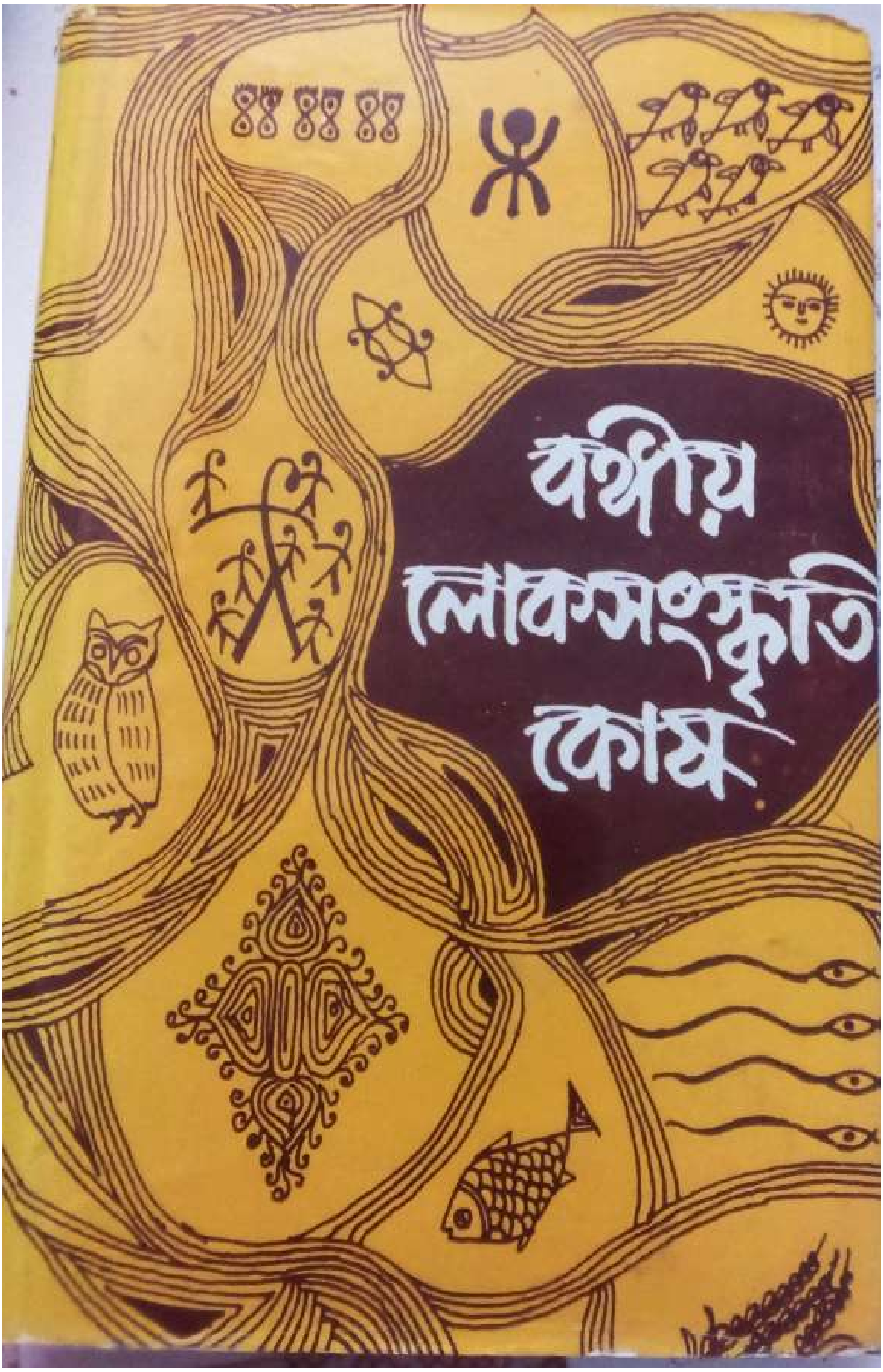

বরুণকুমার চক্রবর্তী রচিত 'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ' গ্রন্থের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য প্রথম অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৯৭, পৃ-৩৯।

চিত্রসংখ্যা—৮

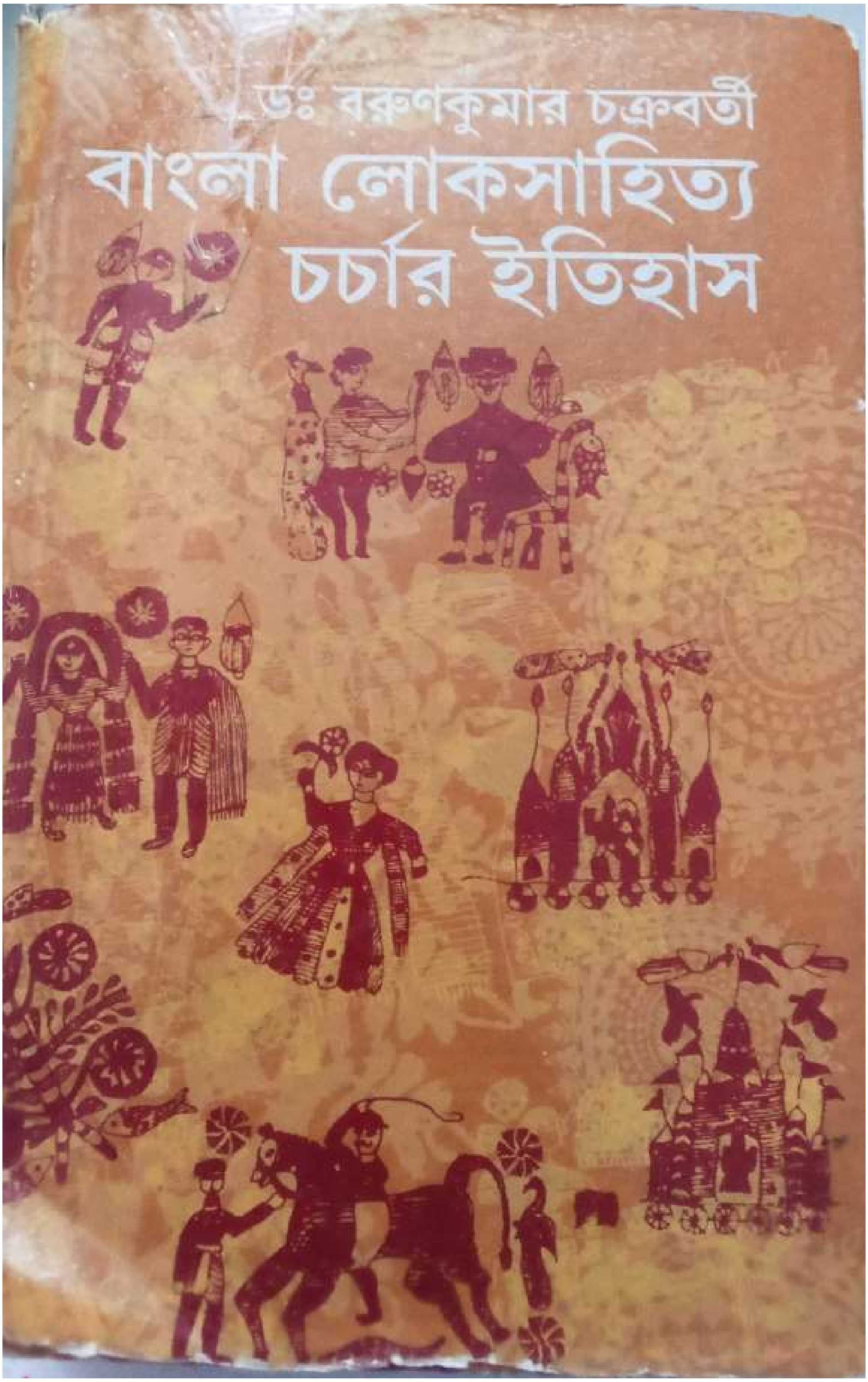

চিত্রটি বরুণকুমার চক্রবর্তী রচিত 'বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস' গ্রন্থের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য প্রথম অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৯৮, পৃ-৩৯।

চিত্রসংখ্যা—৯

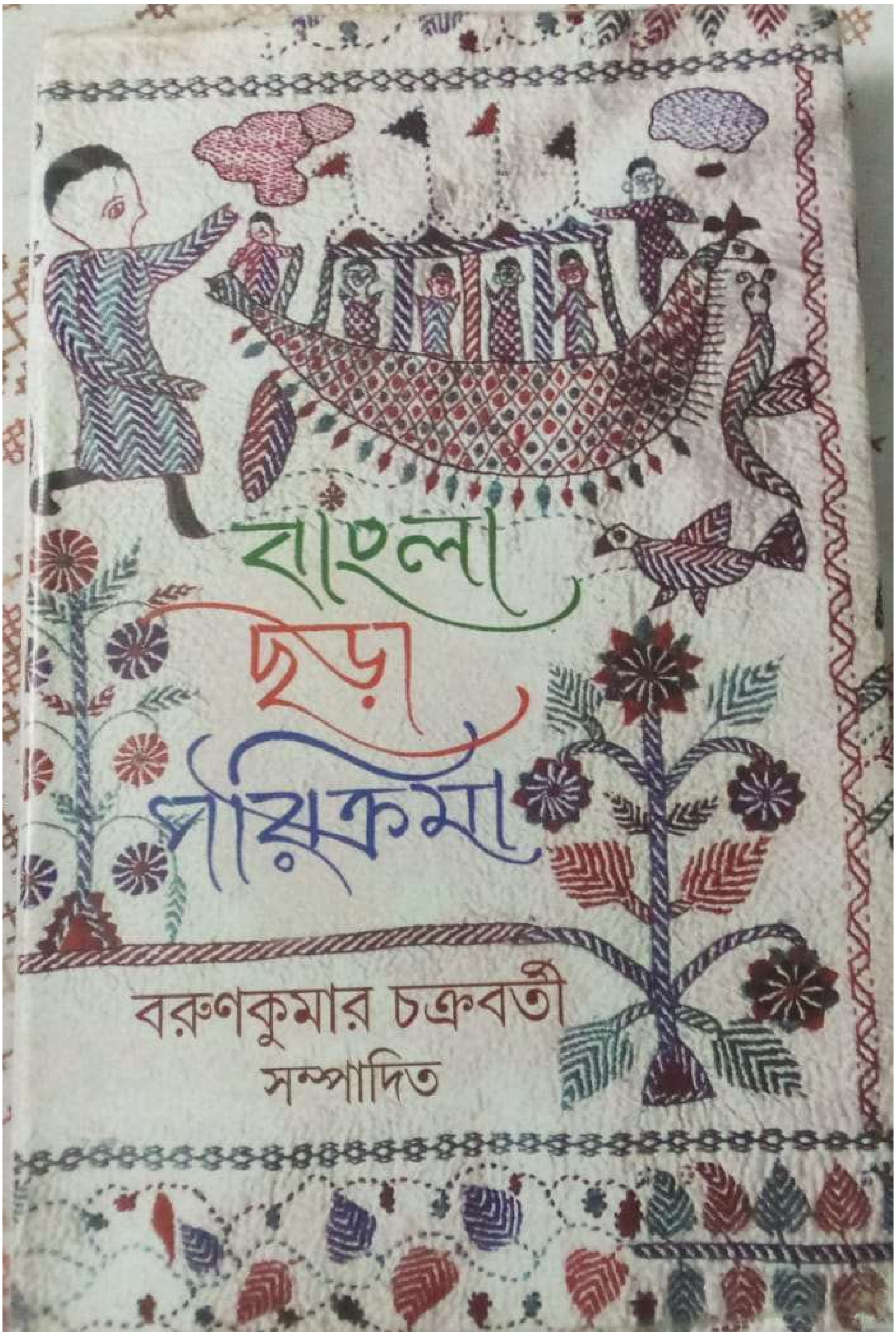

বরুণকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত 'বাংলা ছড়া পরিক্রমা' গ্রন্থের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য প্রথম অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৯৯, পৃ-৪০।

চিত্রসংখ্যা—১০

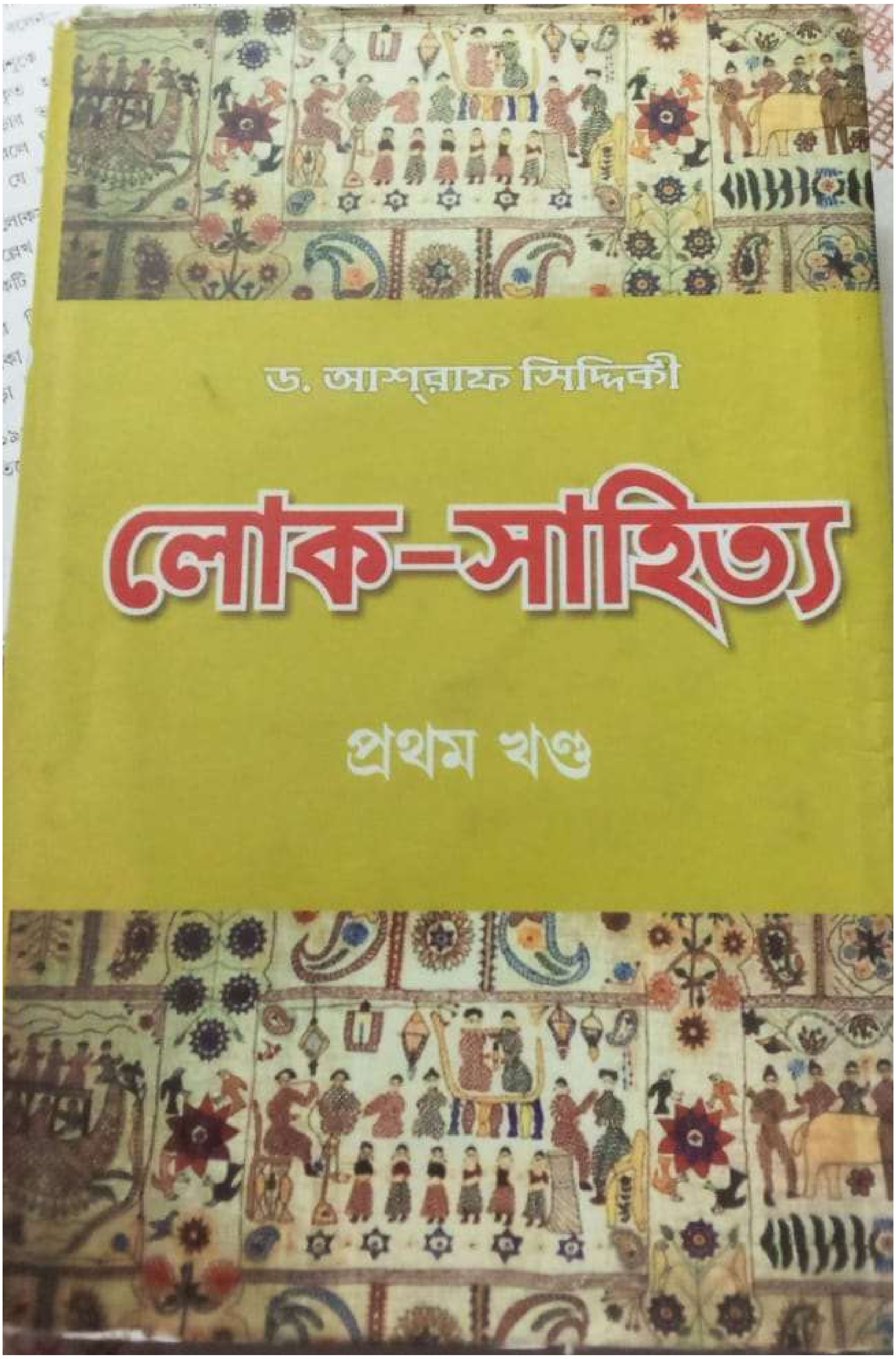

চিত্রটি আশরাফ সিদ্দিকী রচিত 'লোক-সাহিত্য' প্রথম খণ্ড গ্রন্থের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য প্রথম অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-১০০, পৃ-৪০।

চিত্রসংখ্যা—১১

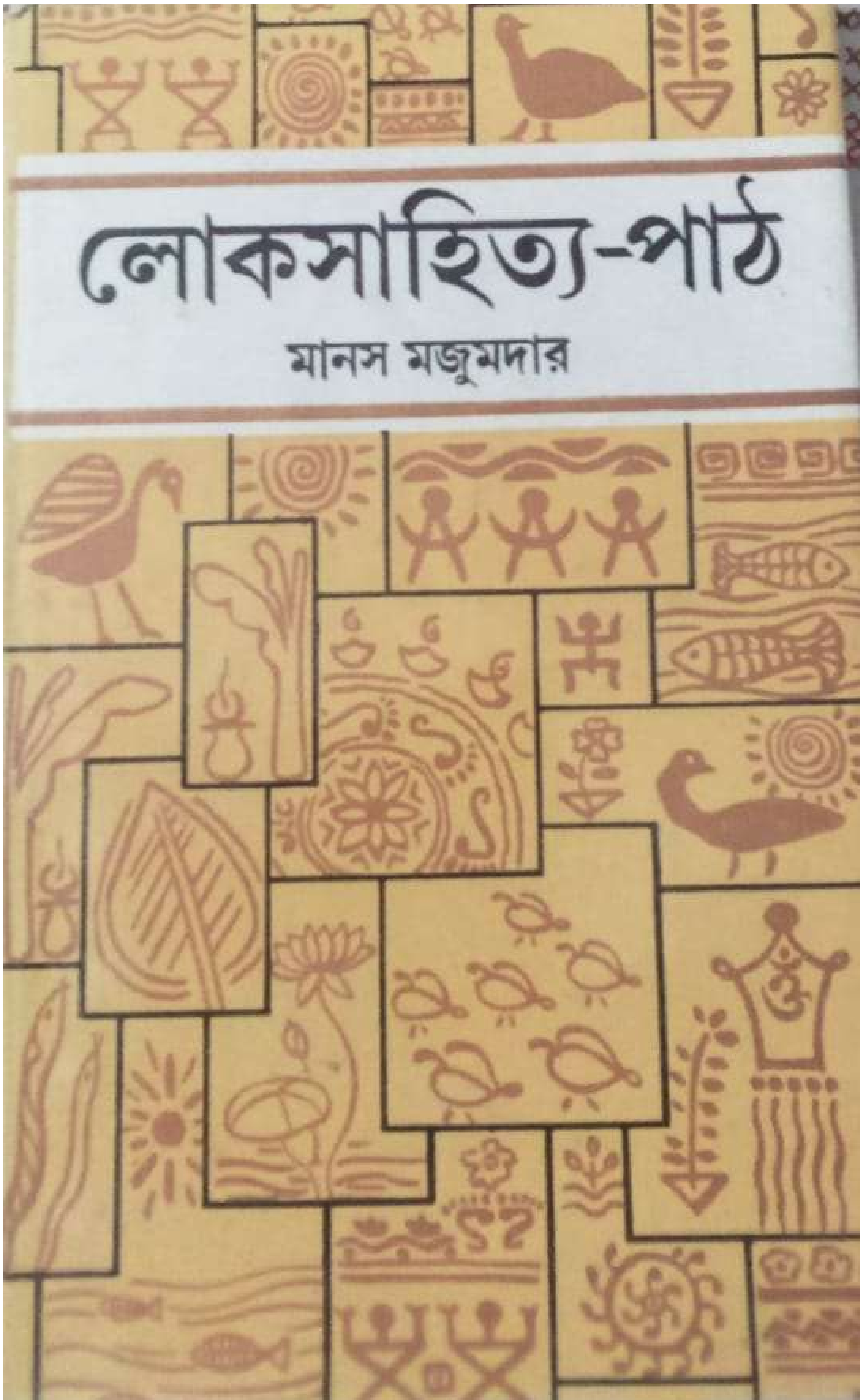

চিত্রটি মানস মজুমদার রচিত 'লোকসাহিত্য-পাঠ' গ্রন্থের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য প্রথম অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-১০৫, পৃ-৪০।

চিত্রসংখ্যা—১২

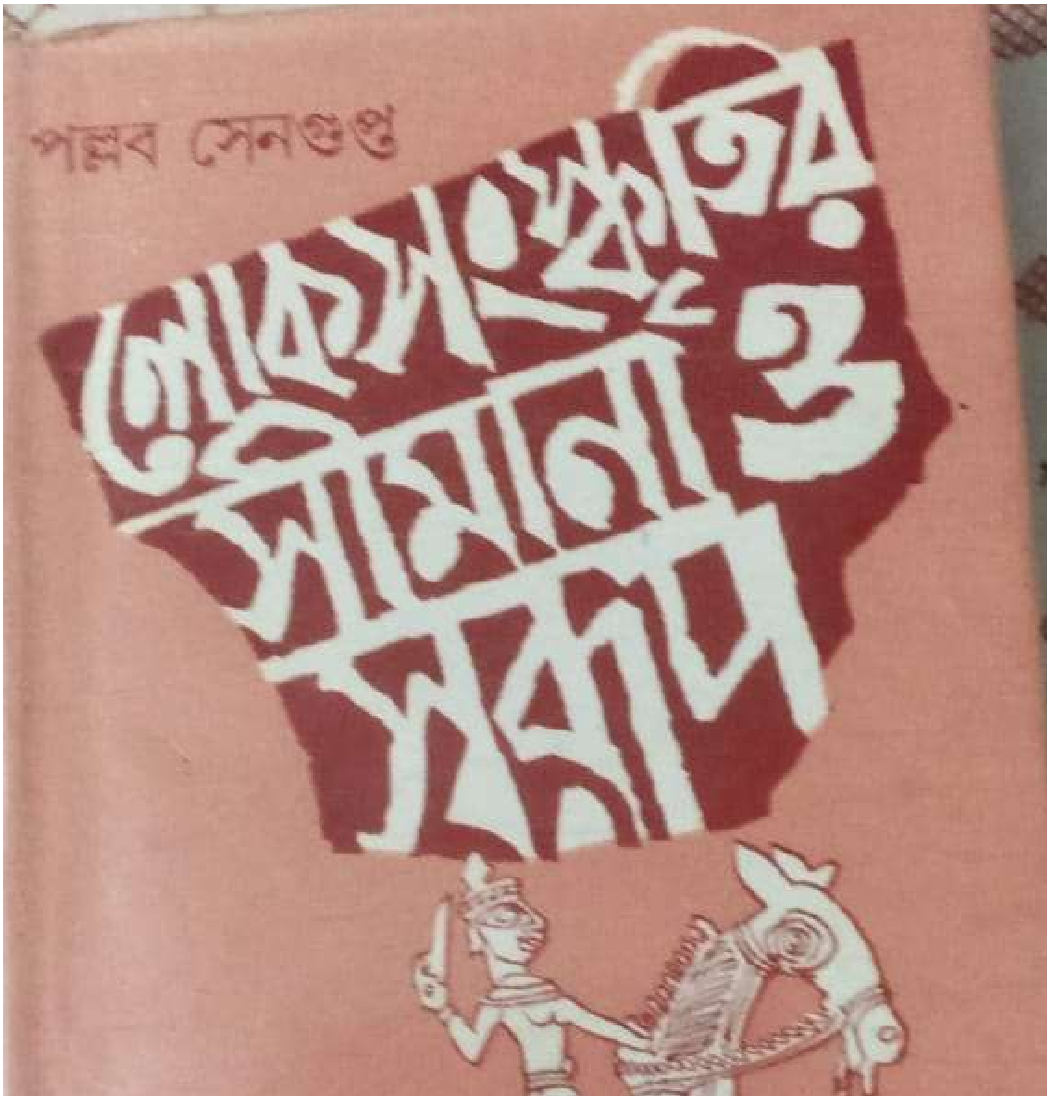

চিত্রটি পল্লব সেনগুপ্ত রচিত 'লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ' গ্রন্থের প্রচ্ছদপত্রের ফটোকপি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য প্রথম অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-১০৬, পৃ-৪০।

চিত্রসংখ্যা—১৩

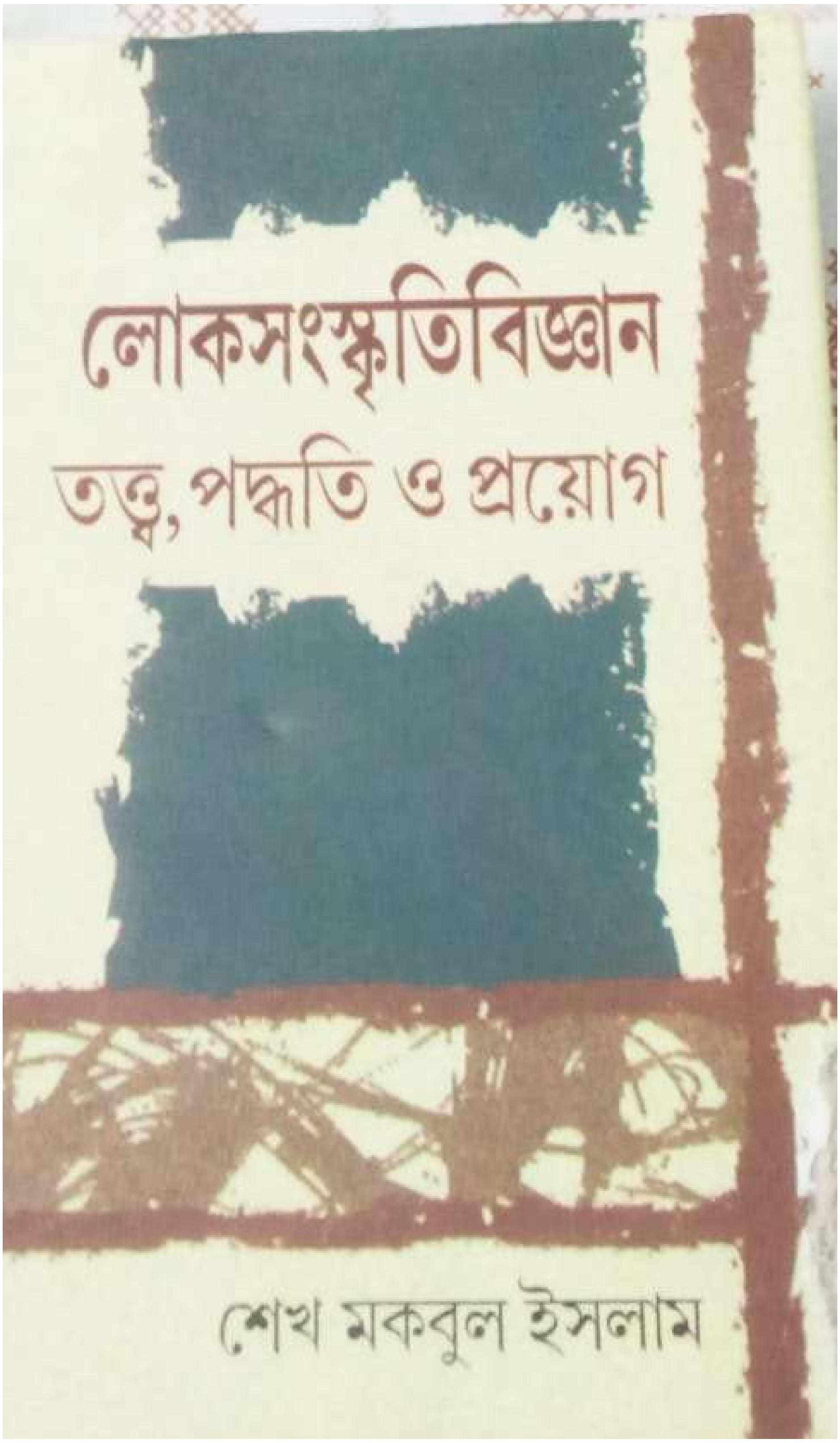

চিত্রটি শেখ মকবুল ইসলাম রচিত 'লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞান তত্ত্ব, পদ্ধতি ও প্রয়োগ' গ্রন্থের প্রচ্ছদপত্রের ফটোকপি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য প্রথম অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-১০৭, পৃ-৪০।

চিত্রসংখ্যা—১৪

সৌগত চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বাংলার ছড়া ছড়ার বাংলা' গ্রন্থের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য প্রথম অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-১০৮, পৃ-৪০।

চিত্রসংখ্যা—১৫

উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষিজাত ফসল ব্রকলীর চাষের ফটোকপি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৫, পৃ-১২২।

চিত্রসংখ্যা—১৫.ক

চিত্রটি ধানচাষের ফটোকপি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৫, পৃ-১২২।

চিত্রসংখ্যা—১৫.খ

চিত্রটি উপকূলীয় অঞ্চলের আলুচাষের প্রতিলিপি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৫, পৃ-১২২।

চিত্রসংখ্যা—১৫.গ

চিত্রটি কৃষিজাত কুমড়ো চাষের প্রতিলিপি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৫, পৃ-১২২।

চিত্রসংখ্যা—১৫.ঘ

চিত্রটি ধানচাষের চারা রোপনের প্রতিলিপি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৫, পৃ-১২২।

চিত্রসংখ্যা—১৫.ঙ

চিত্রটি পাট গাছকে ধোয়ার পরবর্তী পর্যায়। সঙ্গে ক্ষেত্রসমীক্ষায়রত গবেষিকা। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৫, পৃ-১২২।

চিত্রসংখ্যা—১৫.চ

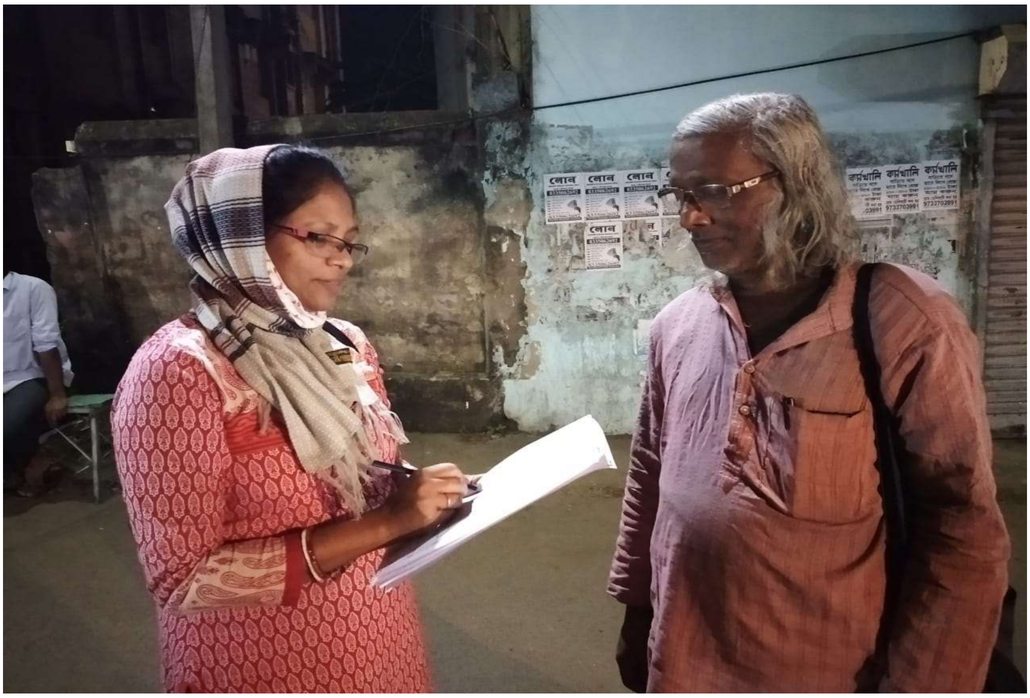

চিত্রটি কৃষিকাজ সম্পর্কিত ছড়া বাহকের সঙ্গো গবেষিকার সাক্ষাৎকার গ্রহণের ফটোকপি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৫, পৃ-১২২।

চিত্রসংখ্যা—১৫.ছ

চিত্রটি ধান রাখবার গোলার প্রতিচ্ছবি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৫, পৃ-১২২।

চিত্রসংখ্যা—১৬

চিত্রটি মৎস চাষের প্রতিলিপি। অঞ্চলে প্রচুর মৎসচাষের কারণে বহু ফিসারী রয়েছে। উপরোক্ত চিত্রটি তার-ই ফটোকপি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৬, পৃ-১২২।

চিত্রসংখ্যা—১৭

চিত্রটি ভেনামী চিংড়ির ফটোকপি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৭, পৃ-১২২।

চিত্রসংখ্যা—১৮

চিত্রটি উপকূলীয় অঞ্চলের শুটকী চাষের জন্য বিখ্যাত স্থান, পেটুয়াঘাট বন্দরের ফটোকপি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৮, পৃ-১২২।

চিত্রসংখ্যা—১৮.ক

চিত্রটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'Deshapran Fishing Harbour'-এর ফটোকপি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৮, পৃ-১২২।

চিত্রসংখ্যা—১৮.খ

সমুদ্র থেকে মাছ ধরে রৌদ্রে নেটের উপর মাছ শুকিয়ে শুটকি মাছ তৈরি করার চিত্র, পাশে গবেষিকা। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৮, পৃ-১২২।

চিত্রসংখ্যা—১৮.গ

চিত্রটি গবেষিকার সঙ্গে শুটকি মাছ বাছাইয়ের মহিলাকর্মীর সাক্ষাৎকারজনিত চিত্র। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৮, পৃ-১২২।

চিত্রসংখ্যা—১৮.ঘ

চিত্রটি গবেষিকার ক্ষেত্রসমীক্ষার ফটোকপি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৮, পৃ-১২২।

চিত্রসংখ্যা—১৮.ঙ

চিত্রটি উপকূলীয় অঞ্চলে শুটকি মাছ বাছাই-এ কর্মরত বহু মহিলা কর্মীর ফটোকপি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৮, পৃ-১২২।

চিত্রসংখ্যা—১৮.চ

চিত্রটি শুটকির বিস্তৃত ক্ষেত্রভূমির প্রতিলিপি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৮, পৃ-১২২।

চিত্রসংখ্যা—১৮.ছ

চিত্রটি শুটকি মাছকে রপ্তনীর উদ্দেশ্যে দড়ি দিয়ে বাঁধাই করে বাজারের উপযোগী করে তোলার চিত্র। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৮, পৃ-১২২।

চিত্রসংখ্যা—১৯

চিত্রটি 'মান'-এর প্রতিলিপি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-১৩, পৃ-১২৩।

চিত্রসংখ্যা—১৯.ক

চিত্রটি বেত শিল্পীর ফটোকপি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-১৩, পৃ-১২৩।

চিত্রসংখ্যা—২০

চিত্রটি বেতের তৈরী 'ধামার' প্রতিলিপি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-১৪, পৃ-১২৩।

চিত্রসংখ্যা—২১

চিত্রটি ঠাকার ফটোকপি। বাঁশ দিয়ে তৈরী, বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-১৭, পৃ-১২৩।

চিত্রসংখ্যা—২১.ক

চিত্রটি বাঁশ দ্বারা নির্মিত ‘ঠাকা’ ও জাল তৈরীর ফ্রেমের ফটোকপি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-১৭, পৃ-১২৩।

চিত্রসংখ্যা—২২

চিত্রটি জেলেমাঝিদের মাছ ধরবার জালের (Net) প্রতিলিপি। এই জাল জেলেদের জীবিকা নির্বাহের অন্যতম সরঞ্জাম। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-১৯, পৃ-১২৩।

চিত্রসংখ্যা—২২.ক

চিত্রটি জেলেদের জীবিকা নির্বাহের অন্যতম একটি চিত্রের প্রতিলিপি। জেলেরা নদী-সমুদ্র থেকে মাছ ধরে, সেগুলিকে সংরক্ষণ করে রপ্তানী করছে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-১৯, পৃ-১২৩।

চিত্রসংখ্যা—২৩

চিত্রটি মাছ ধরতে যাওয়া লঞ্চের প্রতিচ্ছবি। লঞ্চগুলি গভীর সমুদ্রের পাড়ি দেওয়ার পূর্বে মাছ সংরক্ষণের জন্য বরফ বোঝাই করছে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-২০, পৃ-১২৩।

চিত্রসংখ্যা—২৩.ক

চিত্রটি মাছ ধরা লঞ্চের পাশে দণ্ডায়মান গবেষিকার ছবি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-২০, পৃ-১২৩।

চিত্রসংখ্যা—২৩.খ

চিত্রটি নতুন লঞ্চের ফটোকপি। নতুন লঞ্চ সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়ার পূর্বে এই রকমভাবে সাজিয়ে পূজা করে উদ্বোধন করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-২০, পৃ-১২৩।

চিত্রসংখ্যা—২৪

চিত্রটি খেজুরীর ডাকঘরের ভগ্নাবশেষ-এর চিত্র। ব্রিটিশ আমলে নির্মিত ভারতবর্ষের প্রথম ডাকঘর। একটি স্তম্ভকে অবলম্বন করে স্পাইরাল স্টেয়ার উপরের দিকে উঠে গেছে। সামনে একটি খিলান। ডাকঘরের সমস্ত ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এই ছবির অংশটুকুই বর্তমানে রয়েছে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-২১, পৃ-১২৩।

চিত্রসংখ্যা—২৪.ক

চিত্রটি খেজুরীর ইরিগেশন বাংলোতে ক্ষেত্রসমীক্ষারত গবেষিকার ফটোচিত্র। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-২১, পৃ-১২৩।

চিত্রসংখ্যা—২৪.খ

চিত্রটি খেজুরীর ডাকঘরের পাশে ইরিগেশন বাংলোর প্রবেশদ্বারের ফটোকপি। সামনে ক্ষেত্রসমীক্ষারত গবেষিকা। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-২১, পৃ-১২৩।

চিত্রসংখ্যা—২৪.গ

চিত্রটি খেজুরীর অতীত গৌরবের নিদর্শন। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং রাজা রামমোহন রায়ের প্রস্তরমূর্তির চিত্র। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-২১, পৃ-১২৩।

চিত্রসংখ্যা—২৫

চিত্রটি রসুলপুর নদীর প্রতিচ্ছবি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-২২, পৃ-১২৪।

চিত্রসংখ্যা—২৫.ক

চিত্রটি দীঘার সমুদ্র উপকূলের ফটোকপি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-২২, পৃ-১২৪।

চিত্রসংখ্যা—২৫.খ

চিত্রটি খেজুরীর সমুদ্র উপকূলের ফটোকপি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-২২, পৃ-১২৪।

চিত্রসংখ্যা—২৬

চিত্রটি রসুলপুর নদীঘাটে চলমান 'ডিঙি'র প্রতিচ্ছবি। এই ডিঙিতে করে জেলে মাঝিরা দূর সমুদ্রে মাছ ধরতে যান। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-২৩, পৃ-১২৪।

চিত্রসংখ্যা—২৭

চিত্রটি 'ভুটভুটি'র চিত্র। সাধারণ মানুষ থেকে অফিসকর্মী, বাইক আরোহী এই ভুটভুটি করে রসুলপুরের নদী পারাপার করে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-২৪, পৃ-১২৪।

চিত্রসংখ্যা—২৮

চিত্রটি ভ্যাসেলের ছবি। কাছি দিয়ে বাঁধা হচ্ছে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-২৫, পৃ-১২৪।

চিত্রসংখ্যা—২৮.ক

চিত্রটি 'জলধারা-৫৮'-এর ভ্যাসেলের চিত্র। পাশে ভ্যাসেলটির কর্মচারী। যিনি আমার ছড়ার ঐতিহ্যবাহকও। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-২৫, পৃ-১২৪।

চিত্রসংখ্যা—২৮.খ

চিত্রটি রসুলপুর নদীঘাটে নদী পারাপারকারী ভ্যাসেলের চিত্র। ভ্যাসেলটি থেকে যাত্রী নামার চিত্র ধরা হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-২৫, পৃ-১২৪।

চিত্রসংখ্যা—২৯

চিত্রটি চুল ছাড়ানো মহিলাকর্মীর কর্মরত চিত্র। উপকূলীয় অঞ্চলে মেয়েরা যে চুল ছাড়ানোর কাজে যুক্ত থাকেন, চিত্রটি তার প্রমাণ। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-২৭, পৃ-১২৪।

চিত্রসংখ্যা—৩০

চিত্রটি ইটভাটার প্রতিলিপি। স্থান দক্ষিণ কুলতলিয়া। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৩০, পৃ-১২৪।

চিত্রসংখ্যা—৩০.ক

চিত্রটি কাঁচা ইটকে পোড়ানোর পদ্ধতির চিত্র। এই ঢাক্‌নাগুলি তুললে ভেতরের আগুন দেখা যাবে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৩০, পৃ-১২৪।

চিত্রসংখ্যা—৩০.খ

চিত্রটি ইটভাটার চিত্র। উপরে শ্রমিক কাজ করছে, আর নিম্নদেশে কাঁচা ইটকে পোড়ানো হচ্ছে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৩০, পৃ-১২৪।

চিত্রসংখ্যা—৩০.গ

চিত্রটি ইটভাটার মালিক সুখেন্দু বেরা (বয়স ৫১, বি.কম পাশ) ও তাঁর কর্মচারীর সঙ্গো গবেষিকার সাক্ষাৎকারের চিত্র। পেছনে কয়লার পাহাড়, ভাটায় জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৩০, পৃ-১২৪।

চিত্রসংখ্যা—৩১

চিত্রটি বড়ি শিল্পের ছবি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৩১, পৃ-১২৪।

চিত্রসংখ্যা—৩২

চিত্রটি বড়ি শিল্পের প্রধান উপকরণ 'বিরি' কলাই-এর ছবি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৩২, পৃ-১২৪।

চিত্রসংখ্যা—৩৩

চিত্রটি নক্‌সা বড়ির। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৩৩, পৃ-১২৪।

চিত্রসংখ্যা—৩৩.ক

চিত্রটি বড়ি শিল্পী শিপ্রা মণ্ডলের। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৩৩, পৃ-১২৪।

চিত্রসংখ্যা—৩৪

চিত্রটি বিচাবড়ির প্রতিলিপি। চালকুমড়ার বীজ দিয়ে হয় বলে একে বিচা বড়ি বলা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৩৫, পৃ-১২৫।

চিত্রসংখ্যা—৩৫

চিত্রটি 'ঝাঁটা'র প্রতিলিপি। নারকেল কাঁঠি দিয়ে তৈরী। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৩৬, পৃ-১২৫।

চিত্রসংখ্যা—৩৬

চিত্রটি ‘ছেনিয়া’র প্রতিলিপি। খেজুর পাতা দ্বারা তৈরী। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৩৭, পৃ-১২৫।

চিত্রসংখ্যা—৩৭

চিত্রটি ‘ল বাঁধা’ সংক্রান্তির ফটোকপি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৪১, পৃ-১২৫।

চিত্রসংখ্যা—৩৮

চিত্রটি মনসাগাছের ফটোকপি। গাছটি পরিচর্যাযুক্ত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৫০, পৃ-১২৬।

চিত্রসংখ্যা—৩৮.ক

চিত্রটি মনসাগাছের ফটোকপি। পরিচর্যাহীন মনসাগাছ। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৫০, পৃ-১২৬।

চিত্রসংখ্যা—৩৯

জামাইষষ্ঠীর ফটোকপি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৫১, পৃ-১২৬।

চিত্রসংখ্যা—৩৯.ক

চিত্রটি গবেষিকার সঙ্গো ছড়া সংগ্রাহক মাধব সামন্তের সাক্ষাৎকারজনিত ফটোকপি। তাঁর কাছ থেকে অন্যান্য ছড়ার মতো জামাই নিয়েও বহু ছড়া সংগৃহীত হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, ঐতিহ্যবাহকের সাক্ষাৎকার সংখ্যা-৫১, পৃ-১২৬।

চিত্রসংখ্যা—৪০

চিত্রটি দুর্গাথপার ফটোকপি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৫৩, পৃ-১২৬।

চিত্রসংখ্যা—৪১

চিত্রটি 'ধারাচাটু'র প্রতিচ্ছবি। পাত্রটিতে তরল করা আতপ চালের মিশ্রণ আছে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৫৫, পৃ-১২৭।

চিত্রসংখ্যা—৪২

চিত্রটি 'ঘসি'র (ঘুঁটে) প্রতিচ্ছবি। গোরুর গোমাই (গোবর) থেকে তৈরী, জ্বালানীর কাজে ব্যবহৃত হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য তৃতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-১০, পৃ-১৭৩।

চিত্রসংখ্যা—৪৩

চিত্রটি ‘চাঁটাই’ এর ফটোকপি। তালপাতায় তৈরী। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য তৃতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-১৪, পৃ-১৭৪।

চিত্রসংখ্যা—৪৪

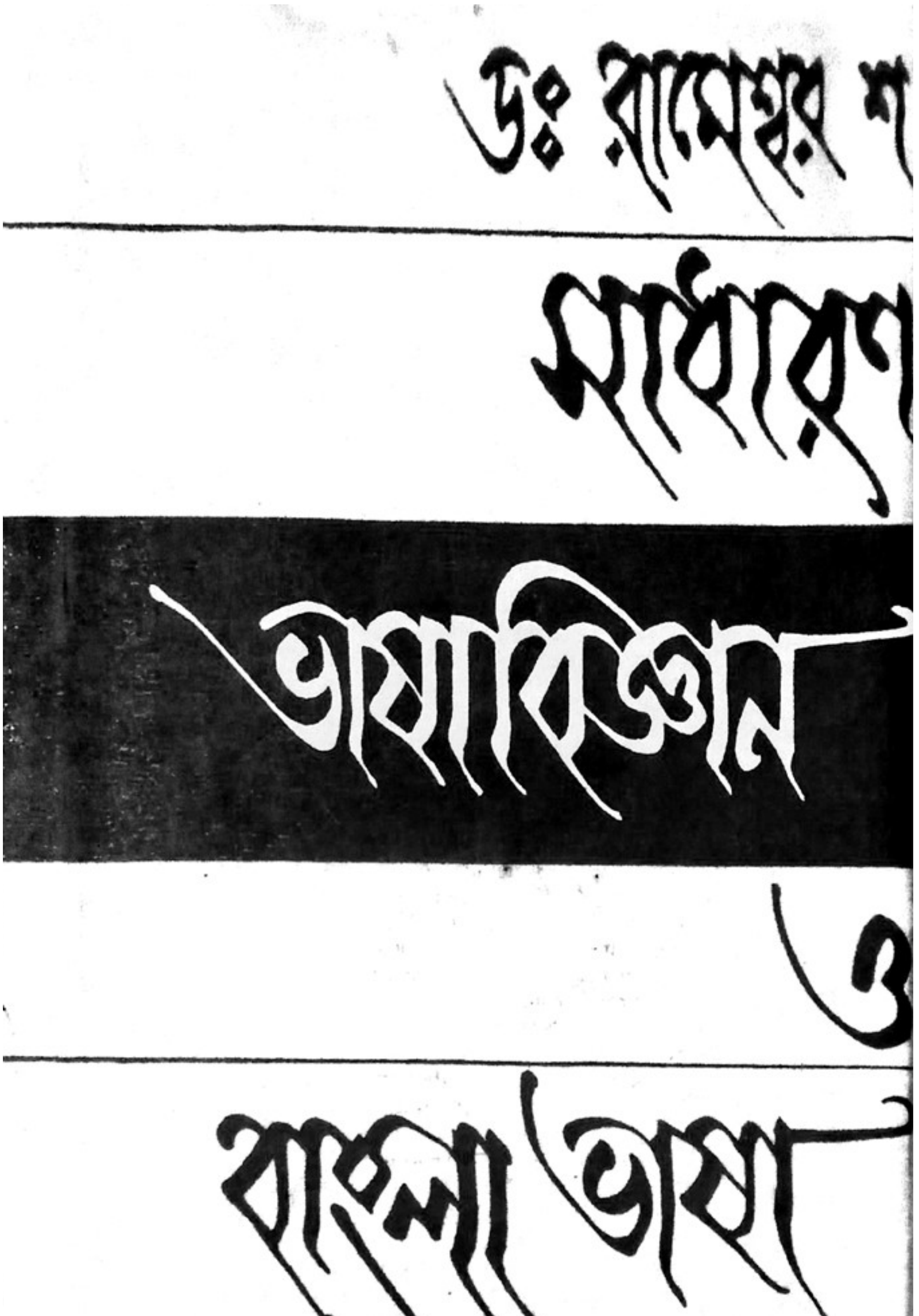

ছবিটি রামেশ্বর শ-এর ‘সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলাভাষা’ গ্রন্থের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য তৃতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-১৭, পৃ-১৭৪।

চিত্রসংখ্যা—৪৫

বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা

অষ্টম সংস্করণ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত অধ্যাপক

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৭৪

চিত্রটি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা' গ্রন্থের নামপত্রের প্রতিলিপি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য তৃতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৪৫, পৃ-১৭৫।

চিত্রসংখ্যা—৪৬

"অনর্থকং মাধিগীষ্মহীত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্"

ভাষার ইতিবৃত্ত

শ্রীসুকুমার সেন

ইস্টার্ন পাবলিশার্স
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

চিত্রটি সুকুমার সেন রচিত 'ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের নামপত্রের প্রতিলিপি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য তৃতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৪৭, পৃ-১৭৫।

চিত্রসংখ্যা—৪৬.ক

১৮৬ ভাষার ইতিবৃত্ত

ঝাড়খণ্ডী অর্থাৎ দক্ষিণপশ্চিম-প্রত্যন্ত অঞ্চলের উপভাষাগুচ্ছ তিনটি প্রধান স্তবকে বিভক্ত। মেদিনীপুরের উত্তর ও উত্তরপূর্বাংশের কথ্যভাষা রাঢ়ীর অন্তর্গত, দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম কথ্য ভাষাগুলিকে **দণ্ডভুক্তীয়** স্তবক বলা যায়, আর মেদিনীপুরের পশ্চিম প্রান্তের ধলভূমের এবং মানভূমের কথাভাষাগুলিকে **কেন্দ্রীয় ঝাড়খণ্ডী** বলা যায়। তিন স্তবকের উপভাষাতে আনুনাসিকের কমবেশি প্রাচুর্য আছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবকের সাধারণ বিশেষত্ব হইল—(১) অনুসর্গহীন সম্প্রদান কারক ("বাড়ীকে বিদায় হইল পবন কুড়র", "বেলা যে পড়ে এল জলকে চল", ঘাসকে গেলছে); (২) নামধাতুর বাহুল্য ("পুখুরের জলটা গঁধাচ্ছে", "আজ রাতকে ভারি জাড়াবে")। দণ্ডভুক্তীয় স্তবকের উপভাষার একটি বিশেষ লক্ষণ হইল যুক্ত ক্রিয়াপদের 'আছ' ধাতুর স্থানে 'বট' ধাতুর ব্যবহার ('করিব্‌টে'=করছে)।

বরেন্দ্রীতে স্বরধ্বনি অনেকটাই অপরিবর্তিত। সানুনাসিক স্বরধ্বনি প্রায়ই আছে। ঘোষবৎ মহাপ্রাণ, অর্থাৎ চতুর্থ বর্ণ, শুধু পদের আদিতে বজায় আছে। শ্বাসাঘাতের নির্দিষ্ট স্থান নাই। জ-কার কখনো কখনো জ়(z) ধ্বনিতে পরিণত হইয়াছে। পদের গোড়ার র-কারের লোপ ও আগম একটি বিশিষ্ট লক্ষণ (যেমন—আমের রস > রামের অস)। শব্দ- ও ধাতু রূপে বরেন্দ্রী মোটামুটি রাঢ়ীরই মতো, তবে অধিকরণে কামরূপী-সুলভ [-ত] বিভক্তিও দেখা যায়; এবং অতীতকালে উত্তমপুরুষে [-লাম] বিভক্তি হয়। রাঢ়ী ও বরেন্দ্রী মূলত একই উপভাষা ছিল, পরে একদিকে বঙ্গালীর অপর দিকে বিহারীর প্রভাব পড়িয়া রাঢ়ী হইতে বরেন্দ্রী বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

বঙ্গালীতে বিপর্যস্ত বা অপিনিহিত স্বর রক্ষিত আছে। অভিশ্রুতি এবং স্বরসঙ্গতি নাই, সুতরাং স্বরধ্বনিতে প্রাচীনত্ব খানিকটা রক্ষিত। যেমন—রাখিয়া > রাইখা; করিয়া > কইরা; দেশি। য-ফলায় ও যুক্তব্যঞ্জনে অপি-নিহিতির মতো স্বরাগম হয়। যেমন—সত্য > সইত্ত, ব্রাহ্ম > ব্রাইম্ম, রাক্ষস > রাইক্‌খস। এ-কার প্রায়ই অ্যা-কারে এবং ও-কার উ-কারে পরিণত। স্বর ধ্বনিতে নাসিক্যতা (nasalization) বজায় নাই; শ্বাসাঘাতের নির্দিষ্ট স্থান নাই। ঘোষবৎ মহাপ্রাণ; অর্থাৎ চতুর্থ বর্ণ, মহাপ্রাণতা ত্যাগ করিয়া কণ্ঠ-নলীয়স্পর্শযুক্ত (recursive) তৃতীয় বর্ণে পরিণত, যেমন সিন্ধীতে। যেমন—ভাত > বাত, ঘা > গ'া। ড়, ঢ় > র। যেমন—বাড়ি > বারি, বড়>

বিবরণটি সুকুমার সেন রচিত 'ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থ থেকে গৃহীত, পৃ-১৮৬ চিত্র। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য তৃতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৪৭, পৃ-১৭৫।

চিত্রসংখ্যা—৪৭

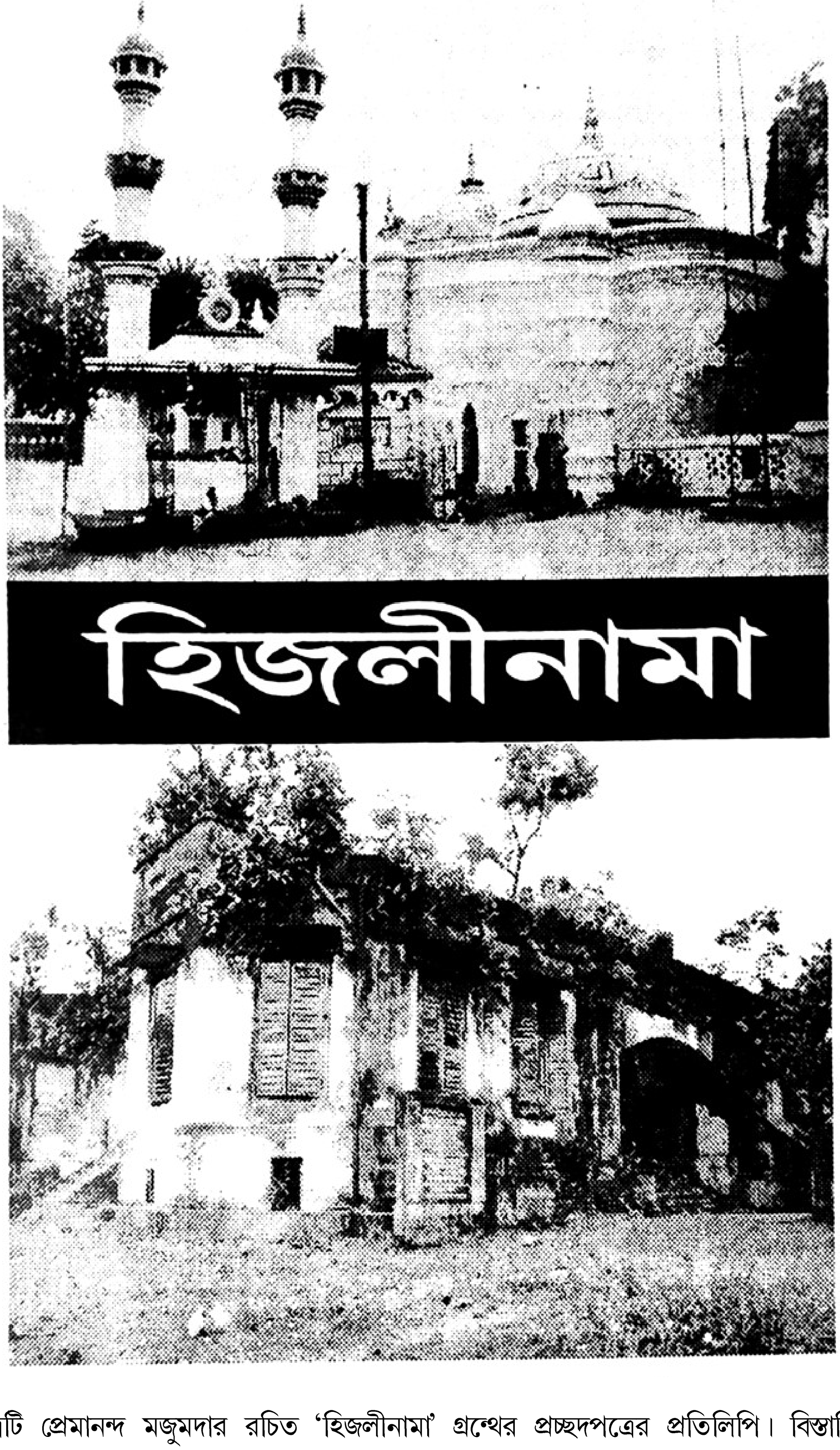

চিত্রটি প্রেমানন্দ মজুমদার রচিত 'হিজলীনামা' গ্রন্থের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য তৃতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৪৯, পৃ-১৭৫।

চিত্রসংখ্যা—৪৮

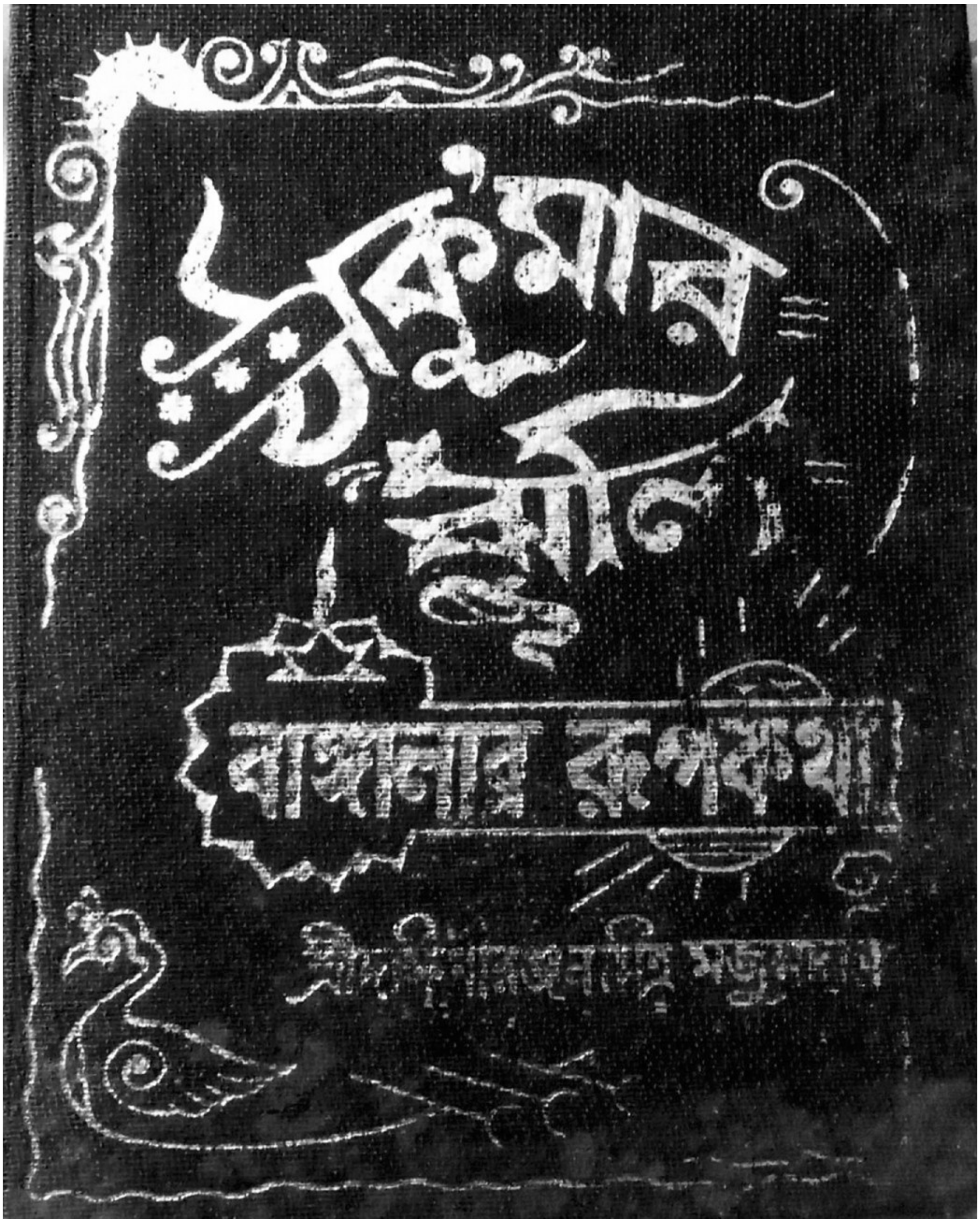

চিত্রটি দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকু'মার ঝুলি বাঙ্গালার রূপকথা' গ্রন্থের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য চতুর্থ অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৭০, পৃ-২০৯।

চিত্রসংখ্যা—৪৯

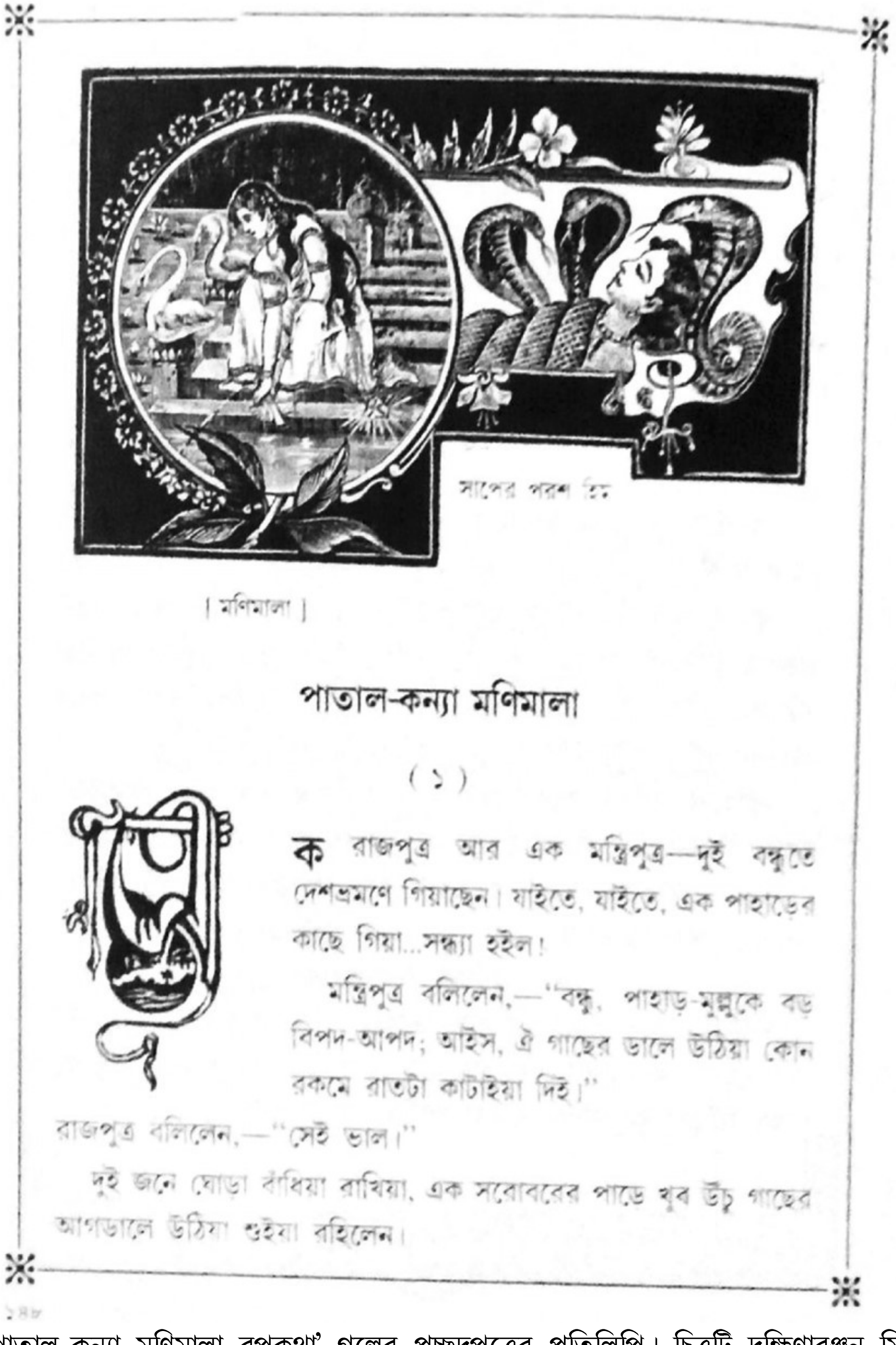

—রূপ-তরাসী—

[মণিমালা]

পাতাল-কন্যা মণিমালা

(১)

এক রাজপুত্র আর এক মন্ত্রিপুত্র—দুই বন্ধুতে দেশভ্রমণে গিয়াছেন। যাইতে, যাইতে, এক পাহাড়ের কাছে গিয়া...সন্ধ্যা হইল!

মন্ত্রিপুত্র বলিলেন,—"বন্ধু, পাহাড়-মুল্লুকে বড় বিপদ-আপদ; আইস, ঐ গাছের ডালে উঠিয়া কোন রকমে রাতটা কাটাইয়া দিই।"

রাজপুত্র বলিলেন,—"সেই ভাল।"

দুই জনে ঘোড়া বাঁধিয়া রাখিয়া, এক সরোবরের পাড়ে খুব উঁচু গাছের আগডালে উঠিয়া শুইয়া রহিলেন।

১৪৮

'পাতাল-কন্যা মণিমালা রূপকথা' গল্পের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের ঠাকুমার ঝুলি বাঙালার রূপকথা গ্রন্থ থেকে গৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য চতুর্থ অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৭৬, পৃ-২০৯।

চিত্রসংখ্যা—৫০

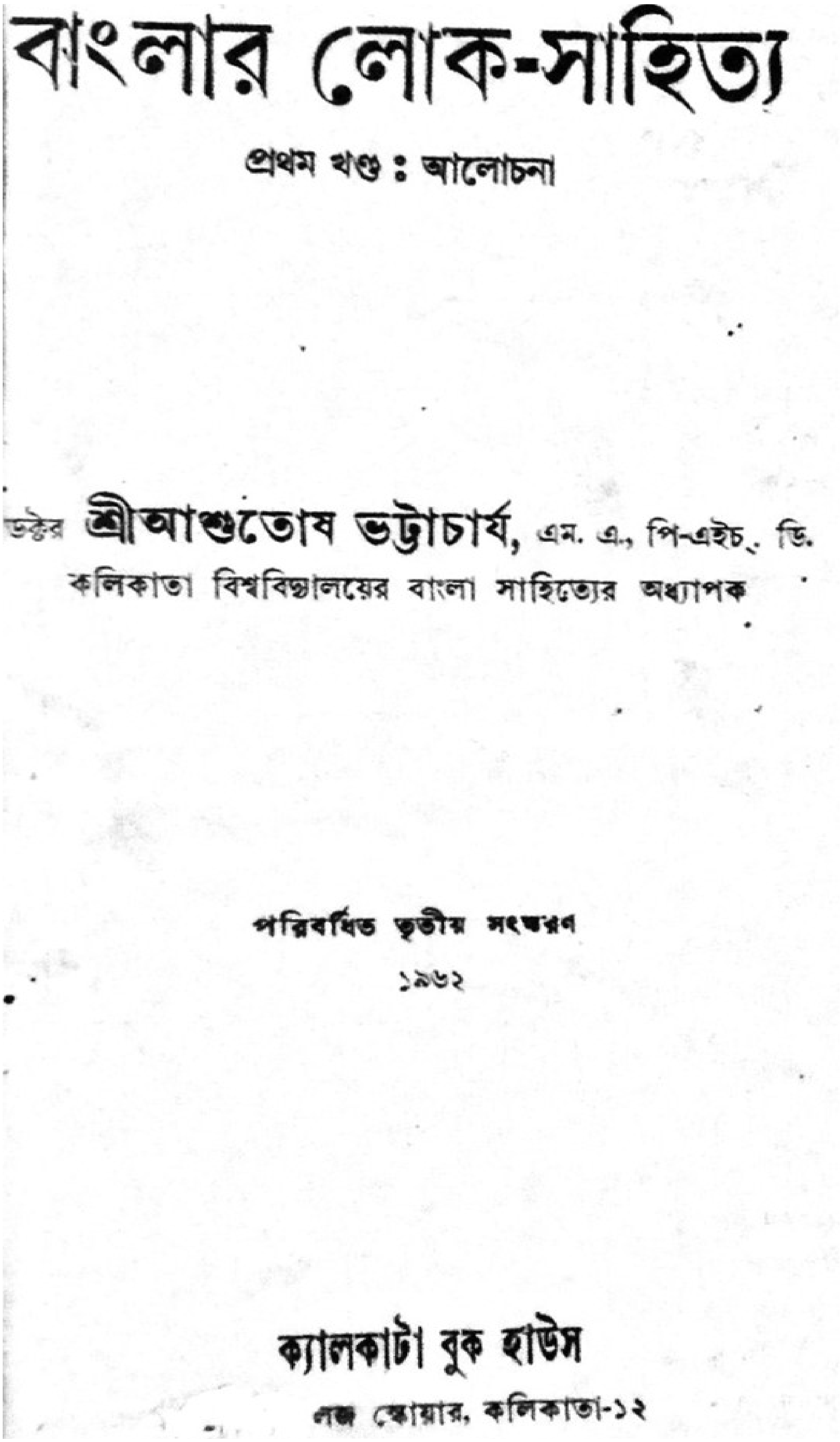
বাংলার লোক-সাহিত্য

প্রথম খণ্ড : আলোচনা

ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, এম. এ., পি-এইচ. ডি.

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক

পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ

১৯৬২

ক্যালকাটা বুক হাউস

লজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলার লোকসাহিত্য' গ্রন্থের নামপত্রের প্রতিলিপি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য চতুর্থ অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৮০, পৃ-২১০।

চিত্রসংখ্যা—৫১

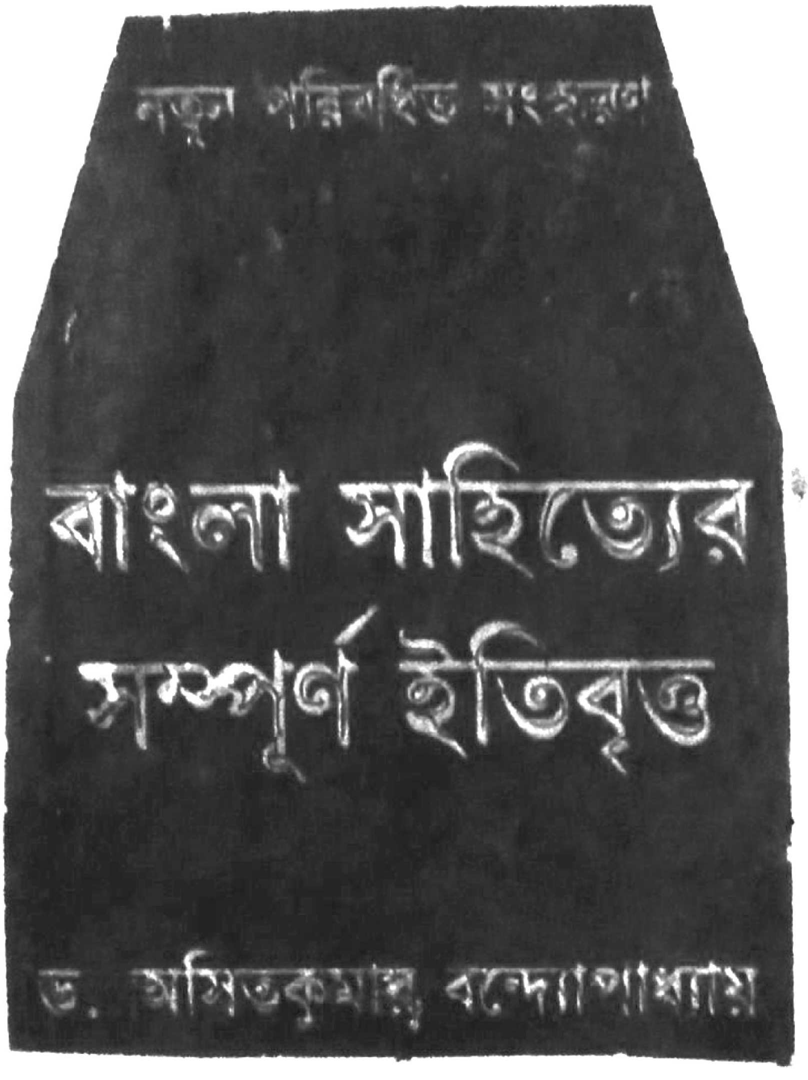

ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের প্রচ্ছপত্রের ফটোকপি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য চতুর্থ অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৯৮, পৃ-২১১।

চিত্রসংখ্যা—৫২

চিত্রটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘সাহিত্য’ গ্রন্থের ফটোকপি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য পঞ্চম অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-২, পৃ-২৩৬।

চিত্রসংখ্যা—৫৩

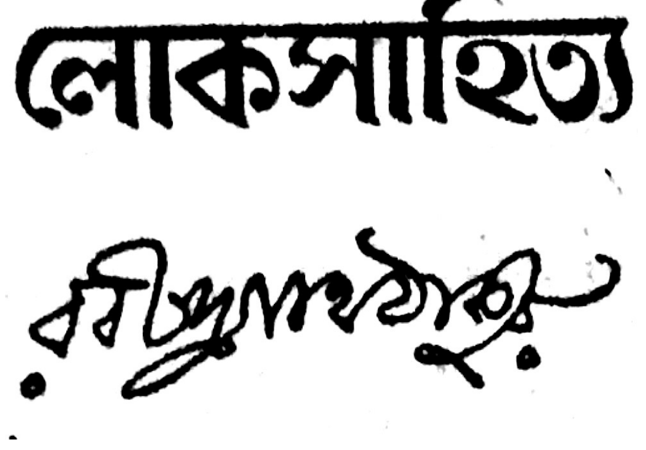
লোকসাহিত্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিত্রটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য পঞ্চম অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৭, পৃ-২৩৭।

চিত্রসংখ্যা—৫৪

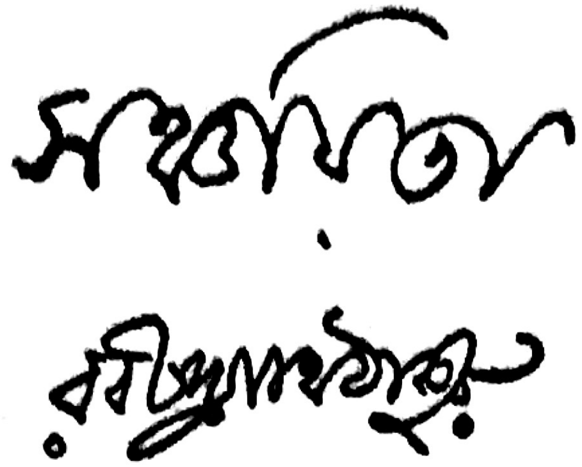

চিত্রটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘সঞ্চয়িতা’ কাব্যসমগ্রের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিচ্ছবি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য পঞ্চম অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৩২, পৃ-২৩৮।

চিত্রসংখ্যা—৫৫

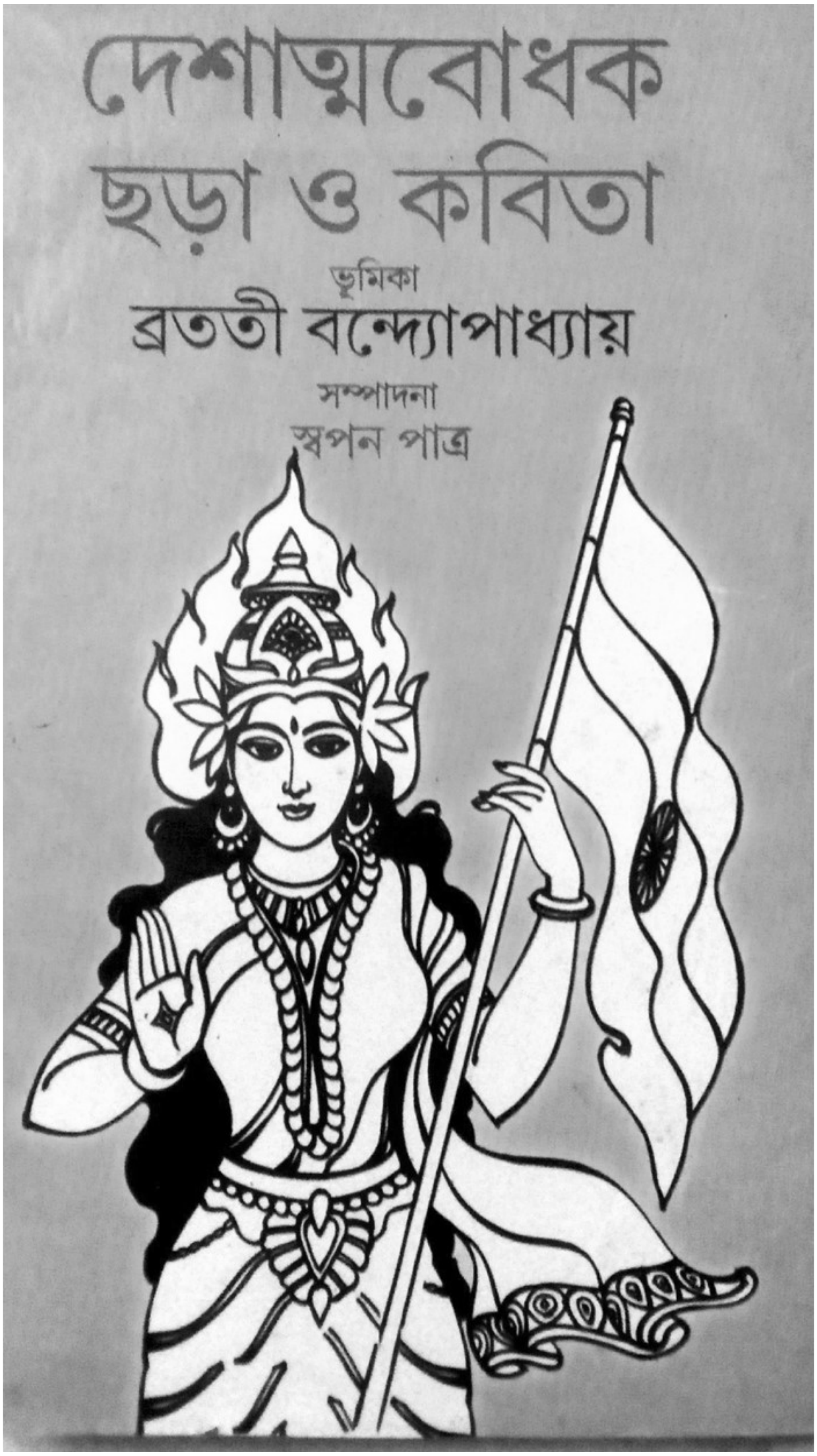

চিত্রটি সম্পাদক স্বপন পাত্রের 'দেশাত্মবোধক ছড়া ও কবিতা'র প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য পঞ্চম অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৫৩, পৃ-২৪০।

চিত্রসংখ্যা—৫৬

কারাগার নাটকের নামপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি মন্মথ রায় রচিত 'কারাগার' নাটক থেকে গৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য পঞ্চম অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৬৮, পৃ-২৪১।

চিত্রসংখ্যা—৫৭

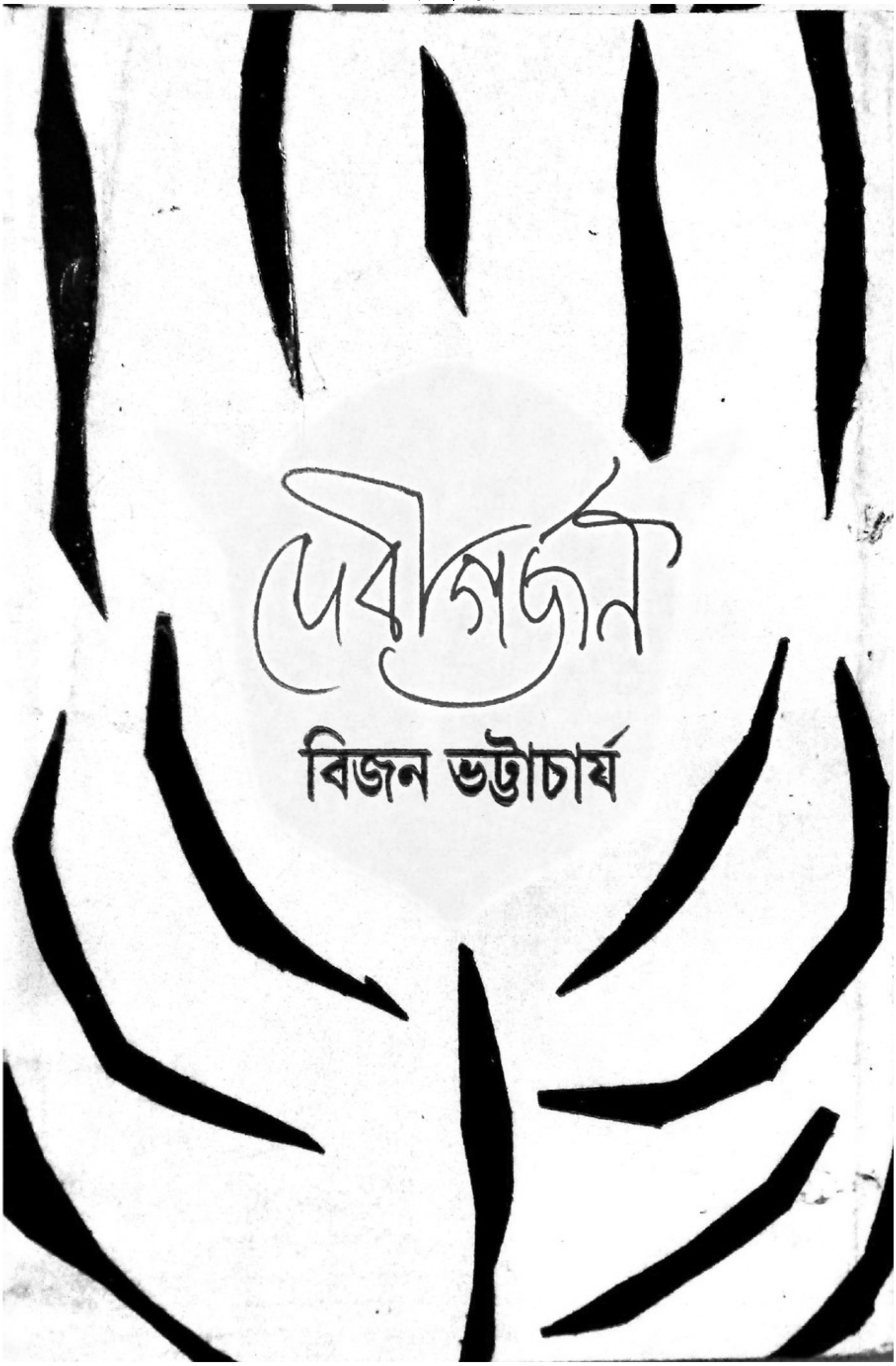

দেবীগর্জন নাটকের নামপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি বিজন ভট্টাচার্য রচিত 'দেবীগর্জন' নাটক। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য পঞ্চম অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৭৪, পৃ-২৪১।

চিত্রসংখ্যা—৫৮

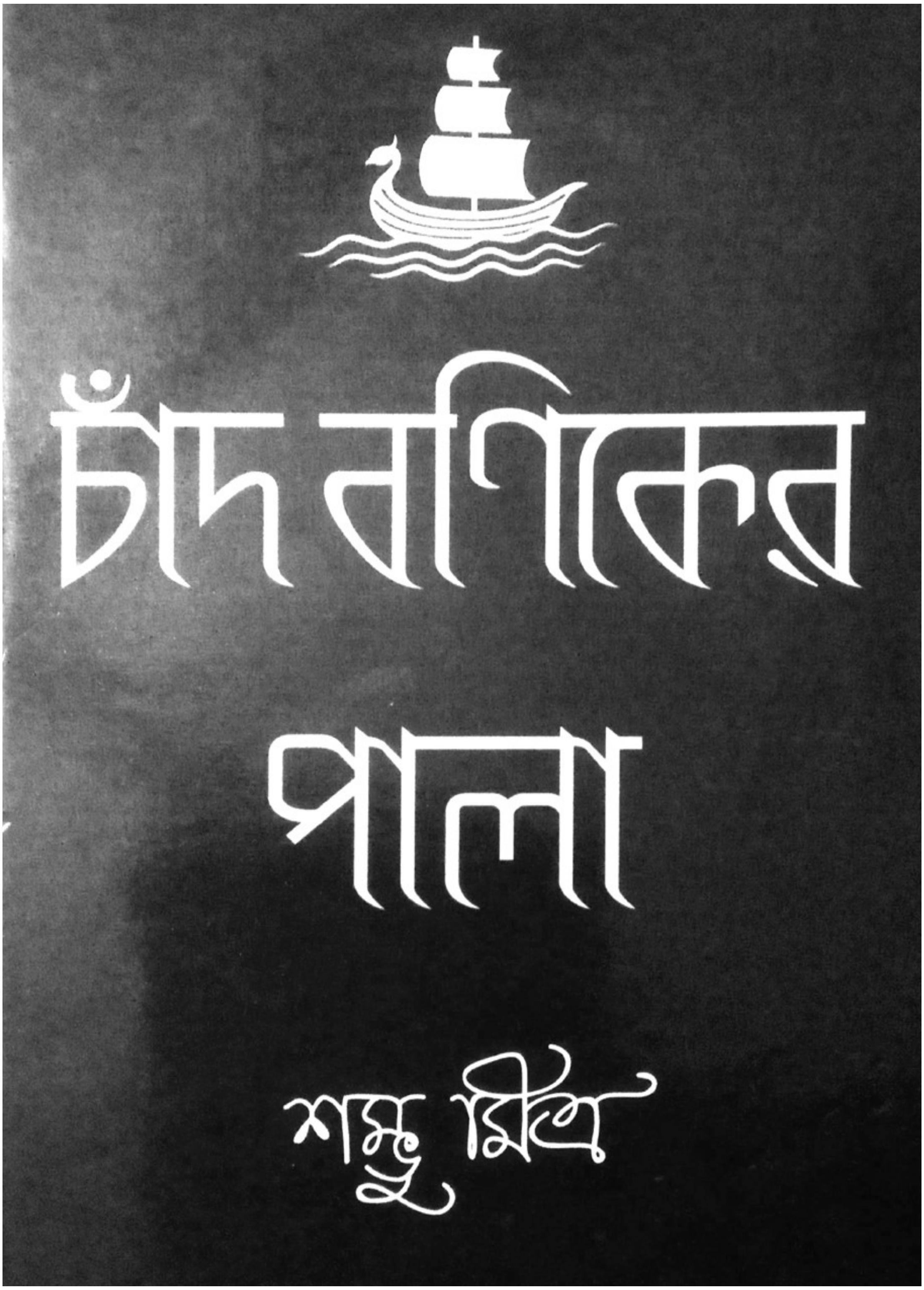

চিত্রটি শম্ভু মিত্র রচিত 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকের নামপত্রের প্রতিলিপি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য পঞ্চম অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৭৭, পৃ-২৪১।

চিত্রসংখ্যা—৫৯

বঙ্কিম রচনাবলী

(উপন্যাস সমগ্র)

চিত্রটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বঙ্কিম রচনাবলী' (উপন্যাস সমগ্র) প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য পঞ্চম অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৯০, পৃ-২৪২।

চিত্রসংখ্যা—৬০

চিত্রটি বনফুল রচিত 'ডানা' উপন্যাসের নামপত্রের প্রতিলিপি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য পঞ্চম অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৯২, পৃ-২৪২।

চিত্রসংখ্যা—৬১

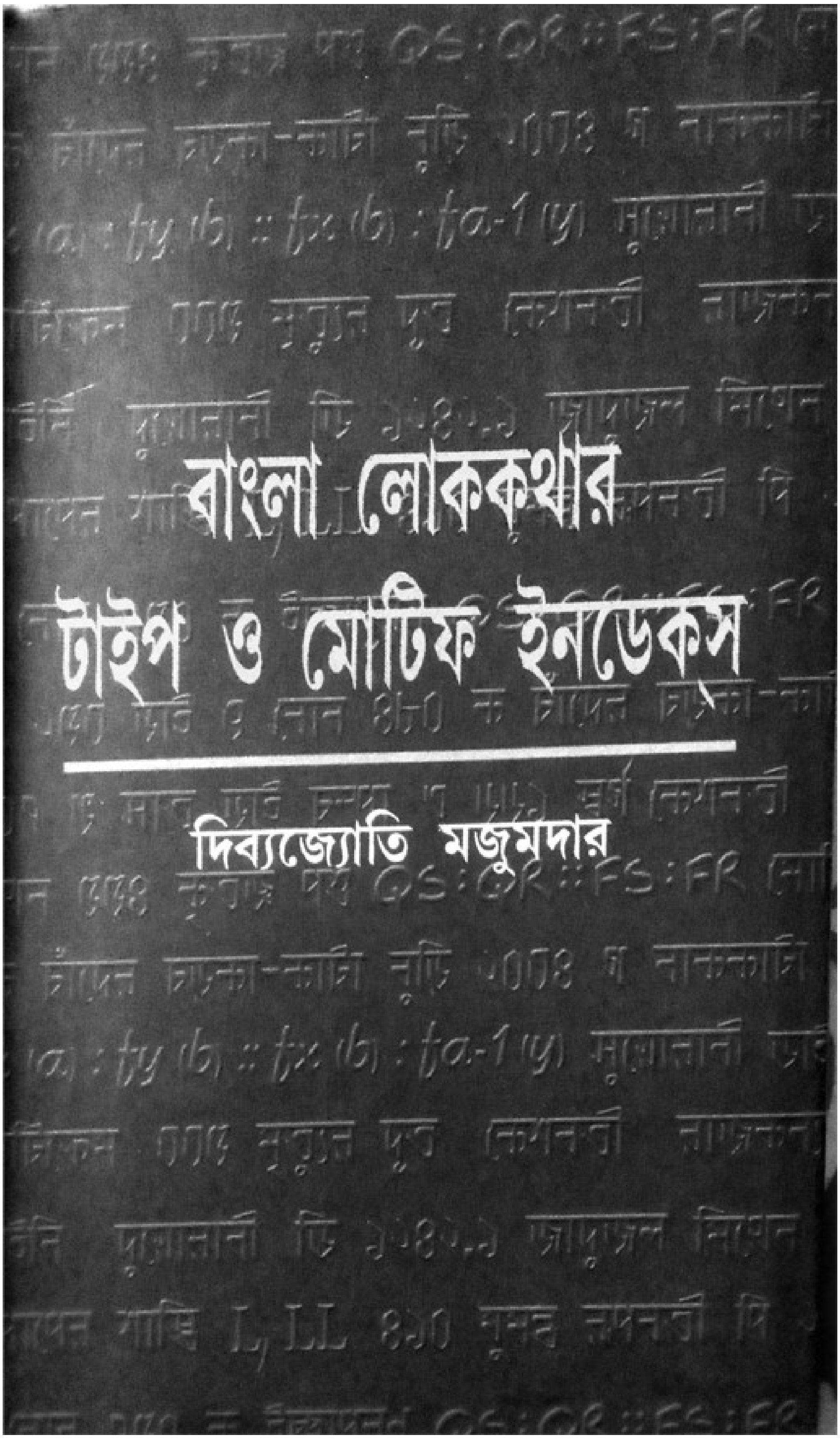

চিত্রটি দিব্যজ্যোতি মজুমদার রচিত 'বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স' গ্রন্থের নামপত্রের প্রতিলিপি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য অষ্টম অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৮, পৃ-৪৪১।

চিত্রসংখ্যা—৬২

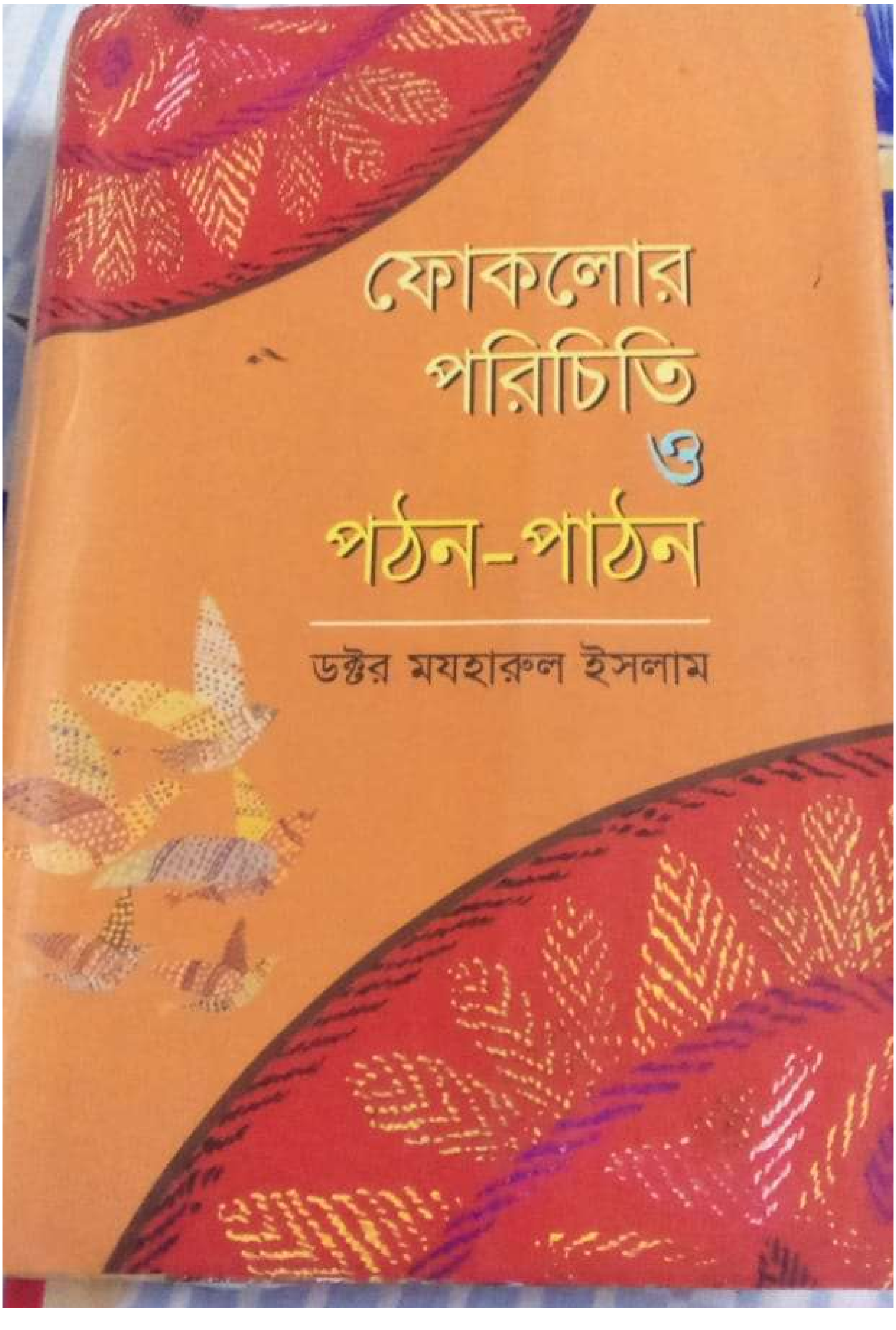

মযহারুল ইসলাম রচিত ‘ফোকলোর পরিচিতি ও পঠন-পাঠন’ গ্রন্থের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নবম অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৫, পৃ-৪৪৮।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ২.

সংগৃহীত দুষ্প্রাপ্য ও অপ্রকাশিত ছড়ার সংকলন।

সূচিপত্র

সংগৃহীত দুষ্প্রাপ্য ও অপ্রকাশিত ছড়ার সংকলন।

১. সমাজ বিষয়ক ছড়া
২. প্রকৃতি বিষয়ক ছড়া
৩. জাদু বিশ্বাসমূলক ছড়া
৪. প্রেম বিষয়ক ছড়া
৫. প্রতিবাদ বিষয়ক ছড়া
৬. ক্রীড়ামূলক ছড়া
৭. বর্তমানের ছড়া
৮. জাতিমূলক ছড়া
৯. রাজনীতিমূলক ছড়া
১০. পাঠান্তর বিষয়ক ছড়া
১১. রঙ্গ-ব্যাঙ্গামূলক ছড়া
১২. শিশু মনস্তত্ত্ব বিষয়ক ছড়া
১৩. বিবিধ।

পরিশিষ্ট-২ ঃ সংগৃহীত ছড়ার সংকলন

১. সমাজ বিষয়ক ছড়া

বিশেষ বিশেষ শব্দের অর্থ ও কোনো কোনো শব্দের উৎপত্তিগত তথ্য বা ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ—

১। খরার দিনে খরা রে
বর্ষার দিনে পাঁয়ি
যে যেমন লোক আমি
চলিয়া গেনে জাঁয়ি

পাঁয়ি— পানি (জল) > পাঁয়ি
জাঁয়ি—জানি (জানি) পূর্ববর্তী সূত্র প্রযোজ্য।

২। ব্যাপারে হ্যাপার লাব
লক্ষ আয় চাষে
তা হইতে অধিক লাভ
কলম ক্ষুচার কাছে

লাব—লাভ > লাব
সূত্র ঃ ভ>ব (বর্গীয় ব্যঞ্জনের স্থান পরিবর্তন)
ক্ষুচা— খোঁচা ($\sqrt{}$ খুচ্+অ+আ)
সূত্র ঃ খু<ক্ষু, ক্ষু=(ক্+ষ) < খু

৩। কপা কপা ভানুমতি
তিন ব্যায়া হইনে
সউ চিরোলদাঁতি

কপা—মূল শব্দ কপাল। অন্ত্য ব্যঞ্জনলোপ
ব্যায়া—বিবাহ > বিয়া > ব্যয়া

৪। কুঞ্জপুরের কুঠিয়া
সাত্খণ্ডের লোক মুঠিয়া
কাদিরপুরের কুলি
ফুলবাড়ির তেলি

কুঠিয়া— পরিশ্রমে অনীহা যার।
(কুষ্ঠ রোগীর মত অথর্ব)

৫। যার নাই জাইতকুল
সে যায় বাজকুল

জাতি > জাইত, অপিনিহিতিগত পরিবর্তন।

৬। খায় দায় রয় সুখে
তার বাড়ি তমলুকে

৭। খায় দায় না দেয় দাম
তার ঘর নন্দীগ্রাম

৮। কিছু ভালো কিছু জ
তার নাম মহিষাদ

জ—জল > জ (অন্ত্য ব্যঞ্জনলোপ)
মহিষাদ-মহিষাদল>মহিষাদ (অন্ত্য ব্যঞ্জনলোপ)

৯। খাঁদি কোল্কা পঁদি
খাঁদির বাড়ে লাউ

খাঁদি—খ্যাঁদা > খাঁদি
কোল্কা—কোলকে > কোল্কা

	খাঁদিকে সাত শিয়ালে খাউ	পঁদি—পঁদ (পাছা)
১০।	সারাদিন গেল হেলা ফেলা	
	রাইত পাইনে সতীনের জ্বালা	
১১।	হারার মা রে হারার মা	দ্যাক্‌তে ; দেখতে > দ্যাখতে > দ্যাকতে
	রত্‌ দ্যাকতে যাবু	সূত্র ঃ এ > এ্যা
	পথে আছে ভাঙাঠাকুর	খ > ক
	তাই দ্যাক্‌তে পাবু	
১২।	ঘুম পাড়ানি মাসি-পিসি ঘুম দিয়া যাও	
	বাটা ভরা পান দুব গাল ভরিয়া খাও	
১৩।	আমরা দুটি ভাই শিবের গাজন গাই	
	ঠাকুমা গেছে গয়া কাশী ডুগ্‌ডুগি বাজাই	
১৪।	শাউড়ীর্‌ পালা	
	কি বউড়ীর্‌ পালা	
১৫।	ঘর্‌ জ্বালানি	
	পর্‌ ভুলানি	
১৬।	থিলে ঘুটে কুড়ানি	থিলে (ওড়িয়া শব্দ, ক্রিয়াপদ, অতীতকালের ক্রিয়া)
	হইচেন্‌ রাজরাণী	অর্থ ঃ ছিলে
১৭।	দব(অ) কহথিল(অ) এ ঢাকশাড়ী	দব ঃ দিব > দব
	দবা ভয়রে তুম্ভে যাইছ	তুম্‌হে > তুম্ভে (প্রাচীন বাংলা)
	ছাড়িগো ননদী মোর্‌	
	খরা বেলে তুম্ভব(অ) দিশুছি মুহ	বেলে অর্থ বেলা
	পান্‌ খাই পিক্‌ পকাই	খরা বেলা অর্থাৎ দুপুর বেলা
	অছ(অ)গো ননদী মোর	পকাই ঃ (হিন্দি ঃ √ফেক্) ফেলছ
১৮।	বউ কর্‌বু ঝাঁপ্‌ড়ি	‘ঝাঁপড়ি’ অর্থ ঃ পরিপাট্যহীন সাদামাটা বউ
	ঘর করবে হাঁপ্‌ড়ি	হাঁপড়ি লৌকিক শব্দ, অর্থ ঃ পরিপাটি করে সংসার পরিচালনা।
১৯।	কাজ করবু কসি	কসি, অর্থ ঃ ফাঁকিহীন
	ভাগ্‌ লুবু বেশি	লুবু < নিবি

২০।　শাশু বউর লাগছে ঠেকা
বুড়ো শশুরের নাইকো দেখা

২১।　বুড়ি কয় বুড়া শুঁয়ে　　শুঁয়ে ঃ শোনা > শুনা > শুঁয়া > শুঁয়ে
ধান কুটে বউ আপন মনে

২২।　সাত্ রাজার ধন্ মানিক্ তোর্
তুই্ মরলে কইবে চোর্

২৩।　কাঞ্চন্ কাঞ্চন্ দুদের সর্
কাঞ্চন্ গেল(অ) পরের্ ঘর্
পরের্ বেটা মার্ল(অ) চড়
কাঞ্চন্ আইল(অ) বাপের্ দর্　　স্বরলোপ
বন্ধু বন্ধু কইলাড়ী　　দর ঃ দুয়ার > দর মধ্যব্যঞ্জন লোপ
উল্টিয়া ধার দিয়া পঁন্দ্ মারি

২৪।　আইস(অ) বন্ধু বুসঅ খাটে
পা ধুই আইস(অ) পুকুর্ঘাটে
ভাত খাবত(অ) ধান্ শুকেটে　　টুই অর্থ বাড়ির মাথা, সবচেয়ে উঁচু অংশ।
ঘর যাবত(অ) টুই দিসেটে　　তুঙ্গা > টুউঙ্গা > টুই

২৫।　এটা দিনে ওটা দেয়
নাইলে কুন্ গুলামটা দেয়

২৬।　কাই করিয়ার কে　　কাই, অর্থ ঃ কোথাকার
দুটা আমড়া ভাতে দে

২৭।　আশা দিল(অ) ভরসা দিল
জমি দিবে রুইয়া　　রোপন রোয়া > রুয়া > রুইয়া
আষাঢ় মাস্ হইতে
ঘরে রইল(অ) শুইয়া

২৮।　পেট্ করেছি ভারি
কুন্ শালার্ ধারি

২৯।　(মেয়ে) কুড়িতেই বুড়ি
(ছেলে) তিরিশে ফিনিস

৩০। লয় কিঁয়া ছয় বিকে   কিনে > কিনিয়া > কিঁয়া
ব্যাটা আমার ব্যাবসা শিকে   খে > কে

৩১। নয় ছয় ভাগ্যে হয়

৩২। লয়ায় ল পঁ   পণ > পঁ (পণ মূল্য)
পুন্যায় ছ পঁ

৩৩। মনটা করে কুরুকুরু
চওড়া কপাল শুরু ভুরু
কার ভাগ্যে কি আছে গুরু
পঁচিশ টাকায় জীবন শুরু

৩৪। সুখের সংসার ভেঙে গেল
বিলাসিতা হল দামী
স্ত্রীকে সুখে রাক্‌তে গিয়ে
স্বামী হল আসামী

৩৫। নিমাই সন্ন্যাসী হল
কাঁদে শচীর হিয়া
চারিদিকে শূন্য দ্যাখে
ওগো বিষ্ণুপ্রিয়া

৩৬। তোমার ঠিকানা যাই হোক্ না
আমার দক্ষিণবঙ্গা
বাঁশগড়ার বাজারে হবে
ঠিকানা পশ্চিমবঙ্গা

৩৭। তিনবার তিনকাঁড়ি
ভাতারকে দেখিয়া এ্যককাঁড়ি

৩৮। জয়ের পরে খরা হয়
তার্ বড়(অ) চিড়্চিড়ানি   সং বধূটিকা > প্রা. বহুড়িয়া >বাং—বউড়ী,
বউড়ী হইয়া সাউড়ী হয়   বহুড়ী > বউড়ী
তার বড়(অ) ফড়্ফড়ানি

৩৯। তু ননদ্ কইবু যেতে
তো ননদ্ কইব(অ) তেতে

৪০।	সেই ঘইতা করলু	সং ভর্তা, ভর্ত্তৃকা > বাং ঘৈতা, ঘইতা
	বইস গড়িগড়ি	গড়ি গড়ি। অর্থ ঃ বয়স গড়িয়ে গেল
৪১।	কাজের কুড়িয়া	কুড়িয়া অর্থ ঃ কুঁড়ে (অলস)
	ভোজনের দেড়িয়া	দেড়িয়া অর্থ ঃ দেড়জন মানুষের খাওয়ার একা একা।
৪২।	কাঁক পেটা খায় দায়	কাক পেটা অর্থ ঃ ভুঁড়ি শূন্য পেট
	ডাবুর পেটার নাম যায়	ডাবুর পেটা ঃ পেট-জোড়া ভুঁড়ি (বড় হাতার সাদৃশ্য)
৪৩।	দিষ্টে আঁটেনি	দিষ্টে < দৃষ্টিতে
	ফাঁড়ে ধরেনি	ফাঁড়ে < ভাণ্ডে (পেটরূপ ভাণ্ড)
৪৪।	ঢামে ঢোল ভিত্রে পোল	ঢাম ঃ বাহ্যাড়ম্বর
	বাপের ঘরে শাঁখা শাড়ী	
	স্বামীর ঘরে বোল	
৪৫।	এ্যক পায়ে জুতা	
	খাঁড়া হারে কুত্তা	হারে। ঘরে > হারে
	খাঁড়াদরকে যাবনি	সূত্র ঃ ঘ হ-শ্রুতি
	কুত্তা ভাজা খাবনি	
৪৬।	আহারে ভালোমন্দ নাই	
	যেদিন যাহা মিলই	
	সানন্দে আহার্ করই	
৪৭।	বেলা হল(অ) তা গাছে	
	চোখের জয়ে শাগ্ ভাজে	জল, জলে > জয়ে
৪৮।	আছে গরু না বয় হাল	
	তার দুক্খ চিরকাল	
৪৯।	পোর লত্রায় পৌতি খায়	বাঞ্জা ম্যায়া, অর্থ সন্তান হয়নি এমন নারী
	বাঞ্জা ম্যায়া চায়া যায়	বাঁজা > বাঞ্জা
৫০।	মার কথা চেঁদিয়া কথা	চেঁদিয়া < ছেঁদা (পয়সা)। অর্থ ঃ মূল্যহীন
	বউর কথা সদ্	সৎ > সদ্।

৫১। জঁতায় ন দেলু তুঁড়ে
মইনে দেলু মুঁড়ে ওড়িয়া প্রভাব

৫২। যাকে দেখ্বুনি হাটেবাটে
তাকে দেখ্বু গেড়িয়াঘাটে

৫৩। জানার কুন(অ) শেষ নাই
মার খাবার কুন(অ) বয়স্ নাই

৫৪। তালপাতার তৈরী তুমি
নামটি তোমার পাখা
শীতকালে শত্রু তুমি
গ্রীষ্মকালে সখা

৫৫। এসো জামাই বসো খাটে
গা ধুয়ে আসো গেড়িয়াঘাটে
পিট্ ভাঙ্‌ব(অ) চ্যালা কাঠে
কাঁদবে শুদু মাঠে ঘাটে

৫৬। ঝি রইনে জামির আদর জামির (জামাইর)
নাইনে জামি গাছের বাঁন্দর

৫৭। কাছের কুটুম ছঁচের্ লাতা ছঁচ (শুচিতা নির্ধারক), নিকানো
দূরের কুটুম ফুলের্ ছাতা

৫৮। দিনে দিনে করিয়া খাইলি মাসে
এক্কাদিনা পৌঁছি গেল জঁ তিরিশে জন > জঁ

৫৯। মা মরল মাউগ বেইল
যউ তিনকে সই তিন হইল

৬০। আয়ু ভাতে ভাত আলু > আয়ু
কুটুম থাকবু কত(অ) থাক্

৬১। দূরে যত(অ) রইবু
আদর্ তত(অ) পাইবু

৬২। গরীবের মাউগ
সকলের শালা-ভাউজ

৬৩। আঞ্জুলে জড়িতে কানা নাই তাঁবুর ফরমাস

৬৪। ম্যায়ালোকের পদে পদে দোষ — ম্যায়ালোক ঃ স্ত্রীলোক (মাতৃশব্দ জাত)
৬৫। ঘড়া দেখিয়া খড়া — ঘড়া < ঘোড়া

৬৬। মা মরু মাউসী থাউ

৬৭। মন ভাঙ্‌লে চপ্‌রা
হাঁড়ি ভাঙ্‌লে খপ্‌রা

৬৮। এ্যাতো বড় কমলালেবু
তার ভিত্‌রে জামাইবাবু
জামাইবাবু অপমান
বউ করেছে বুদ্ধিমান
ছেলে মেয়েরা পাড়ায় যাবে
লাল কুত্তা ভেজে খাবে

৬৯। এক দুই তিন
পায়ে পড়ল ডিম
পা হল ঘা
ডাক্তারখানায় যা
ডাক্তারখানা বন্দ
আমার নাম নন্দ
নন্দ ব্যাটারি
পুকুর কাটারি
পুকুরে নাই মাচ্‌
নন্দ তোর বউকে লিয়া লাচ্‌

৭০। ভাণ্ডারে নাইকো ঘি
ঠক্‌ঠকালে হবে কি

৭১। গোলাপ ফুল তুলতে গ্যালে

হাতে লাগে কাঁটা
বন্ধুর কথা মনে পড়্নে   পড়নে < পড়লে ঃ ল > ন
প্রাণে লাগে ব্যাথা

৭২। ঝি দুবুনি   ঝি ঃ কন্যা
পঁয়ে ফাটিবু

৭৩। চিনি খাওয়া পো গয়ে
কুঁড়া খাওয়া পো বয়ে

৭৪। ওয়ান, খায় পাকা পান
টু, খায় গু
থ্রি, পায়খানার মিস্ত্রি
ফোর, জুতা চোর
ফাইভ, পঁদে পাইপ
সিক্স, খায় ভিক্স
সেভেন, গল্লা খাবেন
এইট, ওড়ায় কাইট
নাইন, সুপার ফাইন
টেন, পকেটে পেন

৭৫। খঁড়ে কাজ নাই   খঁড়ে ঃ খণ্ড, একখণ্ড
মাগির দঁড়ে অব্সর্ নাই   দঁড়ে ঃ দণ্ড (সময় বিভাজন)

৭৬। পৈতা কালো বামুন ভালো
পৈতা সাদা বামুন গাধা

৭৭। চাড়ী রে চাড়ী তোর ঘর যে পুড়ি গেলা   চাড়ী ঃ দুষ্টতাযুক্ত
ঘর পুড়নে কি হইলা আমার চাড়্ তো রইলা   চারণা আছে যে নারীর।
চারী < চাড়ী, র<ড়

৭৮। যাচ্ছ কোথায় ? পিরিত্ যেথায়
আসবে কবে ? চট্বে যবে

৭৯। বড় বউকে ঠেঙ্গা লাঠি
কন্যিয়া বউকে সনার কাঁঠি   কন্যিয়া ঃ কনিষ্ঠা স্ত্রী
বড় বউকে মার মার
কন্যিয়া বউকে গলার হার

৮০। মায়ে কয় ছোটো ছোটো
বাপে না দেয় ব্যায়া
আর কতদিন রাখব যৌবন
আঞ্চল ঢাকা দিয়া

৮১। সাদ্ ছিল মোর বাঁধব ছোটোঘর
জান্‌লা দিয়া দেখব আমি
বার নদীর চর

৮২। অমুন খাঁদির ব্যায়া যায়নি
খাঁদি ঃ নাক খাঁদা কন্যা
ঢোল খুঁজিয়া মরে

৮৩। ছোট বউ ভাত রাঁদে
চায়ে উঠে ধুঁয়াঁ
চায়ে ঃ চালে (খড়ের চাল)
বড়ো বউ মুড়ি ভাজে
ব্যাগ মুড়ি চুঁয়া
ব্যাগ < বেবাক

৮৪। বোনের সঙ্গো দুপুরবেলা
হলুদ জামা গায়
আম-কাঁঠালের ছায়া পথে
কোন্ গাঁয়ে সে যায়

৮৫। হাম্‌তো কল্‌মীকে ছাড়ে গা
লেকিন কল্‌মীতো নেহি ছাড়েগা

৮৬। গরু হারা মাউগ্ মরা
দাউদ্ গায় যার
দাউদ ঃ (চর্মরোগ বিশেষ)
সদাই বিরস বদন
মনে সুক্ নাই তার

৮৭। বক আর ঝক্ কানে দিছি তুলা
ঝক্ (বকাঝকা) ; খণ্ডিত শব্দ
মার আর ধর পিঠে বেঁধেছি কুলা

৮৮। আমার কত্তা সভায় হারন্‌নি
কত্তা < কর্তা
কারুর কথা শুনন্ নি

৮৯। চোরে চোরে মাসতুতো ভাই
এর ব্যায়ায় ওর হা কামাই — ব্যায়ার ঃ বিবাহের

৯০। সুজন বাজায় কুজন গায়
অতি পড়ামুয়া লাচ্‌তে যায় — পড়ামুয়া ঃ পোড়ামুখো

৯১। দাদু কেমন ভালো
চোক্‌ কাঁদো কাঁদো

২. প্রকৃতি বিষয়ক ছড়া

৯২। ডুব ডুব ডুব নদীতে
বিড়াল কাঁদে গদিতে
ও বিড়াল তোর ভাগ্য ভালো
পৃথিবীটা উল্টে গেল
আপেল শক্ত
বেদানা রক্ত
মিষ্টির রস
খায় ঢক্‌ঢক্‌

৯৩। এক্‌তলা দুতলা তিন্‌তলা
পুলিশ যাবে নিম্‌তলা
পুলিশের হাতে লম্বালাঠি
ভয় করবে না কংগ্রেস পাটি
কংগ্রেস পাটি বারোটা
ডিম পেড়েছে তেরটা
একটা ডিম নষ্ট
চড়াই পাখির কষ্ট।

৯৪। শুষ্‌নি শাগ্‌ বলেরে ভাই — শাগ < শাক (বর্গীয় বর্ণের স্থানান্তর)
আমার চারমাথা
ঘুম ঘুম পায়রে ভাই
খাইলে আমার পাতা

৯৫। চিরকাল গেল ঝোটপাতা খাইয়া — ঝোটপাতা ঃ তিক্ত পাটপাতা
বুড়া শিবকে সেলাম করে চিৎপিটিয়া শুইয়া — ইং ঃ জুট < বাং ঝোট

৯৬। গিমা শাগ্‌ বলেরে ভাই
আমি বড় তিতা
আমাকে যে ভাঙ্‌তে আইস্‌বে
মরা মাছের গুতা — গুতা < যুত (রান্না যুত)

৯৭। কাজ নাই মোর গিরিয়া শাগে (সমুদ্রতীরবর্তী নোনতা শাক)
নু দিনে মোর কেমন লাগে

৯৮। লাতুন লাতুন লাতু লো
শাগ্ তুইতে যাই লো
শাগে আছে বাওয়া পকা   পক < পোকা
তোর দাদু খাইলো

৯৯। মাচ্ ধরবু খাবু সুখে
পাট্ পড়বু মরবু দুখে

১০০। খালা দেখ্বু যেঠি   যেঠি ঃ যে স্থানে; ঠি < ঠাঁই
মাচ্ ধর্বু সেঠি

১০১। বাঁশ ভাবছে ঝাড়ে
কত্বা উঠ্ব ঘাড়ে

১০২। জোড়া শালিক ভালো
বিজোড় শালিক দেখ(অ) যদি
দিন্টা হবে কালো

১০৩। তেতু গাছে বাঁসা   তেতু < তেঁতুল
বউ ভাঙ্ল কাঁসা
সে বউ কাই
জ আঁইতে যাইছে   জ < জল (বর্ণলোপ)
সে জ কাই
সাপ ছুঁয়া দিছে
সে সাপ কাই
বঁয়ে ঢুকিছে   বঁয়ে < বনে (উচ্চারণে শ্লথতা)
সে বঁ কাই
ধবা কাটিয়া লিছে   ধবা < ধোপা
সে ধবা কাই
কাপড় কাচ্তে যাইছে
সে কাপড় কাই
রাজা পরিলিছে
সে রাজা কাই
পাখি মারতে যাইছে
সে পাখি কাই
গগনে ফুরুত্

১০৪। টুনটুনি পাখি
নাচত(অ) দেখি
না বাকা নাচ্‌ব(অ) না
পড়ে গেলে বাঁচব(অ) না
পড়েছি বেশ করেছি
তোর কি ক্ষতি করেছি

১০৫। বড়(অ) বড়(অ) গাচ্‌ দেখিয়া পাখি করে বাসা
বড়(অ) বড়(অ) ঘর্‌ দেখিয়া দুঃখী করে আশা

১০৬। বানের জ এসে
সব গেল ভেসে

১০৭। ঝড় হটে
তা গাচ্‌ লড়েঠে — তা < তাল (অন্ত্যব্যঞ্জন লোপ)
তা গাছের গড়া কাটিয়া দেই
তা গুড়ি লিয়া যাই — গুড়ি < কুড়িয়ে (বর্গীয় ব্যঞ্জনের স্থান পরিবর্তন)

১০৮। নদীর জ কল্‌ কল্‌ করে
সোয়ামীরে মনে পড়ে

১০৯। ঝড়ুয়া ব্যায়া ঘর্‌ ছায় — ঝড়ুয়া ব্যায়া ঃ ঝড়-জলের সময়
খরা ব্যায়া ঘুমি যায়

১১০। পরের মেড়া পর্‌ খাবে — মেড়া < ভেড়া (বর্গীয় ব্যঞ্জনের স্থান
আমার কইনে কি হবে — পরিবর্তন)

১১১। সাত্‌ গাইর রস
এ্যক বুড়া হালিয়ার চাষ — হালিয়া ঃ হালচাষের বলদ

১১২। চোর্‌ পড়্‌শি বব্‌রা ভাই — বব্‌রা ঃ বোবা, মূর্খ, অপোগণ্ড।
ছাঁদা ঘটি দুষ্ট গাই
ঘরে উড়স্‌ ছেলে মূর্খ — উড়স্‌ ঃ ছারপোকা
এই ছয়টি বড়ই দুঃখ

১১৩। কানা বক্‌ শুক্‌না গেড়িয়া — গেড়িয়া ঃ গড় পুকুর, গড়খাই
থাউ নাই থাউ আছে পড়িয়া — থাউ ঃ থাক্‌ ('স্থিত' শব্দজাত)

৩. জাদু বিশ্বাসমূলক ছড়া

১১৪। আয় বিষ্টি ঝেঁপে
ধান দুব(অ) মেপে
ধান হবে কাঁড়ি কাঁড়ি
আয় বিষ্টি আমার বাড়ি

১১৫। লেবুর পাতায় করম্ চা
যা বিষ্টি থামিয়া যা

করম্চা ঃ করমচা (একপ্রকার টক-মিষ্টি ফল)

১১৬। রোদ হটে জ হটে
শিয়া-কুত্তার ব্যায়া হটে

শিয়া-কুত্তা ঃ শিয়াল-কুকুর

১১৭। জয়ের পকা জ'কে যা
আমার শিলেট শুকি যা

পকা ঃ পোকা

১১৮। থু থু থু
আমার বঁড়্শির মাচ্
অক্ষুনি পড়্বু

১১৯। ভূত আমার পুত
পেত্নী আমার ঝি
বুকে আছে রামলক্ষ্মণ
ভয়টা আমার কি

১২০। আমি হই ব্যায়া ম্যানা
মন্ত্র তন্ত্র আছে জানা
ভূত পেত শাকচুন্নী
বাক্স ভিত্রে কর্ব বন্দী

ব্যায়া ঃ বায়া < বাবা (স্নেহার্থে)

১২১। মা মনসা বিষ ঝাড়ে
বিষ যা তুই গোবর বাড়ে

১২২। বিষ নামিবু ঝট্পট্
ব্যায়াকে ডাক্ পট্পট্

১২৩। বেগুন বাড়ির পাশে
ভুঁড় শিয়ালী নাচে
ন্যাংটা টকা দ্যাক্তে পাইনে
মুখে লিয়া ছুটে

১২৪। ধা রে মশা ধা
ল বঁ কে যা — ল বঁ ঃ নলবন (জড়তা ও শ্লথতা-জনিত
লয়ের চঙগা ফুক্কিয়া দিনে — উচ্চারণের অসম্পূর্ণতা)
সর্গে উঠিয়া যা

১২৫। দৃষ্টি দৃষ্টি কু দৃষ্টি এক্ষুণি যা
নাইলে তোর্ পিট ভাঙ্‌বে চাপড়্ চাপড়্ ঘা

১২৬। যত কর সুরু পিঠা
পচা চাইনে কাদো পিঠা

১২৭। আমার নাম বিন্দাবনী
ভালো ফুঁ দিতে জাঁয়ি — জাঁয়ি ঃ জানি

১২৮। ঘাড়ে ব্যাথা পিঠে ব্যাথা
শীঘ্র ছাড়ি পালিবে হোতা

১২৯। বাত ভালো পিত্ ভালো — পিত্ ঃ পিত্ত
তেল আছে মালিস্ করো

১৩০। ময়নামতী ফুঁক্ ঝাড়ে
বাত বেদ্‌না কাটিয়া পড়ে

১৩১। এ বিলর লো গিমা সে বিলর লো গিমা
খসি পড়ু পাগ্‌লার শাশুর চখুর ডিমা — শাশু < শশ্রু (শাশুড়ী)

১৩২। এ বিলর লো ফুল সে বিলর লো ফুল
খসি পড়ু পাগ্‌লীর শাশুর কানের দুল

১৩৩। আমার নাম চিন্তামণি
ভালো পান ভাঙ্‌তে জাঁয়ি
আমার অসুদ কড়াকড়া — অসুদ ঃ ঔষধ
ছেলে হবে জড়াজড়া

৪. প্রেম বিষয়ক ছড়া

১৩৪। শিশিরে কি ফুটে ফুল
বিনা বরিষণে
চিঠিতে কি ভরে মন
বিনা দরশনে

১৩৫। আম গাছে আম নাই
ঢিল মারি কেন
তুমায় আমি ভালোবাসি
কইতে পারি না কেন

১৩৬। সাইকেলে যেতে যেতে
ফেটে গেল টিউব
টিউবে লেখা আছে
আই লাব্ ইউ

১৩৭। পিউ পিউ পিউটি
দেখতে তোমায় বিউটি
তুমার সাথে দেখা করা
সেটাই আমার ডিউটি

১৩৮। ধান ঘাটু ঘাটু কন্যাগো হস্তে পাকা পান
বুকের মাঝে বিফল দুটি ব্রাহ্মণকে করদান
ভাল বলেছ ব্রাহ্মণ ঠাকুর ভাল বলেছ তুমি
চোদ্দ বছর না জানি স্বামী
হাটের হাটানি বলে ওটি তোমার কে?
লজ্জার খাতিরে পড়িয়া ওটি আমার ঠাকুরদা হে

১৩৯। তুমি হও বটবৃক্ষ
আমি হই পাতা
তোমার বুকে শুইয়্যা আমি
কইব মনের কথা

১৪০। মা মরে ঝিঅর(অ) লাগি
ঝিঅ মরে তার লাগর লাগি

১৪১। যারে যারে ভাব
তার মু চাইনে লাব্

১৪২। জলে যখন নেমেছি মাচ্ তো ধরবই
ভালো যখন বেসেছি বিয়ে তো করবই

১৪৩। উড়ে গেল পজাপতি
পড়ে গেল ফাঁদে
দিদির পা দু-খানি
দাদাবাবুর কাঁদে কাঁদে < কাঁধে। দ < ধ

১৪৪। যতই সাধিবু
ততই মনের কথা পাইবু

১৪৫। ভাতার্ গেছে কাতারপুর
ছাতা মাথায় দিয়া
আস্বে ভাতার্ দ্যাখবে মুক্
নূতন টাকা দিয়া

১৪৬। ভাঙা ঘরে পাখির বাসা
বুড়াবুড়ির ভালোবাসা

১৪৭। ঘরেতে বর আমি
রইব(অ) সুখে দুজনে
সতীন মাগি আসে যদি
থাপ্পড় দুব(অ) কানে

১৪৮। যার লাগি মোর ছিঁড়া কাঁথা
তার সাথে মোর নাইকো দেখা

১৪৯। ফুল কেন ফুটেছিল
যাবে যদি ঝরে
ভাল কেন বেসেছিলে
যাবে যদি চলে

৫. প্রতিবাদ বিষয়ক ছড়া

১৫০। যারুর্ খাবু যারুর্ পরবু যারুর ঃ যার
তারুর্ বুকে চু ছিঁড়্বু তারুর ঃ তার

১৫১। বাবুভায়াদের দিলে ধার
আস্‌তে যাইতে নমস্কার

১৫২। নাই দুয়ার ভাতার্‌ যে
নানা গীত গায় সে

১৫৩। পরের বউ ভালো
নিজের বউ কালো

১৫৪। পরের পিঠা বড্ড মিঠা
নিজের পিঠা বড্ড তিতা

১৫৫। ভাতকে টান্‌ টান্‌
পিঠাকে খান্‌ খান্‌

১৫৬। যে করে পরের মন্দ
তার মন্দ করে গোবিন্দ

১৫৭। পরের ছেলে পরমানন্দ
নাই পড়নে খুব আনন্দ   পড়নে < পড়লে, ন < ল

১৫৮। আমার ছেলে ছেলেটা
খায় যেন এতটা
নাচে যেন ঠাকুরটা
পরের ছেলে ছেলেটা
খায় যেন এত্তটা
নাচে যেন বাঁদরটা

১৫৯। ভাত্‌ দুয়ার মুরত্‌ নাই   মুরত ঃ মুরদ মরদের (স্বামী) আচরণ।
কিল মারবার গোঁসাই

১৬০। যত কর হাঁইপাঁই
পাঁচশিকার বেশি নাই

১৬১। ঢেকুয়া পঁদে তসর
খ্যাদা নাকে বেসর

১৬২। কাঁহির কালে নাইকো দুলি
আজ দেইছন্ দুঠ্যাং তুলি

কাঁহির ঃ কোন কালে, কোন অতীতে

১৬৩। পেটে নাই দানা
পঁদে বেনারসী কানা

কানা ঃ কানাত (দামি কাপড়)

১৬৪। পড়্শি নাই যেঠি
ঢাম দেখিবু সেঠি

ঢাম ঃ বাড়াবাড়ি রকমের ঐশ্বর্য প্রদর্শন
ঠাম < ঢাম

১৬৫। ছিঁড়া জুতা বুড়া বাপ
যত(অ) খাটিবু তত(অ) লাব্

৬. ক্রীড়ামূলক ছড়া

১৬৬। উবু,
দশ কুড়ি
তিরিশ চল্লিশ
পঞ্চাশ ষাট্
সত্তর আশি
নব্বই সয়

১৬৭। আঁতা পাতা তুলসীপাতা
যে হবে সে সবার রাজা

১৬৮। আক্কর বাক্কর বম্বে বো
আশি নম্বে পুরে শ
শ পে লাগা ধাগা
চোর পুলিশ ভাগা

১৬৯। তা গাছে জ দিতে দিতে
কোমর ভেঙে গেল
একটা তা খুঁজে পেলাম না
চোরের পেটে গেল
চোর চোর চিচিঙ্গা
চোরের মুখে মুতিঙ্গা
চোর গেল মহিষাগোঠ
খেয়ে এল গোরুগোঠ

চিচিঙ্গা ঃ সরল, লম্বা সব্জী বা আনাচ বিশেষ
মহিষাগোঠ ঃ স্থাননাম
খেয়ে ঃ ধেয়ে (খ < ধ)

১৭০। এই ছেলেটা ভেলভেলেটা
খেল্‌তে যাবি পয়সা পাবি
সীতাহরণ ছুটবি খালি
সীতার সাথে পালিয়ে যাবি
ধরা পড়লে ঠেঙগা খাবি
না পড়লে মিষ্টি পাবি

১৭১। আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে
ঢাক ঢোলক ঝাঁঝর বাজে
বাজতে বাজতে চলল ঢুলি
ঢুলি গেল সেই কমলাপুলি
কমলাপুলির টিয়েটা
সূর্যিমামার বিয়েটা
আয় রঙ্গা হাটে যাই
গুয়া পান কিনে খাই
একটি পান ফঁপ্‌রা
মায়ে ঝিয়ে ঝগ্‌ড়া
হলুদ বনে কলুদ ফুল   কলুদ ঃ অবান্তর শব্দজোড়
তারার নামে টগর ফুল

১৭২। ইচিং বিচিং চিচিং চা
পজাপতি উড়ে যা
ভাতে বুসল মাছি
কোদাল দিয়ে চাঁছি
কোদাল হল ভোঁতা
খেঁক শিয়ালের মাথা

১৭৩। লাবণি সরকার
গাছে উঠা দরকার
গাচ্‌ থেকে পড়ে গেলে
অসুদের দরকার
অসুদ নাই ঘরে
টাকা চুরি করে
সাদ্‌দিন পরে
জেল খাটিয়া মরে

১৭৪। টুম্‌পারে টুম্‌পা
গলায় তোর গাম্‌ছা
হাতে তোর বালতি

কাখে তোর কলসী
আমি যদি তোর ছেলে হতাম
কল্‌কাতাতে চাক্‌রী পেতাম
ঝুমুর ঝুমুর পয়সা পেতাম
পান বিড়ি সিগারেট কিনে খেতাম

১৭৫। মিষ্টি দকানী
তুই খ্যাল্‌তে পারুনি
তোর গদা গদা পা
তুই হড়্‌কি পড়ি যা

১৭৬। ডিস্কো ডিবানী
তোকে খ্যাল্‌তে লিবানি লিবানি ঃ নেবনা
তোর গদা গদা পা
তুই হড়্‌কি পড়ি যা

১৭৭। হারকিন বাস্‌ক
নিরানব্বই এ্যাশ্‌ক

১৭৮। বেলা রে বেলা
আমরা করি খেলা
ওই মেয়েটা বসে আছে
ওর কোনো বন্ধু নাই
ওঠো গো ওঠো
চোখের জ মোছ
আকাশ পানে চাও
যাকে ছুঁবে ছুঁয়
১৭৯। আমার এ্যক দাদু ছিল
বিড়ি খাবার লোক
সেই বিড়ি খেয়ে দাদু
বাজারে গেল
বাজারে ছিল ভালুক ভায়া
তাড়া করিল
সেই তাড়া খেয়ে দাদু
গাছে উঠিল
গাছে ছিল কাট্‌ঠোক্‌রা
ঠোক্কর মারিল

সেই ঠোক্কর খেয়ে দাদু
মাটে পড়িল
মাটে ছিল বাব্‌লা কাঁটা
পায়ে ফুড়িল
সেই পা নিয়ে দাদু
বাড়ি ফিরিল
বাড়িতে ছিল টেঁপাটেঁপি
পা টিপিল
সেই পা নিয়ে দাদু
স্বর্গে চলিল
স্বর্গে ছিল শিবদুর্গা
আদর করিল
সেই আদর খেয়ে দাদু
বাঁদর সাজিল

১৮০। ইন্টু পিন্টু টাপা টিন্টু
টান্‌ টুন্‌ ট্যাসা

১৮১। এলেটিং বেলেটিং সইলো
কিসের খবর হইলো
রাজামশাই একটি বালিকা চাইলো
কোন্‌ বালিকা চাইলো
অমুক বালিকা চাইলো

১৮২। একেতে বালিশ খলা
দুয়েতে পাঁপর ভাজা
তিনেতে খেসারী
চারেতে খেজুরী
পাঁচে পাঁচরকমের ভাজা
ছয়েতে ছোলা ভাজা
সাতেতে মটর ভাজা
আটেতে বাদাম ভাজা
নয়েতে ননা ভাজা
দশেতে তেল চুপ্‌চুপ্‌ তেলেভাজা
এগারোতে ঘি চুপ্‌চুপ্‌ ঘিয়ে ভাজা
বারতে বাঘাবাগ্‌ খেলতে যায়
আশি টাকা পায়

আশি টাকার খেসারী কিনে
লাল বাজারে যায়

১৮৩। কচি কচি পেহারা — পেহারা ঃ পেয়ারা
একি তোর চেহারা
কচি গেল পাক্‌তে
রাস্তার লোক দেখ্‌তে
বড়(অ) বাঁধে কে গ
কচাকচির মা
কচি কুক্‌
লবিন চুস্‌ — লবিন চুস < লজেনজুস, ল্যাবেনচুষ
মূল শব্দ ঃ লজেন্স

১৮৪। ছেলি রে ছেলি
তোর ছেলি ধান খেয়েছে
আমার ছেলি লতাপাতা খেয়েছে — ছেলি ঃ ছাগল
আমি তোর ছেলিকে বাঁধ্‌বো
বেঁধে নাও বেঁধে নাও

১৮৫। দাদুগো দাদু
ঘুরতে যাবা
এতদিন কোথায় ছিলি ?
মামার বাড়ি
কী খেয়েছিস্‌
দুদ্‌ ভাত
আমার জন্যে
কাঁচ্‌ কলা

১৮৬। ট্রেন ট্রেন ট্রেন
হাওড়ার ট্রেন
ট্রেন থেকে নেমে এল
সুচিত্রা সেন
সুচিত্রা সুচিত্রা
তোমার পকেটে কী
উত্তমদার জন্য আমি আপেল এনেছি
ও আপেল নেব না
দিদির বিয়ে দেব না
দিদিকে দেব সাজিয়ে
ঢাক ঢোল বাজিয়ে

৭. বর্তমানের ছড়া

১৮৭। হাতে খড়ি শ্লেট নিয়ে
বুড়াবুড়ি পড়বে গিয়ে

১৮৮। সর্বশিক্ষা দিচ্ছে ডাক
সবশিশু শিক্ষা পাক
সর্বশিক্ষা গ্রামে গ্রামে
আলোর শিখা আনল টেনে

১৮৯। আমার কিসের কী
আমার আছে এক্‌শ দিন

কিসের কী ঃ দুঃশ্চিন্তাহীন

১৯০। একশ দিনের কাজ পাইছি
দিল্লী বোম্বাই ভুলে গেছি

১৯১। মহিলা সমিতি কর্‌
পাড়ায় পাড়ায় মিছিল কর্‌
পাবু অনেক সুযোগ-টুযোগ
কম সুদে দিবে লোন

১৯২। কন্যা রত্ন
রাখিবু যত্ন
না রাখিবু আগ্‌লে
নিয়ে যাবে পাগলে

১৯৩। লেখা পড়া যে মেয়ে করে
কন্যাশ্রী যায় তার ঘরে

১৯৪। পরিচয় সভ্যতার
সভার ঘরে শৌচাগার
পেটের রোগের প্রবেশদ্বার
বন্ধ করে শৌচাগার

১৯৫। পায়খানার আগে প্যানে জল
শৌচ করে ঢালব জল
শৌচ পরে সাবান দিয়ে
হাতটি ধুব পরিস্কার করে

১৯৬। ছোট্ট একটি চারাগাছ
তাকে বাড়তে দাও
নিয়মিত স্বাস্থ্য কেন্দ্রে
টিকা নিতে যাও

১৯৭। পেটের অসুখে ও.আর.এস.
ব্যবহার করতে যদি চাও
এক লিটার জলেতে
একটি প্যাকেট মেশাও

১৯৮। আয় করবু ঘরে রইবু
জরির কাজে মন দুবু

১৯৯। কাকু দ্যাখে বেহুলা
দাদু দ্যাখে খবর
দিদা দ্যাখে বাংলা ছবি
কাঁদে সঁপর সঁপর   সঁপর সঁপর (কান্নার নাকী শব্দ)

২০০। জরির কাজে মন দিছি
দিল্লী বোম্বাই ভুলিছি

২০১। আমার জল মিশানো দুদ্ নয় গো
দুদ্ মিশানো জল
একে খেলে ছেলে বুড়া
পায় শরীরে বল
এই দুদেতে পেতেই পার
কুচো চিংড়ি টিকে পনা
একে খেলে ফড়িং হয়
রাম গড়ুড়ের ছানা
বিক্রি আছে কিনবে যদি
এসো আমার বাটিকা
নামেই আমায় সবাই চিনে
নামটি নয়া টীকা
২০২। পাম্পে আছে উদ্যম
বিদ্যুৎ লাগবে কম

২০৩। জীবন যখন একটু ভারি
হাল্কা সোনা মন বাহারি

২০৪। আস্‌ছে পূজার পাঁচ্‌টা দিন
কাট্‌বে খুব মজাতে
প্রথমে আছে ডিকে বসাক
সক্কলকে সাজাতে

২০৫। এবার পূজায় বাড়তি খুশি
সফেদ কিনলে বেনারসি

৮. জাতিমূলক ছড়া

২০৬। মুসলমান অভিমান
দাঁড়ি কুচ্‌কুচ্‌ করে
একটা চুল পড়ে গেলে
আল্লা আল্লা বলে

২০৭। হাটের নিচ্ছা
বাম কে দান

নিচ্ছা ঃ অবিক্রিত নিকৃষ্ট বস্তু
বাম < বামুন < ব্রাহ্মণ

২০৮। বাম ঠাকুর ঠকর(অ)
দাওনা চাটি মকর(অ)

মকর দুগ্ধ-ঘৃত-মধু মিশ্রিত আতপ চালের প্রসাদ। গঙ্গার বাহন মকর। শব্দবিভ্রমে 'মকর' শব্দটি বিশেষ প্রসাদ হিসেবে গণ্য।

২০৯। লুচির উপর পড়ল ডাল
বাম লাচে তায়ে তা

বাম < বামুন
তা < তাল (নৃত্যের তাল)

২১০। লুচির উপর পড়ল দই
বাম বলে খই কই

২১১। বষ্টম টমাটম
কাঁক্‌ড়া খাবার যম
হাঁড়ি ভিত্‌রে কাঁকড়া রাখিয়া
যায় বিন্দাবন

২১২। যৌ ধবা কে সৌ ধবা
ব্যর্থ হইল বৈষ্ণব সাজা

২১৩। যেমন ঠাকুরের তেমন পূজা
কঁ ষষ্ঠীকে খইভূজা

২১৪। জাতর কথা কইব নিগো
জাতর কথা কইব নি
বাপ বাজায় তুতুর তুতুর
মা বিকে কুলা সেনি

৯. রাজনীতিমূলক ছড়া

২১৫। আভা মাতি আইলো
মাইলো ঘাটা খাইলো

২১৬। আভা মাতির মাইলো
জগৎ জুড়িয়া খাইলো

২১৭। শুনলে দাদা হাসি পায়
কাটা হাত ভোট চায়
ভোট দিন বাঁচতে
দা হাতুড়ী কাস্তে

২১৮। ভোট দিলে কাটা হাতে
মরতে হবে আঁতে ভাতে

২১৯। আর নয় দরকার
বামফ্রন্ট সরকার

২২০। জ্যোতিবসুর জ্যোতি নাই
হাত ছাড়া গতি নাই

২২১। জল নাই মেঘ নাই
সিপিএমের ভোট নাই

২২২। অমুক তারিক আসচে দিন
জ্যোতিবসুর বিয়ের দিন

২২৩। তোমার আমার দরে দরে
বামফ্রন্ট ঘরে ঘরে

দরে < দুয়ারে। ঔপভাষিক শব্দ

২২৪। বন্দেমাতরম্
মুড়ি খেয়ে পেট গরম্

২২৫। লড়াই লড়াই লড়াই চাই
লড়াই করে বাঁচ্তে চাই

২২৬। অমুক তারিক অমুক দিন
ভোট কেন্দ্রে যাবার দিন

২২৭। ভোট দিবেন কুন্খানে
পদ্মফুলের মাজ্খানে

২২৮। ভোট দিবেন কুন্খানে
জোড়াফুলের মাজ্খানে

২২৯। চুপচাপ
ফুলে ছাপ্

২৩০। ঘাসের উপর জোড়াফুল
ঘরে ঘরে তৃণমূল
এবার ভোটে জিতবে কে
তৃণমূল কংগ্রেস আবার কে

২৩১। নন্দীগ্রামের মাটি
সোনার চেয়ে খাঁটি

২৩২। নন্দীগ্রামে মমতা
করে দিবে সমতা

২৩৩। আমি যদি ভোটে নামি
রাখ্বনি পচার কমই   পচার < প্রচার (আদি ব্যঞ্জনলোপ)
কী বলবি আমারে আর
অঞ্চল করব ছারখার

১০. পাঠান্তর বিষয়ক ছড়া

২৩৪। ইক্ড়ি মিক্ড়ি চামচিক্ড়ি
চামের কাটা মজুমদার
ধেয়ে এল দামোদর
দামোদরে হাঁড়িকুঁড়ি
দুয়ারে বুসে চালকাঁড়ি

চাল কুটতে হল বেলা
ভাতি খাব কত বেলা
ভাতে বুসল মাছি
কোদাল দিয়া চাঁছি
কোদাল হল ভোঁতা
খা ছুতারের মাথা

২৩৫। তাই তাই তাই
মামা বাড়ি যাই
মামা বাড়ি ভারি মজা
কিল চড়্ নাই

২৩৬। তাই তাই তাই
মামার বাড়ি যাই
মামা দিল দই সন্দেশ
দুয়ারে বসে খাই

২৩৭। তাই তাই তাই
মামাদরকে যাই — মামাদরকে ঃ মামার দুয়ারে, বাড়িতে।
মামাদরে ভারি মজা
কিল চড় নাই

২৩৮। তাই তাই তাই
মামা বাড়ি যাই
মামি এল লাঠি নিয়ে
পালাই পালাই

২৩৯। বড়(অ) বউ বড়(অ) ঘরের ঝি
তারে আর বলব কি
মাজিয়া বউ মজা কাটে
কথা কইনে ঝম্কি উঠে — ঝম্কি ঃ মুখ ঝামটা
সাজিয়া বউর মুখে পান
গুম্রি ভিতর্ কুটে ধান
ছোট বউ দুদের লাউ
তার দিয়া মোর জীবন থাউ

২৪০। উঁচ্ কপালী চিরুণদাঁতি
তোর কপালে নাইকো পতি

২৪১। উঁচ্ কপালী চিরা দাঁতি
তোর কপায়ে নাইকো পতি

২৪২। পাড়া-ধড়্কী ধকড়্ ধাঁই   ধড়্কী ঃ ধাড়ী, গোঁয়ার, স্বাধীনচেতা
তোর কপালে পাল্কী নাই

২৪৩। পরের ছেলে পরমানন্দ
পড়ু নাই পড়ু মহা আনন্দ

২৪৪। পরের ব্যাটা পর্মানন্দ
মূর্খ রইনে খুব আনন্দ

২৪৫। মাসিপিসি বনগাঁবাসি বনের ভিতর ঘর
কখনো মাসি বলেনিতো খই মোয়াটা ধর
কিসের মাসি কিসের পিসি কিসের বিন্দাবন
এতদিনে জানলাম মা বড় ধন

২৪৬। মাসিপিসি বনগাঁবাসি কয়াবয়ে ঘর   কয়া < কলা
গটে কয়া দিলুনি মাউসি জামি-ভাতার কর   জামি ঃ জামাই

২৪৭। সারাদিন ভেবে মরি ভিক্ষা করি
রেঁদে দিবে কে
কাল থেকে বোষ্টমী আমার
জবাব দিয়েছে

২৪৮। বুড়া ভাব্চ কি বসে
দরে ফকির বসেচে
কাল থেকে বোষ্টমী আমার
জবাব দিয়েছে

২৪৯। ধ করতে প নাই
কম্লী শাগে জিরা

২৫০। পঁদ পুড়িয়া খাইতে নু নাই
কম্লী শাগে জিরা

২৫১। উদ্ খাইতে খুদ্ নাই   উদ্ < হুত = আগুন (গরম)
কম্লী শাগে জিরা

২৫২। চাল্‌তা পাতা চাল্‌তা পাতা
বিয়ে দিবি তো দে
এতদূরে দিস্‌ না বাবা
ছাড়তে যাবে কে
দিদিকে দিল আশেপাশে
আমাকে দিল নদীর পাশে
বাবার কি চোক্‌ ছিল না
আর কি বর পেল না

২৫৩। চাল্‌তা পাতা চাল্‌তা পাতা
বিয়ে দুবুতো দে
তোর বিয়েতে লাচ্‌তে যাব
ঝুমকা কিনে দে
দিদিকে দিল আশেপাশে
আমাকে দিল নদীর পাশে
নদীর জ কল্‌কল্‌ করে   জ < জল
মায়ের কথা মনে পড়ে
বাবার কি চোক্‌ ছিলনি
আর কি বর পেলনি

২৫৪। ইড়ি বিড়ি সিড়ি
দু পয়সার বিড়ি
বিড়িতে নাই আগুন
হয়্যা গেল বেগুন
বেগুনে নাই বিচি
হয়্যা গেল কাঁচি
কাঁচিতে নাই ধার
হয়্যা গেল হার
হারে নাই লকেট
হয়্যা গেল পকেট
পকেটে নাই টাকা
হয়্যা গেল ফাঁকা

২৫৫। ইড়ি বিড়ি সিড়ি
পাঁচ পয়সার বিড়ি
বিড়িতে নাই আগুন
হয়ে গেল বেগুন
বেগুনে নাই বিচি
হয়ে গেল কাঁচি

কাঁচিতে নাই ধার
হয়ে গেল হার
হারে নাই লকেট
হয়ে গেল পকেট
পকেটে নাই টাকা
হয়ে গেল ফাঁকা
ফাঁকাতে নাই গাড়ি
ফিরে এলাম বাড়ি
বাড়িতে নাই ভাত
বউকে মারি লাত্

২৫৬। মামনি সরকার
গাছে উঠা দরকার
গাচ্ থেকে পড়ে গেলে
অসুদের দরকার — অসুদের < ওষুধের
অসুদ নাই ঘরে
টাকা চুরি করে
সাদ্দিন পরে
জেল খেটে মরে
পুলিশ মামা টাটা
আণ্ডার প্যান্ট ফাটা
আণ্ডার প্যান্টে দড়ি নাই
বিয়ে করতে মনে নাই

১১. রঙ্গ-ব্যাঙ্গমূলক ছড়া

২৫৭। বাম ঠাকুর বাম ঠাকুর
ঘোলে শাদ্দ হয়? — শাদ্দ < শ্রাদ্ধ (সমীভবন)
কুন্‌শালা কয়?
তুমার বেটা শালা কয়
ও তিথি অনুসারে হয়

২৫৮। ভবানী কাপড় কাচে
দু-ঠ্যাং তার বাব্‌লা গাছে

২৫৯। বৌদি ঘাটে নেমেছে
দাদা দেখ্‌তে পেয়েছে
দাদা দেখ্‌তে পেয়ে
ঢিল ছুঁড়েছে
বৌদি কাঁদ্‌তে বসেছে

দাদা মিষ্টি এনেছে
বৌদি খুশি হয়েছে

২৬০। ওল মুড়া গোল মুড়া
সাগর দাসের লাতি
জঁ পাঁচ ছয় যুক্তি করিয়া   জঁ < জন
ওলে বুসিয়া মুতি

২৬১। এ বিলর লো চিকনী সে বিলর লো চিক্‌নী
খসি পড়ু পুতুলের শাশুড় মাথার উক্‌নী

২৬২। হাট গেলাম বাজার গেলাম
কিনে আনলাম লাউ
হারার মা লাউ খাইয়া
করে হাউহাউ

২৬৩। ফি ফুয়ে ফুত্‌না ফুতন্‌
শায়ুক ফুয়ে ফুত্‌না ফুতন্‌   শায়ুক < শালুক, ফুয়ে < ফুলে
কি বিধাতার ঘত্‌না ঘতন্‌   ফুতনা ফুতন ঃ ফুটনা ফুটন
ঘতনা ঘতন ঃ ঘটনা ঘটন

২৬৪। ঘর নাই দর বাঁদে
মাউগ নাই পোর তরে কাঁদে

২৬৫। আদরিনী চাদর গায়
ভাত পায়নি ভাতার চায়

২৬৬। ভজহরি ডাক্তার
আগে ছিল মোক্তার
হয় যদি জ্বর-কাশি
খেতে দেয় পান্তা বাসি
হলে কারো অম্বল
দেয় চাপা কম্বল

২৬৭। কন্যিয়ার মা কাঁদিয়া মুতে
বরের মা হাসিয়া লুটে

২৬৮। বার্‌তি বার করছে
মুক করছে লেউল   লেউল < নকুল
রাইত পাইনে লিয়া বুসবে
এগরার দেউল

২৬৯। আলু পটলের তরকারী
শিবের মাথায় জল ঢালি
শিব গেল বোম্বে
পার্বতী গেল সঙ্গে
উঁচা উঁচা রাস্তা
হিল তুয়া জুতা
জুতার হিল ভেঙে গেল
পার্বতী পড়ে গেল

২৭০। বালিকা বাদাম বালি
তিন নিয়ে হয় কাঁথি

২৭১। যা দেখিনু বাপের কালে
গোপ আঁকিনু তপ্‌ড়া গালে   গোপ < গোঁফ

২৭২। বৌদি পুকুরঘাটে কী
দাদা এলে বলে দেবো
আচ্ছা মাগীর ঝি

২৭৩। বৌদি পুকুরঘাটে কী
দাদা এলে বলে দেবো
শাকচুন্নীর ঝি

২৭৪। পট পট করে যে
পোক্ পড়িয়া মরে সে

২৭৫। গড়ের মাঠে দেখে এলাম
মশার পেটে হাতি
এমন খবর শুনেছ কি
হিঁচ্‌ড়ে পোয়াতি

২৭৬। আমি মরিঠি পানের তরে
গাঁড়্‌পশানে ঠাট্টা করে   গাঁড়পশানে ঃ গালাগাল বিশেষ

২৭৭। লোকে লোকারণ্য জনমানব শূন্য

২৭৮। গায়ে গা লাগেনি ভিড়ে চলা যায়নি

২৭৯। নিরামমিষ্য
পাঁঠার ঝোল

২৮০। ট্যারা গাড়ি কিনেছে
টেরি চড়বে বলেছে
ট্যারা ব্রেক টিপেছে
টেরি উল্টে পড়েছে

২৮১। পচা পচা পঞ্চান্ন
পচার বউ ছাপান্ন
পচা যাইছে দিল্লী
পচার বউ আঁড়িয়া বিল্লি

২৮২। লালি লাল গাম্ছা গায়
লালি হড়কা কাচাড়্ খায়
লালি লালেশ্বরী
চোখে চশ্মা পরি
হাতে তোর লেডিস ঘড়ি
লালি তোর শ্বশুর বাড়ি

২৮৩। ত বগ্লা খসুছি — ত < তল
উপর বগ্লা হাসুছি
মাঝি বগ্লা কউছি
মোর বি দিন আসুছি

২৮৪। পণ্ডিত যেঠি নাই পারে
মূর্খ সেঠি লাফ্ফি পড়ে

২৮৫। বেহায়ার পঁদে বেনিয়া জয়ে — বেনিয়া ঃ বেণীর মতো করে বাঁধা খড়
সে কয় আরতি করে — জয়ে ঃ জ্বলে

২৮৬। কাব্জি রসের ফেনারে ভাই — কাব্জি < কাগজি (লেবু)
কাব্জি রসের ফেনা
পদা দিয়া বউ পালিল
তুই শালা কি কানা

২৮৭। জ্বালার উপর জ্বালা
আইজ মরল বউর ভাই
কাল মরল শালা

২৮৮। টকায় টকায় খিটির মিটির
জুঁয়াঁয় জুঁয়াঁয় হাসাহাসি জুঁয়ায় ঃ জোয়ানে
বুড়ায় বুড়ায় কাশাকাশি

২৮৯। লুচি গোল হরিবোল
দে দই দে পাতে
ওরে ব্যাটা হাঁড়ি হাতে

২৯০। ইতিহাসে ইতিগজ
ভূগোলেতে গোল
বাংলাতে মোটামুটি
অংকে হরিবোল

১২. শিশু মনস্তত্ত্ব

২৯১। ধেইতা ধিনা
তাধিন ধিনা
খোকন নাচে
দেখে যা না
আহা কেমন
হাত্‌টি তুলে
নাচে আমার
সোনার ছেলে

২৯২। দোল দোল দুলুনি
রাঙা মাথায় চিরুণি
বর আইস্‌বে যখুনি
লিয়ে যাবে তখুনি
বরের মাথায় ল্যাট্‌কাচুল
কনের মাথায় গেঁদা ফুল

২৯৩। খুকুরাণী ফড়্‌ফড়ানি
ভালো বেগুনের চ্যারা
খুকুর তরে বর আইস্‌বে
আয়ে বিয়ে পাস করা

২৯৪। হাড়োরে গড়োরে লাউ বাড়ে কুমড়া বাড়ে হাড়ো, গাড়ো ঃ নামপদ
আমাহারে কচির চোখে ঘুম দিয়া যায়

২৯৫। আয়রে ঘুম যায়রে ঘুম
পাখার বাতাসে
ডিমালু ঝিমালু পাতা
আমাহারে কচির ঘুম দিয়া যা

২৯৬। আয়লারে আয়লা
জেষ্ট মাসের পইলা
জামা দুটা মইলা
গেঞ্জি দুটা ফুটা
প্লাসটিকের জুতা
আলমারিতে গোলাপ ফুল
টেক্সিয়ালার টাকে চুল

২৯৭। আঁতা পাতা ব্যাঙের ছাতা
কী ব্যাঙ?
কলা ব্যাঙ
কী কলা?
বিচা কলা
কী বিচা?
লাউ বিচা
কী লাউ
পানি লাউ
কী পানি
মুত পানি
কী মুত?
ছেলি মুত
কী ছেলি?
রাম ছেলি
কী রাম?
শ্রীরাম শ্রীরাম

২৯৮। আয় আয় চাঁদমামা
টি দিয়ে যা
চাঁদের কপালে চাঁদ
টি দিয়ে যা

২৯৯। দাদাবাবু কমলালেবু
আপেল খাবে গটা
দাদাবাবু মটা

৩০০। দাদাবাবু কমলালেবু
একা খেয় না
আমার দিদি ছোট্ট খুকু
কিচ্ছু জানে না

৩০১। অজয় বিজয় দুইভাই
ব্যাঙ মারে ঠাইস্ ঠাইস্
অজয় বলে ছাড়িয়া দুব
বিজয় বলে ভাজিয়া খাব

৩০২। ভাই আমার ভালো
আম পাড়তে গেল
আম নাই গাছে
কাছা খুলিয়া লাচে

৩০৩। আয়রে পাখি ল্যাজ ঝোলা
খেতে দুব চাল ছোলা
খাবি দাবি কল্‌কলাবি
ছেলেকে নিয়ে খেলা করবি

৩০৪। দ কে জ্বর হইল
বুসতে দিল লাঠি
বাইস জঁ ডাক্তার আইল   জঁ < জন
খাইতে দিল বটি
উল্টিয়া ধার দিয়া ছিঁটিয়া দিনে
হইল টিয়া পাখি
ইন পিন সেপ্টিপিন
দাদু খায় ভিটামিন

৩০৫। ও পিলা
কী পিলা
কাঁচা পিলা
কী কাঁচা
লেবু কাঁচা
কী লেবু
পাতিলেবু
কী পাতি
মোমবাতি
কী মোম

গরম মোম
কী গরম
দুদ্ গরম
কী দুদ্
খাঁটি দুদ্
কী খাঁটি
মারব চাঁটি
কী চাঁটি
মানুষের চাঁটি
কী মানুষ
বন মানুষ
কী বন
আদাবন
কি আদা
তুই একটা হারামজাদা

৩০৬। ও দাদা / একটা কথা / কী কথা/
ব্যাঙের কথা / কী ব্যাঙ / কলা ব্যাঙ/
কী কলা / ভোদ্কা কলা / কী ভোদ্কা/
গু চট্কা / কী গু / কা মানুষের গু/ কা < কালো
কী কা / আদা কা / কী আদা/
তুই একটা হারামজাদা

৩০৭। আরে ও দাদা ও দিদি
এত করে ডাকছি
শুনতে নাহি পাচ্ছ ?
এতটুকু তেঁতুল চক্লেট খাচ্ছ ?
বেস বেস বেস
খেয়ে নাও খেয়ে নাও
চেটে পুটে খেয়ে নাও
কাল মামা আনবেন
রসগোল্লা লেডিকেনি
তখন তুমি যদি চেয়েছে
এই ক্যাঁচকলাটি পেয়েছো

৩০৮। সেই ছেলেটা সেই যে গেল
গেল তো গেল আর এল না

৩০৯। That boy gone ganganagan
ganganagan not return

৩১০। সাঁরে যাঁহা সে আচ্ছা
ভিম্‌রুর পঁচিশটা বাচ্চা
তাই গরুর কি লজ্‌জিয়া

৩১১। টম্‌ অ্যাণ্ড জেরি
টম অ্যাণ্ড জেরি
বিস ফ্রাম ডে
আইলা হো হো হো
আইলা সি সি সি
আইলো হো
আইলা সি
আই অ্যাম এ পেপ্‌সি

৩১২। আয় আয় চাঁদমামা
টি দিয়ে যা
আমাহারে সনার কপালে চাঁদ
টি দিয়ে যায়

১৩. বিবিধ বিষয়ক ছড়া

৩১৩। আসতে যাইতে করে হিত
তার নাম পুরোহিত

৩১৪। বন্ধু বন্ধু কইলাড়ী
উলটিয়া ধার দিয়া পঁদ মারি

৩১৫। ছেলেরা তিরিশে ফিনিশ

৩১৬। যা না খাবে ঝিয়
তাকে জামির পাতে দিয়

৩১৭। পরের ছেলে পরমানন্দ
নষ্ট হইনে খুব আনন্দ

৩১৮। ধন আছে ত মন নাই
মন আছে ত ধন নাই

৩১৯। ভাতারের গাঁইঠে ধন রইনে
মাউগের নাম লক্ষ্মীপ্রিয়া

৩২০। টকামনে মেইঝিমনে
গেড়িয়াঘাটে পুকুরঘাটে
চৈ চৈ চৈ চৈ

৩২১। ইন পিন সেপ্‌টিপিন
দাদু খায় ভিটামিন

৩২২। মেদিনীপুরে জন্ম আমার
বিদ্যাসাগরের দেশে
প্রাণ দিল যেথায় বিনয় বাদল
দেশকে ভালোবেসে
শহীদ হল বীর ক্ষুদিরাম
গলায় নিল ফাঁসি
জন্ম মোদের এই দেশেতে
দেশকে ভালোবাসি
গর্ব করি দেশের লাগি
জন্ম মেদিনীপুরে
অর্ধেকেরও বেশি আছি
জ্ঞানহীন অন্ধকারে
পণ কর্‌ছি আমরা সবাই
সাক্ষর এবার হব রে ভাই
মেদিনীপুরে সাক্ষরতার
আলো মোরা জ্বালবই

৩২৩। কি থেনি কি হেনি — থেনি ঃ ছিলাম, হেনি ঃ ইলাম
দেখনা মোর চালিকি
আউরি দেখবু কালিকি

৩২৪। ঠাক্‌মা তুমি কেমন আছ ?
আমার কি লুবু ভাই
পাকা আম ঝড়তে বুসছি
না, পাকা আম মিষ্টি বেশি

৩২৫। পায়ের উপর পা কেনিরে ?
একঠি আছি
দাঁত মাজতে মাজতে শাগ্‌ তয়ায় জ কেনিরে ? তয়ায়ঃ তলায় (Seed-bed)
না, আলদা হইচি — জ < জল

৩২৬। কে যাওঠ গ সকাবেলা
মড়ির মা দিদি নাকি
কেমা যাবে গ — কেমা ঃ কোনদিকে মুখ করে
লয়া জুতা, লয়া কাপড় পিঁন্ধি — পিন্ধি ঃ পরিধান করে
যাবা বলে মাইঝি দোকে — দোকে ঃ দুয়ারকে
লিকি লাড়ু চাউল ভাজা
ঝি ঝাঁইকে ডাকতে যাবা — ঝাঁই < জাঁই < জামাই

৩২৭। পূজনীয়
বাপ, তোমারে আমি জানাই
পড়ার ভীষণ চাপ
টাকার অভাব
টাকা আমার চাই
ইতি স্নেহের নিমাই
স্নেহের নিমাই,
তোরে আমি জানাই
তোকে জন্ম দুয়া পাপ — দুয়া ঃ দেওয়া
ইতি তোর্ বাপ

৩২৮। পূজনীয়
স্বামী,
তুমাকে আমি বলি
সংসারের বড়(অ) জ্বালা
বৃথা পরেছি মালা
তাই অনেক ভেবে চিন্তে
গেলাম বাপের দর
কখনও যদি পড়ে মনে
আসব তুমার ঘর
ইতি তুমার পর
আদরের
স্ত্রী,
তোকে আমি বলি
তোকে ব্যায়া হওয়াটাই পাপ — ব্যায়া ঃ বিবাহ
এমন জান্‌লে আগেভাগে
ব্যায়া দিতনি বাপ
ডিভোর্স যেদিন দুব তোকে
সেদিন যাব আমি
ইতি তোর স্বামী

৩২৯। কানা মাছি ভোঁ ভোঁ
যাকে পার তাকে ছুঁয়।

৩৩০। ছিল কটাতির ঝি
ঢেকি দেখিয়া বলে এটা কী?

৩৩১। এতে আছে ঝোটপাত্
সব পকার মাথা কাট্

৩৩২। আমি নৌকা ধরিয়া বুসিয়া আছি সকাল থেকে সন্ধিয়া
পারানি কাই কত হইল বিড়ি খাইতে নাই পইসা

৩৩৩। জোরসে ঠেলো হ্যেইয়া
শুকা দুব হ্যেইয়া
গরমভাতে মইয়্যা
নৌকা চলে হ্যেঁইয়া

৩৩৪। হ্যেই চাবাসি হ্যেইলো   চাবাসি < সাবাসি। স > চ
জোর্সে টানো হ্যেইলো
হিচ্কা মারো হ্যেইলো
টান মারো টান হ্যেইলো

৩৩৫। হ্যেই চাবাসি হ্যেইয়া
আরো জোরে হ্যেইয়া
টানরে কাছি হ্যেইয়া
গাচ্ লড়েঠে হ্যেইয়া

৩৩৬। হরিবলা হরিবোল
বলহরি হরিবোল
শ্মশানে চ হরিবোল
বুড়া মর্ছে হরিবোল
বলহরি হরিবোল

৩৩৭। বলহরি হরিবোল
আবার বল হরিবোল
জোর্সে বল হরিবোল
হরিবলা হরিবোল

৩৩৮। দসে দস
টিপলে রস

৩৩৯। শেষ হয়্যালে
আর পাবনি
জড়া তিরিশ
গটে কুড়ি

৩৪০। ঢ্যাড়স পটল কড়ি — কড়ি ঃ Beans
কিলো মাত্র কুড়ি

৩৪১। মাউসি মনে আইস গো
চার গাছার দাম পনের গো

৩৪২। পাঁচশ বারো কিলো কুড়ি
ঝিঙা লও ঝুড়ি ঝুড়ি

৩৪৩। চালের বস্তা বড়ো সস্তা
কম লিনে ষাইট বেশি

৩৪৪। নানা ভাইরে তানা ভাই মো বুলিটি শুন
বিলর মাচ চিল খাইলা ধৌড়ি গটে বুন — ধৌড়ি ঃ বাঁশের তৈরি মৎস্য
ধৌড়ি গলা ভাসিরে পটা গেলা খসি — শিকারের যন্ত্র
নানা ভাই যে কাঁদুথিলে হিড় মাথায় বসি

৩৪৫। আয়রে আয় তিতিবনি গাই দুইতে জিবা
মা বাপ গালি দিনে সন্ন্যাসী হইবা
ভুখ্ করনে কি খাইবা কঁসাই নদীর জল
নিদ্ মাড়নে কেঠি শুইবা গাই পদতল

৩৪৬। জীবন যখন রঙ্গামঞ্চ
বাসর হলো ভেলা
রামনগরের মোড়ে হবে
সিঁন্দুর নিয়ে খেলা

৩৪৭। পাট্ পড়িয়া বা হবে — বা < অশ্লীল শব্দ
ঘসি গুড়িলে জা হবে — জা < জ্বাল, জ্বালানি

৩৪৮। পড়াশুয়াঁ করে যে — পড়াশুয়াঁ < পড়াশোনা
গাড়ি চাপা খায় সে

৩৪৯। ধনিয়ার মু ধনিয়া চায়
নিধনিয়ার মু গড়াগড়ি খায়

ধনিয়া ঃ ধন (অর্থ, সম্পদ) যুক্ত
নিধনিয়া ঃ নির্ধন

৩৫০। তেলুয়া মুড়ি তেল পায়
উখ্‌লা মুড়ি চাইয়্যা যায়

উখ্‌লা ঃ তৈলহীন উস্‌কো

৩৫১। বিনা পইসায় চাক্‌রি আছে
এ বাংলার বুকে
মেধা তালিকায় রইনে নাম
পরোয়া করি কাকে ?

৩৫২। লয়া যুগী ভিকের বাই
রাইত পাইনে যাব কাই

৩৫৩। খেজুর গাছে লাল গাম্‌ছিয়া
কুল ইইচে মিঠা মিঠা

৩৫৪। ঘুম্‌ কি জাঁয়ে বঁ বুদা
ভোক্‌ কি জাঁয়ে কাঁচাঅদা

জাঁয়ে ঃ জানে, বঁ < বন
অদা < আর্দ্র

৩৫৫। চড়্‌ চড়্‌ চড়্‌ দক্তা পতর
গেঁড়ি বৌকে লিয়াল পাল্‌কি ভিতর

দক্তা < দোক্তা (তামাক পাতা)
গেঁড়ি ঃ বেঁটে

৩৫৬। ব্যাগবেটা যেমন তেমন
কচিয়া বেটা মনের মতন

৩৫৭। আম মিষ্টি জাম মিষ্টি
আর মিষ্টি মধু
তা হইতে অধিক মিষ্টি
বাসর ঘরে বধূ

৩৫৮। বটগাছ আস্তগাছ যুদ্ধ লেগেছে
ও বৌদি সরে দাঁড়াও বর আস্তিছে

আস্তিছে < আসিতেছে

৩৫৯। পরের ধনে পড়্‌ধানি
শুকা বিকিয়া মহাজনি

পড়্‌ধানি ঃ প্রধানগিরি
শুকা ঃ শুট্‌কি মাছ

৩৬০। ঘরের ধারে লংকা গাচ
লংকা তুলে খাই

বন্ধুর কথা মনে পড়নে
ঝায়ে মরে যাই

৩৬১। দাদাভাই চালভুজা খাই
নয়না মাছের মুড়া
হাজার টাকার বউ কিন্‌ছি
খাঁদা নাকের চূড়া
খাঁদা হোক্ বোঁচা হোক্
তা সইতে পারি
মুকফিরিনে কথা কইনে   মুকফিরিনে ঃ তার্কিক
তাতেই জ্বলে মরি

৩৬২। যদি যাউ হাঁড়িয়া
দাম লিবে কাড়িয়া
৩৬৩। লাজির বাজার যাবে যে
কম দামে মাল পাবে সে

৩৬৪। আমার নাম নামে নাম্
আমি খাই পাকা আম
তুই খাউ গোরুর চাম্

৩৬৫। গঙ্গা যাইতে পঙ্গা ফাটে
সাগর যাইতে দূর
আদ্ পইসা লিয়া হাতে
দক্ষিঁ বর্ধমান ছুট্   দক্ষিঁ < দক্ষিণ

৩৬৬। বাজনা বাজে মাইক বাজে বাজে জগঝম্প
মাঘের শেষ তবুও কিন্তু যায়নি শীতে কম্প
উৎসবে আজ মাত্‌ছে সবে মানছে না কুন ক্লেশ
একে একে উৎসবে সব মেতে উঠেছে বেশ
কালকে ছিল শিবরাত্রি আনন্দ সবার মনে
জল ঢেলে তাই শিবের মাথায় মানস করে সবে
অমঙ্গাল আজ দূর কর সব সবার মনোভাবে
শিবরাত্রির মানত করে যত কুমারীগণে
উপোষ করে পূজা দেয় বাবা শিবের পদে
দিনটি রবে পরিচিত মানব কুলের মাঝে
শিব-দুর্গার বিয়ে হল শিবরাত্রির সাঁঝে

৩৬৭। বুড়ি তোর হাঁড়ি কুঁড়ি কাই
হাঁড়ি কুঁড়ি কাই্ পাবু ভাই
গ্যাঁড়ায় রাঁদিয়া খাই
গ্যাঁড়ায় রাঁদিয়া খাই বুড়ি তোর
চুলার পাঁউস্ কাই
চুলার পাঁউস্ কাই্ পাবু ভাই
বাড়ে বিছি দেই
বাড়ে বিছি দউ্ বুড়ি তোর
বাড়ির খন্দ কাই
বাড়ির খন্দ কাই পাবু ভাই
হাটে বিকিয়া দেই
হাটে বিকিয়া দউ্ যদি তোর
পইসা কড়ি কাই
পইসা কড়ি কাই পাবু ভাই
পান দক্তা খাই
পান দক্তা খাউ বুড়ি তোর
ঠোঁট্ রাঙা কাই
ঠোঁট্ রাঙা কাই পাবু ভাই
ডেলি পান্তা খাই
ডেলি পান্তা খাউ বুড়ি তোর
পেট গাডু কাই
পেট গাডু কাই পাবু ভাই
ডেলি হাগ্তে যাই
ডেলি হাগ্তে যাউ বুড়ি তোর
পঁদ অদা কাই
পঁদ অদা কাই পাবু ভাই
উনানে সেঁকিয়া লেই
উনানে সেঁকিয়া লউ বুড়ি তোর
উনানে আগুন কাই
উনানে আগুন কাই পাবু ভাই
লোকে দর্কে যাই
লোকের ঘর কাই পাবু ভাই
দিল্লি কটক্ যাই

৩৬৮। কে তার কি কথা কয়
গেলি তার মার কথা কয়

৩৬৯। পান্তা খাইতে নু নাই   নু < নুন
কম্‌লি শাগে জিরা

৩৭০। গরম্‌ভাতে নু নাই
কম্‌লি শাগে জিরা

৩৭১। ভাত খাইয়্যা গা ধুয়ে জ্বরের তরে
বুড়া বইস্যে ব্যায়া হয় পরের তরে   ব্যায়া ঃ বিবাহ

৩৭২। যদি খেতে চাও বোঁদে
বাটি লিয়ে চলে যাও
ছাগলের পঁদে

৩৭৩। জা ভাগারি ঠকর মকর
ননদ রাঁড়ি পর   রাঁড়ি ঃ বিধবা
শাউড়ি রাঁড়ি মরবে যবে
করব তবে ঘর।

৩৭৪। আলতা বাটি পায়ের পাটি
পা ধুয়ে দে
জল নিবি না ডাঙ্গা নিবি
তা বলে দে।

৩৭৫। কর্তা গেছে কাচারি
চিগ্‌নি শাকের হাপারি
জিনি পকার পঁদে আলো
বড় ভাই একটি গল্প বলো
জয়ের পানি জকে যা   জয়ের < জলের
আমার সিলেট শুকি যা

৩৭৬। লয়া নাঙ্গোর কড়ি
দিন পাঁচছয় লবর্‌ চবর্‌
ভাত বিহনে মরি

৩৭৭। ননদিনী রায়বাঘিনী
দাঁড়িয়ে আছে কালসাপিনী
ননদিনী যদি মরে,
সুখের বাতাস বইবে ঘরে

৩৭৮। মাঘেতে মকর মিঠা কটুতলে শিম্‌
ফাগুনেতে দ্বিগুণ মিঠা বাড়তিকেতে নিম্‌

চৈত্রেতে শ্রীফল মিঠা খেয়েছিলেন রাম
বৈশাখেতে শসা মিঠা শোলমাছেতে আম
জৈষ্ঠেতে পাকা আম আষাঢ়ে কাঁঠাল
শ্রাবণেতে খই দই ভাদ্রে পাকা আম
আশ্বিনেতে ঝুনা নারকেল কার্ত্তিকেতে ওল
মক্সিরেতে নবাঅন্ন চিংড়িমাছে ঝোল মক্সিরেতে < মাইসর (মার্গশীর্ষ)
পৌষেতে পিঠাপুলি খেতে লাগে মজা ঃ অগ্রহায়ণ
ঘন আউটা তপ্তা দুধে বাসি পড়াপিঠা

৩৭৯। ভাতার বাপা তেলের কপা
সুরু ধানের খই
শুনরে ভাতার কানে কানে
মনের কথা কই

৩৮০। রথে চড়ে মাসী বাড়ি যাবে জগন্নাথ
সুভদ্রা বোন বলরাম ভাই যাবে এক সাথ
ভক্তেরা মিলে রথে দিল টান
গড়গড়িয়ে জগন্নাথ মাসিবাড়ি যান
রথ টানে সবাই দেখ হাসিখুশি মনে
মেলায় ঘুরে খুশিমত জিনিসপত্র কিনে
মেলায় দেখ(অ) দোকানগুলা আমকাঠালে ভরা
বাড়ি যাবে তাইতো সবাই করছে তাড়াহুড়া
খাওয়ার যত দোকান সব ভীড়ে ঠাসা লোকে
খুশিমত কিনছে জিনিস কেবা কাকে দেখে
চল্‌ল সবে আপন ঘরে রথের মেলা থেকে।

৩৮১। সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়িয়া
সীতা হইল রামের মা

৩৮২। রাধাকৃষ্ণ বাজায় বাঁশি
এ্যাক নিশাসে একস আশি

৩৮৩। বুদ্ধি রইনে আবার
মাউগের বাপের দরে খাটতে হয়।

৩৮৪। কানের ভাতার কান খড়কিয়া
হাঁসের ভাতার দড়ি
মায়্যার ভাতার মদ্দ বটে
মদ্দর ভাতার কড়ি

৩৮৫। সেদিন আর নাইরে বামনী
তয়ে ভাত তাউ উপরে আমানী

৩৮৬। একটা ঝিঙগা দুটা ঝিঙ্গা
ঝিঙ্গার তরকারী
তাড়াতাড়ি রাঁন্দ গিন্নি
যাব কাচারী
৩৮৭। ছোঁড়া যাচ্ছে বাঁধে বাঁধে
লাল গামছা কাঁধে
ঠেলিয়া দিলে হেলিয়া পড়ে
কমলি শাকের ফাঁদে
৩৮৮। কুরুক্ষেত্রের মাঠে
কৃষ্ণ হল সারথি
সন্ধ্যেবেলায় বাজারে হবে
গান্ধারী জননী
৩৮৯। ছিল আগে বাদাম দকানীর ঝি
পালকিতে উঠ্যিয়া বলে
লাল লাল গুলা কী

৩৯০। নাঙ্গোর ঘর নয়
গাঙ্গোর ঘর

৩৯১। ইড়াম পাড়ার বুড়ি
যতই কর মাজন ঘসন
সেই হবে কালিয়া বুড়ি

৩৯২। খাঁড়াহারে ঢ্যারা পূজা
ঘি চচ্চড় কুত্তা ভাজা
খাঁড়াদরকে যাবনি
কুত্তাভাজা খাবানি

৩৯৩। ওর নাম মিতা
চুলে বাঁধি ফিতা
কানে পরি দুল
রঙ বেরঙের ফুল
ওর নাম শালিমা

ওর সাথে খেলব না
ওর সাথে আড়ি
আড়ি আড়ি আড়ি
ওর বাড়ি দোতলা
কাক বসেছে কা কা
মাগো তোমার পায়ে পড়ি
বউ এনে দাও খেলা করি
বউ এর মাথা খোঁপা চুল
বেঁধে দেব গোপাল ফুল
গোলাপ ফুলে পকা
জামাইবাবু বকা
এমন জামাই চাই না
মেয়ের বিয়ে দেব না
মেয়ের বাবা ডাক্তার
মেয়ের মা লেখিকা
মেয়ের পেটে ক্যানসার
আই এ্যম এ ডিসকো ড্যান্সার।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ৩.

অতিরিক্ত ছড়ার সংকলন।

অতিরিক্ত ছড়ার সংকলন

১। ভাবছি খাব চিড়া দই
বিধাতা করিয়া রাকছে
আদ কঁচা পলা খই

২। বাপের পঁদে চাম নাই
মুচির সাথে সইয়া
আদ সের চাউল লিয়া
বারি পড়ছে গয়া

৩ ধুকধুকিকে খাইল মশা
থির করিয়া কঁয়ে বসা

৪। কাঁক পেটা খায় দায়
ডাবুর পেটার নাম যায়

৫। কায়ে কায়ে একি হল
পিঠা পুলির লেজ গজাল

৬। যাকে করে হীন
তার হয় একদিন

৭। উদার পিণ্ডি
বুধার ঘাড়ে

৮। তুমি চল ডালায় ডালায়
আমি চলি পাতায় পাতায়

৯। অল্প ধানে ধনী লাচে
গ ঘাসে গরু লাচে

১০। হাতি যখ হোড়ে পড়ে
টিকটিকি তখ লাথি মারে

১১। দেখাদেখি চাষ
লাগালাগি বাস

১২। যার ব্যায়া তার মন নাই
সাইপড়শির ঘুম নাই

১৩। সমানে সমানে বন্ধুত্ব হয়
অসমানে কভু নয়

১৪। ট্যেঁকে নাই ধন
দারি দেখিয়া পুড়ে মন

১৫। নুন খাই যার
গুণ গাই তার

১৬। ঠাকুর খাবু তো যা
নাইলে চ্যাইয়্যা থা

১৭। যার শীল তার নড়া
ভাঙব তার দাঁতের গড়া

১৮। বুল ঝি বুল
যদ্দিন নাই হয় ফুল
খা ঝি খা
যদ্দিন নাই হয় ছা

১৯। নিজের আছে তো ব্যাকের আছে
নিজের নাই তো কারুর নাই

২০। একে গুণ গুণ দুয়ে পাট
তিনে গণ্ডগোল চারে হাট

২১। রাঁড়ের বাড়ির শাক
যউ নাই পায় তারুর হয় রাগ

২২। রাঁড়ের মুলুক পাইছু
লুটিয়া পুটিয়া খাইছু

২৩। মুক ফস্‌কিলে সাইপড়শি মরে
পা ফস্‌কিলে নিজে মরে

২৪। হিত বলিয়া পিত নাই
রসুন বলিয়া ঝাল নাই

২৫। বাজারে ম্যায়া নষ্ট
বাপের দরে ঝি নষ্ট

২৬। যার সরষিয়া তার তেল
বকা চাইছে ফেল ফেল

২৭। গতর খাটিবু রইবু সুখে
না খাটিবু মরবু দুখে

২৮। হাব্বোড় যাব্বোড় খাবু
গত্তর ভালো পাবু

২৯। হুড়মুড় যাত্রা
যা করে বিধাতা

৩০। ভালো লাগ্‌ল খুদের চাউ
ভাতার পো নাই পাউ

৩১। ভাড়াটে রইবে চক্‌মালায়
মালিক রইবে খত্‌খালায়

৩২। বাজারে কিঁয়ে রানি
দরে কিঁয়ে কানি

৩৩। বড়লোকের বড় কথা
চুলায় হাগলে পড়াপিঠা

৩৪। পিঠার ভিতরে পুর আছে
যদি খাইতে পার
কথার ভিত্‌রে কথা আছে
যদি বুঝতে পার

৩৫। দুঃখী গেল সুখ খুঁজতে
দুঃখ গেল তার পাছে পাছে

৩৬। শাউড়ীর রাগ বউড়ির উপরে
বউড়ীর রাগ ভানুয়া বিলির উপরে

৩৭। ফরসা গুয়ের মালসা
কালো জগতের আলো

৩৮। খাইয়্যা হাগা শুইয়া জাগা যাইয়্যা মাগা
এ তিন ভাগা

৩৯। যৌ যায় লংকায়
সৌ হয় রাবণ

৪০ বাইরে চিক্কন
ঘরে ছুচার কীর্তন

৪১। কামিলার ঠুকুর ঠুকুর
কামারের এক ঘা

৪২। রাম গেল ঘর
লাঙ্গল তুইয়্যা ধর

৪৩। ধর কাছি ধরিয়া আছি
ছাড় কাছি না অনেক আগুনি ছাড়িয়া দিছি

৪৪। ঠাকুর ঘরে কে ?
না, আমি তো কলা খাইনি

৪৫। সময়ের এক ফোড়
অসময়ের দশ ফোড়

৪৬। এ্যাক লাউর বিচা
টিপলে ধর কচা

৪৭। আড়ি আড়ি আড়ি
কাল যাব বাড়ি
পরশু যাব ঘর
কি করবু কর
এ্যাক বালতি জল ঢেলে
পা পিছলে পড়

৪৮। আবা আবা হাতি
আমি হব সাথি

৪৯। এই হনুমান কলা খাবি
জয় জগন্নাথ দেখতে পাবি

৫০। সূর্য পারে ডুবতে
কুঁড়ি পারে ফুটতে
আমি পারি না তোমার মত
বন্ধুকে ভুলতে

৫১। কাঁচের গ্লাস ঠুকে ভেঙো না
পুরোনো দিনের বন্ধু তুমি
আমার কথা ভুলো না

৫২। যাব না মুম্বাই দিল্লী সুরাট
১০০ দিনের কাজ দিয়েছে সরকার
ঘরে থাকব করব কাজ
পূর্ণ হবে মনের সাদ

৫৩। ফুল ফুল ফুলেশ্বরী
বোনকে নিয়ে খেলা করি
বোন কেন কাঁদে
নাক কেটে ফ্যালে
নাকে কেন রক্ত
শিবানীর ভক্ত।

৫৪। শচীন মারে ছক্কা
সৌরভ মারে চার
আমার বন্ধু এসে বলে
হ্যাপি নিউ ইয়ার

৫৫। চুকচুকায়িঁ দেখি দিছি
বিল্লি গু খাবি দিদি

৫৬। রুই মাচ রুই মাচ
আমার দাঁত লে
তোর কচি কচি দাঁত দে

৫৭। কুক দেবে না
গু খাবে

৫৮। বাড়ির পাশে চাকরী করতে নাই
বাজারের কাছে ঘর করতে নাই

৫৯। দু নৌকায় দিয়া পা
পঁদ চিরিয়া পাতা যা

৬০ বাজার করবু ঘুরে
রাঁড় রাখবু দূরে

৬১। অবোধে বুঝাব কত /বোধ নাহি মানে
ঢেকিরে বোঝাব কত/সদা ধান ভানে

৬২। ছাড়িলে হাতের শর
নাহি চিনে ঘর পর

৬৩। ভয় তো ভয়
হারামজাদাকে ভয়

৬৪। তাস পাশা রাড়ের নেশা
এ তিন সর্বনাশা

৬৫। তাঁতি যার গুঁয়ে/তার মনে জাঁয়ে

৬৬। পর মুড়ে খায়/হিড় মুয়ে হাগে

৬৭। শাগ হইনে সিজে/মানুষ হইনে বুঝে

৬৮। ঘর সর্বস্ব তোর/চাবি কাঠিটা মোর

৬৯। খায়তো হোড়ে/নয়তো জাড়ে

৭০। রাম মুর্খ লক্ষণ মুর্খ মুর্খ বিভীষণ
তা হইতে অধিক মুর্খ লংকার রাবণ

৭১। যতই কর মদনানন্দ
ফলবে তোমার কচু

৭২। কুত্তাকে দিল ঘি ভাত
কুত্তা বলে কি ভাত

৭৩। মা বেটা দরবাড়িয়া
ঘটি লিয়াল পঁদ মারিয়া

৭৪। যার পোকে কুমিরে খায়
ঢেকি দেখ্‌নে ভয় পায়

৭৫। দাতা দান করে/কিরপণের পঁদ ফাঁটে

৭৬। দাদা কেমন দানি/অনুমানে চিনি

৭৭। হাঁড়ির ভিতরে লম্ফ/মাউগ ভাতারে গপ্প

৭৮। লোকের ঘরে জামাই আইনে
মণ্ডা মিঠাই খায়
আমার ঘরে জামাই আইলে
মিটির মিটির চায়

৭৯। কবে হবে পো
নাম রাখবে উৎপাতিয়া ছো

৮০। বালের বাল আপনা আপনি
তাকে দিল আট আট পয়সা
আমাকে দিল দু আনি

৮১। ডাল বাগানে গিয়েছি

ডাল ভাত খেয়েছি
ডাল কেন ঘন
আমার নাম মন

৮২। বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা
পুলিশ ছুঁলে ছত্রিশ ঘা

৮৩। চাড়ে চাড়্তা ফুটে
ঘরে ধান নাই খইচিড়া কুটে

৮৪। আগুর হা জিমা যায়
পিছু হা সিমা যায়

৮৫। কৈ মাচ কবকব লো
কৈ মাচ কবকম
আঁটারে ঝিজঁরী বঁগরী
তুম্ভব নজর লব

৮৬। নর নরৌ নরা/ঘর যাবু তো বারা

৮৮। সা রে গা মা পা ধা নি সা
জাঁ কাটিয়া মুরগী বুসা

৮৯। ঘৈতা মাইপর কলি
গড়িয়া ঘাটর কলি

৯০। লক্ষী বিশাই চক্ষী
গড়িয়া ধারে ঘর
লক্ষীকে ব্যায়া দুব
আড়ি টাকা ধর

৯১। হদ্ কুড়ানি মু বাই খাইলাসে
আগকু বিচার গতকু পচার

৯২। মরে রাঁড়ি কদর ছাড়েনি
গেলি ঝুম্কাটিকে তুত হলিদে

৯৩। দুয়ার ছিরকিটি
মল দুয়ার অমনি

৯৪। হাগ ঘড়া পাদ ঘড়া
যাইতে হবে কাচারি গড়া

৯৫। মন যদি হয় চাঙ্গা
পচা পুকুর হয় গঙ্গা

৯৬। লাল পাল্কি সাদা পাল্কি
তার ভিতরে আছে বেধুয়া খানকি

৯৭। এর পনা সুন্দরী গো
তো পনা জনে

আকট ঠেলাঠেলি
কপাট কোনে

৯৮। ঢের করলা নিজের পো
আর করবে লাতি
শীত পড়নে মরবা আমি
পঁদে দিবু বাতি

৯৯। কুঁজার সখ্ হৈলা চিৎ হই্কি শুয়া
গামছার সখ্ হৈলা ধুপা দুয়াকু যাওয়া

১০০। পোর ঘরে লাতি সর্গে দিবে বাতি
ঝির ঘরে লাতি খাল ধারে পুতি

১০১। পেটে খিদা মুয়ে লাজ
সে বন্ধুর নাহি কাজ

১০২। কাজের বেলায় কাজি
কাজ ফুরালে পাজি

১০৩। অতটুকু টিয়াপাখি
পিঁয়াজ ময়া খায়
ভাইসুরকে দেখতে পেয়ে
ঘোমটা টেনে দেয়

১০৪। ও বৌদি ও বৌদি
পাকার ঘাটে কী
কলসি ভেঙেছি
দাদা এলে বলে দেব
দূর খান্‌কির ঝি

১০৫। সব পাতা ঝরে যায়
খেজুর পাতা ঝরে না
সব বন্ধু ছেড়ে যায়
প্রিয় বন্ধু ছাড়ে না

১০৬। আজকে তুমি শুনেছ কি
ভোরের বাংলা খবর
আজকে রাতে বিষ্টি হবে
ভিজবে সারা শহর
ভিজবে তুমার গাড়ি
মনের দরজা খোলা রাখ
আমি আসতে পারি

১০৭। টমটম গাড়ি চলে
লিচু বাগানে

একটা লিচু পড়ে গেল
চায়ের দকানে
ও চা ভাই ও চা ভাই
দকান খুল না
ইস্টিসনে বউ এসেছে
দেখতে চল না

১০৮। পানি কৌতু ভাই পানি কৌতু
ডাঙায় উঠ না
তোমার শ্বশুর ভাত খাবে
বেগুন পোড়ো না
বেগুন হল ফোলা ফোলা
বউ পালাবে দুপুর বেলা

১০৯। পাজির পা ঝাড়া
কুত্তার গু কাড়া

১১০। বকা তিন বার হাসে
বুঝিয়া হাসে
নাই বুঝিয়া হাসে
দেখিয়া হাসে

১১১। খা ধারে লেবু গাছ
আমি হাগি তুই পকা বাচ

১১২। মাঝু পুকুরে পা
উত্তর ধারে গরু পড়িয়াছে
ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খা

১১৩। খাঁড়িয়া কুনঠি শেষ্ট
তেতু কুনঠি মিষ্ট

১১৪। পাপ কুনঠি লুকিছে
সাগর কুন্‌ঠি শুকিছে

১১৫। কায়েত পাক্‌লে ক্ষুরের ধার
খাঁড়িয়া পাক্‌লে গফেফ সার

১১৬। দাদা বড় লোভী
খাবে বলিয়া পাতা কাটতে যাইছে
আমাকে মাটে ঢ্যায়া দও

১১৭। বেতন লেই যাই আইসি
কাজ করনে উপরি পাই

১১৮। কারিগরের পাত
পঞ্চাশ ব্যাঞ্জনে নাই শুধু ভাত

১১৯। যায় জাহান মাগিয়া খাবা
বউ র‍্যাঁড় হইনে আবার ব্যায়া হবা
১২০। পড়েছি পাঠানের হাতে
খেতে হবে এ্যকসাথে
১২১। ছুঁচা গু ঔষধে লাগে
ছুঁয়া গিয়ে পর্বতে হাগে
১২২। কাপড় বিকে পাটে
ঝি বিকায় ঠাটে
বউ নষ্ট হাটে
১২৩। মানুষ উথ্‌লিলে গাড়ায় ঢুকে
দুদ উত্‌রিলে চুলায় ঢুকে
১২৪। ঘরে আছে বাগ
বাইরে বুসি হাগ
১২৫। ধান কটু কটু পদিয়ার মা
ধান শেকায় কে ঠাকুর মা
চাউ পাচ্‌ড়ায় কে সন্ধ্যার মা
১২৬। দুধের হাঁড়ি টকবক
মন করেঠে লক্‌লক্‌
আরে মন তু তো জাঁয়ু
এটা হটে পরের ঘর
যদি হইত বাপের দর
তুয়া খাইতি দুদের সর
১২৭। টকামকা গেঁড়ি কুচা
ঘি চচ্চড় কুত্তাভাজা
১২৮। মাচার ভিতরে ধান
পুলিশ তোর নাঙ
১২৯। জল আনতে গিয়ে তুই
কলসী ভেঙেছিস
দাদা এলে বলে দুব
আচ্ছা মাগির ঝি
১৩০। পঁদ কেনি সুরু
হিংসা কেনি করু
১৩১। পরের ভাতে তেল নষ্ট
পরের তেলে কাপড় নষ্ট
১৩২। খায়া মাখিয়া বাড়ে ধন
তারে বলে উপার্জন

১৩৩। কথায় হারবে নি রাজার ঝি
শুট পিপুল তার করবে কি
১৩৪। হাউড়িরে কাঁদালি মোরে
সারা গা প্যাঁচড়ায় ভরে
মুকটি যেন ধান সিদ্যের হাঁড়ি
তোরে কি মানায় লাল শাড়ি
১৩৫। মাল যেঠি/চোর সেঠি
১৩৬। চলছে গাড়ি/ বেলপাহাড়ি
১৩৭। শিবানী ঘট ডিবানী
বাংলাদেশে ঘর
একটু জ তুয়া দিনে
শিবের পূজা কর।
১৩৮। উঁচা ঘর ফঁপরা বাঁশ
ধার উধার বারমাস
১৩৯। ইড়ি বিড়ি সিড়ি
পাঁচ পইসার বিড়ি
বাপ ব্যাটায় ঝগড়া করিয়া
গোঁপ ছিঁড়াছিঁড়ি
১৪০। জামাই আইলা বাঁদে
লাল গামছিয়া কাঁদে
উট্ রে বুড়ি উট
তিনটা বেগুন কুট
জামাইর পাতে রসা নাই
ছুরুক ছুরুক মুত
১৪১। ভেক্ না ধরলে ভিক্ হবে না
১৪২। ঠেলায় না পড়নে বিড়াল গাছে উঠে না
১৪৩। ঝায়ে স্বাদ কি
জায়ে স্বাদ
১৪৪। কঞ্চি ছড়ি লাপ ঝাপ
তেতু ছড়ি ধরম বাপ
১৪৫। সাগরিয়া লাপিত
ডান চাঁছে ত বাম বাকি
১৪৬। লম্ফে নাই তেল
গুরু হরিবেল
১৪৭। পালা বি তো পালা
পেটে যাচ্ছে নলা

১৪৮। কানা বক শুক্‌নো গেড়িয়া
থাউ নাই থাউ আছে পড়িয়া
১৪৯। মটর মাউছি ছুটি
পইসা লউছি লুটি
১৫০। খড়া ল্যাং ল্যাং ল্যাং
কার দরে যাউথুলু তুই
ভাঙ্গিয়া দিছে ঠ্যাং
১৫১। বেধ্যা ব্যাটা সভায় লাচে
১৫২। গুম গড়ের ঠক
এ্যাক কই মাছে তিন টক
১৫৩। যদি হউ সুজন
এ্যাক তেতু পাতায় ন জন
১৫৪। সাঁইজ ঘুমানি সকাল ভোগী
১৫৫। হু হু দেয়ম হাঁ হাঁ দেয়ম
না দেয়ম ব্যাঘ্র ঝাঁপেন
১৫৬। ফরালী বামুনের পা
কেউটে সাপের ছা
১৫৭। রাজটীকা পাওয়া তাঁতি
তাঁত গড়ায় তার গতি
১৫৮। সব পকা আঞ্জু কাটে
আঞ্জু কাটার নাম যায়
১৫৯। লাক্ টাকার বাড়ি
এ্যাক টাকার ধাড়ি
১৬০। উদের বেলা কুজ
ভাতারকে দেখিয়া মনসাপুজ
১৬১। ভাল বললি সরল কথা
রূপ বিলিনে নানা কথা
১৬২। আইসে কুটুম যায় উপাসে
গা টা বড় চন্দন বাসে
১৬৩। সরস্বতী মাগো/আল্‌তা পরা পা গো
প্রণাম করি তুমাকে/বিদ্যা দাও আমাকে
১৬৪। সক্‌নি দরকে রক্‌নি গেল
খুদ ডালিয়া চাউল লেইল
১৬৫। মৌ টুস্‌কি টাবুয়া গালি
তে আল্‌কি তেলের থালি
১৬৬। হাতি ঘড়া গেল ত
মেড়া বলে কত জ

১৬৭। সূর্য দিল সোনার মুকুট
চন্দ্র দিল হার
সেইখানে লেখা আছে
হ্যাপি নিউ ইয়ার

১৬৮। কথায় সরোবরো বচনে হীন
পুই খাড়া চিবিতে চিবিতে গেল মোর দিন

১৬৯। গাঁইট লড়েনি/বন্দুক ঘাড়ে
শুইয়্যা পড়্যা সে
আওয়াজ কাড়ে

১৭০। যে দেশে শিব নাই
যুগীর পায়ে পূজা হয়

১৭১। কথায় কথা বাড়ে
টাকায় বাড়ে সুদ

১৭২। চাল নাই ডাল নাই
বাল নাই রাঁদে
চিড়া খ্যায়া পড়িয়া রইব
বাল নাই করে

১৭৩। গোয়ের গরু মারিয়া শুঁকুকে দান করা

১৭৪। ভোট দিনে নোট দুব
নাই দিনে বাঁশ দুব

১৭৫। গাছের খাবে/তলার ও গুড়িবে

১৭৬। হাসিয়া হাসিয়া কথা কয়
ও শালা তো প্যায়দা নয়

১৭৭। রাজা খায় খাজা
রানি খায় মুতপানি

১৭৮। পথে পাইছু কামার
ফাল গড়ে দে আমার

১৭৯। সেই তো মল খসালী
তবে কেন লোক হাঁসালী

১৮০। কি খাবুরে সুদাম
গরু-বাছুরের যে দাম

১৮১। জামি হইল স্বামীর মতন

১৮২। যা কে যা ভায়
রসুয়ু দিনে পিঠা খায়

১৮৩। পর্ত্তিকের বাসনা
পড়া মুখে নু ঘুসনা

১৮৪। লক্ষী মাতা লক্ষী মাতা
বর দিও মোরে
শুশ্রা করু তোরে

১৮৫। লম্ফরে তেল নাই মিটিমিটি
ভাত খুলরে রান্না সায়ে যাচ্ছি গুটিগুটি

১৮৬। য্যাস্যাকে ত্যাস্যা মিলে গা
রাজাকে রানি মিলেগা

১৮৭। যত হাসি তত কান্না
বলে গেছে রাম মান্না

১৮৮। মায়ের এ্যক ফঁটা দুদের ঋণ
শোদ হয় না কুনদিন

১৮৯। তোমার সাথে শেয়ার করব
সব কথা খুলে বলব

১৯০। ছেলে-মেয়ের বাপ মা স্বর্গ
মেয়েদের স্বামী স্বর্গ।

১৯১। অত্তটুকু গাই
প গাদা খাই

১৯২। মাগিয়া জামি পায়নি
যাঁচিয়া জামি খায়নি

১৯৩। শিখাকে ধর/পেট চ্যালা কর
পেটের ভিত্‌রে শিঙ্গি মাছ
কর কর কর

১৯৪। কাঁচা টমাটো লাল টমাটো
চাট্‌নি করেছি
জামাইকে দিতে গিয়ে
হড়কে পড়েছি

১৯৫। শান্তি এবার আসবে ঠিক
বুদ্ধর কথায় নান্দনিক

১৯৬। বাহন চলবে কতক্ষণ
অক্সাইড আছে যতক্ষণ

১৯৭। মেয়ের বিয়ে দিতে হলে
আঠারো বছর চাই
আর আগে নয় পাকা কথা
জেনে রেখো সবাই

১৯৮। যারাই করে খুন খারাপি
তারাই ডাকে হরতাল

কোটিপতির হয় না কিছু
সাধারণের পেটে হাত

১৯৯। পাঁচ বছরে একটি ভোট
বুঝে সুঝে দাও চোট

২০০। স্বরূপ চিনতে বাকি ছিল
লোকসভা ভোটে
এখন তারে সবাই চিনে
মাচরাঙা ঠোটে

২০১। রাস্তা হইছে গলি
কাকে বা কি বলি

২০২। পান পান্তা ভক্ষণ
পুরুষের লক্ষণ

২০৩। জামাইবাবু অপমান
বউ করেছে বুদ্ধিমান
ছেলেমেয়েরা পাড়ায় যাবে
লাল কুত্তা ভাজিয়া খাবে

২০৪। চুঁ চুঁ চুঁ
চাম চাম চাম
হাই বেবি
বাই বেবি
কান ধরি
ঠাস ঠাস ঠাস

২০৫। A B C D E F
G কা মতলব গান্ধিজী
গান্ধিজী নে প্যায়া পান
প্যায়া পান ম্যা আমির খান

২০৬। বন্দে মাতরম্/মুড়ি খেয়ে পেট গরম

২০৭। ঠিকার কাজ ফিকা ফিকা

২০৮। আমপাতা জামপাতা
তেতু পাতায় জিরা
বাবা গটে জামা আঁয়া দিছে
পিঠের কোতরে ছিঁড়া

২০৯। হইল কথা সবার মাঝে
যার কথা তার গায়ে বাজে

২১০। খাবোলকে মাছের মাথা খাবু
তিনমুড়িয়ার কোত্‌রে বুদ্ধি লুবু

মাঝু গেড়িয়ায় ডুব দুবু

২১১। মুসা ধান খায় কুটুর কুটুর
ন্যাজ লড়ে তার ছুটুর পুটুর

২১২। কানে কালা/হারকিন বালা

২১৩। আয়রে ডলি কুসুমকলি
বাবুর বাগানে
ফুল তুলব মালা গাঁথব
খেলব দুজনে

২১৪। মাসিমা তোর পায়ে ধরি
মাথা বেঁধে দে
কলকাতাতে যাবো আমি
বন্ধুর অনাসে
কলকাতার খাট গদি আর
নেটের মশারি
বন্ধু আমায় করে গেল
পথের কাঙালী

গ্রন্থপঞ্জি

ক

আকর গ্রন্থ (Main text)

(কালানুক্রমিক)

১. ১৯৬২ আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাংলার লোকসাহিত্য', ২য় খণ্ড, পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, প্রকাশক— ক্যালকাটা বুক হাউস, কলি—১২।

২. ২০০৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'লোকসাহিত্য', পুনর্মুদ্রণ, প্রকাশ—বিশ্বভারতী, কলি-১৭।

৩. ২০১০ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বাংলার ব্রত', পুনর্মুদ্রণ, প্রকাশক—বিশ্বভারতী, কলি-১৭।

৪. ২০১০ দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, 'ঠাকুমার ঝুলি বাঙ্গালার রূপকথা', অষ্টচত্বারিংশৎ সংস্করণ, প্রকাশক—মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলি-৭৩।

খ

সহায়ক গ্রন্থ (Reference)

(বর্ণানুক্রমিক)

১. অতুলচন্দ্র গুপ্ত, 'কাব্যজিজ্ঞাসা', পুনর্মুদ্রণ ১৯৯১, প্রকাশক—বিশ্বভারতী, কলি-১৭।

২. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বাংলার ব্রত', পুনর্মুদ্রণ-২০১০, বিশ্বভারতী, কলি-১৭।

৩. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত', দশম পরিবর্ধিত সংস্করণ-১৯৯০, প্রকাশক— মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলি-৭৩।

৪. আশরাফ সিদ্দিকী, 'লোক-সাহিত্য', ২য় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ-২০১৩, প্রকাশক—নয়া উদ্যোগ, কলি-৬।

৫. আশরাফ সিদ্দিকী, 'লোক-সাহিত্য', ১ম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ-২০১২, প্রকাশক—নয়া উদ্যাগ, কলি-৬।

৬. আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাংলার লোকসাহিত্য', ১ম খণ্ড, পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ-১৯৬২, প্রকাশক— ক্যালকাটা বুক হাউস, কলি—১২।

৭. ঘোষ ও মুখোপাধ্যায়, 'মৈমনসিংহ গীতিকা', নতুন সংস্করণ-২০০৯, প্রকাশক—ইষ্ট ইণ্ডিয়া পাবলিশার্স, কলি-১২।

৮. জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, 'বাঙালা ভাষার অভিধান', দ্বিতীয় সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ-১৯৮৮, প্রকাশক-৩২-এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলি-৯।

৯. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, 'ঠাকুমার ঝুলি বাঙ্গালার রূপকথা', অষ্টচত্বারিংশৎ সংস্করণ-২০১০, প্রকাশক—মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলি-৭৩।

১০. দিব্যজ্যোতি মজুমদার, 'বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্‌স', তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ-২০০৫, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর পক্ষে, কলি-৬৮।

১১. দেবশ্রী পালিত, 'ছড়া লোকায়ত জীবনের কারুভাষ', প্রথম প্রকাশ—২০১২, প্রকাশক বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলি-৯।

১২. নির্মলেন্দু ভৌমিক, 'বাঙ্‌লা ছড়ার ভূমিকা', প্রথম প্রকাশ-১৯৭৯, প্রকাশক সাহিত্যশ্রী, কলি-৯।

১৩. নির্মলেন্দু ভৌমিক, 'প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসংগীত', ২য় খণ্ড সংগ্রহ, প্রথম প্রকাশ—১৯৭৭, প্রকাশক— কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলি-৯।

১৪. নির্মলেন্দু ভৌমিক, 'বাঙলা ধাঁধার ভূমিকা', প্রথম প্রকাশ-১৯৮৭, প্রকাশক— দে'জ পাবলিশিং, কলি-৭৩।

১৫. পবিত্র সরকার, 'লোকভাষা লোকসংস্কৃতি', তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, ২০০৩, চিরায়ত প্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড, কলি-৭৩।

১৬. পল্লব সেনগুপ্ত, 'লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ', দ্বিতীয় সংস্করণ-২০০২, প্রকাশক—পুস্তক বিপণী, কলি-৯।

১৭. প্রেমানন্দ প্রধান, হিজলীনামা, প্রথম সংস্করণ-২০০৩, প্রকাশক-কন্টাই হাউস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন, কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর।

১৮. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বঙ্কিম রচনাবলী', সপ্তম প্রকাশ-২০০৯, প্রকাশক—অক্ষর বিন্যাস, কলি-৯।

১৯. বনফুল, 'ডানা', দ্বিতীয় সংস্করণ-২০০৭, প্রকাশক— দে'জ পাবলিশার্স, কলি-৭৩।

২০. বরুণকুমার চক্রবর্ত্তী, 'বাংলা প্রবাদে স্থান-কাল-পাত্র', পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ-২০০৮, প্রকাশক—অপর্ণা বুক ডিষ্ট্রিবিউটার্স, কলি-৯।

২১. বরুণকুমার চক্রবর্ত্তী, 'লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্করণ', চতুর্থ সংস্করণ-২০০৩, প্রকাশক—পুস্তক বিপণী, কলি-৯।

২২. বরুণকুমার চক্রবর্ত্তী, ‘ধাঁধা ঃ স্বরূপ সন্ধান’, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, প্রকাশক—অক্ষর প্রকাশনী, কলি-৬।

২৩. বরুণকুমার চক্রবর্ত্তী, ‘বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ’, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত পরিমার্জিত সংস্করণ-২০০৭, প্রকাশক—অপর্ণা বুক ডিষ্ট্রিবিউটার্স, কলি-৯।

২৪. বরুণকুমার চক্রবর্ত্তী, ‘বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস’, পঞ্চম সংস্করণ, ২০০৮, প্রকাশক—পুস্তক বিপণী, কলি-৯।

২৫. বরুণকুমার চক্রবর্ত্তী, ‘লোকসংস্কৃতির সুলুক সন্ধানে’, দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ-২০১০, প্রকাশক—পুস্তক বিপণী, কলি-৯।

২৬. বরুণকুমার চক্রবর্ত্তী ও সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘লোকসংস্কৃতি ও নৃ-বিদ্যার অভিধান’, প্রথম প্রকাশ-২০০৯, প্রকাশক—অপর্ণা বুক ডিষ্ট্রিবিউটার্স, কলি-৯।

২৭. ‘বাংলাভাষা ও শিল্পসাহিত্য সংস্কৃতির ইতিহাস’, পরিমার্জিত সংস্করণ ২০১৪-১৫, প্রকাশক—পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ, কলি-৫৬।

২৮. বিজয় ভট্টাচার্য, ‘দেবীগর্জন’, প্রথম প্রকাশ—১৯৬৯, প্রকাশক— দেশ পাবলিশিং, কলি-৭৩।

২৯. বুদ্ধদেব বসু, ‘বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা’, চতুর্দশ সংস্করণ, ২০১০, প্রকাশক— দেজ পাবলিশিং, কলি-৭৩।

৩০. বেণীমাধব শীল, ‘সচিত্র ফুল পঞ্জিকা’, ১৪২৪, একমাত্র প্রকাশক বেণীমাধব শীলস পঞ্জিকা পাবলিকেশন্‌স, কলি-৫।

৩১. ভবানী গোপাল সান্যাল, ‘অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্‌স’, প্রথম প্রকাশ—১৯৬৮, করুণা প্রকাশনী, কলি-৯।

৩২. মনীন্দ্রমোহন বসু, ‘চর্য্যাপদ’, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ-২০০৭, প্রকাশক—সাহিত্য সেবক সমিতি।

৩৩. মযহারুল ইসলাম, ‘ফোকেলোর পরিচিতি ও পঠন-পাঠন’, প্রথম অবসর প্রকাশ-২০১২, প্রকাশক—অবসর প্রকাশনা সংস্থা।

৩৪. মনোরঞ্জন খাঁড়া, ‘কবিতানগর’, প্রথম প্রকাশ-২০১৭, প্রকাশক-বেণুকা।

৩৫. মনাঞ্জলী বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘লোকসংস্কৃতি নূতনের ভাবনায়’, প্রথম প্রকাশ-২০১৩, প্রকাশক-ডাভ্ পাবলিশিং হাউস, কলি-৯।

৩৬. মন্মথ রায়, 'কারাগার', প্রথম প্রকাশ-২০০৬, প্রকাশক-বামা পুস্তকালয়, কলি-৭৩।
৩৭. মানস মজুমদার, 'লোকসাহিত্য পাঠ', প্রথম প্রকাশ-১৯১৯ প্রকাশক দে'জ পাবলিশিং, কলি-৭৩।
৩৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'লোকসাহিত্য', পুনর্মুদ্রণ-২০০৪, প্রকাশক-বিশ্বভারতী, কলি-১৭।
৩৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সঞ্চয়িতা', পুনর্মুদ্রণ, ২০১১, প্রকাশক বিশ্বভারতীয়, কলি-১৭।
৪০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শিশু ভোলানাথ', প্রথম প্রকাশ-২০০২, প্রকাশক-৩/১৬১, শেঠ বাগান রোড, কলি-৩০।
৪১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রবীন্দ্র নাট্য-সংগ্রহ', ১ম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৯, প্রকাশক-বিশ্বভারতী, কলি-৯।
৪২. রাজশেখর বসু, 'চলন্তিকা', সংশোধিত ও পরিবর্ধিত নবম সংস্করণ ১৯৬২, প্রকাশক-১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলি-১২।
৪৩. রামেশ্বর শ, 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা', দ্বিতীয় সংস্করণ-১৯৯২, প্রকাশক-পুস্তক বিপণী, কলি-৯।
৪৪. শীলা বসাক, 'বাংলা ধাঁধার বিষয়বৈচিত্র্য ও সামাজিক পরিচয়', তৃতীয় সংস্করণ ২০০৮, প্রকাশক-পুস্তক বিপণী, কলি-৯।
৪৫. শেখ মকবুল ইসলাম, 'লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞান তত্ত্ব, পদ্ধতি ও প্রয়োগ, প্রথম প্রকাশ-২০১১, প্রকাশক-বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলি-৯।
৪৬. সাহিত্য সঞ্চয়ন, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, তৃতীয় সংস্করণ-২০১৭, প্রকাশক-প.ম.শিক্ষা পর্ষদ, কলি-১৬।
৪৭. সুবলচন্দ্র মিত্র, 'সরল বাংলা অভিধান', পরিমার্জিত নবম সংস্করণ ২০১৩, প্রকাশক-নিউ বেঙ্গাল প্রেস, ৬৮ কলেজ স্ট্রিট, কলি-৭৩।
৪৮. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা', প্রকাশ-১৯৭৪, প্রকাশক-কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলি-৯।
৪৯. সুকুমার সেন, 'ভাষার ইতিবৃত্ত', ত্রয়োদশ সংস্করণ, ১৯৭৯, প্রকাশক-ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স, কলি-৯।
৫০. সুকুমার রায়, 'আবোল তাবোল', প্রথম প্রকাশ-১৯২৩, প্রকাশক-ইয়ু রায় এণ্ড সন্স।
৫১. স্বপন পাত্র, 'দেশাত্মবোধক ছড়া ও কবিতা', প্রথম প্রকাশ-২০১৫, প্রকাশক-লালমাটি, কলি-৭৩।

৫২. সৌগত চট্টোপাধ্যায়, 'বাংলার ছড়া ঃ ছড়ার বাংলা', প্রথম প্রকাশ-২০০৮, প্রকাশক-বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলি-৯।

৫৩. সৌগত চট্টোপাধ্যায়, 'বাংলার ব্রত ও অবনীন্দ্রনাথ', প্রথম প্রকাশ-২০০৮, প্রকাশক রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলি-৯।

৫৪. শম্ভু মিত্র, 'চাঁদ বণিকের পালা', পঞ্চদশ সংস্করণ-২০১৮, প্রকাশক-এম.সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স, কলি-৭৩।

৫৫। Dinesh Chandra Sen, The Folk–Literature of Bengal. Calcutta University, 1920.

৫৬। Lal Bihari Day, Folktales of Bengal, Macmillan, London, 1910.

৫৭। Stith Thompson, Motif-Index of Folk-literature, 6 Vols, Bloomington, 1955-58.

গ

সহায়ক পত্র-পত্রিকা (Journals & Magazines)

(বর্ণানুক্রমিক)

১. বেলালউদ্দিন, 'দিগন্তের খোঁজে', উৎসব সংখ্যা, ত্রয়োদশ বর্ষ-২০১৫, পূর্ব মেদিনীপুর।

২. বৃহস্পতি মণ্ডল, 'চর্যা', ১৮-বর্ষ, ৩১৩-তম প্রকাশ, শারদ সংখ্যা-২০০৯, পূর্ব মেদিনীপুর।

ঘ

অন্তর্জাল (Internet Link)

১. indianexpress.com

২. purbamedinipur.gov.in

৩. bengali.mapsofindia.com

৪. shikshaloy.blogspot.com

—ঃঃ—